ভারতের ও বিদেশের সমবায়

শ্রীজয়দেব ব্যানার্জ্জী, এম. এ
অধ্যক্ষ, কল্যাণী সমবায় শিক্ষণালয়

টেকনিক্যাল পাবলিশার্স
২৩, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক : শ্রীসুনীল রায় চৌধুরী
টেকনিক্যাল পাবলিশার্স
২৩, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৭০

প্রচ্ছদপট :
শ্রীমাণিক সরকার

ছেপেছেন :
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, কলি-৯ (১—৬৪ পৃঃ)
ও
শ্রীবিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
তারকনাথ প্রেস
২, শিবদাস ভাদুড়ী স্ট্রীট, কলি-৪

বেঁধেছেন :
নিউ ক্যালকাটা বাইণ্ডার্স
কলিকাতা-৯

স্বর্গীয় পিতৃদেব ভবতারণ ন্যায়রত্নের
শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত

এই লেখকের অন্যান্য বই ঃ

Co-operative Movement in India

Co-operative Law and Practice in West Bengal

Consumers' Co-operation in Eastern Railway

ভূমিকা

শ্রীজয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে ইংরাজীতে সমবায় সম্বন্ধে একটি পুস্তক রচনা করে সুনাম অর্জন করেছেন। কিন্তু ইংরাজীতে লেখা বই গ্রামের সকল স্তরের মানুষের কাজে লাগে না। অথচ সমবায়কে সফল করতে হলে সকল শ্রেণীর সমবায় কর্মীর তার নীতি ও কার্য্যপদ্ধতির সহিত বিশেষ পরিচয় থাকা প্রয়োজন। এইজন্য বাংলায় অনুরূপ পুস্তক লেখার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সেই অভাব অতি তৎপরতার সহিত পূরণ করেছেন দেখে খুসী হয়েছি। একটি অতিরিক্তি তৃপ্তির কারণ হল এই যে এই দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁর থেকে উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া দুষ্কর। তিনি সমবায় কার্য্যে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিলেন, বর্ত্তমানে সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ এবং তৃতীয়তঃ এ বিষয়ে তিনি খ্যাতিমান্ লেখক।

গ্রন্থখানির আলোচ্য বিষয় খুব ব্যাপক। সমবায়ের নীতি, ভারতে সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস, বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায়ের কার্য্যপদ্ধতি, সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনায় তার স্থান প্রভৃতি সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বিশেষ করে বিদেশে বিভিন্ন জাতি যে বিভিন্ন শ্রেণীর সমবায় স্থাপন করেছেন, তার বিবরণ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় পাঠকের তুলনামূলক আলোচনার সুবিধা হবে। সংক্ষেপে বলা যায় যে সমবায় সংক্রান্ত সকল জ্ঞাতব্য তথ্য এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

বর্ত্তমানে ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত সমবায় ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত হয়েছে তা দু'টি নীতির উপর বিশেষ নির্ভরশীল। একটি হল পঞ্চায়েতের প্রসার এবং দ্বিতীয়টি হল সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি ও শিল্প গড়ে তোলা। সুতরাং গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় পঞ্চায়েত যদি হয় মেরুদণ্ড তা হ'লে সমবায় হবে তার স্নায়ুমণ্ডলীর সমস্থানীয়। আমাদের অভিজ্ঞতা হতে আমরা দেখেছি যে সমবায়ের সাফল্যের একটি প্রধান অন্তরায় হ'ল শিক্ষিত কর্মীর অভাব। এই পুস্তক সেই অভাব পূরণের সহায়তা করবে। যাঁরা শিক্ষার্থী তাঁরা পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পুস্তকখানি ব্যবহার ত করবেনই, আর যাঁরা শিক্ষণের সুবিধা হতে বঞ্চিত তাঁরা এই পুস্তক পাঠ করে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সহিত পরিচিত হতে পারবেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুধু যোদ্ধা হলে চলে না, তার উপযুক্ত হাতিয়ার চাই। এই পুস্তক আমার মনে হয় সেই হাতিয়ারের কাজ করবে।

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য।

মুখবন্ধ

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সমবায়ের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। সমবায় সম্বন্ধে জানবার ও সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করবার আগ্রহ তাই বর্ত্তমান সময়ে জনসাধারণের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলা ভাষায় পাঠক পাঠিকাদের সামনে বর্ত্তমান যুগের বহুমুখী ও ব্যাপক সমবায় আন্দোলনের একটি সামগ্রিক রূপ গ্রন্থাকারে উপস্থাপিত করবার কোনও প্রচেষ্টা কোন লেখক করেছেন বলে আমার জানা নেই।

অধ্যক্ষ 'শ্রীজয়দেব ব্যানার্জ্জীর লেখা "ভারতের ও বিদেশের সমবায়" এই অভাব বহুলাংশে দূর করবে এবং বাংলা দেশের সমবায় শিক্ষা প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য করবে। শ্রীযুক্ত ব্যানার্জ্জীকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আটাশটি পরিচ্ছেদে লেখা এই বইটিতে ভারতের সমবায়, ইহার ক্রমবিকাশ ও বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে। কৃষিঋণ, বিপণন, শিল্প, সমবায় চাষ, গৃহ নির্ম্মাণ, শ্রমিক সমবায়, ক্রেতা সমবায় প্রভৃতি সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন বিভাগ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লেখক প্রয়োজনীয় মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছেন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমাজ উন্নয়ন ও পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থায় সমবায়ের স্থান ও সমবায়ে সরকারী সাহায্য এবং এই বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ষ্টেট্ ব্যাঙ্কের ভূমিকা, নিবিড় চাষ পরিকল্পনা এবং ভারতের বাহিরে কয়েকটি দেশের সমবায় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা বইটিকে আধুনিক তথ্য সমৃদ্ধ ও বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করে তুলেছে।

অধ্যক্ষ শ্রীজয়দেব ব্যানার্জ্জী সমবায় সম্বন্ধে ইংরাজীতে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠার মূলে আছে তাঁর অধ্যবসায় এবং সমবায় কর্ম্মী ও শিক্ষকরূপে তাঁর নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতা। সহজ বাংলায় লেখা এই বইটি বাংলা ভাষায় অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও বাংলার সমবায় কর্ম্মীদের খুবই উপযোগী হ'বে বলে আমি মনে করি। অধ্যক্ষ শ্রীব্যানার্জ্জীর সঙ্গে আমিও আশা করি যে বাংলা দেশের সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির পথ প্রসারে এই বইটি তার অবদান যোগাবে।

শ্রীশ্যামসুন্দর দত্ত
পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রার

উপক্রমণিকা

বাংলা ভাষায় সমবায় সম্বন্ধে কোন পূর্ণাঙ্গ বই নেই। সমবায়ের মাধ্যমে ভারতের গ্রামীন অর্থনীতির পুনর্বিন্যাস করতে হ'বে, একথা দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হয়েছে। কৃষি এবং কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে সমবায়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বহু কমিটি এই অভিমতই প্রকাশ করেছেন যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চেষ্টা না করলে কৃষি ও কুটীর শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিরা কোনরূপ উন্নতি করতে পারবেন না, আর সমবায়েব ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াই যে প্রকৃষ্ট পথ তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। সমবায় বলতে সত্যি কি বোঝায় তা' ব্যাপকভাবে সারাদেশে প্রচার করা দরকার। তবেই সমবায়ের আবহাওয়া ও সমবায়ী মনোবৃত্তি গড়ে উঠ্‌বে। স্কুল-কলেজেও সমবায় যে একটি বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয় হওয়া উচিত বলে অনেকে মনে করেন, তারও এইটি কারণ। অনেক সময় দেখা গেছে যে, সমবায় সমিতির অধিকাংশ সভ্যও সমবায়ের সঠিক অর্থ বোঝেন না। সমবায় আন্দোলনের সুষ্ঠু প্রসারের পথে এটা মস্ত বাধাস্বরূপ। এই বাধা দূর করতে হ'লে বাংলা ভাষায় সমবায়ের মূল তথ্য জনসাধারণের কাছে পরিবেশিত হওয়া দরকার। বাংলা ভাষায় একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ সমবায় বিষয়ক বই-এর প্রয়োজনীয়তা সেই দিক হ'তে বেশী অনুভূত হয়। প্রধানতঃ বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির পথ প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে এই বই লেখা।

এই বইএর আগে ভারতের সমবায় সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় আমার লেখা একখানি বই প্রকাশিত হয়েছে। তার কিছুটা প্রভাব এই বই এর ওপর এসে যে পড়বে তা' স্বাভাবিক। তবে ইংরাজী বইএ বিদেশের সমবায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই নেই। বাংলা বইএ আটটি দেশের সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বাংলা বই-এ অনেক অধ্যায় বাদ দেওয়া হয়েছে এবং অনেক নতুন অধ্যায় যোগ করা হয়েছে। উপরন্তু ক্রেতা সমবায়ের ক্ষেত্রে ওয়াকিং গ্রুপের সুপারিশ, নিবিড় চাষ পরিকল্পনা প্রভৃতি বাংলা বই-এ সন্নিবেশিত হয়েছে যা' ইংরাজী বই-এ ছিল না। এই সব দিক হ'তে বিচার করলে বাংলা বইটিতে আরও তথ্যের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যাবে। আর ভারতের বর্ত্তমান গতিশীল সমবায় আন্দোলনের সব কিছু উল্লেখযোগ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় যা' আজ পর্য্যন্ত ঘটেছে তা' এই পুস্তকে সংযোজিত হয়েছে।

ভারতের সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে অগ্রণী প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক ভাষায় সমবায় বিষয়ক বই অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছে। তার ফলে

সেখানকার সমবায় কর্মীর যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে বলে জানা গেছে। বাংলা ভাষায় লিখিত এই বইও সরকারী ও বে-সরকারী সমবায় কর্মীদের সহায়ক হ'বে বলেই আশা করি। নিম্ন পর্য্যায়ের সমবায় শিক্ষণালয়গুলিতে এবং গ্রাম্য সমবায় সমিতির বর্ত্তমান ও ভাবী সভ্য ও কর্মকর্ত্তাদের শিক্ষণকালেও এই বই ব্যবহৃত হতে পারে। এই প্রদেশের স্কুল-কলেজেও এই বই পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গৃহীত হতে পারে। তাঁরা উপকৃত বোধ করলেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

পরিভাষা সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলা দরকার মনে করি। এই বই এ যে পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা' প্রায় আমার নিজস্ব। যা' জনসাধারণ বুঝতে পারে এই রকম পরিভাষা তৈরী করে ব্যবহার করেছি। তা' ছাড়া যে সব ইংরাজি শব্দের পরিভাষা দুর্বোধ্য হয় সেগুলির ইংরাজি শব্দ রেখে দিয়েছি। বলা বাহুল্য, সেগুলি বাংলা অক্ষরেই লিখেছি, যেমন, ব্যাঙ্কিং, কমিটি, রেজিষ্ট্রী প্রভৃতি। এইটাই সহজবোধ্য হ'বে বলে মনে করি। ব্যবহৃত পরিভাষার মোটামুটি একটি তালিকা পুস্তকের শেষে দেওয়া হল।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন উন্নয়ন কমিশনার শ্রীহিরণ্ময় বন্দোপাধ্যায় আই. সি. এস. মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতি সমূহের রেজিষ্ট্রার শ্রীশ্যামসুন্দর দত্ত আই. এ. এস. মহাশয় মুখবন্ধটি লিখে দেওয়ায় আমি তাঁর কাছেও চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। প্রাক্তন সহকর্মী ও অধ্যাপক শ্রীসুবোধ চন্দ্র গোস্বামী এবং অধ্যাপক শ্রীসত্যেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের কাছেও আমি ঋণী। টেক্‌নিক্যাল পাব্‌লিশার্সের পক্ষে শ্রীসুনীল রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রচেষ্টায় পুস্তকটি এই বৎসর কবিগুরুর জন্ম সপ্তাহে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই। আমার প্রতি পুস্তক প্রকাশের পিছনেই আমার প্রাক্তন ছাত্র ও সমবায় পরিদর্শক শ্রীঅতুল্য চন্দ্র ব্যানার্জ্জীর অবদান অসামান্য। তার কাছে আমি চিরঋণী রইলাম। এই বই লিখতে আমাকে বহু বই-এর সাহায্য নিতে হয়েছে। আমি সে সব বই এর লেখকদের কাছেও ঋণ স্বীকার করি। ইতি—

কল্যাণী
৩০শে বৈশাখ ১৩৭০
(ইং ১৪।৫।৬৩)

জয়দেব ব্যানার্জ্জী

সূচীপত্র

অশুদ্ধি শুদ্ধিকরণ

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭	১৬	অবাখহনায়	অবাঞ্ছনীয়
৩৮	১৭	অং গ্রহণ	অংশগ্রহণ
৪৯	১৮	সরবরায়	সরবরাহ্
৭১	৪	১৩৫৩	১৯৫৩
১১১	৩০	তাছারা	তা' ছাড়া
১৪১	৮	অগ্রসর	অনগ্রসর
১৮০	৭	উপৎপাদন	উৎপাদন
২৫৪	৫	খচর	খরচ
২৫৭	২৪	গভেষণামূলক	গবেষণামূলক
২৭৩	২০	উন্নতর	উন্নততর
৩০২	২০	ব্যহত	ব্যাহত
৩০২	২৯	দারস্থ	দ্বারস্থ
৩০৯	১২	স্বাস্থ্যোন্নতির	স্বাস্থ্যোন্নতির
৩২৪	২৯	সমবায়ে	সমবায়
৩৪৫	১৯	গ্র গ্রণ	গ্রহণ
৩৪৫	২২	ফণ্ড	ফাণ্ড
৩৫২	১	৵০	৩৫২
৩৫২	২৩	রাষ্ট্রপুঞ্জ্য	রাষ্ট্রপুঞ্জ

ভারতের ও বিদেশের সমবায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমবায় কাকে বলে? রচ্‌ডেলের অগ্রদূত সমিতির উদাহরণ:

সমবায়ের অপর নাম সহযোগিতা। ইংরাজীতে সমবায়কে বলা হয়, 'কো-অপারেশন'। এই সহযোগিতা বা কো-অপারেশন মানুষের জীবনের প্রতি স্তরেই প্রয়োজন। মানুষ মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা করে বলেই সমাজ-জীবন সম্ভবপর হয়েছে। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে বলেই জীবনধারণ সম্ভবপর হয়। সুতরাং সহযোগিতা বা সমবায় সর্ব্বত্র প্রয়োজন। কিন্তু আমরা যে অর্থে সমবায়কে ব্যবহার করতে চাই, তা' এই রকম সহযোগিতা নয়। আমরা সমবায় বলতে কাজ করার এমন এক রীতি মনে করি যার মধ্য দিয়ে আর্থিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। কোন একজন লোক একক প্রচেষ্টা দ্বারা তার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সুবিধা দরে কিনতে পারে না। যাদের কাছ থেকে তাকে কিনতে হয় তারা হয়ত খুব চড়া দাম নেয়, আর বেশ ভাল মালও দেয় না। এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তারা শুনবেও না, শুনতে বাধ্যও নয়। তা হলে উপায় কি? উপায় আছে। যদি তার মত অপরাপর সকলে একত্রিত হয় আর সহযোগিতা করে তা হলে একটা সুরাহা হয়। তারা তাদের মাল কেনার টাকা যদি একত্রিত করে বড় কোন বাজার থেকে মাল কিনে নিয়ে আসে, তা হলে দরও সুবিধা হয়, আর মালও ভাল পেতে পারে। আর একটু এগিয়ে গিয়ে যদি তারা তাদের যৎসামান্য পুঁজি বা সঞ্চয় একত্রিত করে একটি মাল কেনা-বেচার দোকান খুলতে পারে তা হলে এই অবস্থার উন্নতি হয়।

ঠিক এই রকমটি করেছিল বিলাতের রচ্‌ডেল নামক এক জায়গার কতকগুলি লোক ১৮৪৪ সালে। তাদের সেই চেষ্টার ইতিবৃত্ত জানলে

সমবায়ের নীতিগুলি হৃদয়ঙ্গম করার সুবিধা হবে। সেই সময় ঐ জায়গায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না। যাও পাওয়া যায়, তার' দাম চড়া। অথচ লোকের রোজগারের পরিমাণ স্বল্প। রচ্‌ডেলে তখন ছিল ফ্লানেল কাপড়ের কল বা মিল বেশী। সেখানকার ২৮ জন তন্তুবায় ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের একদিন এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিল। সে সময় রচ্‌ডেলে শ্রমিকদের সাপ্তাহিক আয়ের পরিমাণ কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র ছয় পেন্স অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ আনা বা ৩৪ নয়া পয়সার মত। অবশ্য কারও কারও সাপ্তাহিক আয় বেশীও ছিল ; যেমন, ১০ পেন্স হতে দেড শিলিং বা ১১ আনা হতে দেড টাকার মত। তাদের চড়া দরে মাল কিন্‌তে হত বলেই একত্রিত হয়ে কথাবার্ত্তা বলছিল। ঐ ২৮ জনের মধ্যে অধিকাংশই ছিল নিরক্ষর অর্থাৎ তারা লিখতে পড়তে জান্‌ত না ; মাত্র ৩।৪ জন লেখাপড়া জান্‌ত। এদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও ছিল। যখন তারা ঐ চড়া দরে মাল কেনার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছিল তখন তাদেব মধ্যে একজন প্রস্তাব করল যে একসঙ্গে সব মাল কিনে আনা যাক নিকটবর্ত্তী বড় বাজার হতে। কারণ একসঙ্গে বেশী কেনার দরুন দামেও সুবিধা হবে আর মালও ভাল পাওয়া যাবে। আর একজন সেই কথার সূত্র ধরে বল্‌ল যে একটা ছোটখাট দোকানই খোলা যাক না কেন ! কিন্তু অন্য একজন সাবধান করে দিল যে তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। কেননা সে নিজে জানে যে এই রকম ভাবে দোকান অনেকে খুলেছিল, কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত টিকতে পারেনি, দোকান গুটিয়ে ফেল্‌তে হয়েছে। অপর একজন জানাল যে এই দোকানগুলোর উঠে যাওয়ার কারণ তার জানা আছে। তারা ধারে মাল বিক্রয় করত আর শেষ পর্য্যন্ত তা আদায় করতে পারত না।

এই কারণটা শুনে সকলে ভাবল, কারণ যখন জানা গেছে তখন এর প্রতিকারও করা যেতে পারে। কেউ ধারে মাল না কিন্‌লেই ত সব সমস্যা মিটে যায়। যা তারা কিনবে তা তারা নগদ দামেই কিনবে। সকলেই তাতে সায় দিল। কিন্তু দোকান খোলার মত তাদের টাকা কোথায় ? আয় অত কম। পুঁজিও কিছু নেই। আর সঞ্চয়ই বা তারা কি করে করবে ঐ কম আয় থেকে। তার উপর এই দরিদ্রদের বিশ্বাস করে ধারও কেউ দেবে না।

ভাবিত হয়ে পড়ল তারা।

কিন্তু কথা আছে 'ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়'। তারা ঠিক করল যে তারা কিছু কিছু সঞ্চয় করবেই এবং সকলে মিলে ২৮ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় চারশ কুড়ি টাকা মত না জমা পর্য্যন্ত সঞ্চয় করে যাবে। তাদের মধ্যে একজন ঐ সঞ্চয়ের অর্থ বাড়ী বাড়ী গিয়ে আদায় করতে থাকবে যতক্ষণ না ঐ পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হয়।

অন্য একজন আর এক সমস্যার কথা তাদের সামনে তুলে ধরল। তারা যখন ভাল মাল ন্যায্য দামে নিজেদের মধ্যে বেচাকেনা করবে তখন ওখানকার দোকানদারেরা নিশ্চয় তাদের দোকানে মালের দাম কমিয়ে দিয়ে চেষ্টা করবে তাদের প্রলুব্ধ করতে, যাতে তারা ঐ কম দামে মাল কিনতে যায় ঐ সমস্ত দোকান হতে! তখন কি তারা ঐ প্রলোভন জয় করতে পারবে? তারা কি পারবে ঐ সব দোকানদারের কারসাজি বুঝতে? কারণ তন্তুবায়দের নিজস্ব দোকান ফেল করলেই তারা আবার চড়া দাম চাইতে পারবে।

এটা সত্যই একটা সমস্যা বটে। তারা প্রতিজ্ঞা করল যে কিছুতেই তারা এই প্রলোভনে ভুলবে না। তারা তাদেব দোকান হতে যে যে মাল পাওয়া যায় সে মাল তাদেব নিজেদের দোকান হতে কিন্‌বেই। এরপর চল্‌ল তাদের সঞ্চয়ের পালা। তারা শেষ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হ'ল। ২৮ পাউণ্ড তারা জমাল। ঐ রচডেলের টোডলেন নামে এক গলিতে তারা দোকান ভাড়া নিল। তাদের পুঁজি কম বলে তারা পাঁচটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে বেচাকেনা করবে স্থির করল; সেগুলি হচ্ছে ময়দা, মোমবাতি, চিনি, মাখন, ওট্‌মিল। আর একটি ব্যাপারে তারা একমত হোল। মাল বেচাকেনার দরুন তাদের লাভ কিছু হবেই, যে লাভ দোকানদারেরা করত। তারা ঠিক করেছিল যে বাজার দরেই তাবা জিনিস বিক্রী করবে। তাতে বাজারের দোকানদাররা তাদের উপর ঈর্ষান্বিত হবে না, আর তার ফলে তারা প্রতিযোগিতাও করবে না। যে লাভ হবে তা তারা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেবে। বণ্টন করার পদ্ধতি হবে মাল কেনার অনুপাতে। অর্থাৎ যে যত মাল কিনবে সে সেই অনুপাতে তত বেশী লাভের অংশ পাবে। অর্থাৎ যে একশত পাউণ্ডের মাল কিনবে সে যদি লাভের অংশ পায় ছয় পাউণ্ড তাহলে যে দেড়শত পাউণ্ড মূল্যের মাল কিনবে সে পাবে নয় পাউণ্ড, আর যে দুইশত পাউণ্ডের মাল কিনবে সে পাবে বার পাউণ্ড। দোকান খুল্‌তে যে যত অর্থ দিয়েছে সেই হিসাবেই তারা লাভের অংশ ভাগ করে নিতে পারত। কিন্তু তা তারা

করল না। কারণ মাল বেচার সময় বাজার দরে তারা মাল বিক্রী করবে ঠিক করেছিল যাতে বাজারের দোকানদাররা চটে না যায়। ফলে ন্যায্য দামের চেয়ে বেশী দাম তাদের দিতেই হবে। তবে ঐ বেশী দাম দেওয়াটা তারা পরে ফিরিয়ে দেবে যে যত মাল কিনবে তার অনুপাতে লাভের অংশ বণ্টন করে।

এর একটা ভাল দিক আছে। বাজার দরে কেনার দরুন বেশী দাম দিতে যে 'বাড়তি' দাম তারা দেবে তা বরং তাদের এক ধরনের সঞ্চয়ের সামিল হবে এবং বছর শেষে তার পরিমাণ যথেষ্ট বেশী হবে। সেটা এককালীন পেয়ে তাদের অনেক উপকারও হবে। তাদের দোকান খোলার এই সংবাদটা রচডেল শহরে জানাজানি হয়ে গেল। ওরা ঠিক করেছিল যে ১৮৪৪ সালের ২১শে ডিসেম্বর দোকান খুলবে। ঐ দিন তাদের সেই ভাড়া করা দোকান ঘরের সামনে অনেক লোক জমা হতে লাগল। তাদের অনেকে তাদের সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক কথা বল্‌তে লাগল। তন্তুবায়রা ভয় পেয়ে গেল; কিন্তু তাদের মধ্যে একজন দোকানের দুয়ার-জানলা খুলে দোকানের কাজ আরম্ভ করে দিল।

এভাবেই তাদের যাত্রা হল শুরু। খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে লাগল তারা। ঠাট্টা বিদ্রূপ শুনে তাদের সতর্কতা বেড়ে গেল এবং যে সব সঙ্কল্প নিয়ে তারা কাজ আরম্ভ করেছিল সেগুলি হতে তারা এতটুকু বিচ্যুত হল না। নগদ দামে তারা মাল কিনে চল্‌ল। নিজেদের দোকানে যা পাওয়া যায় তা তারা অন্য কোথাও কিনল না। দিনের বেলা তারা কাপড়ের কলে কাজ করে আর রাত্রে বিনা মজুরিতে দোকানের কাজ করতে থাকে।

এভাবে এক বৎসর কাজ করবার পর তাদের যে লাভ হল তা তারা নিজেদের মধ্যে মাল কেনার অনুপাতে বণ্টন করে নিল। সেই সময় যীশুখৃষ্টের জন্মদিনের পর্ব্ব এসে গেছে। তারা ঐ অর্থ দিয়ে পরিবারবর্গের নূতন পোশাক কিনে দিল। সেই পোশাক পরে তারা ১৮৪৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর সকালে গীর্জ্জায় হাজির হল। ওখানকার লোকেরা এত গরীব ছিল যে তাদের নূতন পোশাক কিনে পরার সামর্থ্য ছিল না। তারা কিছুদিনের ব্যবহার করা জামাকাপড়, যাকে ইংরাজীতে বলে 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড' কাপড় চোপড়, তাই কিনত পয়সার অভাবে। ঐ তন্তুবায়দের পরিবার-বর্গের লোকেদের নূতন কাপড় পরতে দেখে অন্যান্য সকলে আশ্চর্য্য হয়ে

গেল। তাদের জিজ্ঞাসা করতেই তারা বলল যে এই নূতন পোশাক দিয়েচে তাদের দোকান, যে দোকানের নাম তারা দিয়েছিল 'রচডেল ইকুইটেবল পাইওনিয়ার্স সোসাইটী' অর্থাৎ রচডেল ন্যায়পর অগ্রদূত সমিতি। কি কি নীতি অনুসরণ করে তারা কৃতকার্য্য হয়েচে তা সকলকে জানাল। বছর শেষে লাভের ভাগ হতেই এই সব পোশাক কেনা। কথাটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং ইংলণ্ডের অন্য সব জায়গাতেও ঐরকম সমবায় প্রথায় দোকান বা ভাণ্ডার স্থাপিত হতে লাগল। বর্ত্তমানে এই রচডেলের সমিতিটি এত বড় হয়েচে যে তাতে কর্ম্মচারীর সংখ্যা এখন পাঁচ হাজারের ওপর এবং সমিতির প্রায় দুশ'র ওপর নিজস্ব কারখানা আছে। পৃথিবীতে সমবায় প্রথায় কাজ করার পদ্ধতি এরাই উদ্ভাবন করেছিল, তাই সত্যই এরা অগ্রদূত।

ওপরে যে বিবরণী দেওয়া হল রচডেল পাইওনিয়ার্স বা অগ্রদূত তন্তুবায়দের সম্বন্ধে, তা অনুধাবন করলে কতকগুলো নীতির সন্ধান পাওয়া যাবে এবং সেই নীতিগুলিই মোটামুটি সমবায়ের নীতি বলে স্বীকৃত হয়েছে। তারা নিজেরাও এ সম্বন্ধে কতকগুলি সুস্পষ্ট নীতি লিপিবদ্ধ করেছিল। সেগুলো পরবর্ত্তী অধ্যায় আলেচিত হবে।

প্রথমেই বলা হয়েচে যে মিলেমিশে কাজ করার নাম সমবায়। একা একা যা পারি না সকলে মিলে তা করতে সমর্থ হতে পারি। এটাই সমবায়ের মূলকথা। কিন্তু এই মিলেমিশে কাজ করার উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হওয়া চাই। এ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম যে গুণ থাকা দরকার তা হচ্চে সমিতির সভ্যদের চারিত্রিক দৃঢ়তা। যদি রচ্‌ডেলের ঐ তন্তুবায়গণ নিজেদের দোকান হতে মাল না কিনে বাজারের দোকানদারের প্রলোভনে ভুলত, কিংবা নিজের স্বার্থটি মিটিয়ে সকলের স্বার্থ সম্বন্ধে উদাসীন হত, তাহলে তাদের সমিতি কৃতকার্য্য হত কিনা সন্দেহ। তাই সমবায় প্রথায় কাজ করার প্রথম উপকরণ হ'ল—যে সব ব্যক্তিদের নিয়ে সমিতি গঠিত হবে তারা একটু উঁচুদরের মানুষ হওয়া চাই। যেখানে তার অভাব, সেখানে সমবায় সফল হয়ংনা। এজন্য সমবায় আন্দোলনকে নৈতিক আন্দোলন বলা হয়। মোটামুটি বল্‌তে গেলে সমবায় হচ্চে যে কোন সমস্যা সমাধানের মিলিত প্রয়াস—তবে সেই সমস্যা অর্থনৈতিক হলে তার সমাধান বড় জরুরী মনে হয় এবং সেজন্য সমবায়কে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের মিলিত প্রয়াস বলা হয়ে থাকে। সকলপ্রকার অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রেই সমবায়ের

নীতি অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব। কিন্তু এখানে একথাও মনে রাখা দরকার যে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানই সমবায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, এর মাধ্যমে সামাজিক সমস্যারও সমাধান করা যেতে পারে—তবে তাকে সমবায়ের গৌণ উদ্দেশ্য বলে ধরা হয়ে থাকে।

সমবায়ের সংজ্ঞা

বহু লেখক সমবায়ের বহু রকমের সংজ্ঞা দিয়েছেন, কিন্তু কোন সংজ্ঞাই নিঁখুত নয়। সেই সকল সংজ্ঞার কয়েকটি এখানে দেওয়া হ'ল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সমবায় বিষয়ক আইন আছে তার কোনটিতেই সমবায়ের কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। সি. আর. ফে (C. R. Fay) সমবায়ের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন :—"সমবায় সমিতি যৌথভাবে কারবার করার জন্য গরীবদের এমন এক সংস্থা যা তারা নিঃস্বার্থভাবে পরিচালিত করে এবং যেখানে পরিচালনার এমন শর্ত থাকে যে যারা সভ্যপদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে তারা যে যতটুকু ঐ সংস্থার মাধ্যমে কাজ করবে তদনুপাতে ঐ সংস্থার লভ্যাংশের অধিকারী হবে।" এই সংজ্ঞার ত্রুটি এই যে এখানে সমবায়কে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় স্বরূপ মনে করা হয়েছে এবং অন্য সকল উদ্দেশ্যকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

এম. টি. হেরিকের (M. T. Herick) সংজ্ঞা এরূপ :—"যখন কয়েকজন মানুষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাদের নিজেদের ক্ষমতা বা সঙ্গতি বা উভয়ই—পারস্পরিকভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মিলিত হয় এবং সেই মিলন হতে উদ্ভূত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা তারা যৌথভাবে করে এবং তার লাভ-লোকসান যৌথভাবেই গ্রহণ করে তখন সেই মিলিত প্রয়াসকে সমবায় বলে।" এখানে যৌথ প্রযাস ও স্বাবলম্বনের ওপর এবং স্বেচ্ছামূলক ভিত্তির ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে।

বিখ্যাত আইরিশ লেখক হোরেস্ প্লাঙ্কেট (Horace Plunkett) সমবায়ের এরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন—"সমবায় হচ্ছে স্বাবলম্বন, যা সংগঠনের মাধ্যমে কার্য্যকরী করা হয়।" এখানেও স্বাবলম্বনের ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। স্বাবলম্বন সমবায়ের একটি প্রধান নীতি সন্দেহ নেই—তবে তা এক মাত্র নীতি নয়।

এইচ. ক্যালভার্টের (H. Calvert) সংজ্ঞা—"সমবায় এমন এক প্রতিষ্ঠান যেখানে মানুষ নিজেদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে সাম্যের

ভিত্তিতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মানুষ হিসাবে মিলিত হয়।" প্রফেসার কে. আর. কুলাকার্নি (Prof. K. R. Kulkarni) এর সঙ্গে যোগ করে দিয়েচেন যে, ঐ উদ্দেশ্য-সাধন সদুপায়ে করতে হবে। এই সংজ্ঞাও ত্রুটিহীন নয়। এখানে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায়ের ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়েচে। তাহলেও আমরা এই সংজ্ঞাকে গ্রহণ করতে পারি; কারণ মোটামুটি সমবায়ের অধিকাংশ নীতিই এর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েচে।

সমবায়ের নীতিসমূহ

উক্ত সংজ্ঞাগুলি বিশেষতঃ ক্যালভার্টের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে সমবায়ের কতকগুলি মূল নীতি লক্ষ্য করা যাবে। সেগুলি হচ্চে:

(১) সমবায় প্রতিষ্ঠানে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলিত হয় মানবিকতার ভিত্তিতে এবং তা মূলধনে মূলধনে মিলন হতে স্বতন্ত্র যা জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীতে দেখা যায়। প্রতি সভ্যের একটি করে ভোটের অধিকার থাকে।

(২) এখানে মানুষ সভ্যপদ গ্রহণ করে স্বেচ্ছায়। এই স্বেচ্ছামূলকতা সমবায়ের একটি মূল নীতি।

(৩) সমবায়ে যে মানুষে মানুষে মিলন ঘটে তার ভিত্তি সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

(৪) সভ্যদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন সমবায়ের একটি প্রধান মূলনীতি।

(৫) এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অসাধু পথ গ্রহণ করা চলে না; তা সদুপায়ে করতে হয়।

(৬) সমবায় সংস্থার যে লাভ হয় তা সমবায় সমিতির মাধ্যমে কাজ করার অনুপাতে বণ্টন করা হয়।

(৭) সর্ব্বজনীনতা সমবায়ের একটি নীতি। যে কোন ব্যক্তি সমবায় সমিতিতে যোগদান করতে পারে। উপযুক্ত গুণাবলীর অধিকারী যে কোন ব্যক্তির নিকট সমিতির সভ্যপদ খোলা থাকে।

(৮) মূলধনের উপর স্বল্পমাত্রায় সুদ। এর ফলে লাভ করার স্পৃহা কমে যায় এবং সভ্যদের কাজে লাগা বা সেবা করার মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে।

(৯) সঞ্চয় একটি সমবায় নীতি।

(১০) স্বাবলম্বন এবং পারস্পরিক সাহায্য।

(১১) রাজনৈতিক ও ধর্ম্মীয় ব্যাপারে নিরপেক্ষতা।

এখন এই নীতিগুলির বিশদ আলোচনা করা যাক—

(১) মানুষে মানুষে মিলন, মূলধনে মূলধনে নয় (সমবায় সমিতি ও জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীর মধ্যে পার্থক্য):

জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীতে যে ব্যক্তি যত বেশী শেয়ার বা অংশগত মূলধন ক্রয় করে সেই কোম্পানীর পরিচালনার ব্যাপারে তার তত বেশী ক্ষমতা থাকে। এজন্য জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীতে পরিচালন ক্ষমতা যে কয়জন বেশী শেয়ার কেনে তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সমবায় সমিতিতে কোন সভ্য বেশী শেয়ার কেনার জন্য বেশী ক্ষমতার অধিকারী হয় না। সেখানে সকল সভ্যই এদিক হতে সমান ক্ষমতার অধিকারী এবং শেয়ার ক্রয়ের ওপর সে ক্ষমতা নির্ভর করে না। তাই বলা হয় যে সমবায় সমিতিতে যে মিলন হয় তা মানুষে মানুষে মিলন, মূলধনে মূলধনে মিলন নয়। সমবায় সমিতিতে একজন সভ্য মাত্র একটি দশ টাকার শেয়ার কিনলে একটি ভোটের অধিকারী হয়, আবার এক হাজার টাকা মূল্যের শেয়ার কিনলেও তার একটি ভোটই থাকে। প্রতি সভ্যের একটি ভোট—এটাই সমবায় নীতি। সুতরাং শেয়াররূপী মূলধনের স্থান মানুষের ওপরে নয়। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এটা সমবায় স্বীকার করে। একজন সভ্য হচ্চে মানুষ এবং মানুষ বলেই তার একটি ভোট। জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীতে মানুষের এত উচু স্থান নেই। সেখানে শেয়ার অনুপাতে ভোটের অধিকার। আবার জয়েণ্ট স্টক কোম্পানীতে একজন ধনী লোক অনেক টাকার শেয়ার কিনতে পারেন। তাঁর উদ্দেশ্য থাকে যে তিনি ঐ টাকার ওপর মোটা লভ্যাংশ বা ডিভিডেণ্ড পাবেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের কাজ-কর্ম্মের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ নাও থাকতে পারে। তিনি মোটা লভ্যাংশ পেয়েই সুখী। কিন্তু সমবায় সমিতিতে এ-রকমের সম্ভাবনা নেই। কারণ সব জায়গার সমবায় সমিতির শেয়ারের ওপর ডিভিডেণ্ডের হার বেঁধে দেওয়া হয়। বঙ্গদেশীয় সমবায় বিষয়ক আইনের ৬৭ ধারায় এবং ঐ সংক্রান্ত রুলের ১০২ নং রুলে শেয়ারের ওপর ডিভিডেণ্ডের হার বেঁধে দেওয়া হয়েচে অনধিক শতকরা ৯ টাকা হিসাবে। এই রকম না করলে মুনাফালাভের দিকে সমিতির ঝোঁক বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু সমবায় সমিতির একটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে যে সভ্যদের প্রয়োজনে এবং তাদের সেবার কাজে লাগা। মুনাফালাভের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে এই কাজ বাধা-

প্রাপ্ত হবে। উপরন্ত সমবায় সমিতির লাভ এবং অর্থনীতিতে যে লাভ বা profit-এর কথা বলা হয় সেই লাভ এক নয়। সমবায় সমিতির লাভকে বলা হয় সারপ্লাস (surplus) বা বাড়তি আয়, যার সবটাই সভ্যদের ফিরিয়ে দিতে পারা যায়।

কি পদ্ধতিতে তা সম্ভবপর? সে পদ্ধতি জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানীর পদ্ধতি নয়। অর্থাৎ শেয়ারের অনুপাতে তা ফেরত নয়। সমবায়ের পদ্ধতি হচ্ছে সেই পদ্ধতি যা রচডেলের অগ্রদূত সমিতি উদ্ভাবন করেছিল। যে যত সমিতির কাজে অংশ গ্রহণ করেচে তাকে তত বেশী লাভের অংশ ফেরত দেওয়া হবে। কারণ তারা সমিতির কাজে অংশ গ্রহণ (যেমন দোকান বা ভাণ্ডার সমিতির বেলায় সমিতি হতে ক্রয়) করার দরুনই লাভ হয়েচে। সুতরাং এটাই ন্যায়সঙ্গত যে সেই লাভের অংশীদার তারাই হবে এবং তা হবে সেই কাজের অনুপাতে।

একটি ভাণ্ডার সমিতির কথা ধরা যাক। সেই সমিতিটি পঞ্চাশ হাজার টাকার মাল বিক্রয় করে দেড় হাজার টাকা লাভ করল। এই যে লাভ হল তা সভ্যরা মাল কিনেচে বলেই সম্ভবপর হয়েচে। যদি তারা না কিনত তা হলে অত বিক্রয় হোত না। সুতরাং বিক্রয় করার সময় নিশ্চয়ই সভ্যদের নিকট হতে বেশী আদায় হয়েচে; নইলে লাভ হল কেন? যে বেশীটুকু দামের সঙ্গে নেওয়া হয়েচে সেটুকুই লাভ হয়েচে। এখন এইটুকুর সবটা সভ্যদের মাল কেনার অনুপাতে ফেরত দিলে ঐ বাড়তি আদায়টুকুও ফেরত দেওয়া হয়ে যায় এবং কোন লাভ আর থাকে না। মাল কেনার অনুপাতে ফেরত দেওয়ার নিয়ম এরূপ করা যেতে পারে যে টাকায় দুই নয়া পয়সা ফেরত দেওয়া হবে অর্থাৎ যদি কোন সভ্য একশো টাকার মাল কিনে থাকেন তিনি ফেরত পাবেন দুইটাকা আর যিনি এক হাজার টাকার মাল কিনেচেন তিনি পাবেন কুড়ি টাকা। এই মাল কেনার অনুপাতে ফেরত দেওয়াকে ইংরাজীতে বলে কেনার ওপর রিবেট বা ডিভিডেণ্ড (Rebate or Dividend on purchase)। আমরা এই উদাহরণ দেওয়ার সময় ধরে নিয়েচি যে সমিতি সভ্য ছাড়া অন্য কাউকেই মাল বিক্রয় করেনি বা সংরক্ষিত তহবিল বা রিজার্ভ ফণ্ডের জন্য কোন টাকা রাখা হয়নি। আমরা ওপরে যে এগারটি নীতির আলোচনা করেচি তার ১নং, ৬নং ও ৮নং নীতিগুলির আলোচনা এখানে করা হল।

(২) স্বেচ্ছামূলকতা : যে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে যে কোন সমবায় সমিতির সভ্য হতে পারেন। সমবায় সমিতিতে কাউকে জোর করে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হয় না। আবার যখন ইচ্ছা তখনই তিনি সভ্যপদে ইস্তফা দিয়ে সমিতি হতে চলে আসতে পারেন। তবে সভ্য হবার আগে সমিতির সভ্য হবার গুণগুলি তাঁর থাকা চাই। যেমন—উপযুক্ত বয়স হয়েচে কিনা, সমিতির এলাকার মধ্যে তাঁর বাস কিনা ইত্যাদি। সভ্যপদ ত্যাগ করার সময়ও তাঁর কোন দেনা বাকী থাকলে বা কোন দেনার জামীন হয়ে থাকলে সে দেনা পরিশোধ না হওযা পর্য্যন্ত সভ্যপদে ইস্তফা দিতে দেওয়া হয় না। বঙ্গদেশীয় সমবায় সমিতি বিষয়ক রুলের ১৩নং রুলে এরকম ব্যবস্থা আছে।

(৩) ক্ষমতা : সমবায় সমিতিতে সকল সভ্যেরই সমান অধিকার। এখানে ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, উচ্চ-নীচের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সভ্যগণ সমিতি গঠন করেন সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমিতিতে সকল সভ্যেরই সমান অধিকার থাকে।

(৪) অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন : যে উদ্দেশ্য নিয়ে সভ্যগণ সমবায় সমিতি গঠন করেন তার প্রধান হল অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন। আর্থিক কোন সমস্যার যৌথভাবে সমাধান করার জন্যই সমবায় সমিতি গঠিত হয়। তবে সকল সভ্যেরই সমস্যা যদি একই ধরনের হয় তাহলে কাজ করার সুবিধা হয়। যেমন সকল সভ্যই যদি কৃষক হন, তাহলে তাঁরা কৃষির যে যে বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য মিলিত হয়েচেন তার সমাধান করা সুবিধাজনক হয়। কিন্তু ঐ সমিতির মধ্যে যদি তন্তুবায়, মৎস্যজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক থাকে, তাহলে কার সমস্যা আগে সমাধান করার জন্য সমিতি কাজ করবে তা নিয়ে বিরোধ বাধতে পারে।

আর একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার। সমবায় সমিতির এই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন একটি প্রধান নীতি হওয়ায় কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা ক্রীড়াসংঘ বা ফুটবল ক্লাব প্রভৃতিকে আমরা সমবায় সমিতিরূপে গ্রহণ করতে পারি না। কারণ ঐ সব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সভ্যদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের সম্ভাবনা থাকে না। ঠিক তেমনভাবেই আমরা ট্রেড ইউনিয়নকে সমবায়ের পর্য্যায়ভুক্ত মনে করতে পারি না। কারণ ট্রেড্ ইউনিয়ন সভ্যদের আর্থিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন কাজ বা ব্যবসা করে

না। ট্রেড্ ইউনিয়ন সাধারণত মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করে সভ্যদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে।

(৫) সাধু উপায়ে কাজ করা : সমবায় সমিতিতে অসাধুতার কোন স্থান নেই। সমবায় সমিতি যে ব্যবসা করবে তা সদুপায়ে করতে হবে। গাঁট-কাটাদের সমবায় সমিতি হতে পারে না। উপরন্তু সমবায় সমিতি কোন কালোবাজারী বা ব্ল্যাক মার্কেটিং করতে পারে না।

(৬) লাভ বণ্টনের ন্যায়পর পদ্ধতি : ১নং নীতি আলোচনা প্রসঙ্গে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

(৭) সর্ব্বজনীনতা : যখন ভাণ্ডার সমিতির মত কোন সমবায় সমিতি মাল কেনা-বেচার কাজ করে তখন সেই সমিতি সভ্য ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিকেও মাল বিক্রয় করে লাভ করে থাকে এবং এই বিক্রয়ের ফলে যে লাভ হয় তা ঐ 'অন্যান্য ব্যক্তিরা' পান না। কারণ লাভ বণ্টন হয় সভ্যদের মধ্যে। সুতরাং সভ্য ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিরা বাড়তি দাম দিয়ে লোকসান বরণ করেন। সমাজের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে একদল লোক (যারা সভ্য) অন্য একদল লোকের কাছ হতে (যাঁরা সভ্য নন) বেশী দাম নিয়েছেন। এইরূপ মন্তব্য এক সময় রাশিয়ার সাম্যবাদীরা করেছিলেন এবং সেজন্য তাঁরা সমবায় সমিতিকে ধনতন্ত্র বা ক্যাপিট্যালিজ্‌মের দোসর বলে মার্কা করে দিয়ে সমবায় সমিতির গঠন বন্ধ করে দেন। বস্তুত পক্ষে সমবায়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বাহ্যতঃ সত্য। কিন্তু সমবায় সমিতিতে যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময় সভ্য হতে পারে। সভ্য ছাড়া অন্য ব্যক্তিরা যদি মনে করে সমিতির সভ্য হলে তাদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হবে, তাহ'লে তাতে কোন বাধা নেই। সমবায় সমিতির সভ্য হওয়ার পথ সব সময়ই উন্মুক্ত থাকে। এটাই সমবায়ের সর্ব্বজনীন রূপ ও নীতি। সুতরাং এখানে শোষণের কোন প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া সমবায় সমিতির কাজ সভ্য শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকারই কথা। যেখানে তা সভ্য ছাড়া অন্যের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে সেখানে 'এই অন্যেরা' সভ্যশ্রেণীভুক্ত হতে পারেন। সমবায়ের মধ্যে সর্ব্বজনীনতার নীতি রয়েছে বলে সে পথ সব সময়ই উন্মুক্ত থাকে। যে সংস্থায় সে পথ বন্ধ থাকে সেটা সমবায় সমিতির আখ্যা পেতে পারে না।

(৮) শেয়ার বা অংশগত মূলধনের ওপর সীমাবদ্ধ সুদ : এই নীতিটি ১নং নীতি আলোচনার সময় আলোচিত হয়েছে।

(৯) সঞ্চয়: সঞ্চয় সমবায়ের একটি মূলনীতি। রচ্‌ডেলের ২৮ জন তন্তুবায় যে অগ্রদূত সমিতি গঠন করেছিল তাদের প্রথম সমস্যা ছিল যে মূলধন কোথায় পাওয়া যাবে—কাজ আরম্ভ করা হবে কি দিয়ে? তারা নিজেরাই সে সমস্যার সমাধান করেছিল সঞ্চয়ের পথ ধরে। যেখানে সাপ্তাহিক আয়ের পরিমাণ সাড়ে পাঁচ আনা হতে দেড় টাকা মাত্র, সেখানে সঞ্চয় করা কত শক্ত তা সহজেই অনুমান করা যায়। তবুও তারা তা করেছিল এবং সেই সঞ্চিত মূলধন দিয়েই কাজ আরম্ভ করেছিল।

এই সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থা যদি একটু তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের দেশে সমিতি স্থাপন করা হয় যেন সরকারের কাছ থেকে টাকা পাওয়া যাবে এই আশা নিয়েই। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। কিন্তু সে ব্যতিক্রম এতই নগণ্য যে তা ধর্তব্য নয়।

সমবায়ের উদ্দেশ্য হচ্চে এমন একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা যার মাধ্যমে সকল সভ্যের সাধারণ অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণ করা যায়। অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গেলেই প্রথমে দরকার অর্থ। সে অর্থ নিজেদেরই ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার জন্য রচ্‌ডেলের অগ্রদূতদের মত সঞ্চয় করে যেতে হবে। যদি সমিতির নিজস্ব মূলধন না থাকে তাহলে অন্যান্য মহাজনও সমিতিকে বিশ্বাস করবে না এবং টাকা ধার দেবে না। ধরা যাক একটি সমবায় ঋণদান সমিতির কথা। এখানে সভ্যগণ ঋণ গ্রহণ করে থাকে। সে ঋণের টাকা আসবে কোথা হতে? তাই সভ্যগণকে প্রথম হতে সঞ্চয় করে কিছু টাকা জমাতে হবে এবং ঐ টাকা দিয়ে সমিতির শেয়ার কিনতে হবে। তখন সমিতির ঐ শেয়ারের টাকা দেখে অন্য মহাজন টাকা দিতে এগিয়ে আসবে। উপরন্তু যদি সভ্যগণ বরাবর টাকা জমিয়ে ঐ সমিতিতে গচ্ছিত রাখে তাহলে ঐ জমান টাকা হতেই সমিতির কাজ হয়ত একদিন চলে যাবে—কারুর কাছে হাত পাত্‌তে হবে না। তাছাড়া একদিন প্রতি সভ্যের সঞ্চয়ের পরিমাণ এমন এক মাত্রায় এসে যাবে যখন তাকে আর সমিতির কাছ হতে ধার করতে হবে না। সে স্বাবলম্বী হয়ে পড়বে।

(১০) স্বাবলম্বন, পারস্পারিক সাহায্য ও সেবার মনোভাব—সমবায় সমিতিতে সভ্যগণ তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করার জন্য একত্রিত হয়। তারা মিলিত হয়ে সমিতি স্থাপন করে এবং সমিতি তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করে। এই সাহায্য সকলেই একসঙ্গে গ্রহণ করে না বা সকলেরই হয়ত একসঙ্গে

সাহায্যের দরকার হয় না। ঋণদান সমিতিতে কোন কোন সভ্য তাদের নিজস্ব পুঁজিপাতি ও সঞ্চয় ঐ সমিতিতে গচ্ছিত রাখে; আবার কেউ বা ঐ সমিতি হতে টাকা ধার করে। এভাবে কয়েকজনের সঞ্চিত পুঁজি অপর কয়েকজনের প্রয়োজন মেটায় এবং পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তি গড়ে ওঠে। সমিতিতে যারা টাকা জমা রেখে এইভাবে অন্যদের সাহায্য করে তারা জানে যে তাদের নিজেদের প্রয়োজনেও তারা সমিতি হতে সাহায্য পাবে। এইভাবে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে থাকে এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে আর্থিক সমস্যা মেটাতে পারে। যারা সাহায্য করে, আর যারা সাহায্য পায় তারা সকলেই একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অংশ এবং তাদের মধ্যে কোন স্বার্থের সংঘাত নেই। নিজেদের ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা তারা ঢেকে রাখে সকলে সকলেরই যৎ সামান্য পুঁজি ও শক্তি একত্রিত করে এবং এভাবে একে অপরকে সাহায্য ক'রে তারা নিজেদেরই সাহায্য করে। তাদের এই 'একত্ব'-কে শক্তিশালী করতে যে মূলধনের দরকার তা তারা নিজেরাই যোগাতে চেষ্টা করে, যেমন করেছিল রচডেলের অগ্রদূতগণ। তখন তাদের সঞ্চয় করতে হয় এবং সেই সঞ্চয়ের ফলে যে টাকা জমা হয় তা হতে তারা ক্রমে ক্রমে স্বাবলম্বী হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, সমিতিও একদিন এভাবে সম্পূর্ণভাবে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়ায়। অর্থের জন্য বা কোন কিছুর জন্য পরমুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

এই যে পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে স্বাবলম্বনধর্ম্মী মনোভাব গড়ে ওঠে তাতে স্বার্থপরতার কোন সংস্রব থাকে না। নিঃস্বার্থপরতা ও সাধু উপায়ে কাজ করাই সমবায়ের নীতি। এই প্রবৃত্তি পারস্পরিক সাহায্যের মনোভাব হতে গড়ে ওঠে। সমিতির বৃহত্তর স্বার্থের কাছে কোন এক ব্যক্তি বিশেষের স্বকীয় স্বার্থ যে নিচে এটা সমবায় শেখায়। এজন্যই সমবায়কে নৈতিক আন্দোলন বলা হয়। এজন্যই অনেকে সমবায়কে একটা ধর্ম্ম বলেও অভিহিত করেচেন। যদিও এটা অনেকে মেনে নেবেন না তবুও একথা সত্য যে ধর্ম্মের কতকগুলো বিশেষ রীতিনীতি ও গুণাবলী সমবায়ে রয়েচে। এর মাধ্যমে সভ্যদের চরিত্র গঠিত হয়। নিজের স্বার্থকে সমষ্টির স্বার্থের কাছে ছোট করে ভাবতে শেখা একটা মহৎগুণ। "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—সমবায়ের এই শিক্ষা মানুষকে উন্নতস্তরে নিয়ে যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে সমবায়ের মারফত আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে পারা যায় এবং সে হিসাবে সমবায় প্রতিষ্ঠান মূলতঃ একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ব্যবসার ক্ষেত্রে সমবায় প্রতিষ্ঠানের মত এমন প্রতিষ্ঠান কমই আছে যেখানে সভ্যদের চারিত্রিক উন্নতির ওপর, তাদের নিঃস্বার্থপরতা ও সাধুতার ওপর এতটা জোর দেওয়া হয়। সাধারণ পাঠকের কাছে এটা হয়ত অবিশ্বাস্য মনে হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক স্থানে—ভারতবর্ষে কেন, পশ্চিম বাংলার অনেক গ্রামে এরকম সমবায় সমিতি আমরা দেখেছি, ঐসব উচ্চ গুণাবলী সম্পন্ন সভ্যশ্রেণীভুক্ত মানুষের সন্ধান আমরা পেয়েছি। তা দেখে মন আমাদের ভরে গেছে এবং মনে হয়েছে সার্থক সমবায়ের সম্ভাবনা আমাদের দেশেও যথেষ্ট রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার। সমবায়ের নীতির একটি প্রধান অর্থ এই যে সমবায় সমিতির কাজ এমন হবে যাতে সেই সমিতি সভ্যদের সেবা করতে পারবে।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। কয়েকজন ধনীব্যক্তি অন্য জায়গা হতে এসে এক জায়গায় একটি সিনেমা চালাবার জন্য একত্রিত হয়ে সমবায় সমিতি স্থাপন করতে চাইলেন। এখানে তাঁরা তাঁদের আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে চান সিনেমার লাভ হতে। কিন্তু একে আমরা সমবায় বলব না। কারণ এটা মূলধনের সমাবেশের নামান্তর মাত্র যা জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতে ঘটে থাকে। তাছাড়া এই সিনেমা তাঁরা নিজেরা দেখবেন না এবং সে দেখানর দ্বারা তাঁরা উপকৃতও হবেন না।

অপরদিকে ধরা যাক ঐ জায়গার অধিবাসীরা সিনেমা দেখার জন্য অন্যত্র পয়সা খরচ করে যেতে বাধ্য হন এবং প্রতিমাসেই এরূপ খরচ না করে তাঁদের উপায় থাকে না। তখন তাঁরা নিজেরা কিছু শেয়ার উঠিয়ে একটি সিনেমা গৃহ স্থাপন করলেন এবং সিনেমা দেখতে লাগলেন। এখানে এই যে মিলিত প্রচেষ্টা তাকে আমরা সমবায় আখ্যা দেব। কারণ, এই সিনেমা হওয়ায় সভ্যগণ বাইরে যাওয়ার কষ্ট ও খরচ হতে রেহাই পেয়েছেন। আর সিনেমা প্রতিষ্ঠানটিও সিনেমা দেখানর দ্বারা সভ্যদের সেবা করছেন। সমবায় সমিতির এরূপ সেবাই তার বৈশিষ্ট্য. সমবায় সমিতির কাজ এমন হবে যার মাধ্যমে সমিতির সভ্যগণ উপকৃত হন এবং এই উপকারের মাত্রা যেখানে যত বেশী সেখানে সমবায়ের সমবায়ত্ব তত পরিস্ফুট।

অনেক সময় দেখা গেছে যে সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থাৎ কন্টোলের জিনিস নিয়ে কারবারে নেমেছেন ; যেমন—কাপড়, চিনি প্রভৃতি কন্ট্রোলের কারবার। এই কারবারের দ্বারা সমিতির সভ্যেরা হয়ত কোনভাবেই উপকৃত হন না। সে ক্ষেত্রে এই কারবার সমবায় নীতি বিরোধী।

(১১) রাজনৈতিক ও ধর্ম্মীয় ব্যাপারে নিরপেক্ষতা : সমবায় সমিতিতে রাজনৈতিক বা ধর্ম্মীয় মতামতের কোন স্থান নেই। কেউ কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল বা ধর্ম্মভুক্ত বলে সমবায় সমিতিতে কোন বিশেষ স্থান লাভ করে না। অর্থনৈতিক দিক হতে সকল সভ্যই সমান। রচ্‌ডেলের অগ্রদূত সমিতি গোড়া হতেই এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। এই নীতি অনুসরণ না করার কুফল ফলেছিল ইতালীতে। সেখানে এক সময় সমবায় আন্দোলন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। কিন্তু পরে যখন ইতালীর তদানীন্তন সোস্যালিষ্ট দলের হাত হতে সরকার গঠনের ক্ষমতা জঙ্গীবাদীদের বা ফ্যাসিস্টদের হাতে চলে যায়, তখন সমবায় আন্দোলন সরকারের নিকট যে যে সুবিধা পাচ্ছিল সে সবই প্রত্যাহৃত হয়। ফলে সমবায় আন্দোলন এক মহা বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়। সেজন্যই সমবায়ে রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহন করা হয়েছে।

ধনতন্ত্র ও সমবায়

সমবায়ের ১নং নীতি আলোচনা প্রসঙ্গে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং তা হতে ধনতন্ত্রের খানিকটা রূপ বর্ণিত হয়েছে।

ধনতন্ত্র কি? ধনতন্ত্র এমন এক অর্থনীতিক কাঠামো যেখানে জনসাধারণের যে কোন অংশ ব্যক্তিগত ও স্বকীয় প্রচেষ্টায় লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবসা ব্যাণিজ্য সংগঠন ও পরিচালনা করে এবং তাতে সরকার কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না এবং যদি করেন তবে ন্যূনতম মাত্রায় করে থাকেন। মূলধন নিয়োগকারীগণ ব্যক্তিগত লাভের আশায় ঐ সব ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগ করে। উৎপাদনের সহায়ক যে সমস্ত কলকারখানা থাকে তার মালিকেরা শ্রমিক নিয়োগ করে এবং তাদের বেতন দেয়। সুতরাং শ্রমিকেরা বেতনভুক্-এর পর্য্যায়ে নেমে আসে এবং তাদের খোরাক, পোষাক,

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং ভবিষ্যৎ মনে হয় যেন জাতির এক স্বল্প অংশের হাতে নির্ভর করতে থাকে। মূলধন, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বা অনুরূপ অন্যান্য জিনিষের ওপর মালিকের ব্যক্তিগত অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সেই ব্যক্তিগত অধিকারের ওপর ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় মালিকেরা তাদের কল কারখানা বা উৎপাদনের সহায়ক অনুরূপ অন্যান্য সব কিছুই নিজেদের লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে চালনা করে থাকে। তারা জাতীয় স্বার্থের দিকে না তাকিয়েও কাজ করতে পারে। সুতরাং ধনতন্ত্রে দুটি শ্রেণী তৈরী হয়— মালিক ও শ্রমিক; এবং তাদের দ্বন্দ্ব চিরন্তন হয়ে পড়ে। কারণ মালিকরা চায় শ্রমিককে যত কম বেতনাদি দেওয়া সম্ভব তা দিতে, আর শ্রমিকেরা চায় মালিকের নিকট হতে যত বেশী আদায় করা সম্ভব তত বেশী আদায় করতে।

বাষ্প ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলেই এই ধনতন্ত্রের উত্থান সম্ভবপর হয়েছিল। সস্তাদরে প্রচুর জিনিষপত্র তখন তৈরী হতে আরম্ভ করল এবং খুব সহজে মালপত্র স্থানান্তরিত করার সুবিধা হল যেমন রেল, লরী, জাহাজ প্রভৃতির মাধ্যমে। এই সুবিধা থাকায় ঐ মালপত্র বহু দূর দূরান্তরে চালান হতে লাগল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর ভিত্তি করে ও মালিকানার জোরে কলকারখানার মালিকেরা তাদের ব্যবসা করতে লাগল। তার ফলে তাদের লাভের অঙ্ক বেড়ে যেতে লাগল এবং অপর দিকে সৃষ্ট হল শ্রমিকের দল যাদের শুধুমাত্র বাজারের হারে মজুরী দেওয়া হল কিন্তু লাভের অংশে তাদের কোন ভাগ রইল না।

এই ধনতন্ত্রের মূলভিত্তি রয়েচে প্রতিযোগিতার ওপর। যদি কোন একজন মালিক কোন জিনিষ উৎপাদন করে লাভ পায়, অন্য একজন মালিক বা মালিকের দল তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেই জিনিস তৈরী আরম্ভ করে দেবে। প্রত্যেক মালিকই চেষ্টা করে বাজারে যে দাম চালু রয়েচে তার চেয়ে কম দামে আরও ভাল মাল বাজারে বিক্রী করতে। এই কম দামে জিনিষ উৎপাদন সম্ভব হয় যদি নূতন কোন আবিষ্কৃত যন্ত্র বা উৎপাদন পদ্ধতি সে ব্যবহার করে, কিম্বা যদি তার কারখানা খুব বড় করে সে কাজ করে। কারখানা বড় করলে একটা সুবিধা হয় এই যে বেশী উৎপাদনের দরুণ গড়পড়তা খরচ কম হয়। এক সের সন্দেশ তৈরী করতে যে খরচ পড়বে একমন সন্দেশ তৈরী করতে সের করা খরচ অনেক কম হবে। যখন বাজারে

ভাল জাতের মাল কম খরচায় পাওয়া যাবে, তখন ক্রেতারা অন্য মাল ফেলে রেখে সেই মাল কিনবেই। এরকমটা হয় বলেই সব সময় উৎপাদনকারী মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে থাকে—কে কত কম দামে অপেক্ষাকৃত ভাল মাল বাজারে ছাড়তে পারবে। সমাজের দিক হতে বিচার করলে এতে ক্রেতারাই লাভবান হয় এবং ধনতন্ত্রের এই ভাল দিকটা আছে বলেই ধনতন্ত্র টিকে আছে। কিন্তু এর অন্য একটা দিকও আছে। এই প্রতিযোগিতার ফলে যে সব মালিক হটে যায়, তাদের ব্যবসায় লোকসান হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবসা গুটিয়েও ফেলতে হয়। কারণ তখন আর তাদের জিনিসের চাহিদা থাকে না এবং আগের দামে মাল কাটৃতিও হয় না। ব্যবসায়ে যখন লোকসান হতে থাকে তখন তার মালিক চায় শ্রমিককে কম মজুরী দিতে। মজুর এই মজুরী কমানর ব্যাপারে সাধারণতঃ রাজী হয় না। ফলে মজুরদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। তা'থেকে আরম্ভ হয় ধর্মঘট। ফলে হয়ত কারখানা বন্ধ হয়ে যায় কিংবা হয়ত মালিক কারখানা বন্ধ করে দেয়। সব শেষে মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্বের শেষ পরিণতি ঘটে পুলিশের গুলিচালনায়। দেশের ও সমাজের পক্ষে এই অশান্তি অবাঞ্ছনায়। সরকার তখন হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন এবং তাকে এগিয়ে আসতে হয়।

এ ছাড়া আরও একদিক আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী মালিক বেশী মুনাফা লাভের আশায় চাহিদার চেয়ে অনেক বেশী উৎপাদন করে বসে থাকে। সেই সমস্ত মাল যদি কাটৃতি না হয় তা হলে ঐ সব মাল তৈরী করতে যে কাঁচা মাল বা অন্যান্য জিনিস ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলির অযথা অপচয় ঘটে। সুতরাং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মালের চাহিদা ও তার সরবরাহের তারতম্য এবং তার ফলে দামের ওঠা-নামা ঘটে। আবার যদি কোন মালিক সর্বাপেক্ষা আধুনিক পদ্ধতিতে এবং বেশী পরিমাণে উৎপাদন করার দরুন দাম খুব কম করে ফেলতে পারে তাহলে অন্যান্য উৎপাদনকারী মালিককে প্রতিযোগিতায় হটিয়ে দিতে পারে। অন্যান্যরা যদি বাজার হতে সরে দাঁড়ায় তাহলে সে ঐ মালের একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারে এবং তখন সেই মালের ইচ্ছামত দাম বাড়িয়ে দিতে পারে।

এই যে সমাজ জীবনের অশান্তি—শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট, কারখানা বন্ধ

হতে আরম্ভ করে মালের অপচয় বা একচেটিয়া ব্যবসা—এর সব কিছুরই মূলে রয়েছে মালের চাহিদা ও সরবরাহের অসমতা। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির এটা সবচেয়ে বড় ত্রুটি। কিন্তু সমবায়ের ক্ষেত্রে এই চাহিদা ও সরবরাহের অসমতা বা তার দরুন লাভ-লোকসানের বালাই নেই।

একটা উদাহরণ লওয়া যাক। ধরা যাক্ কোন এক সমবায় মেসের কথা। এখানে মেস সমিতির সভ্যগণ চা, জলখাবার, ভাত-তরকারী খান এবং নির্দ্দিষ্ট দাম দিয়ে দেন। মাসের শেষে দেখা গেল যে ঐ সমবায় মেস চালাতে যে খরচ হয়েচে তার চেয়ে বেশী পাওয়া গেছে সব খাবার জিনিস বিক্রয় করার দাম হতে। এখন এই যে বাড়তি আয়টুকু হল এটা মেসের লাভ। যদি কোন ব্যবসাদার এরকম হোটেল খুলত এই সমস্ত লাভটাই সে গ্রহণ করত। কিন্তু ঐ সমবায় মেস তার সমস্ত লাভটুকুই সভ্যদের ফিরিয়ে দিতে পারে। এখানে সমবায় পদ্ধতিতে অর্থাৎ চা-জলখাবার প্রভৃতি কেনার অনুপাতে সেই লাভের সবটুকুই ফেরত দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ যদি ধরা যায় যে প্রতি টাকার খাবার কিনে খাওয়ার দরুন এক আনা করে ফেরত দেওয়া হবে তাহলে যে যত টাকার চা, খাবার প্রভৃতি কিনেছে, সে তত আনা ঐ লাভ হতে ফেরত পাবে। সুতরাং এখানে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মালিকের লাভের মত সমবায় মেসের লাভ হোল না।

এইজন্যই আগে বলা হয়েছে যে সমবায়ের লাভ আর ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির লাভ এক নয়। সমবায়ে যে লাভ হয় তা বাড়তি আয় (surplus) মাত্র, যার সবটুকুই সভ্যদের ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং এখানে চাহিদা ও সরবরাহের অসমতার দরুণ মালিকের উত্থান-পতনের মত অবস্থার সৃষ্টি হয় না। যদি সমাজটা আগাগোড়া এই ছাঁচে ঢালা যায়, তাহলে আমরা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে সমবায় অর্থনীতির দ্বারা পরিবর্তিত করতে পারি।

সমবায় ও ধনতন্ত্রের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য

(১) উভয়েরই মূলধনের প্রয়োজন হয় ব্যবসা করার জন্য। সেই মূলধনের ওপর সুদ দেওয়া হয়। অংশগত মূলধন বা শেয়ারের ওপর এই সুদকে ডিভিডেণ্ড বলা হয়।

(২) সমবায় সমিতিরও প্রয়োজন হয় জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর মত জমি, শ্রম, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির এবং জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর মতই বাজার দরে সেগুলি পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

(৩) জয়েণ্টস্টক কোম্পানীর মতই সমবায় সমিতি ব্যবসা পরিচালনার জন্য কর্ম্ম-কর্ত্তা নিয়োগ করে এবং তাদের প্রায় একই ভিত্তিতে মাহিনা দেওয়া হয়।

(৪) উভয় প্রতিষ্ঠানেরই ব্যবসায়ে সাফল্য নির্ভর করে তাদের ব্যবসায়-বুদ্ধি ও দক্ষতার ওপর।

(৫) সমবায় ধনতন্ত্রের মত ব্যক্তিগত মালিকানা, ব্যক্তিগত মর্য্যাদা স্বাধীনভাবে ব্যবসা চালাবার অধিকার প্রভৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু এই সকল সাদৃশ্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য প্রচুর আছে। সেগুলি নিম্নে দেওয়া গেল :—

যে যে বিষয়ে পার্থক্য দৃষ্ট হইয়াছে	সমবায়	ধনতন্ত্র
উদ্দেশ্য	সভ্যদের আর্থিক সমস্যার সমাধানে সহায়ক। সেবা-মূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমবায় কাজ করে।	লাভ করাই প্রধান উদ্দেশ্য এবং তা মূলধনের অধিকারীই ব্যবহার করে।
সংগঠনের ভিত্তি	মানুষ	মূলধন
সভ্যপদ	সভ্য হবার গুণাবলীর অধিকারী যে কেউ সভ্য হতে পারে; যে কোন সভ্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ারের বেশী শেয়ার নিতে পাবেন।	শেয়ার যত ইচ্ছা গ্রহণ করা যেতে পারে। উপরন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে কোন ব্যক্তি সভ্যপদে গৃহীত হয় না এবং তাও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যকের বেশী সাধারণতঃ লওয়া হয় না।
পরিচালন পদ্ধতি	গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। প্রতি সভ্যের একটি মাত্র ভোট দিবার অধিকার থাকে।	পরিচালনার ক্ষমতা মুষ্টি-মেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমা-বদ্ধ।
কাদের সাথে কারবার করা হয়	সাধারণতঃ সভ্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; কয়েক ক্ষেত্রে, যেমন ভাণ্ডার সমিতির বেলায় সভ্য ছাড়া অন্যদের সাথেও কারবার করা হয়।	যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত কারবার করা চলে যদি তার সহিত কারবার করে লাভবান হওয়া যায়।
লাভ বণ্টন	সমস্ত লাভই সভ্যদের ফেরত দেওয়া যায় তাদের কারবারের অংশ গ্রহণের পরিমাণ অনুপাতে।	লাভবণ্টন শেয়ারের অধিকারের ওপর নির্ভর করে। যার যত শেয়ার তার তত লাভের অধিকার; সেই প্রতিষ্ঠানের কারবারে সে সংশ্লিষ্ট থাকুক আর না থাকুক।

সমাজতন্ত্র ও সমবায়

সমাজতন্ত্রবাদ প্রকৃতপক্ষে কি এ বিষয়ে সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যেই যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। নীতি হিসাবে সমাজতন্ত্র মানে হচ্ছে—"রাষ্ট্র দেশের সমস্ত উৎপাদনের সহায়ক সংস্থাগুলিকে নিজ অধিকারে রাখবে, তার পরিচালনার এবং বন্টনের ব্যবস্থা করবে। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত মালিকানা মাত্র সেই সব জিনিসের ওপর সীমিত থাকবে যেগুলিকে 'ভোগ্য দ্রব্য' (consumer goods) বলা হয়, যেমন জামাকাপড়, ঘরবাড়ী ইত্যাদি।"

সমাজতন্ত্রের মধ্যেই বিভিন্ন মতবাদী আছে এবং তাদের মধ্যে মতপার্থক্যও যথেষ্ট আছে। তবে সকল মতবাদই কয়েকটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হল এই যে উৎপাদনের-উপাদানগুলির (instruments of production) ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার বদলে রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্যক্তিগত মালিকানা সীমাবদ্ধ থাকবে বাড়ীঘর, আসবাবপত্র ও অন্যান্য ভোগ্যদ্রব্যের মধ্যে। অপর একটি মূলনীতি হ'ল এই যে বর্ত্তমান প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন পদ্ধতির বদলে একটি কেন্দ্রীয় ক্ষমতাবান সংস্থা থাকবে, যা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা দূর করে দেবে। প্রত্যেক কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিই কাজ পাবে এবং তার মজুরী তার কর্ম্মদক্ষতার ওপর নির্ভর করবে। তবে সকলেরই বড় হবার এবং যোগ্যতা অনুসারে বড় কাজে নিযুক্ত হবার অধিকার থাকবে।

সমবায় ও সমাজতন্ত্রবাদের এক বিষয়ে খুব বড মিল আছে। সেটা হচ্ছে এই যে উভয়েই ধনতন্ত্রকে নূতন এমন এক প্রণালীতে পরিবর্ত্তিত করতে চায যাতে লাভের মনোবৃত্তি থাকবে না, বরং থাকবে সেবামূলক মনোবৃত্তি এবং যাতে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মঙ্গল বিধানকে আদর্শ বলে ধরে নেওয়া হবে। কোন কোন সমাজতন্ত্রবাদী সমবায়কে সমাজতন্ত্রের প্রথম ধাপ বলে মনে করে থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা মনে করে যে সমবায় আন্দোলনের একটি গণ্ডী আছে যার বাইরে সমবায়ের কার্য্যকারিতা কমে আসে এবং তখন রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয এবং রাষ্ট্রকে সেই উদ্দেশে এগিয়ে আসতে হয।

উপরে বর্ণিত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সমবায় ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। উভয়ের প্রয়োগ প্রণালী বিভিন্ন। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার স্থান নেই এবং মানুষের নিজের কোন মূল্যই থাকে না। বরং

তার স্থান হয় সমষ্টিগত প্রয়োজনীয়তার অনেক নিচে। অন্যদিকে সমবায় ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সমষ্টির প্রয়োজনীয়তা সে উপলব্ধি করে বলেই তার আদর্শ থাকে 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। সমাজতন্ত্রবাদে মূলধনের কোন স্বীকৃতি নেই। সমবায়ে মূলধনের প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে ধনতন্ত্রবাদে মূলধনের যে দাপট থাকে, তাকে সমবায়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তার উপর সুদ বা ডিভিডেণ্ডের হার সীমাবদ্ধ করে দিয়ে। আবার সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে যে লাভ হয় তা রাষ্ট্র গ্রহণ করে, আর সমবায়ে সেই লাভ পায় কারবারে অংশ গ্রহণকারী সভ্য।

সাম্যবাদ ও সমবায়।

সমাজতন্ত্রবাদের চরম অবস্থাকে সাম্যবাদ বলে। সমাজতন্ত্রবাদের মত সাম্যবাদেও সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ পায় এবং রাষ্ট্র সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। তবে সমাজতন্ত্রবাদে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা কিছুটা বর্ত্তমান থাকে, যেমন ঘরবাড়ী প্রভৃতি ভোগ্য দ্রব্যের ওপর। সাম্যবাদে সে মালিকানারও স্থান নেই। সাম্যবাদে সকলকেই কাজ করতে হবে এবং সকলে তাদের প্রয়োজন অনুসারে কাজের মজুরী পাবে। মজুরী বা বেতন ছাড়া কোন আয়ের পথ খোলা থাকে না। সাম্যবাদে এই অবস্থার সৃষ্টি করার জন্য বিপ্লবের পথ গ্রহণের উপদেশ আছে। সাম্যবাদ সেই বিপ্লবকেও সমর্থন করে। সমাজতন্ত্রবাদ বিপ্লবের বদলে বিবর্ত্তন (evolution) সমর্থন করে। এই বিপ্লব ও বিবর্ত্তনের পথ গ্রহণের মধ্যেই সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মূল পার্থক্য অন্তর্নিহিত।

বর্ত্তমান রাশিয়াকে এই সাম্যবাদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা হয়। সেখানে বিপ্লবের দ্বারা রাশিয়ার জার সম্রাটদের রাজত্বের বা সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটান হয়। তারপর সাম্যবাদের নীতি অনুসারে সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করে দিয়ে প্রকৃত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু তার ফলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও উৎসাহে ভাটা পড়তে থাকে। ভাবটা দাঁড়ায় এই যে কাজ করলেই যখন নিজস্ব প্রয়োজন অনুসারে মজুরী পাওয়া যাবে তখন আর অধিক পরিশ্রম করার প্রয়োজন কি? সুতরাং এই অবস্থার উন্নতিকল্পে কিছু ব্যক্তিগত মালিকানা পুনরায় প্রবর্ত্তন করা হয়। বর্ত্তমানে যে ধরনের সাম্যবাদ রাশিয়ায় রয়েছে তা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্রের (state socialism) নামান্তর মাত্র। সাম্যবাদে রাষ্ট্র সব কিছু উৎপাদনের

ব্যবস্থা করে। রাষ্ট্র শ্রমিককে যে মজুরী দেয় তা শ্রমিক নিতে বাধ্য থাকে। যদি ঐ মজুরীর মাত্রা কম হয় তাহলে মজুরদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার মজুরদের অসন্তুষ্ট করতে গিয়ে যদি বেশী মজুরী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তাতে অন্য বিপদ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সে ক্ষেত্রে মজুরী বেশী দেওয়ার দরুন উৎপন্ন মালের দাম বেড়ে যেতে পারে এবং তার জন্য ক্রেতাসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে।

সাম্যবাদ গরীবদের আকৃষ্ট করে বেশী। কারণ বিপ্লবের পথে ধনীদের নির্ধন করার পথের নির্দ্দেশ রয়েছে এর মধ্যে। তাই বর্ত্তমান দুনিয়ায় গরীব দেশগুলির লোকদের মধ্যে সাম্যবাদের ওপর ঝোঁক বেশী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে—এটা অনেকে বলে থাকেন।

১৮২০ খৃষ্টাব্দের পর হতেই ইংলণ্ডে কারখানা প্রভৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং তার ঢেউ পুরোমাত্রায় ফ্রান্সে পৌঁছায় ঐ সময় বরাবর অর্থাৎ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি। আগেই বলা হয়েছে যে শিল্প বিপ্লবের (Industrial Revolution) ফলেই ধনতন্ত্র জন্মলাভ করেচে। সাম্যবাদও জন্মলাভ করে ঐ এক সময়ে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কার্ল মার্ক্সের লেখনী হতে উদ্ভূত হয় এই সাম্যবাদ, ধনতন্ত্রে ধনীর আরও ধনী হওয়ার পথ উন্মুক্ত, সাম্যবাদে বিপ্লবের পথে ধনীদের নামিয়ে আনার পথও নির্দ্দেশিত। এই দুই চরম অবস্থার মাঝামাঝি পথ দেখাল সমবায় প্রায় ঐ একই সময়ে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে রচ্‌ডেলের অগ্রদূতদের মাধ্যমে। ধনতন্ত্রবাদে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ বিকাশ, সমষ্টির ভাল-মন্দের স্থান সেখানে নেই। সাম্যবাদে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কোন স্থানই নেই—সমষ্টির কল্যাণেই তার কল্যাণ। সমবায় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত মালিকানাকে লোপ করল না, আবার সমষ্টির কল্যাণকে দূরেও সরিয়ে রাখল না। এই দুই চরম অবস্থার মধ্যে যোগ সাধন করল নূতন মন্ত্র দিয়ে—"সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সভ্যদের মিলন ঘটিযে পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে কাজ করে—তাদের স্বাবলম্বী হওযার শিক্ষা দিল। তাই প্রকৃত সমবায়ের প্রসার যত বেশী হয় কল্যাণধর্ম্মী রাষ্ট্রের কাজ ও দুর্ভাবনা তত কমে। সেইজন্যই আজ সকল দেশই সমবায়কে সমর্থন করে এবং সমবায়ের প্রসারে আনন্দিত হয়।

ভারতের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোতে সমবায়ের স্থান

সমাজতন্ত্রে যদি ব্যক্তিগত মালিকানার স্থান না থাকে, আর সমবায়ে যদি ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রেখে কাজ করার ব্যবস্থা থাকে তাহলে সমাজতন্ত্রে কি সমবায়ের স্থান আছে ? ভারতের রাষ্ট্র কাঠামো পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক না হলেও তা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গঠিত। সেক্ষেত্রে সেই কাঠামোতে সমবায়ের কি স্থান সে প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগতে পারে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূলগত নীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছিল যে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, আর অধিক কর্ম্ম সংস্থানের ব্যবস্থা এবং আর্থিক ক্ষমতার যথাসম্ভব সমভাবে বণ্টনই হবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। দেশে চরম দারিদ্র্য ও অতিমাত্রায় ধনাধিকার যাতে পাশাপাশি না থাকে তার চেষ্টা করতে হবে এবং এই দুইয়ের পার্থক্যের মাত্রা যতটা কমিয়ে আনা যায় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই সব সম্ভবপর করে তুলতে হলে কয়লা লৌহ প্রভৃতির মত দেশের দুষ্প্রাপ্য পুঁজিগুলির যাতে সদ্ব্যবহার হয় তার দিকে নজর রাখতে হবে। এর জন্যে উপযুক্ত পরিকল্পনার প্রয়োজন। বড় বড় শিল্পগুলির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ যদিও আমাদের উদ্দেশ্য, তা খুব অল্প সময়ে করা সম্ভব নয়। কারণ অনেক সমস্যা ও অসুবিধার সৃষ্টি হবে তার দরুণ। অনুন্নত গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন শুধু মাত্র রাষ্ট্রের চেষ্টাতে সম্ভব নয়। রাষ্ট্রকে অবশ্য তার উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করতে হবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মত সাময়িক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে, সেই উন্নয়ন কার্য্যে উৎসাহ দিতে হবে এবং সে কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ গ্রাম্য ব্যাঙ্কের কথা ধরা যাক। কৃষি সব সময় ঋণের ওপর নির্ভরশীল। ভারত কৃষি প্রধান এবং শতকরা ৭৫ জনের বেশী লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল। অথচ গ্রামে ঋণ দানের জন্য কোন উপযুক্ত ব্যাঙ্ক নেই। যে কোন শিল্প তার প্রসারের জন্য বাঙ্ক হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়ার জন্য কোন উপযুক্ত ব্যাঙ্ক নেই। ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। এখন যদি আশা করা যায় যে এদের মঙ্গলের জন্য গ্রামে ঋণ দান সংস্থার স্বতঃস্ফূর্ত প্রসার হবে তাহলে সে আশা দুরাশারই নামান্তর মাত্র। সুতরাং রাষ্ট্রকে এমন নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে গ্রামে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় এবং তার উন্নতি হয়। প্রয়োজন হলে

সরকারকে সাহায্য দিতে হবে এবং যখন এই দিকটার উপযুক্তভাবে উন্নতি হবে তখন রাষ্ট্র ধীরে ধীরে সরে যাবে।

আমাদের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গড়া রাষ্ট্র কাঠামোতে রাষ্ট্র সব কিছুরই পরিচালনা গ্রহণ করবে না। বড় বড় শিল্পের বেলায় তা করা হলেও ক্ষুদ্র শিল্পের বেলায়, কৃষিকার্য্যের বেলায় রাষ্ট্র নিজে কোন কিছুরই পরিচালনভার গ্রহণ করবে না। তবে তার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য যা কিছু করা দরকার তা করবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমাগুলির কৃষিকে সুসংবদ্ধ করতে হবে, ক্ষুদ্র শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। নচেৎ রাষ্ট্রের যে উদ্দেশ্য আছে, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মঙ্গল বিধান করা, তা সফল হবে না। এখন এই সব-এর উন্নতি সমবায় প্রসারের মাধ্যমে সম্ভবপর। শুধু তাই নয়, সমবায়ের প্রসারে একাজ দ্রুততর হবে। তাই কৃষি এবং ক্ষুদ্র, কুটীরশিল্পের উন্নয়নের ব্যবস্থা সমবায় প্রথায় করতে হবে। রাষ্ট্র সেই সমবায়ের শক্তি বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এবং সমবায় আন্দোলনকে প্রত্যক্ষভাবে এবং অর্থাদি দিয়ে সাহায্য করবে। ভারতের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গঠিত রাষ্ট্র কাঠামোতে সমবায়ের এই ভূমিকা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।

কো-অপারেটিভ্ কমন্ওয়েলথ বা সমবায়মূলক রাষ্ট্র

এই কো-অপারেটিভ্ কমন্ওয়েলথ্ বা সমবায়মূলক রাষ্ট্র কি? তা বুঝার আগে রাষ্ট্রের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য কি তা আলোচনা করে দেখতে হবে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই ধারণাই বলবৎ ছিল যে রাষ্ট্র মাত্র দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বহিরাক্রমণ হতে দেশকে রক্ষা করবে। চুরি-ডাকাতির হাত হতে জনগণকে রক্ষা করা এবং সম্পত্তি অপহরণকারিদের বাধা দেওয়া ও শাস্তি বিধান করা এবং তার সঙ্গে বহিরাক্রমণ হতে দেশকে রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। মোটের ওপর দেশের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাই ছিল রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য, যার দরুন রাষ্ট্রকে এক কথায় বলা যেতে পারত রক্ষণাবেক্ষণকারী রাষ্ট্র—যাকে ইংরাজীতে বলে Police State.

কিন্তু দেখা গেল যে শুধু এইটুকু করলেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব ঠিক পালিত হয় না। ধনীর জুলুম চলে গরীবের ওপর। টাকার জোরে একজন অপরকে পদানত করে রাখে। রাষ্ট্র পরিচালনার ভার ক্রমে ক্রমে জনগণের

প্রতিনিধিদের হাতে চলে আসতে আরম্ভ হল। তাঁরা দেখলেন যে স্বাধিকার ব্যবস্থার (Laissez Faire) চরম অবস্থার একটি প্রতিকার দরকার। তখন থেকে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ আরম্ভ হল সমাজের বিভিন্ন, অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাতেও। নানা রকম বাঁধাবাঁধি ও আইন কানুন রচিত হল এবং তা এমন এক পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছাল যখন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাই মুস্কিল।

ইংলণ্ডে শস্য নিয়ন্ত্রণ আইন (Anti-corn Law Movement) এবং ফ্রান্সে ফরাসী বিদ্রোহ (French Revolution) তারই প্রতিবাদ কৃত-কার্য্যতার সঙ্গে ধ্বনিত করল। কবডেন, ব্রাইট, রুশো প্রভৃতি মনিষিগণ জনগণকে জাগিয়ে তুললেন। স্বাধিকার ব্যবস্থা আবার আত্মপ্রকাশ করল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথ পরিষ্কার হল—সেখানে আর কোন বাধাই রইল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতির উন্নতি এতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। উন্নত দেশের বাণিজ্যের সঙ্গে অনুন্নত দেশ পাল্লা দিতে পারে না। ফলে আবার রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয় সমাজের বিভিন্ন স্তরে। এই সব দেখেই বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কীন্‌স (Lord Keynes), লিখ্‌লেন তাঁর বই "End of laissez faire"। উপরে যা লেখা হল তা ঘট্‌তে সময় লেগেছে দু'শ বছর। রাষ্ট্র আর পুলিশ-রাষ্ট্র নয়, তা এখন দেশের মঙ্গল বিধানকর্তা যাকে ইংরাজীতে বলে Welfare State. রাষ্ট্র বিজ্ঞান (Politics) ও অর্থনীতি (Economics) এখন পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সামন্ততন্ত্র (Monarchy) তাই এখন প্রায় বিরল। রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার নীতি এখন দেশেব অর্থ নৈতিক মঙ্গলামঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। তাই সোস্যালিজম, কম্যুনিজম্ বা ক্যাপিট্যালিজম্ সব কিছুই দেশের অর্থ-নীতির সঙ্গে জড়িত। অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে কারও অস্তিত্ব নেই। সবগুলিরই লক্ষ্য দেশের জনগণের সর্ব্বাংশের না হলেও তার বৃহত্তর অংশের মঙ্গল বিধান করা। কেউ চায় এ-পথ দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে আর কেউবা চায় অন্যপথ দিয়ে। প্রত্যেকেরই ভালমন্দ উভয় দিক আছে এবং যে দেশে যেটা জনগণের মধ্যে খাপ খেয়েছে সেটাই সেখানকার জনগণের মঙ্গলবিধানে সহায়ক হয়েছে।

ভারতবর্ষের কো-অপারেটিভ্ কমনওয়েলথের আদর্শ পৃথিবীর রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইতিহাসে নূতন অধ্যায় রচনা করেছে। ধনতন্ত্রের মূলমন্ত্র নিহিত থাকে প্রতিযোগিতার মধ্যে। যে কম দামে ভাল জিনিস তৈরী করতে পারে,

তারই জিনিস বিক্রী হয়, আর যে তা পারে না তাকে পাততাড়ি গুটাতে হয়। চাহিদা ও আমদানির (Demand and Supply) ভিত্তিতে এই প্রতিযোগিতা চল্‌তে থাক্‌বে। শেষ পর্য্যন্ত যা উৎকৃষ্ট তাই স্থায়ী হবে, আর সব জিনিষ বাজারে বিক্রী না হওয়ার ফলে বাজার হতে চলে যাবে। নীতি হিসাবে এ ভাল। কিন্তু তাহলেও কতকগুলি কুফল এখানে এসে দেখা দিয়েছে। প্রতি-যোগিতার ফলে কখনও চাহিদার চেয়ে বেশী জিনিস উৎপন্ন হয় এবং তা কাজে না লেগে নষ্ট হয়। আবার কখনও দাম বাড়ানর জন্য কম জিনিস উৎপন্ন হয়ে লোকের দুঃখ ডেকে আনে। তাছাড়া আবার যারা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে (মালিক) তারাই প্রতিপত্তিশালী হয় বেশী। শেষ পর্য্যন্ত শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, যার জন্য দেখা দেয় ধর্ম্মঘট, লক্ আউট্ প্রভৃতি। সমাজতন্ত্রে বা সাম্যবাদে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কোন স্থান নেই। সেখানে সবই নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র। কো-অপারেটিভ কমন্‌ওয়েল্‌থ বা সমবায় মূলক রাষ্ট্র এই দুটোরই কুলক্ষণগুলি দূর করে দেবে।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক গ্রামে বা ইউনিয়নে যদি এমন একটি প্রতিষ্ঠান থাকে যার মারফত সেখানকার চাহিদা অনুসারে জিনিস উৎপাদন হয় এবং সেই অনুসারেই বণ্টন হয় তাহলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও বজায় থাকে এবং রাষ্ট্রেরও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না। কো-অপারেটিভ্ বা সমবায় সমিতির মারফত এটা সম্ভব। সমবায় সমিতিতে চাহিদার সঙ্গে আমদানীর খাপ খাওয়ান সম্ভবপর হয় এবং তার ফলে প্রতিযোগিতার কোন স্থান থাকে না সেখানে। এইরূপ খণ্ড খণ্ড প্রাথমিক সমিতিগুলি মিলিত হতে পারে কেন্দ্রীয় সমিতিতে এবং কেন্দ্রীয় সমিতি সব গড়ে তুলতে পারে জেলা, বিভাগ বা প্রাদেশিক সমিতি। প্রাদেশিক সমিতি শেষ পর্য্যন্ত দেশের সর্ব্বোচ্চ এক সমিতিতে মিলিত হতে পারে। সমস্ত দেশের যা দরকার তা দেশের সর্ব্বোচ্চ সমিতি হতে পর পর পর্য্যায়ে নেমে এসে প্রাথমিক সমিতিগুলোর দ্বারা উৎপাদিত হতে পারে। এখানে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন নেই, নেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের কড়াক্কড়ি। এখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদনও হবে না বা কম উৎপাদন করে দাম বাড়ানোর চেষ্টাও থাক্‌বে না।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রকাঠামোর এই হল আদর্শ। এ আদর্শে পৌঁছাতে অনেক সময় লাগবে। তবে এর চেয়ে বড় আদর্শ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এই-ই হল কো-অপারেটিভ কমন্‌ওয়েল্‌থ্।

এখানে এক প্রশ্ন জাগে যে দেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা বেশী হতে থাকলেই কি আমরা বুঝব যে আমরা আদর্শ সমবায় সমাজের দিকে এগিয়ে চলেছি? বস্তুতঃ পক্ষে ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ সেটা ভেবেই সমবায় সমিতির সংখ্যা বাড়ানর দিকে মনোযোগী হয়েছে।

কিন্তু সে পথ ভুল পথ। এ সম্বন্ধে প্রফেসর ডি. জি. কার্ভে (Prof. D. G. Karve) বলেছেন—"সমবায় সমিতি সংখ্যায় বাড়লেই মনে করা উচিত হবে না যে রাষ্ট্র সমবায়ের আদর্শের দিকে এগিয়ে চলেছে, বরং যাতে তার মাধ্যমে পারস্পরিক কাজকর্ম্মের দ্বারা পারস্পরিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণের পথ প্রসারিত হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তবেই হবে সত্যিকারের সমবায় এবং যে রাষ্ট্রে সকল মানুষের এইরূপ সুযোগ সুবিধা পাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে তাকেই বলা হবে কো-অপারেটিভ্ কমন্‌ওয়েলথ্। তাছাড়া সত্যিকারের কো-অপারেটিভ্ কমন্‌ওয়েল্থ্ গড়ে তুলতে হলে রাষ্ট্রের নীতি সমবায় আন্দোলনের মূল নীতিগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওযা চাই এবং তা রাষ্ট্রের ছোট বড় সমস্ত অর্থ-নৈতিক সংস্থাগুলির ওপর—কি সমবায় সমিতি, কি জয়েণ্টস্টক কোম্পানী, সর্বত্র প্রযুক্ত হওয়া চাই। সবচেয়ে বড় জিনিস যা দরকার তা হল এই যে শুধু মুখে সমবায়ের কথা বা বাইরের কাঠামোটা সমবায় মূলক করে রাখলেই চলবে না, সমবায়ের নীতিগত ব্যবস্থাগুলি কাজে লাগাতে হবে।"

যেমন, ধরা যাক যে শেয়ারের ওপর ডিভিডেণ্ড শতকরা ৬৲ টাকার বেশী দেওযা যাবে না এই যদি আইন করা হয় তাহলে সেই আইন অনুসারে জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানী বা সমবায় সমিতি কেউই তার বেশী ডিভিডেণ্ড দিতে পারবে না। তেমনি আইন করা যেতে পাবে যে শেয়ারের ওপর ভোট নির্ভর করবে না বা একজনের ভোট অন্যজন দিতে পারবে না। যদি এই রকম সমবায়ের মূল নীতিগুলোর ওপর দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো রচিত হয় তা হলে বলা যেতে পারে যে কো-অপারেটিভ কমন্‌ওয়েলথ বা সমবায় সমাজের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। এইভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে সমবায়মূলক সমবায় ব্যবস্থায় পরিণত হবে এবং তার জন্যে রাশিয়ায় যে রক্তপাত হয়েছিল তার প্রয়োজন হবে না। এইরূপে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হওযার জন্য কোন দিক হতেই বিদ্বেষ বা তিক্ততা আসবে না এবং ধীরে ধীরে সমবায় সমাজ গড়ে উঠবে।

একটা অসুবিধা অবশ্য দেখা দিতে পারে। উৎপাদনকারী ও ক্রেতা

এই দুই পক্ষের যদি দুটো বড় সমবায় সংস্থা গড়ে ওঠে—তাহলে, উৎপন্ন জিনিসের দাম কিভাবে নির্দ্ধারিত হবে? উৎপাদনকারী সমিতি চাইবে বেশী দাম পেতে আর ক্রেতাদের সংস্থা চাইবে খুবই কম দাম দিতে। বর্ত্তমানে ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে চাহিদা ও আমদানীর ওপর ভিত্তি করে মূল্য নির্দ্ধারিত হয় তা আগেই বলা হয়েছে আর সেই মূল্যই অধিকাংশ সমবায় সমিতি মেনে নেয়। পশ্চিমী দেশগুলোতে এর একটা সমাধান হয়েছে ক্রেতাদের সংস্থাই উৎপাদনের ভার নেওয়ায়। সেখানে উৎপাদনকারী কোন বিশেষ সংস্থা নেই, তাই এই দ্বন্দ্ব তারা এড়াতে পেরেছে। কিন্তু পশ্চিমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলোতে যা সম্ভব হয়েছে ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশে তা সম্ভব নয়। সুতরাং এরূপ দ্বন্দ্ব দানা বেঁধে উঠলে হয় দু'পক্ষকেই বিচার বিবেচনার দ্বারা উৎপাদনের খরচের ওপর ন্যায্য লাভের ভিত্তিতে মূল্য নির্দ্ধারণ করতে হবে, আর তা নইলে গভর্ণমেণ্ট বা সরকারের মধ্যস্থতা এরূপ ক্ষেত্রে দরকার হবে।

সমবায়ের উপকারিতা

সমবায় ধনতন্ত্রবাদের খারাপ ফলগুলি দূর করার চেষ্টা করে। আগেই বলা হয়েছে যে সমবায় ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের মধ্যবর্ত্তী পথ অবলম্বন করে।

দ্বিতীয়তঃ সমবায় অল্প সঙ্গতি বিশিষ্ট লোকেদের একটি প্রধান অস্ত্র। তারা একক প্রচেষ্টায় তাদের কোন আর্থিক সমস্যা সমাধান করতে হয়ত পারে না। যখন তারা মিলিত হয় তখন মিলিত প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এই মিলন শুধু মিলনই নয়—তারও কিছু বেশী। সমবায় আন্দোলনকে সফল করতে গেলে সব চেয়ে বেশী দরকার সমবায়ী মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তি ভ্রাতৃত্বমূলক মনোভাব জাগিয়ে তোলে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টির স্বার্থের কাছে ছোট করতে শিক্ষা দেয়। এর ফলে মিলিত ভাবে কাজ করা বেশ সহজ হয়। যখন এই মনোভাব খুব উচ্চ পর্য্যায়ে ওঠে তখন উন্নততর মানুষ দেখতে পাওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ সমবায় প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রবর্ত্তন সম্ভবপর করে তোলে। সমবায় সমিতি গণতন্ত্রের শিক্ষাকেন্দ্র স্বরূপ। সমবায় সমিতিতে সাধারণ সভা সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং এই সভার প্রতি সভ্যের একটি করে ভোট থাকে যেমন গণতন্ত্রে প্রতি মানুষের থাকে একটি ভোট।

চতুর্থতঃ সঞ্চয়, স্বাবলম্বন ও পারস্পরিক সাহায্য সমবায়ের মূলমন্ত্র। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে এইগুলি কত উচ্চ পর্য্যায়ের গুণাবলী। এরই ফলে সমবায়ের আদর্শ হয়েছে "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

সমবায়ের সীমা বা গণ্ডী

এ কথা সত্য যে সমবায় অল্প সঙ্গতি বিশিষ্ট লোকেদের একটি প্রধান অস্ত্র, যার মিলিত প্রয়োগে তারা তাদের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। কিন্তু সভ্যগণ যদি একেবারে গরীব হয় তাহলে সমবায় সমিতি কৃতকার্য্য হতে পারে না। সুতরাং সমবায় অত্যন্ত গরীবদের কাজে লাগে না।

দ্বিতীয়তঃ সমবায় বড় বড় ব্যবসা সংস্থানের উপযোগী নয়। কারণ সমবায় সমিতির সভ্যগণের সঙ্গতি খুব বেশী নয় এবং তাদের দেওয়া মূলধন এমন কিছু বেশী হতে পারে না যাতে বড় বড় ব্যবসা বা শিল্প কোন সমবায় সমিতি চালাতে পারে। সেই কারণে সমবায় সমিতির কাজ সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত ছোট প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ। অবশ্য এখানে সেখানে বৃহদাকার সমবায় সমিতি দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি ব্যতিক্রম মাত্র। তাছাড়া ভাল করে অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে এগুলিতে সমবায়ের মূল নীতি-গুলি বেশ প্রকট নয়। এর আর এক দিক আছে। ভারতের মত দেশে যেখানে নিরক্ষরতার হার বেশী, সমবায় সমিতি বৃহদাকার হলে তার সুষ্ঠু পরিচালনার সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে বড় ব্যবসা চালান শক্ত। ভোটের জোরে দক্ষ কর্ম্মকর্ত্তাদের সরিয়ে অদক্ষ কর্ম্মকর্ত্তা এনে অনেক বড় সমিতি কারবার গুটাতে বাধ্য হয় এবং হয়েছে।

তৃতীয়তঃ সমবায় সাধারণতঃ নিরক্ষর লোকের মধ্যে কৃতকার্য্য হয় না। সমবায় প্রণালী অনুধাবন করতে হলে সামান্য লেখাপড়া জানার প্রয়োজন হয়। আমোদের দেশে যে সমবায় এখনও আশানুরূপ কৃতকার্য্য হয়নি তার প্রধান কারণ এই যে ভারতে নিরক্ষরতার হার বেশী।

চতুর্থতঃ সমবায়ে রাজনীতির স্থান না থাকায় সাম্যবাদ সমবায় অপেক্ষা জনসাধারণের মনে বেশী রেখাপাত করে। ধনতন্ত্রবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ প্রভৃতির প্রসার দ্রুত হয় কারণ সেখানে রাজনীতি ও অর্থনীতি পাশাপাশি চলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতের সমবায় আন্দোলনের উৎপত্তি ও বর্তমান সময় পর্য্যন্ত তার পরিণতি

পশ্চিমী দেশগুলির মত ভারতের সমবায় আন্দোলন জনগণের মাঝ হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্মলাভ করে নি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তদানিন্তন বিদেশী সরকার কৃষকদের ঋণ ভার কমাবার উদ্দেশ্য নিয়ে সমবায় আন্দোলন চালু করেন।

ভারতে ইংরেজ শাসন প্রবর্ত্তনের পর হতে দেশীয় শিল্পকলার অপমৃত্যু ঘটে। ওদেশের কলের তৈরী জিনিসপত্রের সঙ্গে এদেশের হাতে তৈরী জিনিষ পাল্লা দিতে পারে না। এই সব ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের জাত ব্যবসা ত্যাগ করে ছুটে যায় চাষের পিছনে। চাষবাসের ওপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। এই সময় রাজস্ব আদায়ের নূতন প্রণালী ও নূতন শাসন ব্যবস্থাও মহাজনদের খাতককে পেষণ করার পথ প্রশস্ত করে দেয়। অতিমাত্রায় সুদের হার কৃষকশ্রেণীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। এর ওপর ছিল মাঝে মাঝে অজন্মা যখন আকাশ হতে বর্ষা না নামত। ফলে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং দিকে দিকে দাঙ্গা বাধতে আরম্ভ হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের পুণা ও আহমদনগর জেলার কৃষকেরা জোর করে মহাজনের দলিলপত্র ও ঋণের নথি তাদের বাড়ী চড়াও হয়ে বার করে নিয়ে আসে। তারপর সেগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। এই অশান্তি এতদূর প্রসার লাভ করেছিল যে তা দমন করতে সৈন্য বিভাগের সাহায্য নিতে হয়েছিল।

এই অবস্থা দেখে বিদেশী সরকার কৃষকের উপকারার্থে কতকগুলি সাহায্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। কতকগুলি আইন পাশ হল—যেমন দাক্ষিণাত্য কৃষি-ত্রাণ আইন (১৮৭৯), জমির উন্নতিকল্পে ঋণ দান আইন (১৮৮১) ও কৃষকের ঋণ আইন (১৮৮৪)। প্রথম আইনটির বলে মহাজনরা কৃষকের জমি আর যাতে সহজে নিয়ে নিতে না পারে তার ব্যবস্থা হল। দ্বিতীয়টির বলে সরকার কৃষককে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেবেন এবং তৃতীয়টির বলে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ দেবার

ব্যবস্থা হল। শেষের দুটি আইন আজও চালু আছে এবং টাকাভি আইন বলে পরিচিত।

কিন্তু এই সব ব্যবস্থা কৃষকের অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন করল না। ক্রমে ক্রমে এটা বুঝতে পারা গেল যে ঋণদান ব্যবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থার সুরাহা হবে না। সেজন্য শাসকশ্রেণীর এক অংশ সমবায় প্রথা প্রবর্ত্তনের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। কারণ শাসকশ্রেণীর অনেকে তখন ইংলণ্ড হতে এসেছে এদেশে এবং তাদের অনেকেই জার্ম্মানী ও ইটালীর সমবায় সমিতির সম্বন্ধে জানতেন। বস্তুতঃ পক্ষে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ প্রদেশ সরকার স্যার ফেডারিক নিকল্‌সন্ নামে একজন ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের লোককে ইউরোপে পাঠালেন। তিনি ওখানকার ঋণগ্রস্ততার সমস্যা কেমন করে সমাধান করা হয়েছে তা দেখবেন এবং ওখানকার জমি বিষয়ক ব্যাঙ্কের মত কোন ব্যাঙ্ক মাদ্রাজ প্রদেশে প্রবর্ত্তন করা যায় কি না তা পর্য্যালোচনা করে রিপোর্ট দেবেন।

স্যার ফেডারিকের রিপোর্ট দুখণ্ডে প্রকাশিত হোল ১৮৯৫ ও ১৮৯৭ সালে। তিনি পশ্চিম জার্ম্মানীতে প্রবর্ত্তিত অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট সমবায় ঋণদান সমিতি প্রবর্ত্তনের জন্য জোর সুপারিশ করলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত যে সামান্য কয়টি কথার মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল তা হচ্ছে "র‍্যাফাইসনের অনুরূপ সমিতি কর" অর্থাৎ র‍্যাফাইসন যেমন অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট সমবায় ঋণদান সমিতি প্রবর্ত্তন করেছিলেন সেইরূপ সমিতি ভারতেও প্রবর্ত্তিত করা উচিত। ১৯০১ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশনও এই মতকে সমর্থন করেন। ইতিমধ্যে ভারতের কয়েক স্থানে কয়েকজন ইংরাজ কর্ম্মচারী সমবায় প্রথায় ঋণদান সংস্থা প্রবর্ত্তন করে তা কৃতকার্য্যতার সঙ্গে চালাতে লাগলেন। এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন উত্তরপ্রদেশে মিঃ ডুপারনেক্স্, পাঞ্জাবে মিঃ ম্যাক্‌লেগান এবং বাংলা দেশে মিঃ লায়ন। এই রকম বেসরকারীভাবে গঠিত সমবায় সমিতি সমবায় আন্দোলন প্রবর্ত্তনের পথ সুগম করে দিল।

ভারতে সমবায় সমিতি প্রবর্ত্তন করা যায় কি না তা বিবেচনা করার জন্য, ১৯০১ সালে স্যার এড্ওয়ার্ড ল'এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি ভারত সরকার কর্ত্তৃক গঠিত হয়। এই কমিটি যে রিপোর্ট দাখিল করে তাতে বলা হয়েছিল যে ভারতের তদানীন্তন অবস্থায় র‍্যাফাইসনের অসীম দায়িত্ববিশিষ্ট সমবায় সমিতির অনুরূপ সমিতির প্রবর্ত্তনই যুক্তিযুক্ত হবে। এই রিপোর্টের সুপারিশ

অনুযায়ী ১৯০৪ সালে আইন সচিব স্যার ইবেটসন একটি বিল উত্থাপন করলেন। এইটিই ১৯০৪ সালের সমবায় ঋণদান সমিতি আইন হিসাবে পাশ হয়। এই আইনের ধারা ও নিয়মগুলির মধ্যে এইগুলি প্রধান :—

(১) একই গ্রাম বা সহরে বসবাসকারী বা একই সম্প্রদায় ও শ্রেণীভুক্ত যে কোন দশজন লোক একটি সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করতে পারে। উদ্দেশ্য হবে সভ্যদের সঞ্চয় ও স্বাবলম্বনকে উৎসাহ দান করা।

(২) সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির গঠন ও পরিচালন ব্যাপার সমবায় সমিতি সমূহের নিযামক বা রেজিষ্ট্রার নামক এক বিশেষ সরকারী কর্ম্মচারীর অধীনে থাকবে।

(৩) সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হবে সভ্য ও সভ্যছাড়া অন্যদের নিকট হতে, সরকার হতে এবং অন্য সমবায় সমিতি হতে আমানত ও কর্জ্জ গ্রহণ করে মূলধন সৃষ্টি করা। এইভাবে সৃষ্ট মূলধন দিয়ে সভ্যদের ঋণ দেওয়া হবে এবং রেজিষ্ট্রারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে অন্য সমবায় সমিতিকেও ঋণ দেওয়া হবে।

(৪) প্রত্যেক সমিতির হিসাবপত্র রেজিষ্ট্রার বা তাঁর অধীনস্থ কোন কর্মচারী দ্বারা বিনা পারিশ্রমিকে অডিট বা পরীক্ষা করা হবে।

(৫) গ্রাম্য সমিতির সভ্যগণের পাঁচভাগের চার ভাগ কৃষক হবে। নাগরিক সমিতির ক্ষেত্রে পাঁচ ভাগের চার ভাগ সভ্য কৃষক নন এমন ব্যক্তি হবে।

(৬) গ্রাম্য সমিতির সভ্যগণের দাযিত্ব অসীম হবে। প্রাদেশিক সরকারের বিশেষ অনুমতিক্রমে এই নীতির ব্যতিক্রম হতে পারবে। নাগরিক সমিতির দায়িত্ব অসীম বা সীমাবদ্ধ যে কোন একটি হতে পারবে।

(৭) গ্রাম্য সমিতিব লাভ হতে সভ্যদের ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ দেওয়া হবে না। লাভেব সবটুকু বর্ষশেষে সংরক্ষিত তহবিলে যাবে। তবে যখন এই তহবিল বাই-ল অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করবে, তখন লাভ হতে কিছু অংশ সভ্যদের দেওয়া যেতে পারবে।

(৮) নাগরিক সমিতির লাভের এক চতুর্থাংশ সংরক্ষিত তহবিলে যাওয়ার পর ডিভিডেণ্ড দেওয়া যেতে পারবে।

(৯) ঋণ শুধুমাত্র সভ্যদের দেওযা হবে। তার জন্য ব্যক্তিগত জামিন বা অন্য কোন বাস্তব বা স্থাবর সম্পত্তির জামিন লওয়া হবে। তবে অস্থাবর সম্পত্তির জামিনে কোন কর্জ্জ দেওয়া হবে না। অনেক কৃষক তাদের সঞ্চয়

হতে গহনা তৈরী করিয়ে থাকেন বলে গহনা জামিন রেখেও কর্জ্জ দেওয়া হবে।

(১০) এই আইন অনুসারে গঠিত সমিতিগুলিকে ষ্ট্যাম্প, রেজিষ্টারী-করণ ও আয়কর আইন অনুসারে দেয় ফি দিতে হবে না।

১৯০৪ সালের আইনের দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যথা—সরলতা ও স্থিতি-স্থাপকতা। এই আইনে শুধুমাত্র ঋণদান সমিতির গঠন ও রেজিষ্টারীকরণে অনুমতি দেওয়া হয়। ভারতের অগণিত নিরক্ষর কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সমিতি নানারকম জটিলতার সৃষ্টি করতে পারবে আশঙ্কা করে এই সরল নীতিটি গ্রহণ করা হয়েছিল যে শুধুমাত্র ঋণদান সমবায় সমিতির উদ্ভব হবে। এই আইনের স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে বলতে গেলে বল্‌তে হয় যে এই আইনকে কার্য্যকরী করার জন্য প্রাদেশিক সরকার নিজ নিজ পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের নিয়ম যাকে ইংরাজীতে বলা হয় "রুল" রচনা করতে পারবেন। এই আইন পাশ হওয়ার দু বছরের মধ্যে ৮০০ সমিতি গঠিত হয়।

এই আইনের কতকগুলি ক্রটি ছিল সেগুলি হচ্চে :—

(১) কোন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠনের অনুমতি ছিল না এই আইনে। (২) ঋণদান সমিতি ছাড়া অন্য কোন সমবায় সমিতি গঠন করা যেত না। (৩) গ্রাম্য সমিতির ক্ষেত্রে লভ্যাংশ বণ্টন প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। (৪) সমবায় সমিতির যে শ্রেণীকরণ করা হয়েছিল—যেমন গ্রাম্য ও নাগরিক সমিতি—তা যুক্তিযুক্ত ছিল না।

১৯১২ সালে এই আইনের সংশোধন করা হয়। যে আইন পাশ হয় তার নামকরণ হতে ঋণদান কথাটি তুলে দিয়ে নামকরণ হয় "সমবায় সমিতি বিষয়ক আইন—১৯১২"। এর ফলে ঋণদান ছাড়াও অন্য সমিতি এবং কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন সম্ভবপর হয়। এই আইনের অন্যান্য প্রধান প্রধান ধারাগুলি নিচে দেওয়া হল :—

(১) প্রাদেশিক সরকার অন্যরকম নির্দ্দেশ না দিলে, কেন্দ্রীয় সমিতির দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হবে এবং গ্রাম্য ঋণদান সমিতির দায়িত্ব অসীম হবে।

(২) রেজিষ্ট্রারের অনুমতি নিয়ে যে কোন সমিতি তার নিট্ লাভের এক চতুর্থাংশ সংরক্ষিত তহবিলে দিয়ে বাকী নিট্ লাভের শতকরা ১০ ভাগ দাতব্য খাতে খরচ করতে পারবে।

(৩) আইনকে কার্য্যকরী করার জন্য প্রাদেশিক সরকারদের রুল তৈরীর

আরও বেশী ক্ষমতা দেওয়া হল যেমন সভ্যপদের সর্ত্তাবলী, সাধারণ সভা পরিচালনার নিয়মাবলী এবং সালিশীর (ডিস্‌পিউটএর) নিয়মাবলী ইত্যাদি। এই সব রুলের আইনের মতই কার্য্যকারীতা ও জোর থাকবে।

(৪) সমবায় আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রি নয় এমন কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইংরাজি "কো-অপারেসন" বা "সমবায়" শব্দটি ব্যবহার করতে পারবে না। তবে এই আইন বলবৎ হওয়ার আগে যদি ঐ শব্দ কোন প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করছিল দেখা যায় তাহলে এটা তার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না।

(৫) সমবায় সমিতির শেয়ার বা তার মত অন্য কোন স্বত্ব কোন আইনের বলে ক্রোক করা যাবে না।

(৬) সমবায় সমিতিকে ঋণ আদাযের ব্যাপারে প্রথম দাবী দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়।

এইভাবে ১৯১২ সালের আইন পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯০৪ সালের আইনের অনেক ত্রুটি সংশোধন করে এবং সমবায় আন্দোলনের উন্নতির পথ প্রশস্ত করে দেয়। ১৯১৪ সালে সমবায় আন্দোলন ঠিক পথে অগ্রসর হচ্ছে কিনা দেখার জন্য মিঃ ম্যাকলেগানের সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি "সমবায় বিষয়ক কমিটি" বা "ম্যাকলেগান কমিটি" নামে পরিচিত। ১৯১৫ সালে এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এর প্রধান সুপারিশগুলি ছিল এইরূপ :—

(১) উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হবে এই উদ্দেশ্য নিয়েই ঋণ দেওয়া উচিত এবং তা সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হোল কি না তা দেখা উচিত।

(২) ঋণ শুধুমাত্র সভ্যদেরই দেওয়া উচিত।

(৩) ঝুকি নিতে হবে এরূপ কোন ব্যবসায়াদিতে ব্যবহারের জন্য কর্জ্জ দেওয়া উচিত হবে না।

(৪) কর্জ্জ দাদনের আগে ভাল করে সব বিষয়ে অনুসন্ধান দরকার এবং তার পরেও লক্ষ্য রাখা উচিত যে কর্জ্জ ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা এবং সময় মত আদায় হচ্ছে কিনা।

(৫) মূলধন যাতে সভ্য এবং তাদের প্রতিবেশীদের কাছ হতে ওঠে তার চেষ্টা করতে হবে।

(৬) অবৈতনিক পরিচালনা পদ্ধতিই শ্রেয়ঃ। পরিচালনার জন্য কোন খরচ করা সমীচিন হবে না।

(৭) ঋণদানের প্রধান ভিত্তি হবে সভ্যগণের সততা অর্থাৎ যে সভ্য ঋণ

পরিশোধের ব্যাপারে যতটা সততা দেখাবে সে ঋণপাবার তত বেশী যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(৮) সমিতির এলাকা ছোট হওয়া উচিত।

(৯) সমবায় নীতি সম্বন্ধে সভ্যদের যথাযথ জ্ঞান থাকা উচিত এবং নূতন সভ্য গ্রহণের ব্যাপারে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

(১০) নিয়ম মত ও যথা সময়ে কর্জ্জ আদায় হওয়া উচিত।

(১১) সভ্যদের মধ্যে সঞ্চয়ীর মনোভাব গড়ে তুলতে হবে এবং তারা যাতে সঞ্চয় করে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

(১২) সংরক্ষিত তহবিলের অঙ্ক যাতে বেশী হয় তার চেষ্টা করতে হবে।

(১৩) ঋণদান সমিতিও যেমন গঠিত হবে, ঋণদান ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের সমিতিও সে রকম গঠনের চেষ্টা করতে হবে যেমন ফসল উৎপাদন সমিতি, বিপণন সমিতি প্রভৃতি।

নূতন সমিতি গঠনের ব্যাপারে কমিটি মন্তব্য করেন যে সমিতির সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বেশী করার প্রয়োজন নেই বিশেষ করে তা যদি বাইরের কোন লোক বা প্রতিনিধি মারফৎ হয়। সমবায় আন্দোলন যাতে যতদূর সম্ভব স্বতঃস্ফুর্ত্ত হয় কমিটি তার উপর বেশী জোর দেন। ঋণ চাওয়া মাত্রই ঋণদান করার মত সহজ ঋণদান পদ্ধতির বিপদ সম্বন্ধে কমিটি সকলের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাছাড়া প্রতি সমিতির হিসাব যাতে ভাল ভাবে অডিট্ বা পরীক্ষা করা হয় এবং সমিতির পরিদর্শন যাতে সুষ্ঠু হয় সেদিকে সবিশেষ নজর রাখার দিকে কমিটি জোর দেন। এর ফলে খারাপ পরিচালনা বন্ধ হবে, সমিতির অর্থ আত্মসাৎ করার সম্ভাবনা ও প্রবৃত্তি দমন করা যাবে এবং সমিতির আমানতকারীদের মনে সমিতি সম্বন্ধে আস্থা জাগবে।

১৯১২ সাল হতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত আন্দোলনের বড় রকমের প্রসার হল। ১৯১১-১২ সালে সমিতির সংখ্যা ছিল ৮১৭৭ এবং সভ্য সংখ্যা ছিল ৪,০৩,৩১৮। ১৯২০-২১ সালে সমিতির সংখ্যা দাঁড়াল ৫২,১৮২ এবং সভ্য সংখ্যা হোল ১৯,৭৪,২৯০। কার্য্যকরী মূলধনের মাত্রা শতকরা হিসাবে ৪১১ ভাগ বেড়ে গেল। ঋণদান ছাড়া কৃষির অন্যান্য ক্ষেত্রেও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষামূলক উদ্যমও এই সময়ের মধ্যে লক্ষিত হোল।

১৯১৯ সালের মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমবায়

আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হয়। এই আইনে সমবায়কে প্রাদেশিক বিষয় (Provincial Subject) হিসাবে গণ্য করা হয়। সমবায় আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার লাভে অধিকতর প্রয়োজনীয় সাহায্য করার জন্য স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন প্রদেশ একে একে ১৯১২ সালের আইন সংশোধন করতে সুরু করে। ১৯২৫ সালে বোম্বাই স্বতন্ত্র সমবায় আইন পাশ করে। ১৯১৯ থেকে ১৯২৯ সাল অবধি অকৃষি-সমবায় আন্দোলনও বিরাট প্রসার লাভ করে; ১৯২৬-২৭ সালে কৃষি-বিষয়ক রাজকীয় কমিশন দেশের সমবায় আন্দোলন উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন সুপারিশ করার সময় মন্তব্য করেন যে, "যদি সমবায় আন্দোলন অকৃতকার্য্য হয়, তবে ভারতের সমস্ত পল্লীবাসীর আশা-ভরসার বিলোপ ঘটবে।"

তারপর ১৯৩০-৩১ সালের পৃথিবীব্যাপী দ্রব্যমূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সমবায় আন্দোলনের পরবর্ত্তী অধ্যায় সুরু হয়। ক্রমশঃ সমবায় আন্দোলন শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়; কৃষিজাত দ্রব্যের দাম অসম্ভব কমে যায়; সঙ্গে সঙ্গে সমিতির সভ্য তথা সমিতির খেলাপী ঋণের পরিমাণও বেড়ে যায় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক অবস্থা স্বভাবতঃই দুর্বল হয়ে পড়ে।

তারপর ১৯৩১ সালে সমবায় আন্দোলনের অবস্থা পরীক্ষা ও উন্নতিকল্পে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯৩৪ সালে ভারতের রিজার্ভব্যাঙ্ক গঠিত হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষি-ঋণ বিভাগ গোড়া থেকেই সমবায় আন্দোলনের প্রতি বিশেষ করে সমবায় ঋণদান আন্দোলনের ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি দেন।

তারপর ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমবায় আন্দোলনের আর একটি বিশেষ অধ্যাযও সুরু হয়। যুদ্ধের ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বেড়ে যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পুরানো খেলাপী ঋণ আদায়ের পথ সুগম হয। কৃষি ও অকৃষি উভয়ক্ষেত্রেই ঋণ ছাড়া অন্যান্য দিকেও সমবায় সমিতির গঠন ও কাজ চলতে থাকে। যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালে সমবায় ভাণ্ডার আন্দোলন বিশেষ প্রসারলাভ করে। কিছু কিছু সর্ব্বার্থসাধক সমিতি, বিপণন সমিতি, সমবায় চাষ সমিতি, শিল্প সমবায় সমিতি ও বাসগৃহ সংস্থান সমিতিও এই সময়ে গড়ে ওঠে।

কৃষি সমবায় সমিতি ও কৃষি-ঋণ সম্পর্কে ১৯৪৪ সালের গ্যাড্‌গিল কমিটি ও ১৯৪৫ সালের 'সরাইয়া কমিটি' কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ করেন। গ্যাডগিল কমিটি বলেন, কৃষি-ঋণ সমস্যার সমাধান হতে পারে একমাত্র সমবায়ের ব্যাপক প্রসারে। কিন্তু অন্যদিকে ঋণের চাহিদার সবটুকু সমবায়ের পক্ষে সরবরাহ করাও সম্ভব নয়, তাই প্রচুর পরিমাণে সরকারী সাহায্য প্রয়োজন। কমিটি তাই কৃষি ঋণ সরবরাহের জন্য প্রত্যেক প্রদেশে সরকারী সাহায্যে পুষ্ট 'কৃষি-ঋণ কর্পোরেশন' স্থাপনের সুপারিশ করেন।

সরাইয়া কমিটি কিন্তু গ্যাড্‌গিল কমিটির সুপারিশ পুরোপুরি মেনে নেন নি, বিশেষ করে কৃষি ঋণ কর্পোরেশন স্থাপনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। সরাইয়া কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি হচ্ছে—

১। চাষীদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য তাদের সব কিছু কাজ সমবায়ের মাধ্যমে করতে হবে ;

২। দশ বছরের মধ্যে ভারতের গ্রামগুলির শতকরা ৫০ ভাগ ও পল্লী বাসীদের শতকরা ৩০ ভাগ গ্রামকে সমবায়ের আওতায় আন্‌তে হবে ;

৩। পল্লী ঋণদান সমিতির সভ্য সংখ্যা ন্যূনতম ৫০ জন হবে।

৪। সভ্যদের উদ্বৃত্ত শস্য-বিপণণের জন্য সমিতি গড়ে তুলতে হবে ;

১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত ভারতের নিয়ামকদের সম্মেলনে উভয় কমিটির সুপারিশ সমূহ আলোচিত হয় এবং সবাই 'সরাইয়া কমিটি'র সুপারিশ গ্রহণের পক্ষে সুপারিশ করেন।

তারপর ১৯৪৯ সালে পল্লী অঞ্চলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা প্রসার কল্পে ভারত সরকার কর্তৃক পল্লী-ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি (ঠাকুরদাস কমিটি) নিযুক্ত হয়। এই কমিটি 'গ্যাডগিল কমিটি'র পরিকল্পিত কৃষি-ঋণ কর্পোরেশনের কাজ যাতে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক গ্রহণ করতে পারে তার স্বপক্ষে মত দেন। কমিটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক অধিকতর আর্থিক সাহায্য দানেরও সুপারিশ করেন।

১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায়ীদের, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের, অর্থনীতিবিদ্‌দের ও অন্যান্যদের এক সম্মেলনে আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে শ্রী এ, ডি, গোরওয়ালার নেতৃত্বে নিখিল ভারত পল্লী-ঋণ কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এই সিদ্ধান্তের বলে ঐ কমিটি নিযুক্ত হয় সঙ্গে সঙ্গে। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সমীক্ষা কমিটির রিপোর্টে সমবায় ঋণদান আন্দোলন এবং ঋণদান ও শস্য বিপণণের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগের

ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। চাষীদের ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে একমাত্র সমবায় সমিতিকে প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু সমীক্ষা কমিটির রিপোর্টে সমবায় আন্দোলনের যে রূপ দেখানো হয়েছে তা' মোটেই সন্তোষজনক নয়। সমবায় সমিতি সে সময় পর্য্যন্ত কৃষিঋণের চাহিদার মাত্র শতকরা ৩'১ ভাগ মেটাতে পেরেছে। কমিটি বলেন, সমবায়ের মাধ্যমে শস্য বিপণনের ব্যবস্থা না করে শুধু ঋণ সম্প্রসারণে চাষীর তেমন কোন উপকার সাধন সম্ভব নয়। তা'ছাড়া পল্লী-ঋণ সমস্যা ভারতের পল্লী অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সমীক্ষা কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্যতম :

(১) সর্বশ্রেণীর সমিতিতে সরকার কর্তৃক অংশ গ্রহণ ;

(২) সমন্বিত (integrated) ঋণ ও বিপণন্ পরিকল্পনা ;

(৩) সমবায় শিক্ষার প্রসার ও দক্ষ ও শিক্ষিত কর্মচারী দ্বারা সমবায় সমিতির পরিচালনের ব্যবস্থা ;

(৪) পল্লী অঞ্চলে ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের প্রসারকল্পে ভারতের ইম্‌পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করা ;

(৫) কৃষিজাত দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম্‌ঘর নির্মাণের ব্যাপারে সরকার কর্তৃক ঐ রকম সমিতিতে অংগ্রহণ ;

(৬) বৃহদাকার কৃষি-ঋণদান সমিতির প্রবর্তন, যাতে ঋণদান সমিতি আর্থিক দিক হতে স্বচ্ছল হতে পারে (economically viable)।

পরবর্তীকাল—

(ক) সমবায় আইন বিষয়ক কমিটি ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে নিখিল ভারত পল্লী ঋণ সমীক্ষা কামটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর স্থির হয় যে, সমীক্ষা কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায় উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কার্য্যসূচী গ্রহণ করা হবে। সমীক্ষা কমিটির সুপারিশের কাজে রূপ দেওয়ার জন্য, বিশেষতঃ সরকার কর্তৃক সমবায় সমিতির অংশগ্রহণ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সন্নিবেশ করার জন্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সমবায় আইন আরও সহজ, বোধগম্য করার জন্য প্রয়োজনমত রদ-বদল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সমবায় আইনের মধ্যে সমতা বজায় রাখার জন্য ভারত সরকার ১৯৫৬ সালের জুন মাসে শ্রীএস. টি. রাজার নেতৃত্বে সমবায় আইন বিষয়ক কমিটি নিযুক্ত করেন। কমিটি ১৯৫৭ সালের

যে মাসে ভারতের সর্ব্বত্র প্রযোজ্য একটি সমবায় আইনের খসড়া এবং একটি রিপোর্ট পেশ করেন।

(খ) স্যার ম্যাল্‌কম্‌ ডারলিং কর্তৃক সমবায় আন্দোলন পর্যবেক্ষণ ও যথাযথ সুপারিশ :—

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায়ের যে সব বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হয়েছে, তা পরীক্ষা করার জন্য এবং সমবায়ের অন্যান্য দিক্‌ও পরীক্ষার জন্য ভারত সরকার স্যার ম্যাল্‌কম ডারলিংকে পরিকল্পনা কমিশনের উপদেষ্টা হিসাবে গ্রহণ করেন। স্যার ডারলিংকে বিভিন্ন রাজ্যের সমবায় দপ্তর সুদৃঢ় করণে, সমবায় কর্ম্মচারীদের উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমবায় আন্দোলনের সংগঠন বিষয়ে সুপারিশ করার জন্যও বলা হয়। সমবায় ঋণদান সমিতি সম্পর্কে স্যার ডারলিং-এর প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি নীচে দেওয়া হল :—

(১) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায়-ঋণ আন্দোলন বিষয়ক কর্মসূচীর তালিকা কিছু কমানো দরকার।

(২) তিন রকমের বৃহদাকার সমিতি গঠন করতে হবে এবং ছোট ছোট সমিতির আর্থিক সমৃদ্ধিলাভের ব্যাপারে যথেষ্ট চেষ্টা প্রয়োজন। স্যার ডারলিং বলেন যে, বৃহদাকার সমিতির যেমন কতকগুলি সুবিধা রয়েছে তেমন খুব বড় সমিতি হলে' সত্যিকারের সমবায়ের আদর্শ পুরোপুরি পালন করা সম্ভব নয়। তাই ইনি বলেন, পুর্নগঠিত প্রাথমিক সমিতিগুলির সভ্য সংখ্যা ৫০০-র বেশী হওয়া উচিত নয়। সমিতির এলাকাভুক্ত কোন গ্রাম, সমিতির প্রধান কার্য্যালয় থেকে দুই মাইলের বেশী দূরে অবস্থিত থাক্‌লে চল্‌বে না।

(৩) সঞ্চয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে সমিতির সভ্যদের সঞ্চয়শীল হওয়ার ম'ত মনোবৃত্তির সৃষ্টি করতে হবে এবং তার ফলে আমানতের পরিমাণ বেড়ে যাবে।

(৪) সমবায় ঋণ ও বিপণনের মধ্যে একটা নিবিড় যোগাযোগ থাকা দরকার। মাল সরবরাহ বা শস্য বিপণন ক্ষেত্রে সমবায় সমিতি যথেষ্ট সাফল্য দেখাতে পারলে, রাসায়নিক সার প্রভৃতি বণ্টনের ভারও উক্ত সমিতিদের ওপর ন্যস্ত করা উচিত হবে।

(৫) গ্রামবাসীদের সামাজিক উৎসবাদিতে খরচ-পত্র কমানোর জন্য সমবায় দপ্তরের কর্মচারীদের চেষ্টা করতে হবে।

(গ) জাতীয় উন্নয়ন সংস্থার সিদ্ধান্ত—১৯৫৮ সালের ৮ই ও ৯ই নভেম্বরে

অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় উন্নয়ণসংস্থা স্থির করেন যে, সমবায় আন্দোলনকে জন-আন্দোলনরূপে সার্থক করতে হলে গ্রাম-ভিত্তিতে প্রাথমিক সমিতি গড়ে তুলতে হবে এবং গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার সক্রিয় প্রচেষ্টা ও দায়িত্ব থাকবে যেমন থাকবে গ্রাম পঞ্চাযেৎ-এর। যেখানে গ্রামের আয়তন খুব ছোট, সেখানে গ্রামবাসীর সম্মতি-ক্রমে একাধিক গ্রাম (১০০০ হাজার জনসংখ্যার ভিত্তিতে) নিয়ে সমিতি গড়ে উঠ্‌তে পারে। সাধারণতঃ পঞ্চাযেৎ ও সমবায় সমিতির এলাকা যতটা সম্ভব একই থাকবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতের সমস্ত পল্লীর পরিবারদের সমবায়ের আওতায় আনা হবে বলে স্থির হয়।

জাতীয় উন্নয়ন সংস্থার সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার জন্য পরিচালন ও সংগঠন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলী বিবেচনা করার জন্য ভারত সরকার একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ নিযোগ করেন। তারপর জাতীয় উন্নয়ন সংস্থার প্রস্তাবসহ ওয়ার্কিং গ্রুপের রিপোর্ট সমস্ত রাজ্য সরকার, ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া'ও বিভিন্ন খ্যাতনামা সমবায়ীদের পাঠান হয়। ১৯৫৯ সালের ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল জাতীয় উন্নয়ন সংস্থার সভায উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের মতামত আলোচনার পর ভারত সরকার সমবায় সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নীতি নির্দ্ধারণ করেন। ভারত সরকার স্থির করেন যে, ১লা এপ্রিল ১৯৫৯ হতে আর বৃহাদাকার ঋণদান সমিতি গঠন করা হবে না। তার বদলে পঞ্চাযেৎ-এর যে এলাকা থাকবে তার ভিত্তিতে গ্রাম্য ঋণদান সমিতি গঠন করা হবে। এইভাবে সমিতিব সভ্যদের মধ্যে পরস্পর জানা-শোনা সম্ভব হবে এবং পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য-বোধ জেগে উঠ্‌বে। পল্লীঋণদান সমিতিতে আর সরকারী অংশীদারী থাকবে না; তবে ৩১শে মার্চ ১৯৫৯ অবধি যে সব বৃহদাকার সমিতি গঠিত হয়েছে, এদের ক্ষেত্রে শুধু সরকারী অংশীদারীর ব্যবস্থা থাকবে। অবশ্য অন্যান্য সমবায় সমিতিতে সরকারী অংশীদারীর ব্যবস্থা আগের মত থাকবে। সভ্যদের মতানুযায়ী গ্রাম্য সমিতিগুলি অসীম বা সসীম দায়িত্ব-বিশিষ্ট থাকতে পারবে। গ্রাম্য সমিতির প্রধান কাজ হবে, স্বল্পমেযাদী ও মধ্যমেয়াদী ঋণদান, কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদনজনিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ এবং কৃষিজাত দ্রব্যের বিপণন। তাছাড়া যাতে কৃষি-উৎপাদন বাড়ে তারজন্য সমিতি সচেষ্ট হবে। তারজন্য অধিকতর সেচ ব্যবস্থা, উন্নততর কৃষি-যন্ত্রপাতি ব্যবহার, উন্নততর

বীজ ও সার তৈরী প্রভৃতির দিকে সমিতি লক্ষ্য রাখবে। সমিতির লক্ষ্য হবে, যাতে গ্রামের প্রতিটি পরিবার সমবায় সমিতির সভ্যভুক্ত হয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, জাতীয় উন্নয়ন সংস্থা গ্রামভিত্তিতে সর্বার্থ-সাধক পল্লীঋণদান সমিতি সংগঠনের স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সমিতিগুলির নাম হবে, "সেবা সমিতি" (Service Co-operative)। জাতীয় কংগ্রেসের নাগপুরের অধিবেশনে উক্ত নামকরণের প্রস্তাব গৃহীত হয় বলেই এই নামকরণ সরকার গ্রহণ করেন।

(ঘ) মেহেতা কমিটির সুপারিশসমূহ—১৯৫৯ সালে মহীশূরে বিভিন্ন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলন কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ঋণ সরবরাই সম্প্রসারণের এবং তা সম্ভবপর করে তুলতে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তা সুপাবিশ করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযোগের সুপারিশ করেন। ১৯৫৯ সালের শেষে শ্রীভি. এল. মেহেতার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং ১৯৬০ সালের মে মাসে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

কমিটি পল্লীঋণদান সমিতিদের জন্য কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম আরোপ করেননি ; বরঞ্চ সমিতি সংগঠন ব্যাপার রাজ্য সরকারদের ইচ্ছাধীনে ছেড়ে দেন। অবশ্য আর্থিক সমৃদ্ধি ও সমবায় প্রকৃতি বজায় রাখার ওপর কমিটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। মেহেতা কমিটির বিশেষ বিশেষ সুপারিশ হচ্ছে :—

(১) ঋণদান সমিতির এলাকা সাধারণতঃ ৩ হাজার জনসংখ্যা যেখানে আছে সে রকম এলাকা নিয়ে হবে এবং এলাকাভুক্ত কোন গ্রামই প্রধান কার্য্যালয় থেকে ৩।৪ মাইলের বেশী দূরে থাকবে না ;

(২) ১ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা অবধি সরকার সমিতির অংশ কিনে নেবেন (State participation in share capital)।

৩। উপযুক্ত সমিতিকে পাঁচ বছরের মধ্যে খরচের জন্য কর্মচারীর বেতন বাবদ সরকার ১২০০৲ টাকা দান করবেন ;

৪। পরিশোধ ক্ষমতা ও কৃষি-উৎপাদনজনিত ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে শুধু ব্যক্তিগত জামিনে ভূমিহীন চাষীকে ও স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেওয়া চলবে :

৫। মধ্য-মেয়াদী ঋণদাদন ব্যাপারে ৫০০৲ টাকার কম কোন ঋণের জন্য জমি-বন্ধক দেওয়ার প্রয়োজন হবে না ;

৬। ঋণের সঙ্গে বিপণনের যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে; প্রাথমিক ঋণদান সমিতিদের অধিকতর গুদাম তৈরীর সুযোগ দিতে হবে;

৭। বিপণন সমিতিকে চাষীদের কাছ থেকে সরাসরি কৃষিজাত দ্রব্য ক্রয়ের অনুমতি দিতে হবে এবং যাতে সমিতির কোন লোকসান না হয়, তার জন্য স্থিরীকৃত মূল্যে বিপণন সমিতির মাল সরকার কিনে নেবেন। শুধু উৎপন্ন শস্য বিক্রী করে ঋণ-পরিশোধে বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। উৎপন্ন শস্য বিক্রী করে যেখানে ভাল দাম পাবে, সেখানেই, বিক্রী করার অধিকার চাষীর থাকবে। অন্য যে কোন আয় থেকে তার ঋণ পরিশোধ করা চলবে।

কমিটি বলেন যে, ভূমিহীন চাষীকে ঋণদান করার দরুনও ঋণদান পদ্ধতি অনেক শিথিল করাতে এবং বহুল পরিমাণে ঋণদানের ব্যবস্থা হওয়ার দরুন ঋণের টাকা খেলাপী হওযার সম্ভাবনা বাড়তে পারে এবং তাতে অনেক সমিতির লোকসানও হতে পারে। এইজন্য প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে 'সাহায্য ও প্রতিশ্রুতি তহবিল' (Relief and Guarantee Fund) গড়ে তুলতে হবে এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় তার যথাযথ ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাছাড়া, প্রত্যেক শ্রেণীর ঋণদান সমিতিতে 'কৃষি-ঋণ স্থিতীশীল তহবিল' (Agriculture Credit Stabilisation Fund) গঠিত ও সুদৃঢ় করতে হবে। কমিটি আরও বলেন, অনেক ঋণদান সমিতি হয়ত প্রস্তাবিত ঋণদানে সম্মত নাও হতে পারে। তারজন্য সরকারী প্রতিশ্রুতি ছাড়া আরও কিছু লোভনীয় আকর্ষণ থাকা উচিত। তাই যে সমস্ত ঋণদান সমিতি তাদের পূর্ব বছরের ঋণের পরিমাণের বেশী পরিমাণ টাকা হালসনে দাদন করবে তাদের ঐ বাড়তি টাকার ওপর শতকরা ৩৲ টাকা হারে সরকার সরাসরি দান করবেন; আর অনুরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ককে দেবেন শতকরা ১৲ টাকা। এই সরাসরি দান ১৯৬১-৬২ সাল থেকে আরম্ভ করতে হবে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল চাষী সম্প্রদায়কে যথেষ্ট ঋণ দেওয়া হ'ল কিনা, তা বিবেচনা না করেই প্রথম দু'বছর সরকারী দান চলতে পারে। অবশ্য উপরি উক্ত সাহায্য পেতে হলে অলঙ্কার প্রভৃতির জামিনে দেওয়া ঋণ অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না। তৃতীয় বছর থেকে সরকারী দান ব্যাপারে যথাযথ বিধি-নিষেধ থাকবে। সরকারী দানের টাকা "অনাদায়ী ঋণ-বিষয়ক বিশেষ তহবিল" (Special Bad Debt Reserve)এ রাখতে হবে এবং উক্ত তহবিলের সম্পূর্ণ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে

জমা রাখতে হবে। নিয়ামকের অনুমোদনক্রমে বিশেষ তহবিল-এর টাকা ব্যবসায়ে খাটানো যেতে পারে বটে, কিন্তু তা সাধারণতঃ ঘাট্‌তি পূরণে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের লোকসানের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ ঐ বিশেষ তহবিল থেকে পূরণ করা চল্‌বে। সাধারণতঃ 'ঘ' ও 'ঙ' (D & E) শ্রেণী সমিতি ছাড়া আর সকল শ্রেণীর ঋণদান সমিতিই উক্ত সরকারী দান পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(ঙ) সরকার কর্তৃক মেহেতা কমিটির সুপারিশ গ্রহণ ও তৃতীয় পরিকল্পনা—

১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় উন্নয়ন সংস্থা মেহেতা কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেন। পূর্বের ন্যায় গ্রাম ভিত্তিতে সমবায় সমিতি সংগঠিত হবে বলে ভারত সরকার স্থির করেন। আর্থিক স্বাচ্ছল্য বজায় রেখে কাজ করতে হলে যদি একাধিক গ্রাম নিয়ে সমিতির এলাকা নির্দ্ধারণ করার দরকার হয় তাও করা যাবে। সমিতির আর্থিক স্বাচ্ছল্য (Viability) সম্ভব হয়েছে বলা যাবে তখনই যখন সমিতি সরকারের ওপর অর্থ সাহায্যের জন্য নির্ভর না করে, নিজস্ব তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় খরচাদি বহন করতে পারবে। যে সব সমিতি অনেক আগে থেকেই কাজ করছে, এদের বেলায় এই এলাকা সম্পর্কিত নূতন ব্যবস্থা কার্যকরী করা হবে না।

সরকারী অংশীদারী সম্পর্কে ভারত সরকার স্থির করেন যে, সাধারণতঃ ৫০০০৲ টাকা অবধি সরকার শেয়ার (অংশ) কিনে নেবেন ; তবে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন বড় সমিতির বেলায় ইত্যাদি) দশ হাজার টাকা অবধি শেয়ার সরকার কিনে নিতে পারেন। সমিতি যত টাকা অংশগত মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে, তত টাকা অবধি সরকার শেয়ার কিনে নেবেন ; অবশ্য অনুন্নত অঞ্চলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। অসীম-দায়িত্ব বিশিষ্ট সমিতির শেয়ারও সরকার কিন্‌তে পারবেন ; এক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব কিন্তু সসীমই থাক্‌বে। এই সরকারী অংশীদারীর একটা সর্ত হচ্ছে যে সমিতির শতকরা ৬০জন সভ্যের এই সরকারী অংশীদারীতে সম্মতি থাকা চাই ; আর ঋণসরবরাহকারী ব্যাঙ্কেরও মত থাকা চাই। সাধারণতঃ শীর্ষ ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এই সরকারী অংশীদারীর ব্যবস্থা থাক্‌বে এবং এইভাবে যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রাথমিক সমিতির শেয়ার কিনে নেয়, তা' হলে ব্যাঙ্ক প্রাথমিক সমিতির কার্য-নির্বাহক কমিটিতে মোট সভ্যের এক-

তৃতীয়াংশ বা তিনজন পর্যন্ত সভ্য মনোনীত করতে পারবেন। এমন কি সরকার সরাসরি সমিতির শেয়ার কিনে নিলেও, সরকার কর্তৃক কোন সভ্য মনোনয়নের ব্যবস্থা থাকবে না। এই ব্যাপারে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেবেন। ৪ থেকে ৮ বছর পর্যন্ত এই সরকারী অংশীদারী কোন সমিতিতে চল্‌তে পারে। প্রয়োজনীয় অংশগত তহবিলের টাকা সংগৃহীত হলে পরবর্ত্তী ৫ থেকে ৮ বছরের মধ্যে এই সরকারী অংশের টাকা ফেরৎ দিতে হবে।

পুনর্গঠিত সমিতিদের মত সেবা সমিতিকেও ৯০০৲ টাকা পাঁচ থেকে আট বছরের মধ্যে কর্ম্মচারীর বেতনাদি বাবদ খরচের জন্য সরকার দান করবেন। তবে যে সব সেবা সমিতি বিভিন্ন আবশ্যকীয় কাজ করছে (যেমন, ঋণদান, উন্নততর বীজ, সার, কৃষি-যন্ত্রপাতি সরবরাহ, সভ্যদের উৎপন্ন শস্য বিপণনের ব্যবস্থা ইত্যাদি) তারাই এই সরকারী দান পাওয়ার যোগ্য হবে।

অনাদায়ী কৃষি-বিষয়ক বিশেষ তহবিলে সরকারী দান সম্পর্কে যেহেতো কমিটির যে সুপারিশ রয়েছে, তা সরকার পুরোপুরি মেনে নেন। তবে প্রথম দু'বছর বাদে দুর্বল চাষী সম্প্রদায়কে ঋণদান সম্পর্কিত খুঁটিনাটি পরীক্ষার ব্যাপারে যেহেতো কমিটির সুপারিশ সরকার মেনে নেননি। সরকার স্থির করেন যে, এই ব্যাপারে রাজ্য-সরকারদের সঙ্গে পরামর্শ করে তার পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চল্‌বে। আগেই বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত ঋণদান সমিতি পূর্ব বছরের ঋণের পরিমাণের বেশী পরিমাণ টাকা হালসনে দাদন করবে তাদের ঐ বাড়তি টাকার ওপর শতকরা ৩৲ টাকা হারে সরকার সরাসরি দান করবে ; আর অনুরূপক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দেবে ১৲ টাকা। কিন্তু পরে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ঠিক হয়েছে যে "নিবিড় চাষ পরিকল্পনা" (Package Scheme) যে সব জেলাতে চালু করা হয়েছে সেখানে এই দানের পরিমাণ প্রাথমিক সমিতির ক্ষেত্রে শতকরা ৪৲ টাকা ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে শতকরা ২৲ টাকা করা হবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবশ্যকীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিখিল ভারত পল্লীঋণ কমিটি সমীক্ষা কর্তৃক সমবায় আন্দোলন বিশ্লেষণ ও তার ভিত্তিতে সুপারিশ

১৯৫৩-৫৪ সাল অবধি ভারতের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি তেমন সন্তোষজনক নয়। কৃষি-ঋণ ক্ষেত্রে, সমবায় মোট চাহিদার মাত্র শতকরা ৩.১ ভাগ সরবরাহ করতে পেরেছে; কৃষি-ঋণদান সমিতির অবস্থা ছিল, অনেকটা যত্র আয় তত্র ব্যয় এর মত; অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃষি-ঋণ দিয়ে এদের জীবনীশক্তি কোন রকমে রাখতে পেরেছে। সমিতিগুলি ছিল খুব ছোট, আর তেমনি ওদের সভ্যসংখ্যা ও মূলধনও ছিল স্বল্প। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমবায় নীতি বিলোপ পেয়েছিল বল্‌লে বাড়িয়ে বলা হয় না। সময় উপযোগী চাষ আবাদের জন্য সভ্যরা ঋণ গ্রহণ করত এবং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্মচারী বা সমবায় দপ্তরের কর্মচারিদের তাগিদে ঋণের টাকা পরিশোধ করত। সমিতি যে ওদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, এ সম্পর্কে সভ্যগণ মোটেই সচেতন ছিল না।

আবার অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অবস্থাও ছিল অনেকটা তেমনি। বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও মধ্য প্রদেশ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অধিকাংশ ব্যাঙ্কই লোকসানে কাজ চালাত। তা'ছাড়া এ সব ব্যাঙ্ক মোটেই স্বাবলম্বী হতে পারে নি। তারপর, মাদ্রাজ, বোম্বাই, অন্ধ্র, মহীশূর, মধ্য প্রদেশ, উড়িষ্যা, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি কৃতকার্য হলেও সে সাফল্য সমানভাবে সম্ভব হয়নি। অন্যান্য রাজ্যে এই ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। অবশ্য অ-কৃষি ঋণদান ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সমিতিগুলি বেশ সফলতার সঙ্গে কাজ করতে পেরেছে। কিন্তু এদের কার্যধারায় সমবায় নীতির রূপ প্রায় ছিল না বল্‌লেই চলে। সমবায় আন্দোলনের কোন কোন বিশেষ দিকে যে সফলতা দেখা যায়, তা সম্ভব হয়েছিল শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন নিঃস্বার্থপর সমবায়ীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরপুর কর্মপ্রচেষ্টায়। যাই হোক্ সমীক্ষা কমিটি পল্লী ঋণ সরবরাহের ব্যাপারে সমবায় আন্দোলনের দান সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :—

পল্লীঋণ সমস্যা সমাধানে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তার মধ্যে সমবায় সমিতি গড়ে তোলা অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৪ সালের সর্বভারতীয় আইন সমবায় ঋণদান সমিতি গঠনে সুযোগ দেয়। ১৯১২ সালের সংশোধিত আইনে কৃষি-ঋণ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সমিতি গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত হয় এবং ১৯২৫ সাল থেকে বিভিন্ন প্রদেশ তাদের সমবায় সম্পর্কিত প্রাদেশিক আইন প্রণয়ন করতে থাকে।

সাধারণতঃ চাষীদের স্বল্প মেয়াদী, মধ্য-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী—এই তিন রকমের ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। স্বল্প মেয়াদী ও মধ্য মেয়াদী ঋণ প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক থেকে আরম্ভ করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও প্রাথমিক সমিতি অবধি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেওযার ব্যবস্থা করা হয়। আর দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দেওয়ার জন্য ছিল জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক।

সমীক্ষা কমিটি বলেন, চাষীদের ঋণের চাহিদার মাত্র শতকরা ৩.১ ভাগ মেটাতে পেরেছে সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি। সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—কি সভ্যদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কি তাদের ঋণ চাহিদা মেটানর ব্যাপারে—সর্বক্ষেত্রেই নিজেদের মধ্য থেকে সব কিছু ব্যবস্থা করে নেওয়া। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি অনেকটা ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের মত কাজ করছে—যেমন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলি জনসাধারণের উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত নিয়ে তা প্রাথমিক সমিতির মাধ্যমে চাষীদের ঋণ-সরবরাহে নিযোগ করে। সমীক্ষা কমিটির মতে, গড়ে মাত্র শতকরা ৩.২ ভাগ চাষী পরিবার সমবায সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করে। সমিতিগুলির সভ্য সংখ্যা, আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন, আমানত ও কার্যকরী তহবিল গড়ে ৪৪ জন ৮২৭৲ টাকা, ৪০৮৲ টাকা ও ৪,১৯০৲ টাকায় দাঁড়িয়েছে। প্রয়োজনীয় তহবিলের জন্য অধিকাংশ সমিতিকেই পরের ওপর নির্ভর করতে হয়। ১৯৫১-৫২ সালেই সমিতিগুলির উপরিউক্ত অবস্থা দৃষ্ট হয়। প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলির অধিকাংশই সমবায় ঋণদানের ব্যাপারে যথাযথ নজর না দিয়ে বরঞ্চ ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতির সভ্য নয়, এমন লোকদের ঋণদানে যত্নপর হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশে সমিতির খেলাপী কর্জ্জের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা ৮২৲ ও ২০৲ টাকা। আর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির অবস্থাও ছিল তথৈবচ। এদের নিজস্ব তহবিল এত কম ছিল যে, প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের ওপর নির্ভর করা ছাড়া এদের গত্যন্তর ছিল না;

ব্যাঙ্কের সংখ্যা ক্রমশঃ অসম্ভব বেড়ে যায় সত্য, কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা তেমনি বাড়েনি! তারপর যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালে বিভিন্ন কাঁচা কারবার করে অধিকাংশ ব্যাঙ্কই প্রচুর লোকসান দেয়। দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণক্ষেত্রে, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ পূর্বঋণ পরিশোধের জন্যই ঋণ-দাদন করে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে জমি-উন্নয়ন উদ্দেশ্যেও ঋণ দেয়। এই ব্যাঙ্কগুলিতে কোন বিশেষ ধরণের কাগজপত্তর পরীক্ষা বা অন্যান্য কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত কর্মচারী ছিল না। ঋণদান ব্যাপারে যথেষ্ট সময় লাগত। তা'ছাড়া প্রয়োজনীয় দীর্ঘ-মেয়াদী তহবিল সংগ্রহেও অনেক ব্যাঙ্ক সমর্থ হয়নি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার কর্তৃক গ্যারাণ্টী থাকা সত্বেও জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের ঋণপত্র তেমন চালু করা যায় নি; কাজেই উপরিউক্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করে সমীক্ষা কমিটি মন্তব্য করেন যে, "ভারতে সমবায় সফলতা লাভ করতে পারেনি।"

প্রাথমিক ঋণদান সমিতির ঋণদান ব্যাপারেও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। নীতিগতভাবে সমবায়-ঋণ হচ্ছে ব্যক্তিগত ঋণ; মানে খাতকের চরিত্র ও ঋণ পরিশোধের ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে সাধারণতঃ সমবায় ঋণদান করা উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঋণের জামিন হিসাবে একমাত্র অস্থাবর সম্পত্তিকেই এ যাবৎ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বড় বড় জোতদার-দেরই ঋণদান ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সমীক্ষা কমিটির মতে, বড জোতদারদের বেলায়, মধ্য জোতদার ও ছোট জোতদারদের বেলায় পরিবার পিছু ঋণ গ্রহণের পরিমাণ গড়ে ২:৲ ৪·৭৲ ও ১·৯৲ টাকায় দাঁড়িয়েছে। চাষ উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়ে চাষী সাধারণতঃ অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করেছে। কৃষি-ঋণ স্থায়ী ঋণ হিসাবে ব্যবহৃত হত, কেননা, গৃহীত ঋণ সাময়িকভাবে পরিশোধ করে কিছু দিন পরেই আবার ঋণ নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কাজেই অনেকক্ষেত্রে সত্যিকারের ঋণ পরিশোধ না করে খাতায় পরিশোধ লেখানোর ব্যবস্থা ছিল।

পল্লী ঋণ ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের স্থান সমীক্ষা কমিটির রিপোর্টের কয়েকটি ছত্রে সুস্পষ্ট হয়েছে; যেমন :—

"দেশের পল্লী ঋণ সরবরাহে সমবায় ঋণের স্থান নিতান্তই নগণ্য। সংগঠন ও আর্থিক দিক দিয়ে শীর্ষ সমিতিগুলি সম্প্রতি সম্যক প্রসারলাভ করেছে বটে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সমিতিগুলি এখনও খুব দুর্বল। কিন্তু সবার

চাইতে সব দিক দিয়ে দুর্বল হচ্ছে, প্রাথমিক সমিতিগুলি। উত্তম সমবায় বা বলিষ্ঠ ঋণ ব্যবস্থা এ দুই-এর কোন ক্ষেত্রেই এর আবশ্যকীয় গুণাবলী নেই বল্‌লেই চলে।”

পল্লীঋণ সরবরাহে সমবায় আন্দোলনের অকৃতকার্য্যতার কারণ :—

১। ম্যাকল্যাগান কমিটি বলেন যে, সমিতির এলাকা একটি গ্রামের বেশী থাকা উচিত নয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত ভারতের নিয়ামকদের সম্মেলনে স্থির হয় যে, যেখানে কোন গ্রামের আয়তন খুব ছোট, সেখানে একটির বেশী গ্রাম নিয়েও সমিতির এলাকা থাকৃতে পারে। যাই হোক্ সবাই মেনে নিয়েছেন যে, অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করণে প্রয়োজনীয় এলাকা নিয়ে কৃষি-ঋণদান সমিতি গড়ে তোলা প্রযোজন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় ছোট ছোট সমিতি কাজ করছে। এদের আর্থিক বুনিয়াদও স্বভাবতঃই দুর্ব্বল।

২। অনেকের মতে সমিতিগুলি অসীম-দায়িত্ব বিশিষ্ট থাকায় সাধারণতঃ স্বচ্ছল, বড় বা মধ্য জোতদাররা সমিতির সভ্য হতে চাযনি। কাজেই ঋণদান সমিতিগুলি গরীব ও দুর্বল চাষীদের নিয়েই সংগঠিত হয়েছে যার ফলে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকৃতকার্য হয়েছে। তাই সমবায় পরিকল্পনা কমিটি (১৯৪৬) সুপারিশ করেন যে, যে সব অসীমদায়িত্ব বিশিষ্ট সমিতি ভাল কাজ করছে, এদের দাযিত্ব অসীম থাকৃতে পারে, কিন্তু পুনর্গঠিত প্রাথমিক সমিতি সসীম দায়িত্ববিশিষ্ট থাকাই বাঞ্ছনীয়। আবার কেহ কেহ বলেন, সমিতির কি ধরণের দাযিত্ব থাকৃবে, সে সম্পর্কে সমিতির চাষী সভ্যগণই ঠিক করবেন।

৩। অনেকের মতে, ঋণদান সমিতির অকৃতকার্যতার কারণ হচ্ছে, প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও শীর্ষসমিতিগুলির মধ্যে নিবিড় যোগাযোগের অভাব।

৪। আবার রাজকীয় কৃষি-কমিশন (১৯২৮) ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিবরণী (১৯৩৭) মন্তব্য করেন যে, ব্যবসায়ের ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক চালানর যে প্রথা তাতে উপযুক্ত শিক্ষণের অভাবই হচ্ছে ভারতের সমবায় আন্দোলনের অকৃত-কার্যতার কারণ।

৫। জনসাধারণের মধ্যে সমবায় শিক্ষার অভাব, সমবায় আন্দোলনে অকৃতকার্যতার অন্যতম কারণ।

৬। আবার কেহ কেহ বলেন, সমবায় সমিতি সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের

ব্যাপারে সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের প্রাধান্য থাকায় সমবায় আন্দোলন কৃতকার্য্য হতে পারেনি।

কিন্তু সমীক্ষা কমিটি বলেন যে, সমবায় ঋণ আন্দোলনের অকৃতকার্য্যতার মূলে যে শুধু উপরিউক্ত প্রধান কারণগুলি রয়েছে তা নয়; অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণও বহুলাংশে দায়ী। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্ত্তৃক প্রকাশিত কোন পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চাষীদের শুধু অবাধ ঋণদানে পল্লীঋণ সমস্যার সমাধান হতে পারে না। যতদিন পর্য্যন্ত চাষীদের কর্জ্জ গ্রহণ ও কর্জ্জ পরিশোধের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্বন্ধ গঠিত না হয় ততদিন সমস্যার কোন সামাধান আশা করা যায় না। ঋণ পরিশোধের ক্ষমতার বেশী মাত্রায় ঋণ গ্রহণ করলে তার ফল অবশ্যই খারাপ হতে বাধ্য। তাই সমীক্ষা কমিটিও বলেন, সমবায় ঋণ আন্দোলনের অসফলতার কারণ হচ্ছে, পল্লী অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমস্যাজনিত কারণ। গ্রামাঞ্চলে উন্নততর চাষ-ব্যবস্থা, চাষ-ব্যবসায় ও জীবনধারণ সম্ভব করাই ছিল সমবায়ের লক্ষ্য। কাজেই সমবায়ের মাধ্যমে উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সম্পাদনে কতটা প্রয়োজনীয় অনুকূল পরিবেশ ছিল, তা দেখা দরকার।

চাষীর আর্থিক স্বাচ্ছল্যের জন্য উন্নততর চাষ ব্যবস্থা প্রয়োজন। আবার ভূমিকর, ভূমিস্বত্ব ও তার মেয়াদ, জমির আয়তন, সেচ-ব্যবস্থা, উন্নততর বীজ ও সার সরবরায়, অবসরকালীন বিভিন্ন পেশার সুযোগ গ্রহণ ইত্যাদি চাষীর আর্থিক স্বাচ্ছল্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কাজেই উপরিউক্ত ব্যবস্থায় সরকারী উদ্যোগ ও প্রচুর আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে সমবায় সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব নয়। আবার উন্নততর চাষ-ব্যবসায়ের দু'টো দিক রয়েছে—একটা হচ্ছে ঋণ, আর একটা হচ্ছে উৎপাদনের পর বিভিন্ন আর্থিক কার্য্য সম্পাদন, যথা, সংরক্ষণ বা গুদামজাত করণ, বিপণন ইত্যাদি। এই দুটো দিকেই চাষীকে মহাজন বা গ্রামের ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভর করতে হয়, কেননা সমবায় সমিতি চাষী-সভ্যদের প্রয়োজনানুযায়ী উৎপাদন ও ভোগ উদ্দেশ্যে ঋণ সরবরাহ করতে সক্ষম হয় না। ঋণ ও উৎপন্ন শস্য-বিপণন ব্যাপারে গ্রাম্য ব্যবসায়ী যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। কাজেই মহাজনরা বেশী সুদ গ্রহণ করলে বা ব্যবসায়ীরা অল্পদামে উৎপন্ন শস্য কিনতে চাইলে চাষীরা সাধারণতঃ আপত্তি করে না। তাছাড়া গ্রাম্য মহাজন বা ব্যবসায়ীদের

টাকার অভাব নেই; প্রয়োজন হলে গ্রাম্য ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক থেকে টাকা সংগ্রহও করতে পারে।

কিন্তু অন্যদিকে, সমবায় সমিতিগুলি হচ্ছে খুব দুর্ব্বল এবং স্বভাবতঃই শক্তিশালী গ্রাম্য মহাজন বা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এরা দাঁড়াতে পারে না। কাজেই এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় সমিতির পক্ষে চাষীদের হিতার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। চাষী সভ্যের স্বভাব ও পরিশোধ-ক্ষমতার ভিত্তিতে যদিও সমবায় সমিতি কর্ত্তৃক ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তবু তা পুরোপুরি কাজে লাগানো হয়নি। সমবায় সমিতির ন্যায় গ্রাম্য মহাজনরা কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি জামিন রাখার ওপর মোটেই গুরুত্ব দেয় না। সর্ব্বোপরি, সমবায় সমিতিগুলির তাদের সভ্যদের আপদে-বিপদে সাহায্য করার মত যোগ্যতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতাও ছিল না। আর শুধু সমবায় সমিতির পরিচালনা, তদারকী, উপদেশদান বা অনুরূপ কাজের মধ্যেই সরকারী কর্ত্তব্য সীমাবদ্ধ থেকেছে।

কাজেই সমীক্ষা কমিটি বলেন, চাষী সভ্যদের উৎপাদন ও বিপণন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করতে হলে, সমবায় সমিতির প্রচুর অর্থ সম্পদ থাকা বাঞ্ছনীয়। সমবায় কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি হলে গ্রাম্য ব্যবসায়ীদের হাত থেকে চাষীদের রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে। ১৯৫১-৫২ সাল অবধি সমবায় সমিতি সত্যিকারের এই সু-বিপণন ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয়নি; তাই ব্যবসায়ের দিক্ থেকে বিচার করলে বল্‌তে হয়, সমবায় সমিতি অকৃতকার্য্যতার সম্মুখীনই হয়েছে। আবার যদি উন্নততর চাষ-ব্যবস্থা ও চাষ-ব্যবসায় সম্ভব না হয়, তবে উন্নততর জীবন ধারণও সম্ভব নয়। কাজেই সমীক্ষা কমিটি মনে করেন যে, যতদিন সমবায় সমিতির কার্য্যধারা চাষীর জীবনের বিভিন্ন দিকে কৃতকার্য্যতার সঙ্গে ধাবিত না হয়, ততদিন সমবায় সমিতির প্রকৃত সাফল্যলাভ সম্ভব নয়।

সমবায় আন্দোলনের অসফলতার প্রধান কারণ সমীক্ষা কমিটির নিম্নলিখিত মন্তব্য হতে বেশ সুস্পষ্ট বোঝা যাবে:—

"অত্যন্ত গরীবদের সমবায়ের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে খুব বড় লোকদের (যেমন, মহাজন, জোৎদার প্রভৃতিদের) সঙ্গে পাল্লা দিতে পারার অক্ষমতা

সমবায় সমিতির অকৃতকার্য্যতার একটি কারণ। শুধু তাই নয়, যদি আশা করা যায় যে এই রকম সমিতি নিজস্ব ক্ষমতাবলে এমন অবস্থার সৃষ্টি করবে যাতে তারা ঐ রকম দুর্দ্ধর্ষ শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের হাত থেকে রেহাই পাবে এবং সমাজের যে বিচিত্র সমাজ-অর্থনীতিক কাঠামো পরাধীনতার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে তার অসুবিধাগুলি দূর করে পল্লীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর করে তুলবে, তবে তা প্রায় দুরাশারই নামান্তর হয়ে পড়ে। সমবায় প্রথায় ঋণদান পদ্ধতির অকৃতকার্য্যতার মূল কারণ এই রকম দুরাশাকে সম্ভব করে তোলার অবাস্তব চেষ্টার মধ্যে নিবদ্ধ।"

কাজেই সমবায় ঋণের পুনর্গঠনই বড় সমস্যা নয়—দুর্ব্বল ব্যক্তি সমষ্টির হিতার্থে সুচারুরূপে কার্য্যসাধনে নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করাই হচ্ছে বড় সমস্যা। সাধারণতঃ দুর্ব্বল জনসাধারণকে নিয়েই সমবায় সমিতিগুলি সংগঠিত হয়েছে। সমিতির সভ্যগণ একদিকে সমিতি থেকে ধার নিচ্ছে। আবার অন্যদিকে কর্জ্জগ্রহণের জন্য মহাজনদের কাছেও হাত পাতছে। আবার দেখা যায়, একই ব্যক্তি হয়ত একদিকে মহাজন, আর একদিকে ব্যবসায়ী। যদিও এদের কোন ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠান নেই, তবু এরা সবাই অবস্থাপন্ন। কাজেই ঋণদান ব্যাপারে সমবায় সমিতিকে উক্ত মহাজন বা ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়।

কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, সমবায় সমিতিগুলির আর্থিক বুনিয়াদ খুব দুর্ব্বল। কাজেই সমবায় সমিতি ও গ্রাম্য মহাজন বা ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনেকটা সিংহ ও মূষিকের মধ্যে প্রতিযোগিতার মত। সমবায় সমিতিগুলির আর্থিক বুনিয়াদ দুর্ব্বল হওয়াতে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক থেকে ধার পায় না। আর সরকার রয়েছে শুধু এদের পরিচালনা, তদারকী করা ও উপদেশ দেওয়ার জন্য। কিন্তু গ্রাম্য মহাজন বা ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনবোধে খুব সহজেই ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক বা দেশীয় ব্যাঙ্ক থেকে অর্থসাহায্য পায়। সমীক্ষা কমিটিও বলেন যে, এই মহাজন বা ব্যবসায়ীরা প্রয়োজন মত তাদের অর্থ সম্পদ বাড়ানোর জন্য অফুরন্ত অর্থভাণ্ডারে পরিপূর্ণ বিভিন্ন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পায়। দুঃখের বিষয়, ভারত বৃটিশ শাসনাধীনে বৃটিশ উপনিবেশ-এ পরিণত হয়েছিল। শহরগুলি ছিল অর্থকরী-শস্য রপ্তানিকেন্দ্র। বিভিন্ন গ্রাম্য ব্যবসায়ীগণ গ্রামাঞ্চল থেকে এ সব শস্য রপ্তানি-কেন্দ্রে নিয়ে

আসত। সুদূর পল্লী অঞ্চলে ক্রমশঃ দ্রব্য বিনিময় প্রথা উঠে যায় এবং মুদ্রা বিনিময় অর্থনীতি চালু হয়। আবার মুদ্রা বিনিময়ের প্রয়োজনীয় অর্থ যোগায় গ্রাম্য মহাজন বা ব্যবসায়ীরা। ক্রমশঃ কুটির শিল্পেরও বিলোপ ঘটে। কাজেই এভাবে গ্রামীণ অর্থনীতির একটা বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে। অবশ্য মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ কয়েকজন মনীষী "গ্রামে ফিরিয়া যাও" বাণী প্রচার করতে থাকেন। উক্ত বাণী কার্য্যকরী করা বা গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুদ্ধার সম্ভব হত যদি সরকার সত্যিকারের চেষ্টা করত। কিন্তু সরকার এই ব্যাপারে এক রকম উদাসীন ছিল, বলা যায়। একদিকে বিদেশী শাসন, অন্যদিকে জনমঙ্গল রাষ্ট্র ব্যবস্থার অভাব ছিল। স্বভাবতঃই শাসন-কেন্দ্র বা অর্থ-কেন্দ্র বলতে একমাত্র শহরগুলিকেই বোঝাত। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন সমবায় সমিতিগুলির গ্রাম্য মহাজন বা ব্যবসায়ীদের আওতায় আসা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আবার সরকারের অধস্তন কর্ম্মচারী, বিশেষতঃ সমবায় ও রাজস্ব দপ্তরের কর্ম্মচারীরাও মফঃস্বলে গিয়ে এই শক্তিশালী মহাজন বা তথাকথিত গ্রাম্য নেতাদের শরণাপন্ন হত। সমীক্ষা কমিটি বলেন যে, সরকারের অধস্তন কর্ম্মচারীদের সঙ্গে এইসব গ্রাম্য নেতার একটা নিবিড় যোগাযোগ থাকাতে, স্বভাবতঃই সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্য্যে রূপান্তরিত করা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কেননা, কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য এইসব গ্রাম্য নেতাদের মতামতের ওপর নির্ভর করতে হত।

অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে উৎসাহী বা সুদক্ষ কর্ম্মচারীরা সমবায় পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সাধারণতঃ যখন কোন দক্ষ ও দরদী সরকারী কর্ম্মচারী এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলী হয়ে যেত তখন উন্নয়নের গতি শ্লথ হয়ে যেত ও তারপর গ্রাম্য নেতাদের মতামতের ওপর আবার সবকিছু নির্ভর করত। কাজেই উৎকৃষ্ট সরকারী পরিকল্পনার ব্যর্থতায় গ্রামের দুর্ব্বল ও গরীব জনসাধারণ আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়ে।

এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় আন্দোলনকে পুনর্জ্জীবিত ও শক্তিশালী করে তুলতে হবে এবং তার জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন বর্ত্তমান সমাজ ও আর্থিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন। কাজেই সমবায় ঋণদান আন্দোলনের সাফল্যের জন্য সমীক্ষা কমিটি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন।

পল্লী অঞ্চলে ঋণ সরবরাহার্থে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলী পরীক্ষা করে সমীক্ষা কমিটি বলেন যে, পল্লী-ঋণদান ব্যবস্থা যে কোন এক প্রতিষ্ঠানের

মাধ্যমেই করতে হবে। সমীক্ষা কমিটি সব রকম প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকারিতা আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত প্রতিষ্ঠানই সেই প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে পল্লী-ঋণদান করা বিধেয়। সমবায় সমিতির সার্থকতা নিম্নোক্ত উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হবে।

ধরা যাক্, একটি সমবায় ঋণদান সমিতি ২০,০০০৲ টাকা ঋণদাদন করেছে ও তা ১০০ জন সভ্যদের মধ্যে মাথা পিছু ২০০৲ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। ঐ ২০,০০০৲ টাকা অন্য কোথাও থেকে (যেমন, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হতে) ধার করে এনেছে এবং তার ওপর শতকরা ৬৲ টাকা করে সুদ দিতে হবে। তাহলে মোট সুদ বাবদ সমিতিকে ১,২০০৲ টাকা দিতে হবে। আর যদি সভ্যদের শতকরা ৮৲ টাকা হারে ধার দিয়ে থাকে তাহলে তাদের কাছ থেকে সমিতি সুদ পাবে ১,৬০০৲ টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ২০,০০০৲ টাকা ঋণগ্রহণ ও ঋণদান করে সমিতির মোট ৪০০৲ টাকা আয় হবে। এখন যদি খাতক সভ্যের সংখ্যা ১০০ থেকে ৫০০তে দাঁড়ায়, তাহলে আয়ের পরিমাণ ৪০০৲ টাকার পাঁচগুণ অর্থাৎ ২০০০৲ টাকা হবে। যদি সমিতির বিভিন্ন খরচ বাবদ ১০০০৲ টাকা ধরা হয়, তাহলেও সমিতির নীট মুনাফা থাকে ১০০০৲ টাকা। উক্ত ১০০০৲ টাকা সমিতি তার সংরক্ষিত তহবিলে রাখতে পারে।

এভাবে দেখা যাবে, প্রায় ২০ বছরের ভেতর সমিতি ২০,০০০৲ টাকা সংরক্ষিত তহবিলে জমাতে পারবে এবং এভাবে নিজস্ব তহবিল সুদৃঢ় করতে পারবে ও অন্য কোথাও থেকে ধার না করলেও ঋণ ব্যবসা চলতে পারবে। (অনেকে মনে করতে পারেন যে এটা শুধু কথার কথা। কাজের দিক হতে এর কোন মূল্য নেই। তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানান যায় যে বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীধরপুর গ্রামে ঠিক এই রকমভাবে শ্রীধরপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক গড়ে উঠেছে।) কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ঋণ সরবরাহ ব্যাপারে সমবায় আন্দোলন তেমন উল্লেখযোগ্য কাজ দেখাতে পারেনি। কিন্তু যখন পল্লী ঋণদান ব্যাপারে সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই ঐ ঋণ দেওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়েছে তখন এই সমস্যার সমাধান হতে পারে যদি সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি পুনর্গঠিত করা যায়। এই পুনর্গঠিত সমিতির মাধ্যমে ভারতের পল্লীঋণ সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা সহকারে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সমীক্ষা কমিটির মতে এই পল্লীঋণের মোট পরিমাণ ৭৫০ কোটি টাকার মত।

কাজেই উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সাধনে সর্ব্বপ্রথম দরকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্ত্তন। শুধু চাষাবাদের জন্য ঋণ দিয়েই সমস্যার সমাধান হতে পারে না। উৎসবাদিজনিত ব্যয়-ভার, ভরণপোষণের ব্যয়-ভার বহনের জন্য আবার চাষীদের মহাজনদের কাছে হাত পাততে হচ্ছে। গ্রাম্য ব্যবসায়ীরাও বিভিন্ন প্রয়োজনে ঋণ সরবরাহ করছে। আবার অন্যদিকে, গ্রামের জমিদারদের অসম্ভব সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বর্ত্তমান। কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই তিন শ্রেণীর লোক—মহাজন, ব্যবসায়ী ও জমিদার গ্রামের জনসাধারণকে শোষণ করার জন্য উন্মুখ। ব্যবসাদার ও মহাজন সস্তাদামে খাতক চাষীর উৎপন্ন শস্য কিনে নিয়ে তা বেশী দামে বিক্রী করে মুনাফাটা পকেটে পোরে। অন্যদিকে আবার ধার দেওয়া টাকার ওপরও চড়া সুদ নেয়। চাষীকে তারা দুদিক থেকেই মারে—বেশী সুদ নিয়ে আর ফসল বিক্রী করে যে ভাল লাভ হত তা থেকে বঞ্চিত করে। এভাবে অনেক সময় চাষী তার সমস্ত উৎপন্ন শস্য হাতছাড়া করতে বাধ্য হয় এবং শেষে উপরিউক্ত ব্যক্তিদের কাছে আবার হাত পাতা ছাড়া উপায় থাকে না। দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা এই অবস্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। তাই শুধু চাষাবাদ ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যেও, যথা বিবাহাদিজনিত ব্যয় প্রভৃতির মত অন্যান্য ব্যযের ক্ষেত্রে সেই ভার বহন করার জন্য চাষীদের ঋণ দিতে হবে; অলঙ্কার প্রভৃতির জামিনেও ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া উৎপন্ন শস্য ন্যায্য দামে বিক্রীর ব্যবস্থাও করতে হবে। চাষীরা তাদের উৎপন্ন শস্য বেশীদিন ধরে রাখতে পারে না। কাজেই ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তা বিক্রী করে দিতে হয়। ফলে তারা শস্যের ন্যায্য দাম পায না এবং আর্থিক অবস্থা 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং'ই থাকে। কাজেই শস্য বিপণনের সঙ্গে ঋণের যোগাযোগ রক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। সমীক্ষা কমিটি কৃষি-ঋণ আন্দোলনের পুনর্গঠনকল্পে নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন :—

(ক) সমবায় সমিতির সমস্ত পর্য্যায়ে সরকারী অংশীদারীর ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক কার্য্যকলাপের মধ্যে (যথা, বিপণন প্রভৃতির মধ্যে) পূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।

(গ) পল্লীবাসীদের প্রতি দরদ আছে এ রকম দক্ষ ও সমবায় শিক্ষায় শিক্ষিত কর্ম্মচারীর মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলির পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।

এক কথায়, চাষীর অর্থনৈতিক সব কার্য্যকলাপকে সমবায়ের আওতায় এনে ফেলতে হবে। একেই বলা হয়েছে সমন্বিত পল্লী ঋণ পরিকল্পনা, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় Integrated Scheme of Rural Credit.

এই পরিকল্পনা রূপায়িত করতে হলে সমবায় আন্দোলনকে চাষ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে সরকারকেও সমবায় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

চাষীদের বিভিন্ন কাজ—যথা, চাষ এবং চাষের মত অন্যান্য কাজ এবং তার সঙ্গে উৎসবাদি প্রভৃতির উদ্দেশ্যেও অল্প সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এমন কি ভূমিহীন কৃষককেও ঋণ দিতে হবে। এই ভাবেই মহাজনদের প্রভাব প্রতিপত্তি কমানো যেতে পারে। আবার গুদাম তৈরী করে এবং সমবায় বিপণন সমিতি গঠন করে চাষীদের শস্য বিপণনের সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। চাষীদের শস্য গুদামে রেখে এবং ঐ শস্যের জামিনে প্রয়োজনীয় আগাম টাকা তাদের দিয়ে গ্রাম্য ব্যবসায়ীদের কুখ্যাত কার্য্যকলাপ বন্ধ করা যেতে পারে।

তবে এ সমস্ত বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধনে প্রচুর টাকার দরকার। কাজেই সমবায় ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়াতে হবে, যাতে চাষী, গ্রাম্য বিপণন সমিতি ও গুদাম ঘরের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ তারা সরবরাহ করতে পারে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছরে চারটি তহবিল গঠন করা হয়েছিল এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক তাতে মোট ২১ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ছিল। এদের মধ্যে দু'টো তহবিলের টাকা সমবায় ঋণদান আন্দোলন ও বাকী দুটো সমবায় বিপণন আন্দোলনে লাগান হবে স্থির হয়েছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বছর থেকে এই তহবিলগুলিতে আরও ১১ কোটি টাকা লাগানোরও কথা ছিল। ঋণ দান সম্পর্কিত তহবিলগুলির টাকা যথাযথ বিনিয়োগ ও তৎসম্পর্কিত পরিকল্পনার ভার ছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওপর। এভাবে সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয় অর্থের অর্দ্ধেক আসার কথা ছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে।

সমীক্ষা কমিটি আরও বলেন, ঋণযোগ্য হলে ভূমিহীন চাষীকেও অল্প সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ভরণপোষণ উদ্দেশ্যেও ঋণদান করতে হবে। স্বর্ণ, অলঙ্কার ও অন্যান্য জিনিসের জামিনে ঋণদান সমিতি স্বল্প-মেয়াদী

ও মধ্য মেয়াদী ঋণ দেবে। অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ বা শস্যহানির সময় স্বল্প মেয়াদী ঋণ আদায় না করে তা মধ্য-মেয়াদী ঋণে পরিণত করা চলবে। কৃষি ঋণ সমিতিগুলি সসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট হবে।

কৃষি-ঋণ ও কৃষি-বিপণনের মধ্যে একটা নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করে উভয়ের সমন্বয় সাধন করতে হবে। প্রতি পাঁচটি পুনর্গঠিত বৃহদাকার কৃষি-ঋণদান সমিতির জন্য একটা করে কৃষি-বিপণন সমিতি থাকবে। ঋণদান সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সভ্য চাষীগণ তাদের উৎপন্ন শস্য ঐ বিপণন সমিতির মাধ্যমে বিক্রীর ব্যবস্থা করবে। সভ্যগণ তাদের শস্য গুদামে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাতে বিপণন সমিতি থেকে গুদামজাত শস্যের বাজার দরের শতকরা ৭৫৲ টাকা আগাম পেতে পারে তার ব্যবস্থা থাকবে। কারণ গুদামে ফসল তুলে হাত গুটিয়ে বসে থাকার মত স্বচ্ছল অবস্থা তাদের নয়। আবার সব টাকা তাদের দেওয়াও উচিত নয়। কারণ শস্যের দাম পড়ে যেতে পারে বা শস্য নষ্ট হতে পারে। সেক্ষেত্রে সমিতির লোকসান হবে। মনে রাখা দরকার যে, সমিতি তাদেরই সম্পত্তি। সমিতির লোকসান হলে তা উঠে যাবে এবং তার ফলে আবার তাদের ঋণের জন্য মহাজন ও ব্যবসাদারদের দ্বারস্থ হতে হবে। বৃহদাকার সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিও সভ্যদের উৎপন্ন শস্য সংগ্রহের ব্যাপারে বিপণন সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে পারবে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় গুদাম তৈরীরও ব্যবস্থা থাকবে। এইসব গুদাম তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় টাকা পাওয়া যাবে জাতীয় পণ্য সংরক্ষণাগার বোর্ড এবং সর্ব্বভারতীয় পণ্য সংরক্ষণাগার কর্পোরেশন থেকে। এই দুইটি সংস্থাই লোকসভায় গৃহীত আইনের বলে স্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমবায়—

নিখিল ভারত পল্লীঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমবায় উন্নয়ন বিষয়ক কার্য্যসূচী রচিত হয়। প্রত্যেক রাজ্য সরকার সমবায় সমিতির পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। অবশ্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শ্রমচুক্তি সমিতি, সমবায় চাষ সমিতি, সমবায় গৃহসংস্থান সমিতি সংগঠনের ওপরও জোর দেওয়া হয়।

১৯৫৫ সালে পাটনায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ভারতীয় সমবায় কংগ্রেস এবং ১৯৫৬ সালে মুসৌরীতে অনুষ্ঠিত রাজ্য সরকারের সমবায় মন্ত্রীদের প্রথম ও দ্বিতীয় সম্মেলনেও সমীক্ষা কমিটির সুপারিশ সমূহ আলোচিত হয়। প্রথম

সম্মেলন স্থির করেন যে, আগামী ১৫ বছরের মধ্যে চাষীদের ঋণ চাহিদার অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা সমবায় সমিতির মাধ্যমে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় মধ্যে পল্লী ঋণের চাহিদার অন্ততঃ শতকরা ১৫ ভাগ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায় উন্নয়নের বিভিন্ন কার্য্যসূচী

ঋণ

বৃহদাকার ঋণদান সমিতি স্থাপনের সংখ্যা	—১০,৪০০
স্বল্প মেয়াদী ঋণদানের পরিমাণ	—১৫০ কোটি টাকা
মধ্য-মেয়াদী ,, ,,	—৫০ কোটি টাকা
দীর্ঘ মেযাদী ঋণদানের পরিমাণ	—২৫ কোটি টাকা

বিপণন ও অন্যান্য অর্থকরী কার্য্যাবলী

প্রাথমিক বিপণন সমিতির স্থাপন সংখ্যা	—১,৮০০
সমবায় চিনির কারখানা	—৩৫
সমবায় তুলা সমিতি	—৪৮
অন্যান্য	—১১৮

পণ্য সংরক্ষণাগার ও গুদামঘর

কেন্দ্রীয় পণ্য সংরক্ষণাগার সংস্থাব গুদাম সংখ্যা	—১০০
রাজ্য ,, ,, ,, ,,	—২৫০
বিভিন্ন সমিতির গুদাম সংখ্যা	—১৫০০
বৃহদাকার ঋণদান সমিতির গুদাম সংখ্যা	—৪০০০

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সমবায়ের অগ্রগতি—

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের শেষে দেখা গেছে যে কৃষিক্ষেত্রে ২ লক্ষ প্রাথমিক সমিতি গড়ে উঠেছে। এদের সভ্যসংখ্যা প্রায় ১·৭ কোটিতে দাঁড়ায়। পল্লী অঞ্চলের জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ এবং কৃষক সম্প্রদায়ের শতকরা ৩৩ ভাগ লোককে সমবায় সমিতিগুলি নিজেদের আওতায় আনতে পেরেছে। ২৫৩০০ সেবা সমিতিও গড়ে উঠেছে এবং ৪২১০০ সমিতিকে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। স্বল্প-মেয়াদী ও মধ্য-মেয়াদী ঋণদাদনের পরিমাণ ও দীর্ঘ মেযাদী ঋণ দাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২০০ কোটি ও ৩৪ কোটি টাকায়। তাছাড়া ১৯০০টি বিপণন সমিতি, ৩০টি সমবায় চিনির কারখানা, ১০৫টি তুলা তৈরীর কারখানা, ৩২১টি অন্যান্য প্রসেসিং সমিতি, ১৬টি সমবায় হিম ঘর, গ্রাম্য ঋণদান

সমিতি কর্ত্তৃক ৪১০০টি গুদাম ও বিপণন সমিতি কর্ত্তৃক ১৬০০টি গুদাম তৈরী করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায়—

তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায়ের বিভিন্ন কার্য্যসূচীর মাধ্যমে পল্লীর পুনর্গঠন লক্ষ্যই প্রধান উদ্দেশ্য। ঋণ, বিপণন, গুদামজাত করণ প্রভৃতির মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের আর্থিক পুনর্গঠন সম্ভবপর করে তোলার নীতি গৃহীত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সমবায়ের আওতায় ভারতের সমস্ত গ্রাম ও গ্রামবাসীকে এনে সমবায় আন্দোলনকে জনগণের আন্দোলন হিসাবে রূপদান করতে হবে। তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় সমবায়ের বিভিন্ন কার্য্যসূচী নিম্নে দেওয়া হল:—

সেবা সমিতি সংগঠন	৩০,০০০
বর্ত্তমান সমিতি সমূহের পুনর্গঠন	৫৫,০০০
স্বল্প-মেয়াদী ঋণদাদনের পরিমাণ	৪০০ কোটি টাকা
মধ্য-মেয়াদী ঋণ দাদনের পরিমাণ	১০০ ,, ,,
দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দাদনের পরিমাণ	১৫০ ,, ,,
সমবায়ের আওতায় কৃষিজীবীর অন্তর্ভুক্তিকরণ	৬২%
সমবায়ের আওতায় পল্লীবাসীর অন্তর্ভুক্তিকরণ	৫২%
প্রাথমিক বিপণন সমিতির সংখ্যা	৫০০
সমবায় হিমঘর	৩৩
সমবায় চিনির কারখানা	৩০
সমবায় তুলা তৈরীর কারখানা	৪৮
অন্যান্য সমিতি	৭৯০

সমবায় সমিতি কর্ত্তৃক উদ্বৃত্ত উৎপন্ন শস্য বিপণন—৪০০ কোটি টাকা।

অন্যান্য সমিতি

প্রাথমিক সমবায় ভাণ্ডার সংগঠনের সংখ্যা	২,২০০
কেন্দ্রীয় বা হোলসেল সমবায় ভাণ্ডারের সংখ্যা	৫১
সমবায় চাষ সমিতির সংখ্যা	৩২০০ (বিশেষ বিশেষ এলাকায়)।
বিপণন সমিতি কর্ত্তৃক গুদাম নির্ম্মাণ	১০০০
পল্লী গুদাম নির্ম্মাণ	৯০০০

সমবায় সমিতিতে সরকারী অংশীদারী

১। সেবা সমিতি—১০০০৲ থেকে ৫০০০৲ টাকা অবধি (সাধারণ ক্ষেত্রে)
১০০০০৲ (বিশেষ ক্ষেত্রে)।

২। প্রাথমিক বিপণন সমিতি ২৫০০০৲

৩। সমবায় চাষ সমিতি ২০০০৲

৪। প্রাথমিক সমবায় ভাণ্ডার ২৫০০৲

৫। পাইকারী সমবায় ভাণ্ডার ২৫০০০৲

সরকারী ঋণদান ও দান-খয়রাৎ

দান-খয়রাৎ :—

১। সেবা সমিতি পরিচালন খাতে ৯০০৲ টাকা
(৫ থেকে ৮ বছরের মধ্যে)

২। বিপণন সমিতি পরিচালন খাতে ৪৬০০৲ টাকা

৩। সমবায় চাষ-সমিতির পরিচালন খাতে ১২০০৲ „
(৩ থেকে ৫ বছরের ভেতর)

৪। প্রাথমিক সমবায় ভাণ্ডারের
পরিচালন খাতে—১৮০০৲ টাকা

৫। পাইকারী সমবায় ভাণ্ডার ৩০০০৲ „

৬। পল্লী গুদাম তৈরী করার খাতে ২৫০০৲ „

ঋণ-খয়রাৎ :—

১। সমবায় চাষ সমিতির কার্য্যকরী
তহবিল বাবদ ঋণ—৪০০০৲ „

২। পল্লী গুদাম তৈরী করার জন্য ঋণ ৭৫০০৲ „

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমন্বিত কৃষি ঋণ পরিকল্পনা কি ও তার তাৎপর্য্য

নিখিল ভারত পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে, 'সমন্বিত কৃষি-ঋণ পরিকল্পনা' যার মূলে রয়েছে কৃষি-ঋণ ও কৃষিজাত দ্রব্য বিপণনের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মহাজন বা ব্যবসায়ীর নিকট হতে চাষী অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। সেই সব সুযোগ সুবিধা পুনর্গঠিত সমবায় সমিতি যদি দিতে পারে তা'হলে ক্রমশঃ ঐ সব মহাজন বা ব্যবসায়ীর যে অন্য রকম কারসাজি থাকে তা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে। মহাজনদের মত পুনর্গঠিত সমিতিকেও সভ্য-চাষীদের উৎসবাদি উদ্দেশ্যে ঋণ দিতে হবে এবং খাতকের চরিত্র ও সাধুতার উপর ভিত্তি করে শস্যের জামিনে ঋণ দিতে হবে। তাদের মত অলঙ্কার প্রভৃতির জামিনেও প্রয়োজন হলে তাড়াতাড়ি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবেই সমবায় ঋণদান সমিতি মহাজনের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তবে এসব কাজ সম্ভব হতে পারে যদি পল্লী ঋণদান সমিতিগুলি পুনর্গঠিত হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই পুনর্গঠন-সমস্যার সমাধান কি ভাবে সম্ভব হতে পারে? অধিকতর সভ্যসংখ্যা এবং অপেক্ষাকৃত বড় এলাকা নিয়ে সমিতি গঠিত হলে আর্থিক স্বাচ্ছল্য সম্ভব হতে পারে। বড় বড় বা মাঝারি ধরনের চাষীদের সমিতির সভ্যভুক্ত করতে হ'লে সমিতিকে সসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট করা দরকার, কারণ তা না হলে তারা সমিতিতে যোগ দেবে না। তবে একথাও সত্যি যে, খুব বড় এলাকা নিয়ে সমিতি থাকলে, সমিতির সভ্যদের মধ্যে পরস্পর জানা-শোনা, সাহায্য ইত্যাদির সম্ভাবনা কমে যায় বা থাকে না, এবং সেক্ষেত্রে সমিতির সমবায় প্রকৃতি অনেকটা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। চাষীদের সত্যিকারের উপকার করতে হলে শুধু বন্ধকী জামিনে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে চলবে না। আগামী শস্য-ফলনের জামিনে ঋণ-দেওয়ারও ব্যবস্থা করা দরকার। কাজেই বৃহদাকার ঋণদান সমিতিতে ঋণদান সম্পর্কে কড়াকড়ির অনেকটা শিথিলতা থাকে। সেই কারণেই বৃহদাকার সমিতি সত্যিকারের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান ও সমবায় প্রতিষ্ঠানের মিলন-কেন্দ্রস্বরূপ হতে

পারে। পল্লী অঞ্চলে কৃষিকার্য্যের উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়ার মত তেমন সুসংবদ্ধ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান নেই। কাজেই বৃহদাকার ঋণদান সমিতিগুলি পল্লী অঞ্চলে আদর্শ গ্রাম্য ব্যাঙ্কের কাজ করবে।

কিন্তু এই সমিতির তহবিল আসবে কোথা হতে? সমবায় সমিতির ওপর জনসাধারণের তেমন আস্থা না থাকায় তাদের নিকট হতে প্রয়োজনমত আমানত সংগ্রহ সম্ভব নয়। কাজেই সরকারকে এবং দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-কে এগিয়ে আসতে হবে; কেননা দেশের যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই কৃষক সম্প্রদায়ের উপকারের জন্য উপযুক্ত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা উন্নয়নে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। সমীক্ষা কমিটির মতে, ভারতে মোট ৭৫০ কোটি টাকা পল্লী ঋণ প্রয়োজন। কিন্তু ১৯৫১ সালের জুনমাস পর্য্যন্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সমবায় সমিতি মোট ঋণ চাহিদার মাত্র শতকরা ৩.১ ভাগ সরবরাহ করতে পেরেছে। কাজেই পল্লী অঞ্চলে ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হলে আরও সমিতি গঠন করা দরকার এবং সমিতিগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমবায় শিক্ষায় শিক্ষিত কর্ম্মচারীও প্রয়োজন।

সমন্বিত পরিকল্পনায় ঋণ ও বিপণনের যোগাযোগের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। কতকগুলি বৃহদাকার ও ক্ষুদ্রায়তন ঋণদান সমিতি কাছাকাছি কোন প্রাথমিক বিপণন সমিতির সঙ্গে একযোগে সভ্য হিসাবে কাজ করবে। এই বিপণন সমিতিগুলি সাধারণতঃ প্রধান প্রধান বিক্রয়-কেন্দ্রে অবস্থিত থাকবে এবং এক একটি রাজ্যের ভিত্তিতে এদের ওপরে থাকবে শীর্ষ বিপণন সমিতি। প্রাথমিক বিপণন সমিতিগুলি সভ্যদের উৎপন্ন শস্য বিপণনের সুব্যবস্থা করবে। সভ্য-চাষীদের ফসল যাতে মাঠ থেকে ঘরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী করতে না হয় এবং তা ধরে রাখা যায়, সেইমত ব্যবস্থা করবে এবং যখন বাজার দাম বাড়বে, সেই সময় শস্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। এইভাবে চাষীদের গ্রামের মহাজন বা ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। খাতক সভ্য ঋণদান সমিতি থেকে যে টাকা ধার নেবে, তা শোধ করার জন্য বিপণন সমিতির গুদামে উদ্বৃত্ত শস্য রেখে দেবে। তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে ফসল বিক্রী করার লোকসানের হাত থেকে সে একদিক হতে বাঁচবে। আবার অন্যদিকে ঐ ফসল বিপণন সমিতির গুদামে থাকায় ঋণদান সমিতির ঋণ পরিশোধের তাড়াও থাকবে না। পরে ঐ ফসল বিক্রী করে ঐ ঋণ

পরিশোধ করতে পারবে। তা ছাড়া যে শস্য গুদামে জমা থাকবে তার জামিনে বিপণন সমিতি চাষীদের আগাম কিছু টাকাও দিতে পারে। ঋণদান সমিতি চাষীসভ্যদের উন্নততর বীজ, সার, কৃষি-যন্ত্রপাতি, দৈনন্দিন আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থাও করতে পারে। বিপণন সমিতি নিজস্ব ছাড়াও রাজ্য বা কেন্দ্রীয় গুদাম কর্পোরেশনের গুদামে উদ্বৃত্ত শস্য রাখার ব্যবস্থা করতে পারবে। বিপণন সমিতিতে সরকারী অংশীদারী সম্ভব করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পণ্য রক্ষাগার বোর্ড (Warehousing Board) এর বিভিন্ন তহবিল থেকে পাওয়া যাবে। তাছাড়া সমিতির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্জ্জ বা এককালীন দান পাওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশ হাজার টাকা অংশগত মূলধন বিশিষ্ট ১,৮০০টি বিপণন সমিতি বড় বড় ব্যবসায় কেন্দ্রে গড়ে তোলার কথা ছিল। তাছাড়া, প্রত্যেক রাজ্যে শস্য বিপণন, অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য বণ্টন ইত্যাদি কাজের জন্য একটি পৃথক শীর্ষ বিপণন সমিতি গড়ে তোলার কথা ছিল। সমন্বিত পরিকল্পনায় সমবায় বিপণনের মত সমবায় প্রথায় খোসা ছাড়ান, দাইল ইত্যাদি ভাঙ্গার কাজ প্রভৃতির, যাকে ইংরাজীতে বলা হয় প্রসেসিং (Processing), তার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সাধারণতঃ 'প্রসেসিং' এর কাজ—যেমন, ধান থেকে চাল, মটর, মসুর, কলাই প্রভৃতি রবি শস্য থেকে ডাল তৈরী করার কাজ বিপণন সমিতিই করবে; কিন্তু ইক্ষু প্রভৃতি অর্থকরী শস্য-প্রধান এলাকায় পৃথক 'প্রসেসিং' সমিতি থাকবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় চিনির কারখানা, তুলা উৎপাদন কেন্দ্র, চালের কল ইত্যাদি বিষয়ক ২০৩টি সমবায় সমিতি গড়ে তোলার কথা ছিল। এই ধরনের প্রত্যেক সমিতিতে সরকারী অংশীদারীরও ব্যবস্থা ছিল।

বিভিন্ন গ্রাম এলাকায় অসংখ্য গুদাম স্থাপন করা ছাড়াও কৃষিজাত দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পণ্য সংরক্ষণাগার কর্পোরেশন ২০০ শত লক্ষ টন দ্রব্য ধরে এমন ৩৫০টি গুদামঘর তৈরী করার প্রস্তাব করেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সমন্বিত কৃষি-ঋণ পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :—

(১) কৃষিক্ষেত্রে সব রকমের সমিতিতে সরকারী অংশীদারীর ব্যবস্থা;

(২) কৃষি-ঋণ ও অন্যান্য আর্থিক কাজ—যেমন, বিপণন ও 'প্রসেসিং' ইত্যাদির মধ্যে পূর্ণ-সহযোগিতা ও সমন্বয়;

(৩) সমবায় সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা সমিতির সুষ্ঠু পরিচালনা।

এই সমন্বিত পরিকল্পনাটি এক সহজ দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান যেতে পারে। ধরে নেওয়া যাক্, রাম নামে কোন ব্যক্তি কোন একটি বৃহদাকার ঋণদান সমিতির সভ্য। এই সমিতিটি আবার ঐ এলাকায় একটি বিপণন সমিতিরও সভ্য। রাম ঋণদান সমিতি থেকে চাষাবাদের জন্য ৫০ টাকা ধার নিয়েছে। ফসল ওঠার পর সে ১০ মণ ধান (তখন হয়ত বাজার দর মণ প্রতি ১০৲) বিপণন সমিতির গুদামে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে সে বিপণন সমিতি থেকে বাজার দরের শতকরা ৭৫৲ টাকা হিসাবে মোট ৭৫৲ টাকা আগাম পেল। এই ৭৫৲ টাকার শতকরা ৭৫ ভাগ অর্থাৎ ৩৭৷৷০ দিয়ে সে ঋণদান সমিতির পাওনা টাকা আংশিক শোধ করল এবং পকেটে বাকী ৩৭৷৷০ নিয়ে বাড়ী চলে গেল। কিছু দিন বিপণন সমিতি ঐ ১০ মণ ধান গুদামে ধরে রেখে দিল। পরে যখন ধানের দাম বাড়ল এবং ধরা যাক্ যে তা মণ-প্রতি ১৩৲ টাকা হল, তখন সমিতি সব ধান বেচে দিয়ে ১৩০৲ টাকা পেল। এখন সমিতি রামকে বাকী ৫৫৲ টাকা (১৩০—৭৫৲) দিয়ে দিল। অবশ্য গুদাম খরচা বাবদ বিপণন সমিতিকে খুব সামান্য কিছু দিতে হবে। রাম ৫৫৲ টাকা পেয়ে তার বাকী দেনা ১২৷৷০ ও যা সুদ হয়েছিল তা দিয়ে দিল। বিপণন সমিতি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমেও ফসল বিক্রীর টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে। আবার বিপণন সমিতিটি গুদাম রসিদ (Warehouse receipt) দিতে পারে। এই রসিদ ব্যাঙ্কে চেক ভাঙ্গানর মত ভাঙ্গিয়ে টাকা পাওয়া যেতে পারে।

আগে কিন্তু রাম তার উৎপন্ন শস্য ধরে রাখতে পারত না। পারিবারিক খরচা বহন করার জন্য ও মহাজনদের চাহিদা মেটানোর জন্য ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই স্বভাবতঃ কম দরে সবটা বিক্রী করে দেওয়া ছাড়া তার উপায় ছিল না। তা' ছাড়া তার বাড়ীতে শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল না। কিন্তু এই সমন্বিত পরিকল্পনায় সে তার একমাত্র মহাজন, ঋণদান সমিতির ঋণের আংশিক পরিমাণ টাকা দিতে পারে এবং পারিবারিক প্রয়োজনে টাকা দরকার থাকলে তা ঐ আগাম টাকা থেকে সহজেই মেটাতে পারছে; কেননা, বিপণন সমিতি তাকে গুদামজাত শস্যের বাজার দরের শতকরা ৭৫ ভাগ টাকা আগাম দিয়ে দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কতকগুলি ব্যাপার বিবেচনা করা দরকার :—

১। সভ্যদের ঋণের চাহিদা মেটানোর জন্য সমবায় ঋণদান সমিতি (বৃহদাকার ঋণদান সমিতি)-র যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন।

২। প্রতি ৫টি বৃহদাকার ঋণদান সমিতির জন্য একটি বিপণন সমিতি গঠন করা প্রয়োজন।

৩। প্রত্যেক বিপণন সমিতির গুদাম থাকা দরকার।

৪। বিপণন সমিতির গুদামে মজুত শস্যের মূল্যের (বাজার দর) অন্ততঃ শতকরা ৭৫৲ টাকা আগাম দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

উপরি উক্ত প্রয়োজনীয় অর্থ কি ভাবে আসবে, স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠতে পারে। ঋণের চাহিদা মেটানোর জন্য রয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। বৃহদাকার সমিতিগুলিতে সরকার কর্তৃক অংশগত মূলধন কেনারও ব্যবস্থা রয়েছে। সাধারণতঃ চাষীদের তিন রকমের ঋণ দরকার হয়, যথা, স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী। স্বল্প মেযাদী ঋণ সরবরাহ করবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার নিজস্ব তহবিল থেকে। মধ্য-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেযাদী সরবরাহের জন্য "জাতীয় কৃষি ঋণ (দীর্ঘ মেয়াদী) তহবিল" নামে একটা তহবিল সৃষ্টি করা হবে। সমবায় সমিতিতে সরকারী অংশীদারী সার্থক করে তোলার জন্য এই তহবিল থেকে প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে প্রযোজনীয় ঋণ দেওযা হবে। তাছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক "জাতীয় কৃষিঋণ (স্থিতিশীল) তহবিল" নামে আর একটি তহবিল পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। স্বল্প-মেয়াদী ঋণকে মধ্য মেযাদী ঋণে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এই তহবিল থেকে রাজ্য সরকারদের কর্জ হিসাবে দেওয়া হবে। আর অন্যদিকে, বিপণন সমিতি সংগঠনের দাযিত্ব থাকবে ভারত সরকারের ওপর। পণ্য সংরক্ষণাগার বোর্ড-এর মাধ্যমে ভারত সরকার উপরিউক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। "জাতীয় সমবায় উন্নযন তহবিল" নামক তহবিলের মাধ্যমে বোর্ড বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হবেন। ১৯৫৬ সালের "কৃষি উৎপন্ন শস্য (উন্নয়ন ও সংরক্ষণ) কর্পোরেশন আইন" পাশ হওযার পর "জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড" ও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পণ্য সংরক্ষণাগার কর্পোরেশন স্থাপিত হযেছে। কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ইত্যাদি বিভিন্ন পর্য্যায়ে গুদাম বা পণ্য সংরক্ষণাগার তৈরী করার প্রস্তাব রয়েছে। এই সব ব্যাপারে ভারত সরকার তার কর্ত্তব্য "জাতীয় সমবায় ও পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড" এর মাধ্যমে পালন করবেন। প্রয়োজনীয় অর্থ "জাতীয় পণ্য সংরক্ষণোন্নয়ন তহবিল" থেকে পাওয়া যাবে। "নিখিল ভারত পণ্য-সংরক্ষণ কর্পোরেশন"ও উপরি উক্ত কাজে মনোনিবেশ করবে। রাজ্যে রাজ্য সরকার কর্তৃক "প্রাদেশিক পণ্য সংরক্ষণ কর্পোরেশন" স্থাপিত হবে।

বিপণন সমিতির গুদামে মজুত শস্যের জামিনে আগাম টাকা চাষী-সভ্যদের দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করবে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া। তাছাড়া সংরক্ষণ ও গুদাম ঘরের রসিদ যে কোন ব্যাঙ্কে ভাঙ্গিয়ে টাকা পাওয়া যেতে পারবে।

১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে এই সমন্বিত পরিকল্পনা চালু হয়েছে এবং পরিকল্পনা রূপায়ণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে বিভিন্ন সমবায় ঋণদান সমিতির অংশীদারীর জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক "জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘ-মেয়াদী) তহবিল" থেকে ২৬৮ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। উক্ত টাকার মধ্যে বৃহদাকার ঋণদান সমিতি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, শীর্ষ সমবায় ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের জন্য যথাক্রমে ৯২·৮৫ লক্ষ, ১০৬·৩৬ লক্ষ, ৬৬ লক্ষ ও ৩৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। একই বছরে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৩৩·৯৭ কোটি টাকা স্বল্প মেয়াদী ঋণ ও ১·৫৭ কোটি টাকা মধ্য-মেয়াদী ঋণ হিসাবে দিয়েছেন। জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড বিভিন্ন রাজ্যসরকারকে বিপণন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে মোট ১৯৭·২৩ লক্ষ টাকা ঋণ ও দান হিসাবে দিয়েছেন।

চাষীর জীবনে বিভিন্ন অর্থকরী কার্য্যাবলীর মধ্যে সংযোগ সাধনই হচ্ছে সমন্বিত ঋণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। পরিকল্পনা কাজে রূপ দিতে গিয়ে বেশ ভাল ফলই পাওয়া গেছে; যেমন, ১৯৫৬-৫৭ সালে ১,২৪৯টি বৃহদাকার ঋণদান সমিতি, ৩৭৬টি গুদাম ও ৯টি চিনির কারখানা সংগঠন বা তৈরী করা হয়েছে।

নিম্নলিখিত তালিকা হতে সমন্বিত পরিকল্পনার একটা নিখুঁত বিবরণ পাওয়া যাবে।

(ক) পল্লীঋণ সম্প্রসারণ

(১) জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘ মেয়াদী) কার্য্য তহবিল

[রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ৫ কোটি টাকা এককালীন দান ও পরে দ্বিতীয় পরিকল্পনার ৫ বছরের প্রতি বছরে ৫ কোটি টাকা দান করবেন]

সর্ব্ব প্রকার ঋণদান সমিতিতে সরকারী অংশীদারীর জন্য রাজ্য সরকারকে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণদান।	প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ও তার মাধ্যমে অন্যান্য সমবায় ব্যাঙ্ককে ১৫ মাস থেকে ৫ বছরে দেয় মধ্য-মেয়াদী ঋণদান।	সরাসরি জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ককে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণদান বা পরোক্ষভাবে জমি-বন্ধকী-ব্যাঙ্কের "বিশেষ উন্নয়ন ঋণপত্র" ক্রয়।

(২) জাতীয় কৃষি-ঋণ (স্থিতিশীল) তহবিল
[রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতি বছর ১ কোটি টাকা
এই তহবিলে রাখবেন]

দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অজন্মা প্রভৃতির দরুন স্বল্প মেয়াদী ঋণ পরিশোধ না করতে পারায়, উহা মধ্য-মেয়াদী ঋণে পরিণত করার জন্য প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ককে মধ্য-মেয়াদী ঋণদান।

(৩) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিজস্ব তহবিল

প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ও তার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতিকে স্বল্প-মেয়াদী ঋণদান (প্রয়োজন ক্ষেত্রে সরকারী গ্যারান্টিতে দান)।

(খ) কৃষিজাত দ্রব্য বিপণন, সংরক্ষণ ইত্যাদি (ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের পরিচালনাধীনে)

জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড

বোর্ড দু'টো তহবিলের মাধ্যমে কাজ করবে

জাতীয় সমবায় উন্নয়ন তহবিল (বিপণন উদ্দেশ্যে) [ভারত সরকার প্রতি বছর ৫ কোটি টাকা তহবিলে রাখবেন]

বিপণন ও সংশ্লিষ্ট সমিতির শেয়ার কেনার জন্য রাজ্য সরকারকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদান।

রাজ্য সরকারের মাধ্যমে সমিতিগুলিকে এককালীন খরচা বা চলতি খরচা বহন উদ্দেশ্যে অর্থ দান।

জাতীয় পণ্য সংরক্ষণোন্নয়ন তহবিল (শস্য গুদামজাত ও সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে) [ভারত সরকার প্রতি বছর ৩ কোটি টাকা রাখবেন]

নিখিল ভারত পণ্য সংরক্ষণ কর্পোরেশনের অংশ ক্রয় ও উহাকে প্রয়োজনীয় ঋণদান।

প্রাদেশিক পণ্য সংরক্ষণ কর্পোরেশনের অংশ ক্রয় ও উহাদের ধার দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে ঋণদান।

রাজ্য সরকারের মাধ্যমে সমবায় সমিতিকে ঋণদান।

তিন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ও সরকারকে দান-খয়রাৎ।

(গ) নিখিল ভারত ও প্রাদেশিক পণ্য সংরক্ষণ কর্পোরেশন ও সমবায় সমিতির মাধ্যমে শস্য সংরক্ষণের উন্নয়ন।

১। নিখিল ভারত পণ্য সংরক্ষণ কর্পোরেশন (আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন ১০ কোটি টাকা)
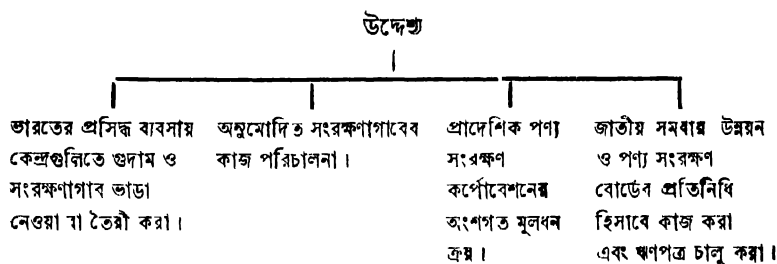
২। প্রাদেশিক পণ্য সংরক্ষণ কর্পোরেশন (রাজ্য আইনে গঠিত)
[৫০ লক্ষ টাকা আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন]
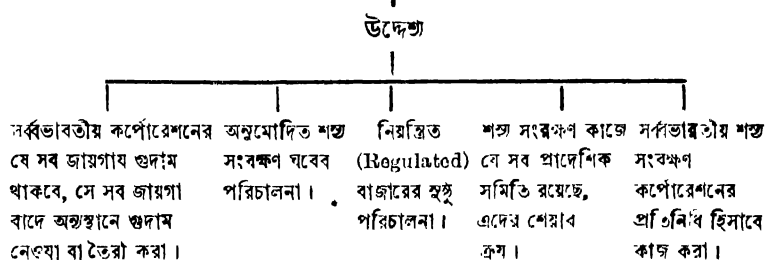
৩। সমবায় সমিতি (প্রাদেশিক পণ্য সংরক্ষণ কর্পোরেশন শতকরা ৫০ ভাগ অংশ কিনে নেবেন)
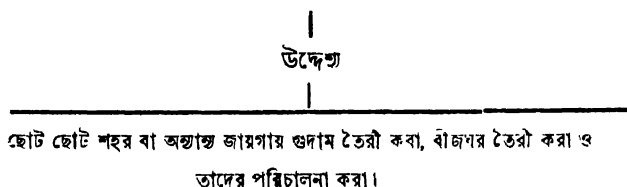
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভারতে সমবায় সমিতির শ্রেণী বিভাগ

সমবায় সমিতিগুলিকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—(১) ঋণদান সমিতি ও অ-ঋণদান সমিতি (মাদ্রাজে ও পশ্চিম বাংলায় এই ভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়); (২) উৎপাদক, ক্রেতা এবং সম্পদ সরবরাহ সমিতি (বোম্বাই-এ এই শ্রেণীবিভাগ বর্ত্তমান)। প্রত্যেক শ্রেণীর সমিতি আবার বিভিন্ন স্তরে আরও কতকগুলি শ্রেণীর সৃষ্টি করে, যেমন—প্রথমে প্রাথমিক সমিতি, তারপর তাদের ওপরে মধ্যস্থানীয় কেন্দ্রীয় সমিতি, আবার কেন্দ্রীয় সমিতির উপর স্তরে শীর্ষ সমিতি। প্রতিটি উচ্চ স্থানীয় সমিতি অধস্তন সমিতিকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে; আবার অধস্তন বা সংশ্লিষ্ট সমিতি তাদের উচ্চস্থানীয় সমিতির কর্মনীতি পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। কাজেই—

শীর্ষ সমিতি (সবার উপরে)
|
কেন্দ্রীয় সমিতি (মধ্যম পর্য্যায়ে এবং সাধারণতঃ জেলার ভিত্তিতে)
|
প্রাথমিক সমিতি (নিম্নতম স্তরে যা প্রধানতঃ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়)

ঋণদান ক্ষেত্রে সমিতিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগে ভাগ করা যেতে পারে:—
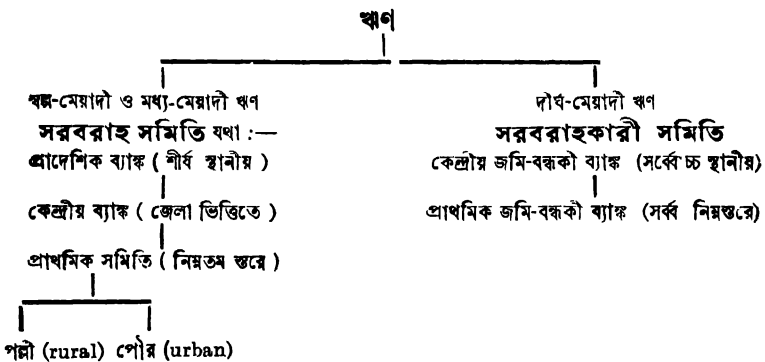
(ক) ঋণদান সমিতির রকম ভেদ:—

(১) পল্লী-ঋণদান সমিতির নিম্নলিখিত রকমভেদ আছে:—পুরানো অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট ঋণদান সমিতি, ধর্মগোলা, কৃষি-ব্যাঙ্কিং বৃহদাকার ঋণদান

সমিতি, সেবা সমিতি ইত্যাদি। স্বল্প-মেয়াদী ঋণ সাধারণতঃ উপরি উক্ত সমিতিগুলো সরবরাহ করে থাকে। আর দীর্ঘ-মেয়াদী-ঋণ সরবরাহ করে জমি-বন্ধকী-ব্যাঙ্ক।

(২) পৌর-ঋণদান সমিতি—শহরের সমবায় ঋণদান সমিতি; যেমন, পৌর ঋণদান ব্যাঙ্ক, অফিসের কর্মচারীদের ঋণদান সমিতি, শ্রমিকদের ঋণদান সমিতি (সাধারণতঃ বোম্বাই-এ এ ধরনের সমিতি রয়েছে), শিল্প সমবায় ব্যাঙ্ক ইত্যাদি।

(৩) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক।

(৪) প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক।

(খ) উৎপাদক সমবায় সমিতি—

(১) কৃষি উৎপাদক সমিতি, যেমন, সমবায় চাষ সমিতি, সমবায় কৃষি বিপণন ইত্যাদি।

(২) শিল্পোৎপাদক সমিতি; যেমন, তন্তুবায় সমিতি, মৎস্যজীবী সমিতি, শিল্পজাত দ্রব্য বিপণন সমিতি ইত্যাদি।

(গ) ক্রেতা সমবায় সমিতি—

ক্রেতা সমিতির মধ্যে প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সমবায় ভাণ্ডারের নাম করা যেতে পারে।

(ঘ) অন্যান্য সমিতি—

(১) গৃহ সংস্থান বা উপনিবেশ সমিতি।

(২) দুগ্ধ সরবরাহ সমিতি।

(৩) যানবাহন বা পরিবহণ সমিতি।

(৪) শ্রম সমিতি—যেমন, শ্রমিক ঋণদান সমিতি, শ্রমচুক্তি সমিতি, বনশ্রমিক সমিতি ইত্যাদি।

(৫) মহিলা সমিতি (সাধারণতঃ শিল্প সমিতি)

(৬) উদ্বাস্তু সমিতি।

(৭) উন্নততর জীবনধারণ সমিতি, স্বাস্থ্য সমিতি, শিক্ষা-সমিতি ইত্যাদি।

(৮) সমবায় বীমা সমিতি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গ্রাম্য ঋণদান সমবায় সমিতি

প্রয়োজনীয়তা—যে কোন শিল্প চালাতে গেলে কোন-না-কোন ঋণের প্রয়োজন হয়। কৃষি ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শিল্পের সামিল। কৃষিরও ঋণ প্রয়োজন হয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে কৃষককে ঋণ সরবরাহ্ করার জন্য কোন ব্যাঙ্ক আছে কি? সাধারণ ভাবে নেই। ঋণদানের ব্যাপারে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান-গুলির নাম উল্লেখযোগ্য।

(১) স্টেট্ ব্যাঙ্ক—গ্রামাঞ্চলে এদের কোন শাখা-অফিস নেই।

(২) ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক—এদের ব্যবসায়-কেন্দ্র সাধারণতঃ মহকুমা শহর বা বিখ্যাত কোন বাণিজ্যিক-কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ থাকে। পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটির মতে, এই ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলো কৃষি-উৎপাদনে তাদের মোট কর্জ্জ দাদনের মাত্র শতকরা ০'৯ ভাগ ও কৃষিজাত দ্রব্যের পাইকারী ব্যবসায়ীদের মোট ঋণের মাত্র শতকরা ১৭ ভাগ দিতে পেরেছে।

(৩) দেশীয় ব্যাঙ্ক; যথা, মহাজন ইত্যাদি—এরা মোট কৃষি-ঋণের শতকরা ৮৯ ভাগ সরবরাহ্ করে থাকে।

(৪) পোস্ট অফিস সেভিংস্ (আমানত) ব্যাঙ্ক—১৯৫১ সালে পোস্ট অফিসের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০,০০০ হাজার এবং ভারতের গ্রাম সমূহের মাত্র শতকরা ৪০টি গ্রামে পোস্ট-অফিস বা ডাকঘর ছিল।

(৫) সমবায় সমিতি ও ব্যাঙ্ক—১৯৫১-৫২ সালে কৃষি-ঋণের চাহিদার মাত্র শতকরা ৩'১ ভাগ দিতে পেরেছে।

(৬) সরকারী-বিভাগ—সরকার-প্রদত্ত 'টাকাভি ঋণ'-এর পরিমাণ হচ্ছে মাথাপিছু গড়ে ১৫৲ হ'তে ২৫৲ টাকার ভেতর। সমীক্ষা কমিটির মতে, এ ধরনের ঋণ পেতে প্রায় ৬ মাস সময় লেগে যায়। তা' ছাড়া এ ধরনের ঋণ ও সমবায় ঋণের মধ্যে কোন যোগাযোগও নেই। আর 'টাকাভি ঋণ' সাধারণতঃ বড় বা মাঝারি কৃষকদের দেওয়া হ'য়ে থাকে।

উপরিউক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, পল্লী-ঋণ সরবরাহ সমস্যার সমাধানকল্পে ১৯৫০ সালে পল্লী ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন:—

(১) তালুক ও মহকুমা শহরে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যবসায়ী-ব্যাঙ্কের শাখা খোলার ব্যবস্থা করা।

(২) গ্রামাঞ্চলে অধিকতর সমবায় ব্যাঙ্ক ও পোস্ট-অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্ক স্থাপনের ব্যবস্থা।

(৩) টাকা প্রেরণ-বিষয়ক সুযোগ-সুবিধায় পরোক্ষ সরকারী সাহায্য। 'শ্রফ্ কমিটি (১৩৫৩)' গ্রামাঞ্চলে লাইসেন্স প্রাপ্ত তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃক শাখা-অফিস স্থাপনের জন্য সরকারী অর্থ সাহায্যের জন্যও সুপারিশ করেন।

আবার পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করেন যে, পোস্ট-অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কে চেক্ প্রথা চালু করুক ও ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের ন্যায় কাজ করুক্। পরিশেষে নিখিল ভারত পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটি পল্লী-ঋণ সরবরাহের সমস্যা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করে নিম্নলিখিত সংখ্যাতত্ত্ব পরিবেশন করেন :—

বিভিন্ন ঋণ-সরবরাহকারী সংস্থা			মোট কৃষি ঋণের শতকরা কত ভাগ ঋণ সরবরাহকারী সংস্থা দিচ্ছেন
১। সরকার	...	...	৩·৩%
২। সমবায় সমিতি	...	...	৩·১%
৩। আত্মীয়-স্বজন	...	...	১৪·২%
৪। জমিদার	...	...	১·৫%
৫। কৃষি মহাজন	...	...	২৪·৯%
৬। পেশাদার মহাজন	...	...	৪৪·৮%
৭। ব্যবসায়ী ও দালাল	...	...	৫·৫%
৮। ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক	...	...	০·৯%
৯। অন্যান্য	...	...	১·৮%

সমীক্ষা কমিটি নিরূপণ করেন যে ভারতে মোট কৃষি-ঋণের চাহিদা পরিমাণ ৭৫০ কোটি টাকার মত।

গ্রাম্য সমবায় সমিতির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস

১৯০৪ সালের আইনে ঋণদান সমিতির ওপর বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল। কারণ ভাবা হয়েছিল যে গ্রাম্য কৃষি-ঋণদান সমিতি সভ্যদের সমবায় নীতি উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা দিতে পারবে। যখন এ ধরনের সমিতির অর্থ সম্পদ বাড়বে ও তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে, তখন অবশ্য অন্যান্য জটিল বহুমুখী ব্যবসায় করা সম্ভব হবে। স্যার ফ্রেডারিক নিকল্‌সন্ তাঁর রিপোর্টে গ্রামাঞ্চলে

বহুমুখী গ্রাম্য সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনের স্বপক্ষে অনেক আগেই সুপারিশ করেছিলেন। ভারতীয় আইন সভায় সমবায় বিল উপস্থাপনকালে আইন সচিব স্যার এডওয়ার্ড, মিঃ নিকল্‌সনের সুপারিশ মেনে নেন নি। কাজেই প্রকৃত পক্ষে গ্রাম্য ঋণদান সমবায় সমিতির কৃষি-ঋণ দাদন করা ছাড়া অন্য কোন ব্যবসায় ছিল না। কিন্তু গত ২৫ বছরে এই ঋণদান সমিতিগুলোর উদ্দেশ্য সমূহ পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এখন এক বিরাট পরিবর্ত্তন এসে গেছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে, গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণে, বর্ত্তমানে এই ঋণদান সমিতি এক অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে কাজ করছে। ১৯০৪ সালের আইন পাশ হওয়ার আগে মধ্য প্রদেশে মোট ১৫৮টি সমবায় ঋণদান সমিতি ছিল। এই সমিতি-গুলো সাধারণতঃ জাতি বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে ও নির্দ্দিষ্ট গ্রাম-এলাকার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

সমবায় ঋণদান সমিতির ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাসকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়:—

(১) **প্রথম অবস্থা** (১৯০৪—১৯১৫)

বৈশিষ্ট্য

(ক) সীমাবদ্ধ এলাকা (যা'তে পারস্পরিক জানা-শোনা ও তদারক সম্ভব হয়)।

(খ) অসীম দায়িত্ব।

(গ) সভ্যগণের সমান অধিকার ও গণতান্ত্রিক পরিচালনা।

(ঘ) সমিতিকে স্বাবলম্বী ও পরিচালনার ব্যাপারে খরচ-খরচা যাতে কম হয় তার জন্য বেতন না নিয়ে কার্য্য পরিচালনার পদ্ধতি।

(ঙ) আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার জন্য লাভ থেকে সংরক্ষিত তহবিলের সৃষ্টি করা।

(চ) সভ্য নির্ব্বাচনে সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন এবং সভ্য ছাড়া অন্য কাউকে ঋণ না দেওয়া।

(ছ) ব্যক্তিগত জামিনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ।

(জ) অধিকাংশ সভ্য যাতে কৃষিজীবী হয় সেরূপ ব্যবস্থা।

(ঝ) লভ্যাংশ দানে বাধা-নিষেধ।

সংরক্ষিত তহবিল কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে না আসা অবধি সমস্ত লাভের অঙ্ক সংরক্ষিত তহবিল বৃদ্ধির জন্য ঐ তহবিলে যোগ করা।

(ঞ) সমবায় দপ্তর স্থাপন করা ; সমবায় সমিতি বিষয়ক বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য নিয়ামক, পরিদর্শক ও নিরীক্ষক প্রভৃতি কর্মচারীর নিয়োগ।

(ট) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কোন সমবায় সমিতিকে তার আমানতের সম পরিমাণ কর্জ্জ দাদন (এর পরিমাণ অনধিক ২০০০৲ টাকা ছিল)।

(ঠ) সমবায় আন্দোলন সম্প্রসারণের জন্য নিয়ামককে আন্দোলনের বন্ধু ও পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করার ব্যবস্থা। ম্যাক্‌ল্যাগান কমিটি (১৯১৫) এই সব সমিতির দ্রুত সংগঠনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন।

(২) **দ্বিতীয় অবস্থা**—সম্প্রসারণকাল (১৯১৫-৩০)

এই সময়ে গ্রাম্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলোর অবস্থা নিম্নলিখিত তালিকা হ'তে প্রতীয়মান হ'বে :—

	১৯১৫-১৬	১৯২৯-৩০
গ্রাম্য সমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা···	১৭,৭০০	৯১,৮০০
সভ্য সংখ্যা···	৭১,৭০০	৩১,১৮,০০০
আমানতের পরিমাণ···	৩৪,০০০ টাকা.	৩৪,৯৩,০০০ টা.
কর্জ্জদাদন ··	২,২৮০০০ টাকা.	১২,০৫,০০০ টা.
লাভ···	২০,০০০ টাকা.	১,২৬,০০০ টা.

বৈশিষ্ট্য

(ক) সমিতির সংখ্যা বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন হারে বাড়তে থাকে।

(খ) কৃষকগণ সমবায় সমিতি সম্বন্ধে তেমন সচেতন ছিল না। তারা এই সমস্ত সমবায় প্রতিষ্ঠানকে সাধারণতঃ অল্পসুদে ঋণদাদনকারী সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে মনে করত।

(গ) সমবায় সমিতিগুলি কৃষকদের ব্যবসা-বুদ্ধি শেখাবার উৎসস্থল হয়ে দাঁড়ায় ;

(ঘ) এই সমবায় সমিতিগুলি অল্পসুদে ঋণ-দাদন করার ফলে গ্রাম্য মহাজনদেরও সুদের হার অনেক কমাতে হয়।

(ঙ) তদারকের কাজ মোটেই সন্তোষজনক ছিল না।

(চ) অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে সমিতির খেলাপী কর্জ্জের পরিমাণ অসম্ভব বেড়ে যায়।

(৩) **তৃতীয় অবস্থা**—অবনতিকাল (১৯৩০-৩৯)

বৈশিষ্ট্য

(ক) পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার (World-wide Depression) হাত থেকে সমবায় সমিতিগুলিও রেহাই পায় নি।

(খ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে সভ্যগণ সমিতির পাওনা মেটাতে পারে নি।

(গ) সমিতিগুলির অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে।

(ঘ) বিভিন্ন কমিটি, যথা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি (১৯৩১), বোম্বাই প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি (১৯৩১) ও মাদ্রাজ ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি (১৯৩১) প্রভৃতি বাজে সমিতিগুলি তুলে দেবার স্বপক্ষে সুপারিশ করেন।

১৯৩৪-৩৫ সালে অর্থনৈতিক মন্দা তীব্র আকার ধারণ করে। গ্রাম্য সমিতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ 'ঘ' বা 'ঙ' শ্রেণীতে (D and E class) পরিণত হয়। বাংলাদেশের শতকরা ৯টি ও মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের শতকরা ৪৭টি সমিতিকে লিকুইডেশনে দেওয়া হয়।

অবনতির কারণ

(ক) অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা।

(খ) পরিশোধ ক্ষমতার অতিরিক্ত কর্জ্জ গ্রহণ।

(গ) ভারতের কৃষিকার্য্য যে প্রতি বৎসর কৃতকার্য্য হবেই সে নিশ্চয়তার অভাব।

(ঘ) সভ্যদের কর্জ্জ যে পুরোপুরি অন্যের আমানত হতে দাদন করা হচ্ছে, এ কথা প্রায় সমিতিগুলি ভুলতে বসেছিল।

(ঙ) যাদের জন্যে ব্যাঙ্ক গড়া, তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতার নিতান্ত অভাব।

(চ) কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির সভ্যদের মধ্যে সততার অভাব।

(ছ) উৎপাদন উদ্দেশ্যেই শুধু ঋণ দেওয়ার বাধ্য-বাধকতা ছিল না।

(জ) সরকার কর্ত্তৃক সাহায্য বা তদারকী ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় মাত্রায় না হওয়া।

অবস্থা উন্নয়নের ব্যবস্থাবলম্বন

১৯৩৭ সালে এই ভাবে অধিকতর সমিতি তুলে দেবার বিপক্ষে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মত প্রকাশ করেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেন যে, এইভাবে সমিতি তুলে দিলে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি প্রভূত পরিমাণে ব্যাহত হ'বে।

কাজেই প্রাথমিক সমিতিগুলির পুনর্গঠনই হ'বে সুবিবেচনার কাজ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ২ নং বুলেটিন-এ সুপারিশ করা হয় যে, শুধু চাষীদের ঋণদানই প্রাথমিক সমিতিগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হ'বে না ; গ্রামীণ সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিই হ'বে প্রকৃত উদ্দেশ্য। নতুন সমিতি রেজেস্ট্রীকরণে বাধা-নিষেধ, অনুকূল অবস্থানুসারে প্রয়োজন মত বহুমুখী গ্রাম্য সমিতি গঠন, কর্জ্জ আদায়কল্পে জেলা শাসক ও নিয়ামকদের দায়িত্ব গ্রহণ ইত্যাদি অন্যান্য ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হয়।

চতুর্থ অবস্থা—পুনর্গঠনকাল (১৯৩৯-৪৬)

উপরিউক্ত বিভিন্ন সুব্যবস্থা অবলম্বন করাতে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ও চাষের জমির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়াতে চাষীদের ঋণ-পরিশোধের ক্ষমতা বেড়ে যায় ও সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য সমিতির কার্য্যোন্নতি ও কর্ম্ম-ক্ষমতা বাড়ে। এই সময়কার (১৯৩৯-৪৬) বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ—

(ক) সমবায় সমিতি সমূহের আর্থিক উন্নতি।

(খ) কর্জ্জদাদন অসম্ভব বেড়ে যায় ; যেমন, ১৯৪৫-৪৬ সালে কর্জ্জদাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ কোটি টাকা।

(গ) কর্জ্জ আদায় ব্যাপারেও সম্যক উন্নতি ঘটে। বকেয়া কর্জ্জের পরিমাণ ২৪ কোটি টাকা থেকে ১৯ কোটিতে নেমে যায়।

(ঘ) অনাদায় যোগ্য অনেক ঋণের আদায় এই সময় সম্ভবপর হয়।

(ঙ) চাষী সভ্যদেরও ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং পূর্ব ঋণ পরিশোধ করে নতুন করে ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন করে।

(চ) এই অনুকূল অবস্থার সুযোগ নিয়ে মাদ্রাজ প্রদেশ বিপণনের সঙ্গে ঋণের যোগাযোগ সাধন করে নিয়ন্ত্রিত ঋণদান (Controlled Credit) ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করে।

(ছ) কৃষি সমিতির সংখ্যা শতকরা ৩৩ ভাগ বেড়ে যায়।

(জ) বাংলাদেশ এক নতুন ধরনের গ্রাম্য ব্যাঙ্ক স্থাপন করে। এই ব্যাঙ্কগুলির নাম কৃষি-ঋণদান বা শস্য ঋণ সমিতি (Crop Loan Societies)। বাংলাদেশে গ্রাম্য ব্যাঙ্কের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শতকরা ৮০ ভাগ কর্জ্জই খেলাপী হয়। বহু সংখ্যক ব্যাঙ্ক তুলে দেওয়া হয়। এই সময় সমবায় পরিকল্পনা কমিটি (Co-operative Planning Committee) ভারতের গ্রাম সমূহের অন্ততঃ শতকরা ৫০ ভাগ গ্রামে সমবায় ঋণদান সমিতি গঠিত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন।

পঞ্চম অবস্থা—স্বাধীনতা পরবর্ত্তীকাল (১৯৪৬ হ'তে আজ-অবধি)

ভারত বিভাগের ফলে পঞ্জাব, বাংলাদেশ ও আসাম বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পঞ্জাবে সমবায় আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল লাহোরে। বাংলা প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের অধিকাংশ কর্জ্জই পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন পল্লী ঋণদান সমিতিতে পড়ে ছিল। পঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই অবস্থার উন্নতিকল্পে এগিয়ে আসতে হয় এবং পাকিস্তানে আবদ্ধ টাকার জন্য সরকারী আশ্বাস বা গ্যারান্টি দিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে এরূপভাবে আবদ্ধ টাকার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় ১,২৫,০০,০০০ টাকার মত এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার জন্য সরকারী আশ্বাস দেন।

বৈশিষ্ট্য

(ক) ঋণদান সমিতির পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ চল্‌তে থাকে।

(খ) অধিকাংশ গ্রাম্য ঋণদান সমিতিকে সর্ব্বার্থসাধক সমবায় সমিতিতে পরিণত করা হয় ও দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগার মত দ্রব্যাদি সরবরাহ, বীজ সরবরাহ, বিপণন ইত্যাদি কাজও এদের ওপর দেওয়া হয়।

(গ) অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট সমিতিগুলিকে সসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট সমিতিতে পরিণত করার ব্যাপারে একটা সুনির্দ্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা হয়।

১৯৪৬-৪৭ সালে, মোট গ্রাম্য সমিতির মধ্যে ২৩,০০০ সসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট সমিতি ছিল। ১৯৫২-৫৩ সালে, মোট ১,১২,০০০ কৃষি ঋণদান সমিতির মধ্যে ৩২ হাজারটি ছিল সসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট। আর একই সময়ে সসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট সমিতির সংখ্যা বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে যথাক্রমে ২,২০০, ২৫,০০০ ও ২,২০০তে দাঁড়ায়। আসাম, উড়িষ্যা, পঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, ভূপাল, দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশে সাধারণতঃ গ্রাম্য সমিতিগুলি ছিল অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট।

গ্রাম্য ঋণদান সমিতির শ্রেণী বিভাগ

সাধারণতঃ গ্রাম্য ঋণদান সমিতিগুলিকে ছয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা :—

১। এক উদ্দেশ্য বিশিষ্ট কৃষি-ঋণদান সমিতি।

২। সর্ব্বার্থসাধক সমবায় সমিতি।

৩। কৃষি ব্যাঙ্ক।

৪। শস্য ব্যাঙ্ক বা ধর্ম্মগোলা।

৫। বৃহদাকার ঋণদান সমিতি।

৬। সেবা সমিতি।

১। **এক উদ্দেশ্য বিশিষ্ট কৃষি-ঋণদান সমিতির বৈশিষ্ট্য—**

(ক) তহবিল সংগ্রহ করা ও সভ্যদের মধ্যে এই তহবিল স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী ঋণ হিসাবে অল্প সুদে দাদন করা।

(খ) সভ্যদের সঞ্চয়ের অভ্যাস করানো।

(গ) সভ্যদের উৎপন্ন দ্রব্য বিপণনের ব্যবস্থা করা।

(ঘ) সভ্যদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তাদের স্বাবলম্বী ও মিতব্যয়ী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা।

২। **সর্ব্বার্থসাধক সমবায় সমিতি—**

বৈশিষ্ট্য :—শস্য উৎপাদন ও তার বিপণনের জন্য সভ্যদের ঋণ সরবরাহ করা এই সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য। স্যার হোরেস্ প্লাঙ্কেট এই সর্ব্বার্থসাধক সমিতির আদর্শকে উন্নততর কৃষিকার্য্য, উন্নততর জীবনযাত্রা (better farming, better business and better living) বলে বর্ণনা করেন। কাজেই এই আদর্শ অনুসারে ঋণ বা বিপণন ছাড়া এইরূপ সমিতির আরও বিভিন্ন কার্য্যসূচী রয়েছে। তা' ছাড়া সাধারণ কৃষি-ঋণদান সমিতি ও এইরূপ সর্ব্বার্থসাধক সমবায় সমিতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন—প্রথমোক্ত সমিতি সাধারণতঃ নগদ টাকায় কর্জ্জদাদন করে, কিন্তু শেষোক্ত সমিতি নগদ টাকা ব্যতিরেকে অন্যান্য উপায়ে ঋণদাদনের ব্যবস্থা করে। ঋণদাদন ও সভ্যদের উৎপন্ন দ্রব্য বিপণনের ব্যবস্থা ছাড়াও সর্ব্বার্থসাধক সমিতি আরও অনেক কাজ করে। যেমন, খাদ্যদ্রব্য, দুধ, কাপড় ইত্যাদি বিক্রি করে, দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগার মত দ্রব্যাদি বিক্রি করে, সার, বীজ ইত্যাদি সরবরাহ করে ও বিভিন্ন পল্লী সংস্কারের কাজ করে।

৩। **কৃষি ব্যাঙ্ক—**

১৯৪১ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রস্তাব করেন যে, গ্রামাঞ্চলে দুই শ্রেণীর সমিতি থাকা উচিত ; যথা—কৃষি ব্যাঙ্ক ও অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট কৃষি ঋণদান সমিতি। কৃষি-ব্যাঙ্কগুলি সসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট ও অধিকতর বৃহৎ এলাকায় একটা ইউনিয়ন নিয়ে কাজ করবে ও সাধারণতঃ সম্পত্তি ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট জামিনে অবস্থাপন্ন চাষীদের কর্জ্জদাদনের ব্যবস্থা করবে।

সাধারণ ব্যাঙ্কের ন্যায় এরাও আমানত গ্রহণ করবে, কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায় উদ্দেশ্যে সভ্যদের ঋণ সরবরাহ করবে, অলঙ্কার প্রভৃতি জামিন রেখে দাদন করার

ব্যবস্থা করবে, চেক্, বিল ইত্যাদি ভাঙ্গাবার ব্যবস্থা করবে ও মূল্যবান দ্রব্যাদি নিরাপদে গচ্ছিত রাখার ব্যবস্থা করবে। পল্লী ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি (Rural Banking Enquiry Committee) এই ধরনের কাজ-কারবারের স্বপক্ষে মন্তব্য করেন।

বাজার কিংবা কোন জনাকীর্ণ কেন্দ্রে সাধারণতঃ এই সব ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য্যালয় থাকবে। শহরে অবস্থিত ব্যাঙ্কের যে সব করণীয় কাজ থাকে তার প্রায় সবই এই ব্যাঙ্ক করতে পারবে। অন্ধ্রপ্রদেশে এ ধরনের কতগুলো ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে। ওখানে সব চাইতে নাম করা ব্যাঙ্ক হচ্ছে 'আলামুরা সমবায় পল্লী-ব্যাঙ্ক'। কাজেই এ ধরনের ব্যাঙ্ক সংগঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের ন্যায়। এই ব্যাঙ্কগুলি গ্রামাঞ্চলে যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কাজ করতে পারবে; পল্লী অঞ্চলের কোন অংশের উদ্বৃত্ত তহবিল সংগ্রহ করে তা অন্য কোন ঘাটতি অঞ্চলের চাহিদা মেটাবে।

৪। শস্য ব্যাঙ্ক বা ধর্ম্মগোলা—

শস্য ব্যাঙ্ক বা ধর্ম্মগোলা ভারতে একটা নতুন কিছু নয়। ভারতের গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের ধর্ম্মগোলা বা শস্যগোলা ভারতের সমবায় আন্দোলনের অনেক আগেই ছিল। এই ধরনের সমিতির কাজ হচ্ছে, সভ্যগণ সমিতিকে কিছু ধান (ধরা যাক ১০ সের) চাঁদা হিসাবে দেবে। এইভাবে সংগৃহীত ধানের পরিমাণ যথেষ্ট হবে। তারপর সমিতি এই সংগৃহীত ধান শস্য ব্যাঙ্ক বা ধর্ম্মগোলায় রাখবে এবং নিতান্ত জরুরী অবস্থায়, যেমন, দুর্ভিক্ষ চলছে এমন সময় বা ঐ রকম কোন সময়ে ধর্ম্মগোলা তার সভ্যদের ঋণ হিসাবে ঐ ধান ধার দেবে। এই ধরনের শস্য গোলা সমিতি সব চাইতে বেশী গড়ে ওঠে হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই, বিহার ও উড়িষ্যায়। হায়দ্রাবাদে ১৯৫২—৫৩ সালে সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৭,০০০, সভ্যসংখ্যা ৫ লক্ষ ও ধান্য কর্জ্জের পরিমাণ ৬৬ লক্ষ টাকা। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার তপশীলভুক্ত জাতি ও অনুন্নত সম্প্রদায়দের ভেতর এই ধরনের ধর্ম্মগোলা সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেন। ধান কেনা, গুদাম নির্ম্মাণ ও কিছু আসবাবপত্র কেনা বাবদ মোট ১০ হাজার টাকা ও বাৎসরিক পরিচালন-খাতে ব্যয় বাবদ ১ হাজার টাকা প্রত্যেক পরিকল্পনাভুক্ত সমিতিকে দেওয়া হয়।

৫। বৃহদাকার সমবায় ঋণদান সমিতি—

নিখিল ভারত পল্লী ঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশক্রমে এই ধরনের সমিতি

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠে। পরে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হচ্ছে।

৬। **সেবা সমিতি—**

জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিল কতকগুলো কারণে ভবিষ্যতে বৃহদাকার সমিতি গঠন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তার জায়গায় কোন নির্দ্দিষ্ট একটি গ্রামের এলাকার ভিত্তিতে সেবা সমিতি গড়ে তোলার সুপারিশ করেন। যেহেতো কমিটির (১৯৬০) সুপারিশ অনুযায়ী সেবা সমিতির সংগঠন ও কার্য্যধারায় কিছু রদ-বদল করে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রূপ দেওয়া হয়েছে। পরে এ বিষয়েও আলোচনা করা হচ্ছে।

পল্লী ঋণদান সমিতির কার্য্যধারা

গ্রামের ঋণদান সমবায় সমিতিগুলিকে পল্লী ব্যাঙ্কও বলা হয়। ১৯৫৪ সালের ৩০শে জুন ভারতের মোট সমিতি সংখ্যার শতকরা ৬৯টি ছিল এই ধরনের পল্লী ব্যাঙ্ক বা গ্রাম্য ঋণদান সমিতি।

(ক) **সাধারণ সভা :—**প্রত্যেক সমবায় সমিতির ন্যায় এই ধরনের ঋণদান সমিতির সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা সাধারণ সভ্যদের ওপর দেওয়া থাকে। সকল সভ্য প্রত্যেক সমবায় বৎসরে অন্ততঃ একবার কোন সভায় মিলিত হয় এবং সমিতির কার্য্যাবলী আলোচনা করে। এই বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি তার বিবরণী পেশ করে, সাধারণ সভ্যগণ সমিতির বিভিন্ন কাজ, বিশেষ করে খেলাপী ঋণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে। এই সভায় প্রত্যেক সভ্যের ঋণের স্বাভাবিক বা ঊর্দ্ধতম সীমা নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। এই ধরনের সভা সভ্যদের পারস্পরিক সমবায় মনোভাব জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য খরচ খরচা যতটা সম্ভব কম করা উচিত। সমিতির বিভিন্ন খরচ খরচা—বিশেষ করে বাজে খরচ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই সভায় পরীক্ষা করা উচিত।

(খ) **দায়িত্ব :—**১৯৩৪ সাল অবধি, অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট সমিতিই গড়ে ওঠে। কিন্তু দেখা গেছে, সমিতি লিকুইডেশনে গেলে এই অসীম দায়িত্ব নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে গ্রামাঞ্চলে সমবায় আন্দোলনের প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব গ্রামবাসীদের মনে জেগে উঠেছে। তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 'ঘ' ও 'ঙ' শ্রেণীর সমবায় সমিতিগুলিকে তুলে না দিয়ে তাদের পুনর্গঠনের সুপারিশ করেন।

অসীম দায়িত্বের পেছনে রয়েছে সভ্যদের পারস্পরিক দায়গ্রহণের আদর্শ। কিন্তু নিরক্ষর সভ্যগণ এই অসীম দায়িত্বের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝতে পারে না, যার ফলে সচ্ছল সভ্যদের ঘাড়ে ভীষণ চাপ পড়ে, তাই যতটা সম্ভব এরা এই ধরনের সমিতির কাছ থেকে দূরে থাকতে চায়। সভ্যপদে ভর্ত্তি হওয়ার ব্যাপারেও বিভিন্ন বাধা-নিষেধ থাকে ও তা অনুমোদন সাপেক্ষ। বোম্বাইএর অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট সমিতিতে ৫০ জন ও বাংলাদেশের আইনে ৫০০ জন সভ্য থাকতে পারে। ১৯৪৬ সালের সমবায় পরিকল্পনা কমিটি মন্তব্য করেন যে পল্লী-ঋণদান সমিতি সসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট করা হোক। নিখিল ভারত পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটিও সসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট বৃহদাকার ঋণদান সমিতি গঠনের সুপারিশ করেন। আবার সেবা সমিতিগুলি অসীম বা সসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট দুইই হতে পারে।

(গ) **আয়তন** :—পল্লী ঋণদান সমিতির আয়তন কতটা হবে এ সম্পর্কে বেশ মতভেদ আছে। ম্যাক্ল্যাগান কমিটির মতে, এ ধরনের সমিতি প্রথমে ছোট সমিতি হিসাবে কাজ আরম্ভ করবে। যদি অবস্থার উন্নতি হয় এবং কার্য্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, তবে সমিতির আয়তন ক্রমশঃ বাড়ানো যেতে পারে। কমিটি আরও বলেন, এই সমিতির সভ্যসংখ্যা থাকবে ৫০ থেকে ১০০র মধ্যে। ১৯৩০ সাল অবধি গ্রামপিছু একটা করে এই রকম সমিতি ছিল। কিন্তু তারপর আয়তনের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে। ১৯১২-১৩ সালে, ১৯২৯ সালে, ১৯৫২-৫৩ সালে ও ১৯৫৭-৫৮ সালে প্রত্যেক সমিতির সভ্য-সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪১, ৩৪, ৪৬ ও ৬১।

সমীক্ষা কমিটি গ্রাম পিছু একটা করে সমিতি গঠনের বিপক্ষে মন্তব্য করেন। কমিটি বলেন, অধিকতর ব্যবসায় তথা বলিষ্ঠ সমিতির জন্যে বৃহৎ এলাকা থাকা দরকার। সমীক্ষা কমিটির সুপারিশ সরকার পুরোপুরি গ্রহণ করেন ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তার রূপ দেন। কিন্তু ১৯৫৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে বৃহদাকার সমিতি আর গঠন না করার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেন। তারপর যেহেতো কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে সমবায়ের নীতি ও প্রকৃতি বজায় থাকবে এবং সমিতির আর্থিক স্বাচ্ছল্যের ধারা অব্যাহত থাকবে—এই দুটো জিনিস প্রধানতঃ দেখেই সেবা সমিতি গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কাজেই সেবা সমিতির আয়তন সাধারণতঃ গ্রাম ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ থাকবে; কিন্তু প্রয়োজন হ'লে একাধিক গ্রাম নিয়েও

সেবা সমিতি গঠন করা চল্‌বে। তবে দেখতে হ'বে, সমিতির এলাকায় লোকসংখ্যা ৩০০০-এর বেশী না হয়, আর এলাকাভুক্ত গ্রাম সমূহের দূরত্ব সমিতির প্রধান কার্য্যালয় হ'তে ৩।৪ মাইলের বেশী না হয়।

(ঘ) **সভ্যপদ :**—সভ্যপদের গুণাবলী সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি গ্রাম্য ঋণদান সমিতির সভ্য হ'তে পারে। তবে, সভ্যপদে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা তা হ'তে বঞ্চিত করণের ক্ষমতা থাকে সাধারণ সভার ওপর। সমীক্ষা কমিটির মতে কাউকে সভ্যপদ থেকে বঞ্চিত করলে, তার বিরুদ্ধে নিয়ামকের কাছে আপীল করার প্রয়োজনীয় বিধি সমবায় আইনে থাকা উচিত। কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক রচিত খসড়া সমবায় আইনেও অনুরূপ ব্যবস্থা রয়েছে।

(ঙ) **কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি** ঃ—সমবায় আইন ও উপবিধি অনুযায়ী প্রত্যেক সমবায় সমিতিই একটি কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি নির্ব্বাচিত করবে। সমবায় আইন ও উপবিধিতে এই কমিটির দায়িত্ব ও অধিকারের কথা উল্লেখ থাকে। কমিটিতে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের প্রতি সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। বছরের পর বছর একই সভ্য হয়ত কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিতে থাক্‌তে পারে ; কিন্তু বাংলাদেশের সমবায় আইন অনুযায়ী নিয়ামকের অনুমতি ব্যতিরেকে কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিব কোন সভ্যই তিন বছবের বেশী পঞ্চায়েৎ হিসাবে থাকতে পারে না। কাজেই বিভাগীয় কর্ম্মচারী বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুপারভাইজারদের সব সময় লক্ষ্য রাখতে হ'বে, যা'তে অবাঞ্ছিত সভ্যগণ নির্দ্দিষ্টকালের বেশী কমিটিতে না থাকতে পাবে। তা'ছাড়া এমন হ'তে পারে যে, কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সভ্যগণই কর্জ্জের কিস্তি খেলাপ করেছে। সে ক্ষেত্রে, স্বভাবতঃই অন্যান্য সাধারণ সভ্যগণ কিস্তি খেলাপ করলেও এঁরা আইন অনুযায়ী কোন মামলা দায়ের করতে চান না। বৃহদাকার সমবায় ঋণদান সমিতির ক্ষেত্রে কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির মোট সভ্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বা তিনজনের অনধিক সভ্য সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু যেহেতু কমিটি সুপারিশ করেছেন যে, সরকার কর্ত্তৃক মনোনয়নের ব্যবস্থা না থাকাই শ্রেয়ঃ। যদি কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোন সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতির মূলধনের অংশীদার হয়, তা'হলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঐ সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির মোট সভ্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বা তিনের অনধিক সভ্য মনোনীত করতে পারে। আর যেখানে সরকার কর্ত্তৃক মনোনয়নের প্রয়োজন আছে বলে মনে হবে, সেখানে মনোনয়নের ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে।

(চ) **সম্পাদক**—কোন কোন সমিতির সম্পাদক বেতনভুক্ত আবার কোন কোন সমিতিতে সম্পাদক অবৈতনিক হিসাবে কাজ করেন। সাধারণতঃ বেতনভোগী সম্পাদক কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সভ্য থাকতে পারেন না। যা' হোক, সম্পাদকের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, সততা, দক্ষতা প্রভৃতি গুণের ওপর সমিতির উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। সাধারণতঃ গ্রামের ছোট ছোট সমিতির পক্ষে বেতনভোগী সম্পাদক রাখা সম্ভব হয় না। কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবৈতনিক সম্পাদক নিয়োগ ব্যবস্থা দেখা যায়। কোথাও কোথাও স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষককে সামান্য পারিশ্রমিক দিয়ে সম্পাদক নিয়োগের ব্যবস্থা দেখা যায়। মাদ্রাজে কোনও সমিতির সম্পাদক হ'তে গেলে তাকে ন্যূনতম সমবায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। অন্যান্য রাজ্যে সমিতিগুলি নিজেই নিজেদের সম্পাদক নিয়োগ করে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য্য যে বেতনভোগী কোন কর্ম্মচারী বা সম্পাদক নিয়োগ ব্যতিরেকে কোন সমিতির কাজ ভাল ভাবে চলতে পারে না। ১৯৪৫ সালে দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিশন মন্তব্য করেন যে সমবায় সমিতির প্রথমাবস্থায় (যখন স্থানীয় সমবায় নেতা পাওয়া সম্ভব হয় না) শিক্ষিত ম্যানেজার থাকা উচিত। তাদের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্যে কিছু সংখ্যক ম্যানেজারকে বিভাগীয় সরকারী কর্ম্মচারী হিসাবে পদোন্নতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটি ঠিক করেন যে প্রত্যেক বৃহদাকার ঋণদান সমিতিতে একজন ক'রে বেতনভোগী ও প্রয়োজনীয় গুণসম্পন্ন ও সমবায় শিক্ষায়তনে শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্পাদক থাকবেন। সেবা সমিতিতেও ম্যানেজারদের মাহিনা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

(ছ) **তহবিল**—গ্রাম্য ঋণদান সমিতির তহবিল বা মূলধনের উৎস হচ্ছে এইগুলি—সভ্যদের কাছ থেকে শেয়ারের টাকা, সভ্য ও অন্যান্যদের কাছ থেকে আমানত, সমবায় সমিতি বা ঋণ সরবরাহকারী ব্যাঙ্কের কাছ থেকে কর্জ্জ এবং সরকার থেকে দান-খয়রাৎ ইত্যাদি।

শেয়ার—আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন ও লাভ থেকে গড়া বিভিন্ন তহবিল দিয়ে সমিতির নিজস্ব মূলধন গঠিত হয়। শেয়ারের দাম সাধারণতঃ ১০৲ থেকে ৫০৲ টাকা হ'য়ে থাকে; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১০৲ টাকা মূল্যের শেয়ার থাকে। শেয়ারের টাকা ভিন্ন ভিন্ন কিস্তিতে দেওয়া যেতে পারে। সাধারণতঃ সভ্যদের কর্জ্জ দাদনের সময় তাদের প্রয়োজনীয় শেয়ারের টাকা কেটে নেওয়া হয়। কর্জ্জের পরিমাণ সাধারণতঃ কোন সভ্যের ক্রীত শেয়ারের ৮ থেকে ১০

গুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে সভ্যদের সঞ্চয় হ'তে শেয়ারের দাম দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। কোন কোন সমিতিতে লভ্যাংশের টাকা না নিয়ে, তা' সমিতিতে জমিয়ে শেয়ারের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। কত টাকা অবধি শেয়ার কেনা যাবে, তা' অবশ্য সব রাজ্যে সমান নয়। বোম্বাইতে ৩০০০৲ টাকা বা মোট শেয়ার মূল্যের এক-পঞ্চমাংশ (এই দুই অঙ্কের মধ্যে যেটা যখন কম থাকবে এতটুকু) অবধি কোন সভ্য শেয়ার কিনতে পারে। বাংলাদেশে এর পরিমাণ এক-দশমাংশ বা এক হাজার টাকার মধ্যে (যেটা কম হবে এতদূর পর্য্যন্ত)।

পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটি সুপারিশ করেন যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত বৃহদাকার ঋণদান সমিতির আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন প্রয়োজনীয় পরিমাণ না হচ্ছে, ততক্ষণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এ সমিতিগুলির শেয়ার কিনতে থাকবে। এজন্যে রাজ্য সরকার রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করবে। আশানুরূপ পরিমাণ টাকা না হওয়া অবধি সভ্যদের কাছ থেকে আবশ্যকীয় শেয়ারের টাকা আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে। আশানুরূপ পরিমাণ শেয়ারের টাকা সংগৃহীত হওয়ার পর অবশ্য রাজ্য সরকার আর শেয়ার কিনবেন না। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারী শেয়ারের টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য সভ্যদের কাছ থেকে শেয়ারের টাকা সংগ্রহ করে যেতে হবে। আমেরিকাতেও এ ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৫৯ সালের মার্চ্চ মাস অবধি বৃহদাকার ঋণদান সমিতিতে সরকার কর্তৃক সমিতির এইরূপ অংশগ্রহণ বজায় ছিল। কিন্তু তারপর থেকে এ ধরনের বৃহদাকার সমিতি সংগঠন বন্ধ হয়ে যায় এবং তার বদলে গ্রামভিত্তিতে সেবা সমিতি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেহেতু কমিটির সুপারিশক্রমে এ সব সেবা সমিতির শেয়ারও সরকার কিনে নেবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অসীম-দায়িত্ব বিশিষ্ট সেবা সমিতির শেয়ার সরকার কিনলে অবশ্য সরকারের ওপর অসীম দায়িত্ব আরোপ করা চলবে না এবং এই মর্ম্মে প্রত্যেক রাজ্যের সমবায় আইনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে, তবেই সেরকম সমিতির শেয়ার সরকার নেবেন।

সংরক্ষিত তহবিল—সমবায় আইনানুসারে প্রত্যেক বছরের লাভের নির্দ্দিষ্ট অংশ সংরক্ষিত তহবিলের জন্যে রাখা হয়। সমবায় আইনে এই সংরক্ষিত তহবিল সৃষ্টি ও তার বিনিয়োগ বা ব্যবসায়ে খাটানো সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিধি রয়েছে; যেমন, বোম্বাইতে সংরক্ষিত তহবিলের সম্পূর্ণ টাকা ব্যবসায়ে

খাটানো চলে। আবার মাদ্রাজে কার্য্যকরী মূলধনের এক-পঞ্চমাংশের ঊর্দ্ধ পরিমাণ সংরক্ষিত তহবিলের টাকা প্রাথমিক সমিতি তার নিজস্ব ব্যবসায়ে খাটাতে পারে. আর বাকী টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হয়। সমীক্ষা কমিটির মতে, কৃষি-ঋণদান সমিতির বিভিন্ন তহবিলের টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখা উচিত। সমিতির সংরক্ষিত তহবিলের জমা টাকার ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক উচ্চতর হারে সুদ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

আমানত—পল্লী-ঋণদান সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য থাকবে, সমিতির এলাকাভুক্ত ব্যক্তিদের নিকট হ'তে অর্থ সংগ্রহ করে তার যথাযথ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা। গ্রামে সভ্য ও অন্যান্যদের কাছ থেকে আমানত যোগাড় করে তা' ঋণ-দানে নিয়োগ করাই হবে মুখ্য উদ্দেশ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কার্য্যকরী মূলধনের নিতান্ত নগণ্য অংশ হচ্ছে আমানত। তাই সমীক্ষা কমিটি সুপারিশ করেন যে প্রাথমিক সমিতিতে স্থায়ী বা দীর্ঘ-মেয়াদী আমানত সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হ'বে। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এজেণ্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে সেভিংস্ আমানতও গ্রহণ করতে পারে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এ ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। বোম্বাইতে কর্জ্জের টাকা দাদনের সময় সভ্যদের কাছ থেকে দীর্ঘ-মেয়াদী আমানত আবশ্যকীয়রূপে কেটে নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এ ধরনের ব্যবস্থা সাধারণ সভ্যদের মনঃপূত না হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা, মহাজনগণও কর্জ্জদাদনের সময় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে টাকা কেটে নেয়। তাই মাদ্রাজ ও বাংলাদেশে যে 'গৃহ-সঞ্চয়-বাক্স' (Home Savings Box) রাখার ব্যবস্থা রয়েছে, তা' প্রশস্ত বলে মনে হয়।

কর্জ্জদাদন—প্রাথমিক ঋণদান সমিতি সাধারণতঃ স্বল্প-মেয়াদী ও মধ্য-মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। মোট ঋণ দাদনের মধ্যে মধ্য-মেয়াদী ঋণের পরিমাণ তেমন সন্তোষজনক নয়। ঋণদান ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে। তাই সমীক্ষা কমিটি সুপারিশ করেন যে, ঋণদান ব্যাপারে বোম্বাই-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। সেখানে ঋণের পরিমাণ আবাদী জমির আনুমানিক শস্যমূল্যের ওপর নির্ভর করে। প্রতি একর জমিতে কত টাকা অবধি ঋণ দেওয়া হ'বে, তা' প্রত্যেক জেলার তদারকী কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের বাৎসরিক সম্মেলনে ফসল আবাদের অনেক আগেই স্থির করা হয়। কর্জ্জের দরখাস্ত, কর্জ্জ মঞ্জুর প্রভৃতির ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই প্রায় সমান।

প্রকৃতপক্ষে শস্য ও জমি, এই দুটোই জামিন রেখে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা

রয়েছে। তবে আবশ্যকীয় জামিন বল্‌তে শস্য-জামিনকেই বুঝায়। কিন্তু যাদের জমি আছে, তাদের এই মর্ম্মে একটা অঙ্গীকারপত্র সম্পাদন করতে হয় যে, সমিতি থেকে প্রাপ্ত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ঋণ পরিশোধার্থে জমি দায়গ্রস্ত থাক্‌বে। বোম্বাইতে সেচ্ অঞ্চলে ও অর্থকরী শস্য (money crop) বেশী জন্মায় এরূপ অঞ্চলে কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতির সভ্যদের 'ক্যাশ ক্রেডিট' দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মজুরদের মজুরী দেওয়ার জন্যে উক্ত 'ক্যাশ ক্রেডিট' ব্যবস্থা খুব কার্য্যকরী হচ্ছে। তবে এ ধরনের 'ক্যাশ ক্রেডিট' একমাত্র 'ক' বা 'খ' শ্রেণীভুক্ত ভাল সমিতি ও তাদের সভ্য পেতে পারে। দুর্ভিক্ষজনিত কোন কারণে পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ করতে না পারলেও সভ্যদের নতুন করে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে বোম্বাইতে। এ ক্ষেত্রে, বীজ কেনা ও আগামী বৎসরের কৃষিকার্য্যের ব্যয়ভার বহন উদ্দেশ্যে ও জামিনের প্রাচুর্য্যের ভিত্তিতে ঋণ দেওয়া হয় এবং পূর্ব্ব-ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দিয়ে ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু হাল সনের ঋণ উৎপন্ন শস্য বিক্রী হওয়ামাত্র পরিশোধ করতে হয়। বলদ, কৃষিযন্ত্রপাতি ক্রয়, সেচ উদ্দেশ্যে কূপ খনন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে মধ্য-মেয়াদী ঋণেরও ব্যবস্থা রয়েছে। যে উদ্দেশ্যে মধ্য-মেয়াদী ঋণের প্রয়োজন, তার অর্দ্ধেক ঋণ গ্রহণকারীকে সংগ্রহ করতে হয়, আর বাকী অর্দ্ধেক সমিতি থেকে পাওয়া যায়।

ঋণদান ব্যাপারে সমীক্ষা কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন :—

(১) সমিতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঋণ পুরামাত্রায় দাদন করবে ;

(২) চাষ আবাদ ও ফসল কাটার মধ্যবর্ত্তী সময়ে কৃষকের ভরণ পোষণের জন্য ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হ'বে ;

(৩) প্রতি একর জমিতে কৃষিকার্য্যের জন্য যা খরচ পড়বে সেই অনুপাতে এবং উৎপন্ন ফসলের যা মূল্য হবে তার ভিত্তিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাক্‌বে ;

(৪) ঋণের সম্পূর্ণ টাকা এককালীন না দিয়ে চাষের প্রয়োজন অনুযায়ী দু'চার কিস্তিতে দাদনের ব্যবস্থা করা উচিত ;

(৫) যতটা সম্ভব নগদ টাকা ধার না দিয়ে বীজ, সার, ইত্যাদি ধারে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে ;

(৬) বোম্বাই-এর ন্যায় ব্যক্তিগত জামিন ছাড়াও শস্য জামিন নেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত ;

(৭) কৃষি-ঋণ ছাড়া, প্রত্যেক সমিতি উৎপাদন ও অনধিক পাঁচ বৎসরে শোধ করার কড়ারে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে ;

(৮) সম্ভব হ'লে, সভ্যদের বীজ, খড়, সার ও কৃষিযন্ত্রপাতি সরবরাহের ভার নিতে হ'বে সমিতিকে ;

(৯) যে সব জিনিস দৈনন্দিন প্রয়োজনে সব সময় লাগে এমন সব জিনিস সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। নিয়ামকের অনুমোদন নিয়ে আদায়ীকৃত অংশগত মূলধনের দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা এই সব জিনিসের ব্যবসায়ে খাটানো যেতে পারে ;

(১০) কোনও ভাল বৃহদাকার ঋণদান সমিতি স্বর্ণ, অলঙ্কার বা অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। তবে প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ ও নিরাপত্তাজনিত অনুকূল ব্যবস্থা থাকলেই এ ভাবে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে ;

(১১) বিবাহ, অসুখ-বিসুখ বা এই রকম অন্য কোন উদ্দেশ্যেও ঋণ দেওয়া যেতে পারে।

সুদের হার—স্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে, সভ্যগণ কি হারে কর্জ্জের ওপর সুদ দেবে ? ম্যাক্‌লাগান কমিটির মতে সমিতির সংরক্ষিত তহবিল সন্তোষজনক না হওয়া পর্য্যন্ত চড়া হারে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। ভারতের বিশিষ্ট সমবায়ী শ্রী ভি. এল. মেহেতাও ম্যাক্‌লাগান কমিটির যুক্তি সমর্থন করেন। কিন্তু ১৯৪৫ সালে গ্যাড্‌গিল্ কমিটি অন্যরূপ মত প্রকাশ করেন। এই কমিটি বলেন, সুদের হার কোন ক্ষেত্রেই শতকরা ৬।০ আনার বেশী হওয়া উচিত নয়। যাই হোক্, কার্য্যক্ষেত্রে এইসব বিভিন্ন মত আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ঋণদান সমিতি যদি অন্ততঃ শতকরা ৪৲ টাকা হারের সুদে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে, তবেই ৬।০ হার সুদে সভ্যদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে। যদি এই তহবিল সমিতির নিজস্ব তহবিল হয়, তা'হলে কোন অসুবিধা নেই সত্য, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সমিতিকে ঋণ দাদনের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা বহুলাংশে অন্য কোথাও হতে সংগ্রহ করতে হয়। অন্যপক্ষে সমিতির কর্জ্জ গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ধরে নেওয়া যাক্, সমিতি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ্জ গ্রহণ করবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুদের হার কিন্তু শতকরা ৪৲ টাকার কম হওয়া সম্ভব নয়। এ কথাও বিবেচনা করা দরকার যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অন্যান্য ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আমানত গ্রহণ করতে হয় এবং সেজন্য

আমানতের ওপর শতকরা ২৲ থেকে ৩৲ টাকা সুদ দিতে বাধ্য হয়। কাজেই যে তহবিলের ওপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ২৲ টাকা থেকে ৩৲ টাকা হারে সুদ দিতে হয় সে কি ক'রে শতকরা ৪৲ টাকা হারে এই তহবিল বিনিয়োগ করতে পারে? এ এক জটিল সমস্যা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাই প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে শতকরা ২৲ টাকা হারে শস্য-ঋণ দিচ্ছে এবং প্রাদেশিক ব্যাঙ্কও স্বভাবতঃই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে ৩½ টাকা হারে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রাথমিক সমিতিকে শতকরা ৬৷৹ হারে ঋণ দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক ঋণদান সমিতির নিজস্ব তহবিল গড়ে ওঠার পক্ষে অবস্থা অনুকূল নয়, কারণ তার আয়ের পরিমাণ খুব বেশী হয় না। অবশ্য সুদের হার বাড়িয়ে দিলে অধিকতর লাভ করা সম্ভব হয় এবং সংরক্ষিত তহবিল বা অন্যান্য নিজস্ব তহবিল আশানুরূপ পরিমাণ গড়ে তোলা যায়। এ ভাবে বিভিন্ন সমিতি বা ব্যাঙ্ক আর্থিক ব্যাপারে স্বাবলম্বী হ'তে পারে। ১৯৫৭-৫৮ সালে উত্তর প্রদেশ ও বোম্বাই-এ প্রাথমিক সমিতিগুলির সুদের হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৮ট্ট টাকা ও ৬¼ টাকা থেকে ৯½ টাকা অবধি। একই বছরে পঞ্জাবে ছোট সমিতিগুলির সুদের হার ছিল ৭½ টাকা। আসাম, বাংলাদেশ ও উড়িষ্যাতে প্রাথমিক সমিতির সুদের হার ছিল শতকরা ৮৲ টাকা।

তদারকের (সুপারভাইজারের) **কাজ**—সমিতির সভ্যগণ সমিতির সভ্য হিসাবে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না হওয়া পর্য্যন্ত এবং সমিতি তার কাজ-কর্ম্মের তদারকী, পরিদর্শন ও হিসাব পত্র পরীক্ষার ব্যাপারে যত্নবান না হওয়া পর্য্যন্ত সমিতির উন্নতি তথা সমবায় আন্দোলনের উন্নতি হওয়া শক্ত। কি ধরনের তদারকী বা পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকা উচিত, সে সম্পর্কে ১৯৩৯-৪০ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেন যে, বর্ত্তমান তদারকী ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। তাদের মতে, উপযুক্ত পারিশ্রমিকে অল্পসংখ্যক কর্ম্মচারী প্রত্যেক সমিতিতে থাকা বাঞ্ছনীয়। স্থানীয় অবস্থা, বিশেষ করে সভ্যগণ সম্পর্কে, ওয়াকিবহাল কর্ম্মচারী দিয়ে প্রকৃত তদারকী সম্ভবপর হবে। শুধু কর্জ্জ-দাদন করেই তাদের কর্ত্তব্য শেষ হবে না। সভ্যদের শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, মিতব্যয়িতার অভ্যাস ইত্যাদি বিষয়েও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এই সব কর্ম্মচারীদের কাজে উৎসাহ দান ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট অপর কোন কাজে এদের পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আবার এদের কাজ-কর্ম্ম দেখাশুনার জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকা দরকার।

সুপারভাইজার বা তদারককারীর কাজ হ'বে এইরূপ :—

(১) যত ঘন ঘন সম্ভব প্রত্যেক সমিতিতে যাওয়া প্রয়োজন। ' অন্ততঃ ৩ মাসে একবার প্রত্যেক সমিতিতে সুপারভাইজারের যাওয়া উচিত ;

(২) সভ্যদের জমি-জমা ও তার উৎপাদন ক্ষমতা কতটুকু তা সম্যক্‌ভাবে জানা উচিত এবং তার ভিত্তিতে সভ্যদের সম্পত্তি-তালিকা প্রস্তুত করা উচিত ;

(৩) কৃষি-কার্য্য বা অন্যান্য উৎপাদনজনিত ব্যয় বাবদ ঋণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ ;

(৪) কর্জ্জের দরখাস্ত প্রস্তুত করণ ;

(৫) সমিতির খাতাপত্র ঠিকভাবে লিখে রাখার ব্যবস্থা করা ;

(৬) বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করা ও তার প্রস্তাব লেখা ;

(৭) যে উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হয়েছে সেই উদ্দেশ্যেই তা লাগান হয়েছে কিনা তার তদারক করা ;

(৮) সভ্যদের উৎপন্ন শস্য বিক্রীর ব্যবস্থা করা ;

(৯) শস্য বিক্রীর পর ঋণের টাকা আদায় করা ;

(১০) কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সভ্যদের বে-আইনী কর্জ্জদান, উপবিধি লঙ্ঘন সম্পর্কে সৎ পরামর্শ দান ;

(১১) খেলাপী ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করা ;

(১২) সভ্যদের বাড়ী গিয়ে এদের খেলাপী কিস্তি আদায়ের ব্যবস্থা করা ;

(১৩ প্রয়োজন অনুপাতে ঋণের ব্যবস্থা ও তার নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখা ;

(১৪) অডিটে প্রদর্শিত ত্রুটি সমূহের সংশোধনের ব্যবস্থা করা ;

(১৫) বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা ;

(১৬) সমিতির সভ্য ও কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সভ্যদের সমবায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

প্রত্যেক সুপারভাইজারের পক্ষে উপরিউক্ত কার্য্যাবলী সম্পাদন করা সম্ভবপর হয় যদি তাঁর ওপর খুব বেশী সংখ্যক সমিতির তদারকের ভার না থাকে। ১৯৩৮ সালের মাদ্রাজ সমবায় কমিটি বলেন যে, প্রত্যেক সুপারভাইজারের অধীনে ১৫টির বেশী সমিতি থাকা উচিত নয়; আবার ১৯৪০ সালে সমবায় পরিকল্পনা কমিটি বলেন, ঊর্দ্ধতনপক্ষে ২৫টি সমিতির জন্য একজন সুপারভাইজার থাকা উচিত। ১৯৩৯-৪০ সালে রিজার্ভ

ব্যাঙ্ক সুপারিশ করেন যে, বোম্বাই-এর ন্যায়, যেখানে সমবায় আন্দোলন বেশ উন্নত, সেখানে তদারকের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক-এর নেওয়া উচিত। অন্যান্য রাজ্যে সংশ্লিষ্ট রাজ্য-সরকার সুপারভাইজারদের পুরোপুরি সরকারী কর্ম্মচারী হিসাবে নিয়োগ করবেন ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অধীনে কাজ করার সুযোগ দেবেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুপারভাইজারের বেতন ন্যূনতম ১০০৲ টাকা করার ব্যবস্থা ছিল। কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে উক্ত ১০০৲ টাকা বেতন দেওয়া সম্ভব না হলে সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় অংশ বহন করা হত। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও উক্ত সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা রয়েছে।

বৃহদাকার কৃষি ঋণদান সমিতির উৎপত্তি

ভারতে সমবায় আন্দোলনের গোড়ার দিকে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, গ্রাম ভিত্তিতে সমবায় সমিতি গড়ে উঠ্‌লে সমিতির কাজ-কর্ম্ম বেশ ভাল চল্‌বে, কেননা, তা'তে সভ্যদের পারস্পরিক জানা-শোনা, সাহায্য ইত্যাদির পথ প্রশস্ত হবে। তা' ছাড়া সম্পাদক বা কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির অন্যান্য সভ্য সমিতির অবৈতনিক কাজ করলে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হবে। কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরের সমবায় সমিতির কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ আশা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। ঋণদান ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমবায় সমিতি কত কম পরিমাণ টাকা দাদন করে—মাত্র শতকরা ৩'১ ভাগ। এই সামান্য অংশও সত্যিকারের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পৌছায় না! তাছাড়া সমিতির আর্থিক বুনিয়াদ দুর্ব্বল থাকার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, সমিতি বছরের পর বছর লোকসান দিয়ে কাজ করছে। সভ্যরা পরস্পরের কাজ দেখা-শোনার ব্যাপারে বিশেষ করে কর্জ্জ আদায় ব্যাপারে নিতান্তই উদাসীন। বিনা পারিশ্রমিকে কাজ-কর্ম্ম চলার দরুন সমিতির কাজে আশানুরূপ দক্ষতা আসেনি। অসীম-দায়িত্বের ভয়াবহ দিকটা অনেক সচ্ছল চাষীকেই সমিতির কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এই সমস্ত বিভিন্ন কারণে সমবায় কৃষি-ঋণদান আন্দোলন দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। কাজেই আন্দোলনের এই অবস্থার উন্নতিকল্পে নিখিল ভারত পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটি কৃষি ঋণদান সমিতিগুলির পুনর্গঠনের সুপারিশ করেন।

কৃষি ঋণ সরবরাহ ব্যাপারে গ্রাম্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন থেকেই

উপলব্ধি করা হয়েছিল। শ্রফ্ কমিটি, পরিকল্পনা কমিশন ও অন্যান্য বিভিন্ন কমিটি ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক পল্লী অঞ্চলে শাখা-অফিস স্থাপন ও তার ফলে যদি তাদের ক্ষতি হয় সেই ক্ষতি পূরণার্থ সরকারী সাহায্য, গ্রামাঞ্চলে পোস্ট-অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কের সম্প্রসারণ ইত্যাদির সপক্ষে সুপারিশ করেন। কিন্তু অবস্থার গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এ সমস্ত ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। চাষীদের ঋণদান ব্যাপারে একমাত্র সমবায় প্রতিষ্ঠানই উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু এই সমবায় প্রতিষ্ঠানই বা চাষীদের কতটুকু উপকার করতে পেরেছে? সমীক্ষা কমিটি বলেন, সমবায় প্রতিষ্ঠান পল্লী-ঋণদান ক্ষেত্রে অকৃতকার্য্যই হয়েছে! কিন্তু তবু সমবায় আন্দোলনকে সফল করে তুলতেই হবে। তবে এই সাফল্যের জন্য চাই কোন সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা—সমবায় আন্দোলন পুনর্জ্জীবিত করে তোলার পরিকল্পনা। পল্লী-ঋণদান সমবায় সমিতির পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বৃহদাকার ঋণদান সমিতির সংগঠন হ'বে এ পরিকল্পনার প্রধান অঙ্গ। তাই সমীক্ষা কমিটি বলেন, "সমবায় ঋণদানের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনায় বৃহদাকার সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপন প্রধান স্থান লাভ করবে। এই সমিতিগুলি বেশ কতগুলো গ্রাম নিয়ে বা অধিকতর বেশী এলাকা নিয়ে, সুবৃহৎ সভ্য সংখ্যা নিয়ে-ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ অংশগত মূলধন নিয়ে গড়ে উঠ্‌বে।" এলাকাভুক্ত কোন বিপণণ কেন্দ্রে এই বৃহদাকার সমিতির অফিস্ থাকবে। প্রয়োজন ক্ষেত্রে পুরানো সমিতিগুলির পুনর্গঠন করতে হবে। কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতির একত্রীকরণের মাধ্যমেও এই পুনর্গঠনের কাজ সমাধা হতে পারে। আর নতুন করে যে সমিতিই সংগঠন করা হবে তা শুধু বৃহদাকার সমিতি হবে। জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা অঞ্চলে এই ধরনের সমিতি সংগঠনের কাজ সুরু করতে হবে। এই বৃহদাকার সমিতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি অন্যতম :—

সভ্য—সমিতির এলাকায় প্রয়োজনীয় গুণের অধিকারী যে-কেহ সমিতির সভ্য হতে পারে। কোন সমিতি যদি এরূপ কোন ব্যক্তিকে সভ্য হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী না হয়, তাহলে নিয়ামকের কাছে আপীল করা চল্‌বে।

দায়িত্ব—সভ্যগণ কর্তৃক ক্রীত শেয়ার মূল্যের সমপরিমাণ বা তার দ্বিগুণ, তিনগুণ বা পাঁচগুণ প্রভৃতির মত পরিমাণ দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাক্‌বে।

শেয়ার বা অংশ—এই সমিতি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নির্দ্দিষ্ট অংশগত মূলধন সংগ্রহ করবে। সরকার মোট অংশগত মূলধনের শতকরা ৫১ ভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কিন্‌বেন। যতদিন পর্য্যন্ত ন্যূনতম অংশগত

মূলধন গড়ে না উঠ্‌ছে, ততদিন সভ্যদের প্রয়োজনীয় অংশ কিন্‌তে হবে। ন্যূনতম অংশগত মূলধন সংগৃহীত হওয়ার পর সরকার আর অংশ কিন্‌বেন না; কিন্তু সভ্যগণ এই সরকারী অংশগত মূলধন ফেরত দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অংশ কিনে যাবেন। শেয়ার বা অংশমূল্য যতটা সম্ভব কম থাক্‌বে।

আমানত—সমিতি শুধু স্থায়ী বা দীর্ঘ-মেয়াদী আমানত গ্রহণ করতে পারবে। তবে নিয়ামকের অনুমোদন ক্রমে সেভিংস্‌ আমানতও গ্রহণ করতে পারে। কিছু কমিশনের বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবেই শুধু সেভিংস্‌ আমানত গ্রহণ করা চল্‌তে পারবে।

সমিতির নিজস্ব আমানত—নিজস্ব আমানত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখতে হবে। অবশ্য এই আমানতের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বেশী হারে সুদ দেবে।

কর্জ্জদাদন ব্যবস্থা—ঋণদান ব্যাপারে শস্য-ঋণকে প্রাধান্য দিতে হবে। যতদূর সম্ভব কিস্তি কিস্তি ঋণ দেওয়াই শ্রেয়ঃ হবে। নগদ টাকা ধার না দিয়ে বরং সার, বীজ প্রভৃতি ধারে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে। একর প্রতি চাষাবাদের খরচও পরে উৎপন্ন শস্যের আনুমানিক মূল্য কত হবে তা দেখে এবং উৎপন্ন শস্যের কত দাম হতে পারে তা দেখে সেই ভিত্তিতে ঋণের পরিমাণ ধার্য্য করতে হবে। সাধারণতঃ এই বছর বছর কর্জ্জদাদনের ক্ষেত্রে জমি বন্ধক না রাখাই যুক্তিযুক্ত হবে। তবে উৎপন্ন হচ্ছে যে শস্য সেই শস্যকে জামিন রাখতে হবে এবং তার ওপর সমিতির আইনগত অধিকার থাক্‌বে। শস্য-ঋণ নিয়ন্ত্রণাধীন থাক্‌বে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ছোট জোতদারদের ঋণের চাহিদার শতকরা ৫০ ভাগ বা ৭০ ভাগ দেওয়ার ব্যবস্থা থাক্‌বে। এমন কি উৎপাদনের ক্ষেত্র ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্যে দীর্ঘ-মেয়াদী আমানতের জামিন রেখে কোন সভ্য ঋণ পেতে পারবে। উৎপাদন উদ্দেশ্যে পাঁচ বছরের মেয়াদে মধ্য-মেয়াদী ঋণ দেওয়াও চল্‌বে। সভ্যদের বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরবরাহ করারও দায়িত্ব নিতে হবে সমিতিকে। সম্ভব হলে স্থায়ী চাহিদার ভিত্তিতে বা সভ্যদের প্রয়োজন অনুযায়ী চিনি, কেরোসিন তেল, দেশলাই ইত্যাদি দৈনন্দিন আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহেরও ভার সমিতি নিতে পারে। সুপরিচালিত ও আর্থিক দিক হতে সচ্ছল সমিতি সমবায় ভাণ্ডারের ন্যায় জিনিসপত্তর সরাসরি কেনা-বেচাও করতে পারবে। মূল্য-নিরূপণের ও নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকলে স্বর্ণ ও অলঙ্কারের জামিনেও ঋণ সরবরাহ করা চল্‌বে। তবে এ ধরণের ঋণদাদনে

নিয়ামকের অনুমোদন অত্যাবশ্যক। বিবাহ, অসুখ ইত্যাদি বাবদও ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে পারে। শস্য-ঋণের সঙ্গে কৃষি-বিপণনের নিবিড় যোগসূত্র থাকা বাঞ্ছনীয়। ঋণী সভ্যকে তার উৎপন্ন শস্য ঐ এলাকার বিপণন সমিতির মাধ্যমে বিক্রী করতে হবে এই শর্ত্তে রাজী হলে তবেই সে ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। সভ্যদের উৎপন্ন শস্য-বিক্রী ব্যাপারে প্রাথমিক ঋণদান সমিতি বিপণন সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবে। অবশ্য প্রাথমিক সমিতিও বিপণন সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হবে। প্রত্যেক বৃহদাকার ঋণদান সমিতিতে একজন সুদক্ষ, শিক্ষিত, প্রয়োজনীয় গুণের অধিকারী, বেতনভোগী সম্পাদক থাকবে।

পুরানো ঋণদান সমিতি ও বৃহদাকার ঋণদান সমিতির মধ্যে পার্থক্য :—

পুরানো সমিতি	বৃহদাকার সমিতি
১। এলাকা—কোনও নির্দ্দিষ্ট গ্রাম বা তার চেয়ে ছোট এলাকা।	১। বেশ কতগুলো গ্রাম নিয়ে এলাকা, যাতে করে আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় হতে পারে।
২। সভ্য—নির্দ্দিষ্ট সংখ্যকের বেশী হতে পারে না বা যে কোন ব্যক্তিকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয় না।	২। সবার জন্য সভ্যপদ উন্মুক্ত। সভ্যপদে বঞ্চিত করলে নিয়ামকের নিকট আপীলের ব্যবস্থা।
৩। দায়িত্ব—অসীম।	৩। দায়িত্ব—সসীম।
৪। অংশগত মূলধন—	৪। অংশগত মূলধন—
(ক) ন্যূনতম কোন পরিমাণ নেই।	(ক) ন্যূনতম অংশগত মূলধন গড়ে তুলতে হয় ;
(খ) সরকার কর্ত্তৃক অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা নেই।	(খ) সরকার কর্ত্তৃক অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে।
৫। আমানত—সর্ব্বপ্রকার আমানত গ্রহণ করতে পাবে।	৫। আমানত — একমাত্র স্থায়ী আমানত গ্রহণ করতে পারে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবে সেভিংস্-আমানতও গ্রহণ করতে পারে।

পুরানো সমিতি	বৃহদাকার সমিতি
৬। ঋণদাদন ব্যবস্থা—	৬। ঋণদাদন ব্যবস্থা—
(ক) জমি জামিন রেখে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, স্বর্ণ বা অলঙ্কারের জামিনে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই;	(ক) ভূমিহীন চাষীকেও ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা—শস্যও জামিন রেখে ঋণদান করা যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বর্ণ বা অলঙ্কার জামিন রেখে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।
(খ) শুধুমাত্র উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা;	(খ) উৎপাদন উদ্দেশ্যে, ভরণ-পোষণ ও বিবাহ, অসুখবিসুখ ইত্যাদি উদ্দেশ্যেও ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে;
(গ) বিপণনের সঙ্গে ঋণদানের কোন যোগ নেই;	(গ) বিপণনের সঙ্গে ঋণদানের যোগাযোগ রয়েছে;
(ঘ) শাখা-ব্যবসায় ছাড়া অন্য কোন বেচাকেনার কাজ নেই;	(ঘ) নিয়ামকের অনুমোদন-ক্রমে সাধারণ ব্যবসায়ের অঙ্গ হিসাবে বীজ, কৃষিজাত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নিয়েও ব্যবসা করতে পারে;
(ঙ) অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ বা অনুরূপ কোন কিছু হওয়ার ফলে ফসল না হলেও ঋণ আদায় করা হয়;	(ঙ) অনাবৃষ্টি বা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির ফলে অজন্মা হ'লে শস্য-ঋণকে মধ্য-মেয়াদী ঋণে পরিণত করা যেতে পারে;
(চ) সাধারণতঃ শস্য-ঋণই দেওয়া হয়।	(চ) শস্য-ঋণ ও মধ্য-মেয়াদী ঋণ দেওয়া হয়।

বৃহদাকার ঋণদান সমিতির স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ ঃ

১। সুপরিকল্পিতভাবে সংগঠিত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত বৃহদাকার সমিতি সত্যিকারের পল্লীব্যাঙ্কের যে রকম কাজ করা উচিত সেই রকম কাজ করে চাষীদের চাহিদা মেটাতে পারে। অর্থ-বিনিয়োগের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য

রেখে ঋণের নিয়ন্ত্রণ, বিপণনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ও ঋণী সভ্যের অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্য্যকলাপের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়।

২। অবৈতনিক কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তে বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিয়োগের ফলে সমিতির সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব হয়।

৩। অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর এলাকা নিয়ে কাজ করার জন্য যথেষ্ট ঋণ সরবরাহ তথা আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করা সম্ভব হয়। বার্ষিক ৯০০৲ হারে বেতন দিয়ে ম্যানেজার রেখেও কোনও বৃহদাকার ঋণদান সমিতি ২০,০০০৲ টাকা অংশগত মূলধন (যার মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হয় তাই) নিয়ে সন্তোষজনক লাভে কাজকর্ম্ম করতে পারে। কেননা, এই বিশ হাজার টাকার অংশগত মূলধনের ওপর কোন সুদ দিতে হবে না। কাজেই এই সমস্ত টাকা সভ্যদের শতকরা ৮৲ টাকা সুদের হারে ধার দিলে বছরে সুদ বাবদ ১,৬০০৲ টাকা পাওয়া যেতে পারে। অন্যপক্ষে ধার করে টাকা তুলে সেই টাকা সভ্যদের ধার দিয়ে তাই থেকে অনুরূপ লাভ করতে হলে অন্ততঃপক্ষে একলক্ষ টাকার মত দাদন করতে হবে। কেননা, আয়ের মাত্রা শতকরা ১।০ থেকে ২।০-র বেশী থাকে না। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুদের হার (৬।০) ও সমিতির সুদের হারের (৭॥০ হতে ৮॥০) পার্থক্য এর বেশী থাকে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যদি পল্লী-ঋণদান সমিতি ছোট হয় এবং তাকে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ্জ গ্রহণ করে ঋণের ব্যবসায় চালাতে হয়, তা' হলে এদের অবস্থা শোচনীয় হতে বাধ্য। গ্রামভিত্তিতে সমিতির কর্জ্জ গ্রহণ ও কর্জ্জদাদনের সুদের হারের পার্থক্য অন্ততঃ শতকরা পাঁচ টাকা না হ'লে, এদের অদূর ভবিষ্যতে আর্থিক সাচ্ছল্য আনয়ন করা এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়ে, বিশেষ করে যেখানে বেতনভোগী কর্ম্মচারী রাখতে হয় এবং তা রাখার প্রয়োজনীয়তা সবাই মেনে নিচ্ছেন।

বৃহদাকার ঋণদান সমিতির বিপক্ষে যুক্তিসমূহ:

১। খুব বড় সমিতি হওয়ার ফলে, সমিতির সমবায় প্রকৃতি পুরোপুরি বজায় রাখা অসম্ভব। বিরাট এলাকায় বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সভ্যগণ একে অন্যকে জানতে পারে না; কাজেই পারস্পরিক জানা-শোনা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

২। বৃহদাকার ঋণদান সমিতির পরিকল্পনা কার্য্যক্ষেত্রে রূপদানের পক্ষে কতকগুলো বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যেমন—

(ক) সরকার সময়মত অংশগত মূলধন সমিতি হতে না লওয়ায় অনেক সমিতির পক্ষেই আর্থিক স্বাচ্ছল্য লাভ করা সম্ভবপর হয় নি। কেননা, সভ্যদের কর্জ্জদাদনের জন্য তাদের ধার করা টাকার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়েছে। আবার অন্ততঃ এক লক্ষ টাকার মত টাকা ধার করে তা সভ্যদের মধ্যে খাটানো অনেক সমিতির পক্ষেই প্রথম কয়েক বছরে সম্ভব হয় নি। কারণ টাকা অনাদায়ী হওয়ার সম্ভাবনা অনেক ক্ষেত্রে বেশী হয়ে দাঁড়ায়।

(খ) প্রয়োজনীয় কর্জ্জদাদন করতে না পারায়, লাভের অঙ্ক কমে যায় এবং এরকম হওয়ার জন্য বেতনভোগী ম্যানেজার রাখাও অনেক সমিতির পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর যারা বেতনভোগী কর্ম্মচারী বা ম্যানেজার রেখেছিল, মূলধন ভাঙ্গিয়েই তাদের বেতন দিতে হয়েছে। এ সব কারণে স্বভাবতঃই সমিতি লোকসান ভিন্ন লাভে চালান সম্ভব হয়নি।

(গ) অনেক সমিতির গুদাম তৈরী হয়ে গেছে, কিন্তু বিপণন সমিতি গড়ে ওঠেনি। গুদামের সদ্ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে হচ্ছে না। বরঞ্চ গুদামখাতে সরকারী ঋণ ও তার সুদ গুনতে হচ্ছে।

(ঘ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বৃহদাকার সমিতিগুলির এলাকা এমন বড় হয়েছে, যা'তে একজন নতুন ম্যানেজারের পক্ষে বিভিন্ন দিকের তাল বজায় রাখা সম্ভবপর হয়নি।

সেবা সমিতি

১৯৫৮ সালের শেষের দিকে ভারতের জাতীয় উন্নয়ন সংস্থা (National Development Council) স্থির করেন যে, ভবিষ্যতে আর কোন বৃহদাকার সমিতি গঠন করা হবে না; বরঞ্চ তার পরিবর্ত্তে ছোট ছোট সমিতি গঠন করতে হবে। ভারত সরকার কর্ত্তৃক উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে ১৯৫৯-৬০ সালের সুরু থেকে বৃহদাকার ঋণদান সমিতি সংগঠন বন্ধ হয়ে যায় এবং তার স্থলে 'সেবা সমিতি' গ্রাম পঞ্চায়েৎএর এলাকার ভিত্তিতে গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৬০-৬১ সালে মোট ২৮,৪৪০টি সেবা সমিতি সংগঠন করা হবে, স্থির হয়।

সেবা সমিতি কি?—সেবা সমিতি এমন এক সমিতি যা গ্রামাঞ্চলে সভ্যদের কর্জ্জ গ্রহণের প্রয়োজন মেটাবে এবং কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

ঋণদাদন—সাধারণতঃ স্বল্পমেয়াদী ও মধ্য মেয়াদী ঋণদানের ব্যবস্থা থাকে সেবা সমিতিতে।

স্বল্প মেয়াদী ঋণ—উৎপাদনজনিত ব্যয়ের পরিমাণ ও পরিশোধের ক্ষমতার ভিত্তিতে সর্ব্বপ্রকার কৃষক যেমন, প্রান্তিক (Marginal), ও উপ-প্রান্তিক (Sub-marginal) ও ভূমিহীন চাষীকে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাক্‌বে সেবা সমিতিতে। মেহেতা কমিটি (১৯৬০) সুপারিশ করেন যে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ঋণ ব্যক্তিগত জামিনে দেওয়া যেতে পারবে। জমিবন্ধকের স্থলে 'উৎপাদন-পরিকল্পনা' ঋণদানের ব্যাপারে প্রধান স্থান লাভ করবে। কৃষির উৎপাদন যদি বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে শুধু ঋণ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকেই ঋণ দিলে চল্‌বে না, ঋণদাদনের উদ্দেশ্যের ওপরও নজর রাখতে হবে। ঋণ-দাদনের অন্যতম শর্ত্ত থাক্‌বে, ঋণী-সভ্যকে তার উদ্বৃত্ত ফসল নিকটবর্ত্তী কোন বিপণন সমিতির মাধ্যমে বিক্রী করতে হবে। তবে কাজের সুবিধার জন্য, উৎপন্ন শস্য সংগ্রহ ব্যাপারে সেবা সমিতি বিপণন সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবে। এই ব্যবস্থায় স্বভাবতঃই ধার আদায় করার কাজ সহজ হবে। তাছাড়া ঋণ ও বিপণনের এই নিবিড় যোগাযোগ ধারের জামিন স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

স্বল্প মেয়াদী ঋণের জন্য সেবা-সমিতি সাধারণতঃ জমি-বন্ধক নিয়ে ধার দেবার প্রথার আশ্রয় নেবে না। যে শস্য উৎপন্ন হবে তার জামিন এবং ব্যক্তিগত জামিনেই ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। ঋণদান ব্যাপারে মধ্য ও ছোট ছোট জোতদারদের দাবীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ভূমিহীন চাষীকেও ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ঋণের পরিমাণ যতটা সম্ভব সন্তোষজনক হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে চাষী সভ্যদের আর মহাজনদের কাছে হাত পাত্‌তে না হয়। সময় মত ঋণ দিতে হবে, নতুবা ঋণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে। যতটা সম্ভব বীজ, সার ইত্যাদিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাক্‌বে। নগদ-টাকায় ঋণ সাধারণতঃ কিস্তিবন্দীতে দেওয়ার ব্যবস্থা থাক্‌বে।

মধ্য-মেয়াদী ঋণ—গবাদি পশু ক্রয়, কূপ খনন, সেচ-ব্যবস্থার যন্ত্রপাতি বসান বা অনুরূপ উদ্দেশ্যে মধ্য-মেয়াদী ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাও থাক্‌বে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটির সভ্য ও সাধারণ সভ্যগণ লক্ষ্য রাখবেন যে যে উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হয়েছে, সে উদ্দেশ্যেই তার ব্যবহার হচ্ছে কিনা। যদি সেই উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অন্য উদ্দেশ্যে ঋণ ব্যবহৃত হয়, তা হলে অবিলম্বে

ঋণ ফেরৎ চাইতে হ'বে। আবার স্বল্প মেয়াদী ঋণকে যাতে মধ্য মেয়াদী ঋণ হিসাবে ব্যবহার করা না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর যাতে সমস্ত ঋণ আদায় হয়, সেদিকেও কার্য্যনির্বাহক কমিটির নজর দিতে হবে।

অন্যান্য কাজ : সভ্যদের বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের ভারও নিতে হবে সেবা সমিতিকে। যেহেতু সমিতি একসঙ্গে অনেক পরিমাণ মাল কিনবে, সেহেতু সভ্যদের অপেক্ষাকৃত কমদামে সেই মাল সরবরাহ করতে সমর্থ হবে। সভ্যগণ নগদ টাকায় এই সমস্ত জিনিষ ক্রয় করতে না পারলে, ধারে বিক্রী করার ব্যবস্থা করতে হবে।

কেরোসিন তেল, দেশলাই, চিনি প্রভৃতি সভ্যদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগে এমন জিনিষগুলির সরবরাহও সেবা-সমিতিকে করতে হবে। সাধারণ ভাবে এই সব জিনিষ সভ্যদের চাহিদানুযায়ী সমিতি একসঙ্গে বহুল পরিমাণ ক্রয় করবে কারণ তাতে দামের সুবিধা ও নানারকম সুবিধা হবে।

বিপণন সমিতির মাধ্যমে সভ্যদের উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রীর ব্যবস্থাও থাকবে সেবা সমিতিতে। নিকটবর্ত্তী কোনও বিপণন সমিতির সভ্য হয়ে সভ্যদের উৎপন্ন শস্য সংগ্রহ করার ভার নিতে হবে। বিপণন সমিতির পক্ষে সেবা সমিতির কার্য্য নির্বাহক কমিটির কোন সভ্য 'বিপণন পঞ্চায়েৎদার' হিসাবে কাজ করতে পারেন। জমা শস্য বিক্রয় করার পর যাতে সেবা সমিতির পুরোপুরি ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। আদর্শ সেবা সমিতি সভ্যদের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করবে।

কোন সুদক্ষ কৃষকের মাধ্যমে সেবা সমিতি উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা করবে। এ ধরণের কৃষকদের মাধ্যমে গোময় সার প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যবস্থাও করবে সমিতি। উৎপাদিত সমস্ত বীজ সেবা সমিতি কিনে নেবে ও ঋণ হিসাবে সভ্যদের মধ্যে বণ্টন করবে। এ ধরনের বিভিন্নপ্রকারের উৎকৃষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা সভ্যগণের মাধ্যমে কার্যকরী করার চেষ্টা করবে।

বিভিন্ন উৎসবাদিতে সভ্যগণ যাতে খরচ-খরচা কমায় তার জন্যও সেবা সমিতি চেষ্টা করবে। সমিতির সভ্যদের মিতব্যায়িতার অভ্যাস বাড়িয়ে তুলবে। সচ্ছল সভ্যগণ যাতে তাদের টাকা আমানত রাখে বা উদ্বৃত্ত অর্থ সমিতিতে জমা রাখে তার জন্য চেষ্টা করতে হবে। সভ্য নয় এমন লোকদের কাছ থেকেও আমানত সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। কার্য্যকরী তহবিলে নিজস্ব তহবিল ও

আমানতের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়াতে হবে, যাতে সেবা সমিতি তাড়াতাড়ি স্বাবলম্বী হতে পারে। আদর্শ সেবা সমিতি তাকেই বলা হ'বে যে কার্য্যকরী তহবিলের বহুলাংশ নিজস্ব তহবিল দ্বারা ভরাবার দিকে নজর রাখবে।

সেবা-সমিতির কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ—

১। এলাকাভুক্ত সকল গ্রামবাসীই সমিতির সভ্য হতে পারবে। গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ ভিত্তিতে এই সমিতি সংগঠন করা হবে। প্রয়োজন ক্ষেত্রে, আর্থিক সাচ্ছল্য-লাভ করতে পারার দিক্ বিবেচনা করে সেবা-সমিতির এলাকা কয়েকটি গ্রাম নিয়েও হতে পারবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে খুব কম সংখ্যক গ্রাম নিয়ে সমিতি গঠন করা যায়। আর্থিক সাচ্ছল্য লাভের দিকও মনে রাখতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমবায় প্রকৃতি যাতে বজায় থাকে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। যে এলাকার লোকসংখ্যা ৩০০০ সেই রকম এলাকা নিয়ে সেবা সমিতি গঠিত হতে পারবে। তবে এলাকাভুক্ত গ্রাম সমূহের দূরত্ব যাতে প্রধান কার্য্যালয় হতে ৩।৪ মাইলের বেশী না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। আর্থিক দিক হতে সচ্ছল সেবা সমিতি দীর্ঘকাল ধরে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার ওপর নির্ভর না করে স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করবে।

২। প্রান্তিক; উপ-প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকও সমিতির সভ্য হতে পারবে। গ্রামে কর্মকার বা কুম্ভকার প্রভৃতি শ্রেণীর পক্ষে যদি আলাদা সমিতি গঠন সম্ভবপর না হয়; তা হলে সেবা সমিতিতে তাদেরও সভ্য করে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। গরুর গাড়ী চালিয়ে বা গরু পুষে যারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, এদেরও সভ্য করে নিতে হবে। তা ছাড়া গ্রামে তাঁতী বা অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত কারিগররা যদি আলাদা শিল্প সমিতি গঠন করতে সমর্থ না হয়, তাহলে এদেরও সভ্য করে নিতে হবে। গ্রামের অন্ততঃ শতকরা ৪০টি পরিবার নিয়ে সেবা সমিতি কাজ সুরু করবে। তবেই সেই সেবা সমিতিকে আদর্শ সেবা সমিতি বলতে পারা যাবে, যে কাজ সুরু হবার তিন বছরের মধ্যে গ্রামের শতকরা ৮০টি পরিবারকে তার আওতায় আনতে পারবে।

৩। সাধারণতঃ সমিতির সভ্যপদের জন্য ভর্ত্তি ফি '৫০ নয়া পয়সা আর শেয়ার মূল্য ১০৲ টাকা হবে।

৪। সাধারণতঃ সমিতি সসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট থাকবে। কিন্তু যদি সভ্যগণ চান, তবে সমিতি অসীম-দায়িত্ব বিশিষ্টও হতে পারে।

কেমন করে সেবা সমিতি গঠন করা যাবে—

(১) বর্ত্তমান কৃষি ঋণদান সমিতি ও সর্ব্বার্থসাধক সমিতিকে সেবা সমিতিতে পরিণত করা যেতে পারে। উপবিধি সংশোধন করে বা সেবা সমিতিতে উপবিধি গ্রহণ করে সেবা সমিতি গঠন করা যেতে পারে।

(২) একই উপায়ে বর্ত্তমান ছোট ছোট কৃষি-বিপণণ সমিতিগুলিকে সেবা সমিতিতে পরিণত করা যেতে পারে।

(৩) বৃহদাকার ঋণদান সমিতির এলাকাকে কতকগুলি বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করে সেখানে সেবা সমিতি সংগঠন করা চল্‌তে পারে।

(৪) ছোট ছোট অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলিকে একীভূত করে সেবা সমিতি গঠন করা যেতে পারে।

(৫) যেখানে উপরিউক্ত সমিতি নেই, সেখানে নূতন করে সেবা সমিতি গঠন করতে কোন অসুবিধা নেই।

সেবা সমিতিতে সরকারী অংশীদারী—প্রাথমিক ঋণদান সমিতির মধ্যে সর্বপ্রথম বৃহদাকার ঋণদান সমিতিতে সরকারের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু পরিশেষে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের শেষে বৃহদাকার সমিতি সংগঠন বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হবার পর সরকারী অংশীদারীও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মেহেতা কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকার স্থির করেন যে সমস্ত প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতিতে সরকারী অংশীদারীর পুনঃ প্রবর্ত্তন করা হবে। সাধারণতঃ আধাআধি ভাবে ৫০০০৲ টাকা অবধি শেয়ার সরকার নেবেন; কিন্তু স্থল বিশেষে যেমন, বড় সমিতির ক্ষেত্রে এবং অনুন্নত অঞ্চলে অবস্থিত সমিতি ও সেচ অঞ্চলে অবস্থিত সমিতি (যেখানে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে বলে অধিকতর ঋণদান প্রয়োজন) তাদের ক্ষেত্রে ১০,০০০৲ টাকা অবধি শেয়ার সরকার নিতে পারবেন। তবে এই সরকারী অংশীদারীর একটা সর্ত্ত হচ্ছে, সমিতির শতকরা ৬০ জন সভ্য এই অংশীদারীতে রাজী হওয়া চাই ও তাতে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সমর্থন প্রয়োজন। সরকার শেয়ারের অংশীদার থাকায় সরকার ঐ সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিতে সভ্য মনোনয়ন করতে পারেন। কিন্তু সরকার তা না করে সভ্য মনোনয়নের সে অধিকার ঐ এলাকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দিয়ে দেবেন।

অন্যান্য সরকারী সাহায্য :—

(১) যেহেতো কমিটির সুপারিশক্রমে সরকার স্থির করেছেন যে গ্রামাঞ্চলে অসচ্ছল চাষী সম্প্রদায়কে ঋণ দেওয়ার জন্য পূর্ব বছরের ঋণের পরিমাণের যেটুকুন বেশী ঋণ বর্ত্তমান বছরে দেওয়া হবে, তার শতকরা ৩৲ টাকা সরকার এককালীন দান হিসাবে দিয়ে দেবেন। এই ধরনের সরকারী সাহায্য ১৯৬২-৬৩ সাল থেকে সুরু হবে। অবস্থার পর্য্যালোচনা করে উক্ত সাহায্যের মেয়াদ স্থিরীকৃত হবে। তবে অলঙ্কার প্রভৃতির জামিনে সমিতি যে পরিমাণ ঋণ দেবে, তার জন্য এই সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে না। সরকার প্রদত্ত উক্ত এককালীন দান 'বিশেষ অনাদায়ী ঋণ সংরক্ষণ তহবিল' (Special Bad Debt Reserve) খাতে রাখতে হবে এবং নিয়ামকের অনুমোদন ক্রমে তা ব্যবসায়ে খাটানো চল্‌বে। সমিতির যদি লোকসান হয় তাহলে সেই লোকসানের সবটুকু এই তহবিল থেকে পূরণ করা যাবে। শুধু 'ক' 'খ' ও 'গ' শ্রেণীভুক্ত সমিতিই উক্ত সরকারী সাহায্য পাওয়ার যোগ্য হবে।

(২) ম্যানেজারের মাহিনা বা অনুরূপ পরিচালনার খরচের জন্য সরকার মোট ৯০০৲ টাকা তিন হতে পাঁচ বৎসরের ভিত্তিতে দান করবেন। তবে যে সব সেবা সমিতি বিভিন্ন কাজ করছে যেমন, ঋণ সরবরাহ, উৎপাদন উদ্দেশ্যে সার, বীজ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ, সভ্যদের উদ্বৃত্ত শস্য বিপণনের ব্যবস্থা ইত্যাদি তারাই একমাত্র উক্ত সরকারী সাহায্য পাবে।

সেবা সমিতি পরিচালনা—

সমিতির সাধারণ সভা নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হতে হবে এবং উক্ত সভায় প্রচুর সভ্য সমাবেশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির নিয়মিত ভাবে সভাও হওয়া উচিত। সাধারণ সভায় সভ্যদের সমবায় নীতি ও পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা উচিত। সমবায় ইউনিয়ন যে সমবায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবে তার পূর্ণ সুযোগ নিতে হবে সমিতির সভ্যদের। সমিতি রাজনীতি থেকে দূরে থাক্‌বে। সমিতি নিজস্ব ক্ষমতা অনুসারে সমিতিতে পূর্ণ সময় বা আংশিক সময়ের জন্য সম্পাদক মাহিনা দিয়ে রাখার ব্যবস্থা করবে। সমিতির খাতা-পত্র ঠিক ভাবে রাখতে হবে। ঋণের পরিশোধ ব্যাপারে কোনরূপ খেলাপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য দৈব-দুর্বিপাকের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের কড়াকড়ি থাকবে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক

প্রাথমিক সমিতিকে কেন্দ্র করেই ভারতে সমবায় আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই সমিতিগুলি নিজস্ব মূলধন ও সরকারী ঋণ দিয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। তাই ১৯০৪ সালের আইনে কেন্দ্রীয় সমিতি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৯১২ সালের আইনেই প্রথম কেন্দ্রীয় সমিতি রেজেষ্ট্রী করার সুযোগ ঘটে। কৃষি-ঋণের ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক হচ্ছে প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি বা ব্যাঙ্কগুলির ঊর্দ্ধতন বা কেন্দ্রীয় সংঘ; তাছাড়া অন্যান্য প্রাথমিক সমিতির কেন্দ্রীয় সংস্থা বল্‌তেও এই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ককেই বুঝায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস :

গঠনকাল (১৯০৬-১৯২০)—

১৯০৬ সালে উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বান্দা জেলার বরগড় গ্রামে প্রথম একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। একে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আখ্যা না দিয়ে বরং প্রাথমিক সমিতি বল্‌লেই ভাল হয়। ১২।১৩টি শাখা-অফিসের মাধ্যমে এই সমিতি সভ্যদের ঋণ সরবরাহ করত। প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বল্‌তে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার শিহোরা নামক স্থানের ব্যাঙ্ককেই বুঝায়। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক সমিতিগুলিকে ঋণদান করা। অবশ্য পরে এই সব প্রাথমিক সমিতির স্থাপনা ও পরিচালনা ইত্যাদি কাজের ভার ব্যাঙ্কটি নেয়।

ঐ সময়ে যে সমস্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে, তাদের প্রধান কার্য্যসূচী সীমাবদ্ধ থাকে নিজেদের ও সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতিগুলির পরিচালনা ও অন্যান্য কার্য্যধারা নির্দ্ধারণে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কি কার্য্যসূচী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যের সমবায় নিয়ামক বিভিন্ন মন্তব্য করেন। শেষে 'ম্যাক্‌লাগান্‌ কমিটি'ও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন, যেমন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা, কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিতে প্রাথমিক সমিতির প্রাধান্য, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা বজায় রাখার জন্য এই কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সভ্যের বিদায় গ্রহণের ব্যবস্থা ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তদানীন্তন মাদ্রাজের নিয়ামক নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :

ভারতের পল্লী অঞ্চলে মহাজনের নাগপাশ হতে রেহাই পেতে হলে প্রচুর ধনসম্ভারে পূর্ণ কেন্দ্রীয় ঋণদান সমিতি বা ব্যাঙ্কের প্রয়োজন। এই ব্যাঙ্কগুলি যদি স্থানীয় লোকদের সঞ্চয়কে নিজের আমানতের মাধ্যমে টেনে নিতে পারে এবং হিসাবপত্র রাখার সুব্যবস্থা করতে পারে ও সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করতে পারে তা'হলে এইরূপ বৃহৎ কেন্দ্রীয় ঋণদান সংস্থা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতিগুলির সুপরিচালন ব্যবস্থার যথেষ্ট সহায়তা ও উন্নতি বিধান করতে পারবে।

সম্প্রসারণকাল (১৯২০-১৯২৯)—

এ সময়ের নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয়:—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সম্প্রসারণ; তাদের কার্য্যকরী মূলধন যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যাওয়া; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের আর্থিক অবস্থার অসাচ্ছল্য যেহেতু অনাদায়ী ঋণের (Bad Debt) ঘাটতি পূরণের জন্য তাদের কোন তহবিল ছিল না; তাদের লাভের অঙ্কের মোটা অংশ অনাদায়ী সুদে আটকা পড়ে ছিল। উপরন্তু অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছিল।

অবনতি কাল (১৯২৯-১৯৩৭)—

পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার (Depression Period) প্রতিক্রিয়া ভারতের কৃষিক্ষেত্রে তীব্র আকার ধারণ করে। কৃষিজাত দ্রব্য মূল্যের মান ১৩৯ (১৯২৯) হতে ১৯৩৩ সালে ৬৪ তে নেমে আসে। স্বভাবতঃই চাষীদের তথা প্রাথমিক সমিতিগুলির ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা কমে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক বুনিয়াদ দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। ফলে এই ব্যাঙ্কগুলি তাদের ঋণ সরবরাহের ব্যাপারে সতর্ক হয়। আশানুরূপ জামিন ছাড়া ঋণদান প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। অবশ্য একদিকে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৫৮৩ হতে বেড়ে ৬১১তে দাঁড়ায়, কিন্তু অন্যদিকে, সভ্যসংখ্যা এক লাখ থেকে নেমে আসে ৮৯,০০০ এ।

প্রাক্ যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালীন অবস্থা (১৯৩৭-৪৬)—

১৯৩৭ সাল হতে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে সুরু করে। এই ব্যাঙ্কের মতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের মত কাজ চালাতে হবে। জনসাধারণের এবং প্রাথমিক সমিতিগুলির

আমানতের নিরাপত্তার দিকে আর সেগুলি সুষ্ঠুভাবে খাটানোর দিকে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত আমানতের কত পরিমাণ টাকা fluid cover বা সহজলভ্য তহবিল হিসাবে রাখা উচিত সে সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলে যে প্রত্যেক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ককে স্থায়ী আমানতের শতকরা ২৫ ভাগ, সেভিংস্ আমানতের শতকরা ৩০ ভাগ ও চল্‌তি আমানতের শতকরা ৩৫ ভাগ মজুত তহবিল হিসাবে রাখতে হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আরও বলে যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যেন দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ না দেয়। কারণ তাদের মূলধনের অধিকাংশই হচ্ছে স্বল্প-মেয়াদী বা মধ্যম মেয়াদী আমানত। উপরন্তু তারা বলে যে আমানতের ওপর দেয় সুদের হার প্রাথমিক সমিতিকে ধার দেওয়া টাকার সুদের হারের চেয়ে যথেষ্ট কম থাকা উচিত।

স্বাধীনতা-উত্তর কাল (১৯৪৭ সাল থেকে আজ অবধি)—

এ সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, সর্ব্ব ভারতীয় পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটি নিয়োগ ও ১৯৫৪ সালের শেষে ঐ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্পর্কে কমিটি মন্তব্য করে যে, ভারতের অধিকাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কএর আর্থিক বুনিয়াদ দুর্ব্বল। আদায়ীকৃত অংশগত মূলধনের পরিমাণ অনেক ব্যাঙ্কেই এত কম যে শীর্ষ-ব্যাঙ্ক থেকে প্রয়োজন অনুপাতে ঋণ পাওয়া সম্ভব হয় না কারণ অংশগত মূলধনের দশগুণের বেশী টাকা শীর্ষ-ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ ধার দেয় না। সেজন্য প্রাথমিক সমিতিগুলিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাদের প্রয়োজনানুযায়ী টাকা ধার দিতে পারে না। এই সবের একমাত্র কারণ হচ্ছে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি খুব ছোট। সমীক্ষা কমিটি তাই বলেছে যে ছোট ছোট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে জেলার ভিত্তিতে এক একটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেক মহকুমায় পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটা করে শাখা ব্যাঙ্ক থাকবে। প্রত্যেক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্ততঃ বিশ থেকে পঁচিশ লাখ টাকা কার্য্যকরী মূলধন থাকা উচিত এবং আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ড যোগ করে যে টাকা হবে তার পরিমান অন্ততঃ তিন লাখ টাকা হওয়া উচিত। প্রত্যেক রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের শেয়ারের শতকরা অন্ততঃ ৫১ ভাগ কিনে নেবে। ঋণ সরবরাহ ব্যতিরেকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্য কোন ব্যবসায় করতে পারবে না।

কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্কের শ্রেণীবিভাগ :—

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা, মিশ্র ব্যাঙ্ক (mixed) ও অবিমিশ্র (pure) ব্যাঙ্ক। মিশ্রব্যাঙ্কে প্রাথমিক সমিতি ও ব্যক্তি উভয়েই সভ্য হতে পারে। কিন্তু অবিমিশ্র ব্যাঙ্কে একমাত্র প্রাথমিক সমিতিই সভ্য হতে পারে। অবিমিশ্র ব্যাঙ্কে সমবায়ের মূলনীতি প্রয়োগ সম্ভবপর হয়, কারণ প্রাথমিক সমিতি তার একমাত্র সভ্য হওয়ায় ঐ রকম সমিতির সুযোগ সুবিধার দিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যথেষ্ট নজর দিতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে একটি বড় অসুবিধাও আছে। প্রাথমিক সমিতির ভেতর হতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চালানোর মত উপযুক্ত লোকের অভাব দেখা যায়। তাই উপযুক্ত লোকের অভাবে অবিমিশ্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া অবিমিশ্র ব্যাঙ্কগুলি মিশ্র ব্যাঙ্কের মত স্থানীয় লোকেদের আমানত অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করতে পারে না। অন্যদিকে মিশ্র ব্যাঙ্কের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিতে উপযুক্ত লোকের অভাব হয় না। কারণ ব্যক্তি-সভ্যের প্রতিনিধিরা সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চালানোর মত উপযুক্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়। তার দরুণ সুপরিচালন ব্যবস্থা সম্ভব হয়। তার ওপর এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কে নামজাদা লোকেদের যোগাযোগ থাকায় স্থানীয় আমানত সংগ্রহের ব্যাপারেও তেমন কোন অসুবিধা দেখা দেয় না। কিন্তু এই সুবিধা থাকলেও মিশ্র ব্যাঙ্কের ত্রুটিও আছে। মিশ্র ব্যাঙ্কের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিতে ব্যক্তি-সভ্যের প্রতিনিধিদের প্রাধান্য থাকে এবং স্বভাবতঃই তারা প্রাথমিক সমিতির স্বার্থের দিকে নজর না দিয়ে, কি করে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের মত বেশী লাভ করা যায়, তার দিকেই লক্ষ্য রাখে। কাজেই এ শ্রেণীর ব্যাঙ্কের কার্য্য-কলাপে সমবায়ের মূলনীতির অভাব দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ—

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এক দিকে পল্লী অঞ্চলের সাধারণ কৃষকদের দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও অন্য দিকে শহরাঞ্চলে শহুরে লোকদের দ্বারা পরিচালিত শীর্ষব্যাঙ্ক এর মধ্যে যোগসাধন করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিভিন্ন কাজের ভেতর নিম্নলিখিত কাজগুলি উল্লেখযোগ্য :—

(১) সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতিগুলিকে। বিশেষ করে প্রাথমিক কৃষি

ঋণদান সমিতিকে কর্জ্জদাদন করা। পল্লী ঋণ সমীক্ষা কমিটির মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তার এলাকায় সমস্ত কৃষি ও অকৃষি সমবায় সমিতিদের ঋণদানের ভার নেবে। অবশ্য অকৃষি সমিতিদের ঋণদান ব্যাপারে যথেষ্ট মতদ্বৈত আছে। যেমন বোম্বাই এর সমবায়ীগণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণদানের ক্ষেত্রে শুধু কৃষি সমিতিদের প্রাধান্য দিতে চান। তাঁরা শিল্প সমবায় সমিতিদের জন্য পৃথক শিল্প সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করার পক্ষপাতি।

(২) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একদিকে আর্থিক দিক হতে দুর্ব্বল প্রাথমিক সমিতিদের ঋণদান করে অন্যদিকে সচ্ছল সমিতি সমূহের উদ্বৃত্ত তহবিল আমানত হিসাবে গ্রহন করে। এইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কর্জ্জগ্রহনেচ্ছু ঘাটতি সমিতিদের সঙ্গে সচ্ছল সমিতিদের সংযোগ স্থাপিত হয়।

(৩) স্থানীয় জনসাধারনের মনে আস্থা সৃষ্টি করে এবং তার ফলে যথেষ্ট আমানত সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়।

(৭) সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতিদের কাজকর্ম্ম যাতে ভালভাবে পরিচালিত হয় সেদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারে এবং তাদের সভ্যদের সমবায় বিষয়ে যথাযথ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে পারে।

(৫) প্রাথমিক সমিতিগুলি তাদের রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে নিরাপদে গচ্ছিত রাখতে পারে। এই সব কাজ সুচারুরূপে করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষিত **সুপারভাইজার** নিয়োগ করতে হয়। আবার, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সকল রকমের আমানত গ্রহণ করে; বিল, চেক্, হুণ্ডী, ডিভিডেণ্ট ওয়ারেণ্ট, রেল রসিদ ইত্যাদির টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করে; মূল্যবান জিনিষপত্র নিরাপত্তায় রাখার ব্যবস্থা করে খদ্দেরদের অশেষ উপকার করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও শীর্ষ-ব্যাঙ্কের শাখা-অফিস :

অনেকে মনে করেন যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তুলে দিয়ে তার জায়গায় শীর্ষ ব্যাঙ্কের শাখা-অফিস খুলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সব কাজ করা যায়। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বোম্বাই ও সৌরাষ্ট্রের অনেক জেলাতে শীর্ষ-ব্যাঙ্ক তাদের শাখা-অফিসের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের করণীয় কাজ করে আসছিল। শীর্ষ-ব্যাঙ্কের শাখা দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ চালানোর স্বপক্ষে এই যুক্তি দেখান হয় যে বাজারে শীর্ষব্যাঙ্কের অধিকতর সুনাম থাকায় সে প্রচুর আমানত সংগ্রহ

করতে পারে এবং অধিকতর দক্ষ কর্ম্মচারী নিয়োগ করতে পারে। তাছাড়া কর্জ্জ-দাদন ও তৎ সংশ্লিষ্ট কাজে যথাযথ দৃষ্টি দেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হয়। **রায়ালাশিমা সমবায় কমিটি** (১৯৪৬) ও মন্তব্য করেন যে, প্রাথমিক সমিতি ও শীর্ষ ব্যাঙ্কের মাঝখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থাকাতে প্রাথমিক সমিতির সভ্যদের অনর্থক বেশী সুদ গুণতে হয়। কাজেই যদি শীর্ষ ব্যাঙ্ক সরাসরি বা তার শাখা অফিসের মাধ্যমে কর্জ্জদাদনের ব্যবস্থা করে, তা'হলে প্রাথমিক সমিতির সভ্যদের পক্ষে অনেক কম সুদেই কর্জ্জ পাওয়া সম্ভবপর হয়। আবার 'বোম্বাই প্রাদেশিক সমবায় কমিটি (১৯৩১)' উপরিউক্ত যুক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন সত্য, কিন্তু কেন্দ্রীয় জেলা ব্যাঙ্কগুলিকে শীর্ষব্যাঙ্কের শাখা অফিসে এবং এদের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিকে উপদেষ্টা কমিটিতে পরিণত করার বিপক্ষে মন্তব্য করেন। তাঁদের মতে, এমন উপদেষ্টা কমিটি কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির ন্যায় কাজ করতে সক্ষম হতে পারে না। আবার মোটামুটি কাজ চালানোর ব্যাপারেও শাখা অফিসকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেতনভুক্ কর্ম্মচারীর ওপর নির্ভর করতে হবে। কাজেই শীর্ষব্যাঙ্কের শাখা অফিসকে ব্যাঙ্কিং ইউনিয়নে পরিণত করার ও উপদেষ্টা কমিটির স্থলে স্থানীয় কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গঠনের জন্য কমিটি সুপারিশ করেন। বস্তুত: শীর্ষব্যাঙ্কের যুক্ত রাষ্ট্রীয় (Federal) কাঠামো বজায় রাখতে হলে তার পক্ষে জেলাতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ করা উচিত নয়। প্রথমত: শীর্ষব্যাঙ্ক সরাসরি জেলার প্রাথমিক সমিতিগুলিকে কর্জ্জদাদন করবে না; দ্বিতীয়ত:, আমানত সংগ্রহের ব্যাপারে ও অন্যান্য সাধারণ ব্যাঙ্কের কাজ বাড়ানোর ব্যাপারে স্থানীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে শীর্ষব্যাঙ্কের এমন কোন শাখা অফিস থাকাও উচিত নয়। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এলাকায় মহারাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের যে ছয়টি শাখা অফিস কাজ করছে (১৯৬১), তাদের তুলে নেওয়ার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। শীর্ষব্যাঙ্কের শাখা অফিস কোন জেলা হতে উঠিয়ে নিয়ে সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করলে, আমানত সংগ্রহ ও অন্যান্য ব্যাপারে বিঘ্নের সৃষ্টি হতে পারে বলে অনেকের ধারনা। কিন্তু মহারাষ্ট্রে দেখা গেছে যে, শীর্ষব্যাঙ্কের শাখাঅফিস তুলে নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের ফলে বরঞ্চ আমানত ও অন্যান্য কাজ অনেক বেশী বেড়ে গেছে। তাছাড়া, প্রাথমিক সমিতিদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হলে ও স্থানীয় নেতৃত্ব অধিকতর পরিমানে সৃষ্টি করতে হলে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় নেই। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি আর্থিক দিক্ হতে দুর্ব্বল হয়ে

পড়ে বা তার সুষ্ঠু পরিচালনায় যদি ব্যাঘাত ঘটে, তা হলে তার যথার্থ প্রতিকার শীর্ষব্যাঙ্কের শাখা-অফিস স্থাপনে নয়। কারণ, এতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দুর্ব্বলতা আরও বেড়ে যাবে। তাই ১৯৫২ সালে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটি শীর্ষ ব্যাঙ্কের শাখা অফিসের স্থলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের স্বপক্ষে মন্তব্য করেন এবং আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর এলাকায় এবং যেখানে সমবায় আন্দোলন সুদৃঢ় নয় সেখানে প্রাদেশিক সরকার কর্ত্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত শীর্ষব্যাঙ্কের শাখা অফিস স্থাপনের সুপারিশ করেন। অবশ্য অবস্থার সম্যক্ উন্নতি হবার পর শীর্ষব্যাঙ্কের শাখাঅফিসের স্থলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠন করার কথাও কমিটি বলেন। নিখিল ভারত পল্লী ঋণসমীক্ষা কমিটি এই মন্তব্য বা সুপারিশ পুরোপুরি সমর্থন করেন।

আয়তন বা এলাকা

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এলাকা ভারতের সব জায়গায় সমান ছিল না। পূর্ব্বতন বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এলাকা জেলা ভিত্তিতে ছিল; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও পূর্ব্ব পাঞ্জাবে এলাকা অপেক্ষাকৃত ছোট ছিল, যেমন পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এলাকা কোন একটি মাত্র মহকুমার ভেতর সীমাবদ্ধ ছিল।

ম্যাক্‌লাগান কমিটির মতে, সুষ্ঠু কার্য্য পরিচালনার দিকে লক্ষ্য রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আয়তন যতটা সম্ভব বড় হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রথমতঃ ছোট এলাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাজ সুরু করতে পারে সত্য, কিন্তু প্রচুর মূলধনের ব্যবস্থা না থাক্‌লে আয়ের পরিমাণ কম হবে এবং তার ফলে খরচ খরচার পর কোন উদ্বৃত্ত হওয়া হয়ত সম্ভব হবে না। তাই কমিটি বলেন, কোন নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অন্ততঃ ২০০ থেকে ২৫০টি প্রাথমিক সমিতি নিয়ে কাজ করতে হবে। তবে এলাকা যতটা সম্ভব কোন নির্দ্দিষ্ট জেলাতে সীমাবদ্ধ রাখার সুপারিশ এই কমিটি করেন। ১৯৫২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এলাকা সম্পর্কিত বিষয়টি বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সাধারণতঃ প্রতি জেলায় একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থাকবে এবং এই ব্যাঙ্কের আদায়ী কৃত অংশগত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল এক সঙ্গে যোগ করে অন্ততঃ তিন লাখ টাকা ও কার্য্যকরী মূলধন বিশ থেকে পঁচিশ লাখ টাকা থাকা উচিত। স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটির এই মন্তব্য নিখিল ভারত পল্লী ঋণ সমীক্ষা কমিটি

পুরোপুরি সমর্থন করেন এবং বলেন যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এলাকা কোন্ জেলার এলাকার চেয়েও ছোট হতে পারে যদি তার আর্থিক সাচ্ছল্য বজায় রাখা যায় এবং অন্যান্য কারণে তা দরকার হয়। আর যে সমস্ত ছোট ছোট অসচ্ছল ব্যাঙ্ক জেলার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে, তাদের একত্রিত করে জেলার ভিত্তিতে একটি মাত্র সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করতে হবে। কমিটি আরও সুপারিশ করেন যে এই একত্রীকরণ প্রস্তাবে কোন ছোট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রাজী না হলে, শীর্ষ-ব্যাঙ্ক থেকে তার সভ্যপদের বিলোপ সাধন করা উচিত। উপরন্তু সরকার যে সব সুযোগ-সুবিধা দেন তা আর তাকে দেওয়া উচিত হবে না। একীভূত ও পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অধিকাংশ শেয়ার সরকার কিনে নেবেন বলে যে পরিকল্পনা রয়েছে, তাতে স্বভাবতঃই একত্রীকরণের পথ সুগম হবে।

পল্লী ঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশ সরকার গ্রহণ করেন এবং সেই সুপারিশ অনুযায়ী সারা দেশব্যাপী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পুনর্গঠনের কাজ সুরু হয়েছে।

গঠন প্রণালী—

ভারতে মিশ্র ও অবিমিশ্র এই দু' রকমের কেন্দ্রীয়-ব্যাঙ্ক রয়েছে। মিশ্র ব্যাঙ্কে ব্যক্তি বিশেষ বা প্রাথমিক সমিতি—সবাই সভ্য হতে পারে। উভয় শ্রেণীর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই সভ্যদের কর্জ্জ দেবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করে। কিন্তু ব্যক্তি সভ্যকে একমাত্র বোম্বাই ছাড়া আর অন্য কোন রাজ্যে এ কর্জ্জ দেবার ব্যবস্থা নেই। মিশ্র ব্যাঙ্কের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিতে ব্যক্তি-সভ্যদের ও সমিতি-সভ্যদের, উপবিধিতে স্থিরীকৃত হারে, প্রতিনিধিত্ব করার ব্যবস্থা থাকে।

ম্যাক্লাগান্ কমিটির মতে শুধু মাত্র সমিতি-সভ্যের প্রতিনিধি নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি গঠন করে কাজ চালান যেতে পারে সন্দেহ নেই, তবে সেই রকম কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি ঠিক ব্যাঙ্ক চালাবার উপযোগী হয় না কারণ প্রাথমিক সমিতি হতে উপযুক্ত দক্ষ লোক পাওয়া শক্ত। তাই মিশ্র ব্যাঙ্কই হচ্ছে আদর্শ ব্যাঙ্ক যেখানকার কার্য্য পরিচালনায় ব্যবসায়ী বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক ও সভ্য-সমিতির উপযুক্ত সভ্যদের স্থান থাক্‌বে এবং এক শ্রেণীর সভ্য অন্য শ্রেণীর সভ্যদের সম্পূরক হিসাবে কাজ করবে। তবে সমিতির সভ্যদের চূড়ান্ত অধিকার যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কার্য্যকরী মূলধন—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধন নিম্নলিখিত উৎস হতে সাধারণতঃ সৃষ্ট হয়:—কর্জ্জ, আমানত, অংশগত মূলধন বা শেয়ার ও লাভ থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন তহবিল। সভ্য-সমিতিদের চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে হলে, ও অন্যান্য কাজ সুষ্ঠু ভাবে করতে হলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যথেষ্ট মূলধন থাকা আবশ্যক। তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটি ন্যূনতম শেয়ার ও সংরক্ষিত তহবিলের মোট টাকার পরিমাণ ৩ লাখ ও কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ২০ থেকে ২৫ লাখ টাকার সুপারিশ করেন। পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটিও উক্ত সুপারিশ সমর্থন করেন। শেয়ার ও সংরক্ষিত তহবিলের কয়েক গুণের হারে কর্জ্জ গ্রহণ সীমাবদ্ধ থাকে। সেজন্য শেয়ার ও সংরক্ষিত তহবিলের টাকা যত বেশী পরিমাণ বাড়ে ব্যাঙ্কের ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা ততই বেড়ে যায়।

প্রকৃত পক্ষে অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মহীশূর প্রভৃতি রাষ্ট্র ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি ১৯৫৯-৬০ সাল অবধি স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ মত ন্যূনতম শেয়ার, সংরক্ষিত তহবিল বা কার্য্যকরী মূলধন সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় নি। যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের শেয়ার সংরক্ষিত তহবিল বা আমানতের টাকার পরিমাণ ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৯-৬০ সালের ভেতর ছয় গুণ বেড়ে গেছে, তথাপি কার্য্যকরী মূলধন গঠনে শেয়ার, সংরক্ষিত তহবিল, আমানত ও কর্জ্জের পরস্পর হার পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে শেয়ারের পরিমাণ মোট কার্য্যকরী মূলধনের মাত্র শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ৯ থেকে ৬ ভাগ, আমানতের পরিমাণ ১ থেকে ৪৪ ভাগ আর কর্জ্জের পরিমাণ মোট কার্য্যকরী-মূলধনের শতকরা ৩৭ থেকে ৮৫ ভাগ অবধি দাঁড়ায় অর্থাৎ অধিকাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এখনও বহুলাংশে কর্জ্জের টাকার ওপর নির্ভরশীল।

(ক) শেয়ার ও সংরক্ষিত তহবিল—সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতি সমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের শেয়ার কেনে এবং তা থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অংশগত মূলধন সৃষ্ট হয়। পল্লীঅঞ্চলের বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এইভাবে শেয়ারের বাবদ প্রচুর টাকা সংগ্রহ করা বেশ কষ্ট সাধ্য। সেইজন্যই পল্লী ঋণ সমীক্ষা কমিটি প্রাথমিক ঋণদান সমিতি ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে সরকারী অংশীদারীর সুপারিশ করেন যার পরিমাণ হবে মোট অংশগত মূলধনের ৫১ ভাগ। সমীক্ষা কমিটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংরক্ষিত তহবিল বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে সমবায় বিভাগ ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালক মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেহেতো

কমিটির মতে, সমিতির ঋণের টাকার অন্ততঃ ২০ ভাগ টাকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের শেয়ার কেনা উচিত। দেনী নয় এমন প্রাথমিক সমিতিগুলিরও প্রতি বছর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের শেয়ার প্রয়োজনীয় হারে কেনা উচিত।

(খ) **আমানত ও কর্জ্জগ্রহণ**—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে যতটা সম্ভব অন্য কোথাও থেকে দেনা না করে স্থানীয় আমানত সংগ্রহ করে ও নিজস্ব শেয়ার ও সংরক্ষিত তহবিলের টাকা দিয়ে নিজের কাজ চালান উচিত। এইটাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত নীতি। কিন্তু প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতির সভ্যদের জমিয়ে রাখার মত উদ্‌বৃত্ত আয় নেই। কিন্তু অন্যদিকে অ-কৃষি ঋণদান সমিতিগুলির আমানতের পরিমাণ কম নয়। তারা সেই টাকার লাভজনক বিনিয়োগ চায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আমানতকারীগণ নিজেদের ব্যবসায়ের কাজে প্রয়োজনের সময় ব্যাঙ্ক হতে ধার আশা করে অথবা তাদের গচ্ছিত রাখা টাকার ওপর সুদের হার বেশী করে পাবার আশা করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের মত আমানত কারীদের ধার দেওয়াও যেমন নীতি বিরুদ্ধ আবার তাদের পক্ষে বেশী হারে আমানতের ওপর সুদ দেওয়াও মুস্কিল। কারণ ৪ হতে ৪½ টাকার শতকরা হারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে প্রাথমিক সমিতিদের কর্জ্জদাদন করতে হয়। এই সুদের হার এমনই হওয়া উচিত যাতে প্রাথমিক সমিতির সভ্য শতকরা ৬¼ টাকার হারে ধার পেতে পারে। একদিকে আমানত কারীকে বেশী সুদ দিলে কর্জ্জের সুদ বেড়ে যায় অন্যদিকে বাৎসরিক চাষাবাদের জন্য শতকরা ৬¼ হারের বেশী সুদে টাকা ধার দেওয়াও চলে না। তবে বেশী সুদে আমানত গ্রহণ করে বেশী সুদে তা ধার দেওয়ার নীতিই বেশী সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয়।

অধিকতর পরিমাণে আমানত সংগ্রহ ব্যাপারে মেহেতা কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন :

(ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে সরকারী অংশীদারী বেশ কিছু দিন চালিয়ে যেতে হবে, যাতে করে জনসাধারণের মনে আস্থা সৃষ্টি করার ফলে প্রচুর আমানত সংগ্রহ সম্ভব হয় ;

(খ) আমানতের ওপর অন্যান্য ব্যাঙ্কের ন্যায় সমহারে সুদ দিতে হবে ;

(গ) স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে তাদের তহবিল আমানত রাখার প্রয়োজনীয় অনুমতি দিতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তরফ থেকেও তাদের তহবিল আমানত রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে ;

(ঘ) যেখানে প্রয়োজন সেখানে সরকারকে আমানতের সুদ ও আসল ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে হবে;

(ঙ) স্থানীয় জনসাধারণের উপকারার্থে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কাজ করবে;

(চ) অধিকতর আমানত সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রয়োজনীয় শাখা অফিস খুল্‌বে;

(ছ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিতে বে-সরকারী ব্যক্তিদের সভ্যপদ থাকবে ও বিশেষ করে ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান অবশ্যই বে-সরকারী ব্যক্তি থাকবেন;

(জ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও জাতীয় সঞ্চয় সংস্থার মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ থাকবে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সমবায় ব্যাঙ্কের আমানত সংগ্রহ ব্যাপারে, আর একটা জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সেটা হচ্ছে ভারতের আমানত বীমা পরিকল্পনা (Deposit Insurance Scheme)। উক্ত পরিকল্পনা ১লা জানুয়ারী ১৯৬২ হ'তে চালু হয়েছে। প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের ১,৫০০৲ টাকা অবধি আমানতের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন 'আমানত-বীমা কর্পোরেশন'। উক্ত পরিকল্পনার আওতা হতে সমবায় ব্যাঙ্কদের বাদ দেওয়াতে আমানত সংগ্রহ ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হবে। এরকম অবস্থায় যেহেতো কমিটির প্রস্তাবানুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আমানত সম্পর্কে সরকারী গ্যারান্টি অত্যাবশ্যক। মাদ্রাজের কেন্দ্রীয় গৃহ-বন্ধকী ব্যাঙ্কের আমানত ব্যাপারে অনুরূপ সরকারী গ্যারান্টির ব্যবস্থা রয়েছে এবং সুখের বিষয়, ২০শে আগষ্ট, ১৯৬১ তারিখে যে সমবায় বিল মাদ্রাজের আইন সভায় পাশ হয়েছে, তাতে সমবায় ব্যাঙ্কের আমানত ব্যাপারে সরকারী গ্যারান্টির ব্যবস্থা রয়েছে।

এইত গেল আমানতের কথা। তারপর কর্জ্জ গ্রহণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে পরোক্ষভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওপর নির্ভর করতে হয়। স্বল্প-মেয়াদী কৃষি-ঋণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাধারণ তহবিল হতে ও মধ্য-মেয়াদী কৃষি-ঋণ ঐ ব্যাঙ্কে সৃষ্ট "জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘ-মেয়াদী কারবার) তহবিল" হতে পাওয়া যাচ্ছে। কৃষি-ঋণের জন্যও আবাহমান কাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওপর নির্ভর করলে চল্‌বে না। তাছাড়া সারা দেশের প্রয়োজনীয় কৃষি-

ঋণের চাহিদা পুরোপুরি মেটান রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে যে সম্ভব নয় তা কিছুদিন আগে মাদ্রাজের এক সভায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর-এর বক্তৃতায় প্রতীয়মান হয়েছে। ইনি বলেছেন, সমবায় সমিতিগুলিকে তাদের নিজস্ব সম্পদ বাড়িয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে; কেননা, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি-ঋণ দাদনের যতই অধিকতর ব্যবস্থা থাক্ না কেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তা মেটানোর একটা সীমা আছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ২০০ কোটি টাকার বেশী ঋণ ব্যবস্থা করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

নিম্নলিখিত তালিকা হতে ১৯৫৫-৫৬, ১৯৫৬-৫৭, ও ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যকলাপ সম্পর্কে মোটামুটি আভাশ পাওয়া যায়:

[অঙ্ক—এক লক্ষ হিসাবে]

	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংখ্যা—	৪৭৮	৪৫১	৪১৮
সভ্যসংখ্যা (হাজার হিসাবে)			
ব্যক্তি বিশেষ—	১৪৪	১৪৭	১৪৭
সমিতি—	১৫৬	১৬৪	১৭৬
কার্য্যকরী মূলধন—	৯২,৬৭	১১০,২৬	১৪৭,০০
নিজস্ব তহবিল—	১৫,১৫	১৮,৪৫	২৪,৯৯
আমানত—	৫৫,৭১	৫৮,৪৮	৬৬,৮৮
অন্যান্য ঋণ (শীর্ষ ব্যাঙ্ক, সরকার ও যৌথ ব্যাঙ্ক হতে)—	২১,৮০	৩৩,৩৩	৫৫,১৩
দাদন—	৭৯,৮৪	১০০,৮০	১৫৯,৮৭
বকেয়া (outstanding)—	৫৪,৩৪	৭১,৯০	১০০,৯৬
আদায়—	৬৮,১৯	৬৫,৩৩	১৩২,৬০
পূর্ব্ব বাকী (over due)—	৭,৮৮	৯,৩৪	১১,৮৮
পূর্ব্ব বাকী বকেয়ার শতকরা—	১৪'৫৫	১৩	১১'৮

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক

প্রয়োজনীয়তা—জমি জামিন রেখে যে ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেয়, তাকে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক বলা হয়। মরগেজ হচ্ছে ঋণ পরিশোধের জন্য জমি বন্ধক দেওয়ার পদ্ধতি। কৃষকদের কৃষি-কার্য্যের খরচার জন্য স্বল্প-মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করতে হয়; আবার জমির উন্নতির জন্য দামী কৃষি-যন্ত্রপাতি কেনার জন্য বা পূর্ব্ব-ঋণ পরিশোধ করার জন্য এদের দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের প্রয়োজন হয়। অধিকাংশ দেশে এ ধরনের ঋণ যোগায় মহাজন বা সরকারী দপ্তর। কিন্তু দেখা গেছে, মহাজন বা সরকার—কেউ এ ধরনের ঋণ সরবরাহ করার পক্ষে উপযুক্ত নয়। এজন্য কোনও এক বিশেষ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান আবশ্যক এবং সেটা হচ্ছে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক। উৎপাদন ও অনুৎপাদন সম্পর্কিত উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দেওয়া হয়। উৎপাদন-সম্পর্কিত উদ্দেশ্যের ভিতর, জমির উন্নতি, জমি-কেনা, কূপ খনন, পুকুর কাটানো, দামী কৃষি-যন্ত্রপাতি কেনা, ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। আবার অনুৎপাদন সম্পর্কিত উদ্দেশ্যের ভিতর, পূর্ব-ঋণ শোধ, বিবাহ ইত্যাদি উৎসবের ব্যয়-বহন উল্লেখযোগ্য। উন্নত দেশ সমূহে এই জমি-বন্ধকী ঋণ উৎপাদন-সম্পর্কিত উদ্দেশ্যেই নেওয়া হয়। কিন্তু ভারতে কিছুদিন আগেও এই দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের অধিকাংশই অনুৎপাদন সম্পর্কিত উদ্দেশ্যে নেওয়া হত বলে ১৯২৮ সালে রাজকীয় কৃষি কমিশন (Royal Commission on Agriculture) মন্তব্য করেন।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে প্রথম জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয়। এই ব্যাঙ্কের কাজ অনেকটা সমবায় নীতিতে ও সরকারী তদারকে চল্‌ত। যাই হোক্, তখন থেকে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক সমবায় ভিত্তিতে বা যৌথ কারবার ভিত্তিতে বা সরকারী ভিত্তিতে কাজ করবে কি-না, সে সম্পর্কে তীব্র বিতর্কের সূত্রপাত হয়। ১৯২০ সাল অবধি ধরে নেওয়া হয় যে, যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কের ভিত্তিতে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক কাজ করবে। কিন্তু যৌথ মূলধনী-ব্যাঙ্কের লাভের নেশা চাষীদের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে না। আবার সম্পূর্ণ সমবায়ের ভিত্তিতেও এই ধরনের ব্যাঙ্কের কাজ চালানো সম্ভব নয়। কারণ জমির মূল্য নিরূপণ, যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি বিশেষ রকমের কাজ যা জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ককে করতে হয় তা কৃষকদের দ্বারা পরিচালিত সমবায় সংস্থার পক্ষে কৃত-

কার্য্যতার সহিত করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয় না। শেষে ১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি (Central Banking Enquiry Committee) সমবায় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপনের সপক্ষে সুপারিশ করেন। অবশ্য বড় বড় জোতদারদের ঋণ দেওয়ার জন্য যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক স্থাপনের কথাও কমিটি বলেন। কাজেই এ ধরনের ঋণ সরবরাহের জন্য এমন এক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন, যেখানে যৌথ ব্যাঙ্কের দক্ষতা, সরকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রাচুর্য্য ও সমবায় প্রতিষ্ঠানের মত খাতকের প্রতি পুরোপুরি পৃষ্ঠপোষকতা, এ সবকটার সমাবেশ পাওয়া যাবে।

ভারতে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস—

প্রথম অবস্থা (১৯২০-১৯৩০) গঠন কাল:

জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে ভারতে সরকার ও মহাজন শ্রেণীর লোক দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ সরবরাহ করত। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের "জমি-উন্নয়ন বিষয়ক ঋণ আইন"-এ জমির স্থায়ী উন্নতি সাধনে সরকার কর্ত্তৃক দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সরকারী দপ্তরের কড়াকড়ির ভয়ে ও কৃষকদের নিরক্ষরতার জন্য এই আইনের সুযোগ সুবিধা খুব কম কৃষকই নিতে পেরেছে। ১৯০৪ সালে সমবায় আন্দোলন প্রবর্ত্তনের পর, ঋণদান সমিতিগুলিকে স্বল্প মেয়াদী ঋণের সঙ্গে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করার জন্য উৎসাহিত করা হত। এ ধরনের ব্যবস্থার কিন্তু ফল দাঁড়াল অন্যরূপ। অনেক ঋণদান সমিতি শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়। কারণ কম মেয়াদের ভিত্তিতে নেওয়া আমানত যদি দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণে লগ্নী করা হয় তা'হলে আমানত ফেরত দেওয়ার সময় টাকার টানাটানি পড়া প্রায় অবশ্যম্ভাবী। শেষে ১৯২০ সালে পাঞ্জাবে প্রথম জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। জমির মালিক ও কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলি এর সভ্য হয়। চার বছর পর, বাংলাদেশের রাজসাহী জেলার নওগাঁতে গড়ে ওঠে দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক। ১৯২৬ সালের ভেতর, ভারতে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং ঐ বছরের নিয়ামকদের সম্মেলন (Registrars' Conference) জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক সমবায়ের ভিত্তিতে দেশের সর্ব্বত্র গড়ে তোলার জন্য সুপারিশ করে। ১৯২৯ সালে মাদ্রাজে একটি কেন্দ্রীয় জমী-বন্ধকী ব্যাঙ্ক ও ১২টি প্রাথমিক জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ঐ বছর, বোম্বাই ও মহীশূরে যথাক্রমে ৩টি প্রাথমিক জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক ও ১টি কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে। ১৯৩৫ সালে বোম্বাই-এ প্রাদেশিক জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক-এর কাজ চালু হয়।

১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি জমীবন্ধকী ব্যাঙ্কের কার্য্য-পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত সুপারিশ করেন।

দ্বিতীয় অবস্থা (১৯৩১-৩৯) ঃ অবনতি কাল—

এই সময়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্রব্যমূল্য হ্রাস। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অসম্ভব কমে যাওয়ার ফলে চাষীদের শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। মহাজনদের হাত থেকে জমি রক্ষা করা একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। জমি-বন্ধকী ঋণের চাহিদা ক্রমশঃ বেড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, এ সময়ে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি একমাত্র চাষীদের পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদানে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু এ ভাবে শুধু স্বল্প সুদে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দিয়ে চাষীদের রক্ষা করা যায় না; চাষীদের ঋণের সদ্ব্যবহার করার জন্যও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। শুধু চাষীদের বন্ধকী-জমির ওপর নজর না দিয়ে তাদের পরিশোধের ক্ষমতার দিকেও জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তাই ১৯৩৭ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষি-ঋণ বিভাগ মন্তব্য করে যে, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের ঋণী সভ্য কোন ভাল কৃষিঋণদান সমিতি বা সর্ব্বার্থসাধক সমিতিতে কিছুদিন সভ্য থাকবে, যাতে তার ঋণের সদ্ব্যবহারের অভ্যাস জন্মায় এবং ফলে ঋণ পরিশোধ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। ১৯৩৯ সালের জুন মাসের শেষে ভারতে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়ায় ২২৬ এবং এর প্রায় অর্দ্ধেকই মাদ্রাজে গড়ে ওঠে। ১৯৩৯ সালের জুন মাসের শেষে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণদাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ কোটি টাকা।

তৃতীয় অবস্থা (১৯৩৯-৪৬) ঃ যুদ্ধ কাল—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়াতে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের ঋণ-দানের কাজ অনেকটা কমে যায়। কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বেড়ে যাওয়াতে বন্ধকী-ঋণের চাহিদাও ক্রমশঃ কমে যায়। তারপর এই সময় অধিকাংশ প্রদেশে চাষীদের ঋণভার কমানোর উদ্দেশ্যে ঋণসালিসী বোর্ড (Debt Settlement Board) স্থাপিত হয়। আবার 'অধিক শস্য ফলাও' আন্দোলনে সরকারও প্রচুর ঋণ সরবরাহ করতে থাকেন। এ সমস্ত কারণে স্বভাবতঃই দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের চাহিদা বেশ কমে যায়। এ সময়ে কোন কোন জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের আর্থিক উন্নতি হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু বঙ্গদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়।

চতুর্থ অবস্থা (১৯৪৭-১৯৫৩) : যুদ্ধোত্তর কাল—

এ সময়ে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যকলাপ নিম্নলিখিত তালিকা হতে প্রতীয়মান হবে :—

[অঙ্কের পরিমাণ লক্ষে]

	ব্যাঙ্কের সংখ্যা	সভ্যসংখ্যা	কার্য্যকরী মূলধন	ঋণদাদনের পরিমাণ	বকেয়া	পূর্ববাকী	লাভ বা ক্ষতি (+) বা (−)
১৯৪৭	২৬৮	১৩৯,০৭৫	৪০০,৯৪	৭৩,৯৮	৩৬০·৩২	৩·৩৮	+ ১·১২
১৯৫৩	২৮৮	২৪৩,৬১৭	৮৬৬,৩০	১৪৬,১৮	৭৯৩·৭৯	১৪·২০	+ ১·৬৪

সর্ব্বভারতীয় এই ব্যাঙ্কগুলিব অর্দ্ধেকই মাদ্রাজে অবস্থিত এবং এর পরই যথাক্রমে মহীশূর ও বোম্বাই-এর স্থান। ১৯৫৩ সালে সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর স্থান নিম্নলিখিত তালিকা হতে অনুমান করা যায়।

	ব্যাঙ্কসংখ্যা	সভ্যসংখ্যা	কার্য্যকরী মূলধন	ঋণদান	ঋণের বকেয়া	পূর্ব্ববাকী	লাভ বা ক্ষতি (+) বা (−)
মাদ্রাজ	১৩০	১৫৮,০৪৩	৬০৬·৫৫	১০৪·৩৬	৫৬০·৯৩	৩·০৩	+ ১·৪৩
বোম্বাই	১৯	২৮,০৪০	৯৫·০৩	১২·৭৬	৮৯·১১	৬·৩০	+ ০·০৫

এই সময়, জমির উন্নতি বিধানেও ঋণ দেওয়া হত। ১৯৫৩ সালের ভেতর মাত্র ৬টি রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে, কিন্তু অন্যদিকে কোন কোন রাষ্ট্রে প্রাথমিক ব্যাঙ্কও গড়ে ওঠেনি। জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক জমির স্বত্ব যাচাই ও মূল্য নিরূপণের পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে ঐ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে বেশ সময় লাগ্‌ত। দীর্ঘ-মেয়াদী তহবিল পাওয়াও ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। যদিও সরকার কর্ত্তৃক পরিশোধের আশ্বাস প্রাপ্ত ডিবেঞ্চার বা তমস্সুকের মত ঋণপত্র বিক্রি করে তহবিল সংগ্রহের চেষ্টা হত, তবু তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ তেমন সন্তোষজনক ছিল না।

পঞ্চম অবস্থা (১৯৫৪ থেকে আজ অবধি)—

নিখিল ভারত পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটি ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

নিখিল ভারত পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটি ভারতের জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করে এই মন্তব্য করেন যে, ব্যাঙ্কগুলি চাহিদা অনুযায়ী ঋণ সরবরাহ করতে পারে না। কৃষির উন্নতির জন্য খুব কম ঋণই দেওয়া হয়;

উৎপাদনের চেয়ে পূর্ব্ব-ঋণ পরিশোধই ব্যাঙ্কগুলির ঋণদাদনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া অধিকাংশ ঋণই যাচ্ছে বৃহৎ চাষীদের হাতে। ঋণদাদনেও বেশ সময় লেগে যাচ্ছে। তাই সমীক্ষা কমিটি জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক সম্পর্কে নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন :

(১) প্রত্যেক প্রদেশেই একটা করে কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক থাকা উচিত। এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি বিভিন্ন সময়ের—যেমন, ৫, ১০, ১৫, ২০ বছরের মেয়াদের ডিবেঞ্চার বাজারে বিক্রি করে দীর্ঘ-মেয়াদী তহবিল সংগ্রহ করবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ভারতের স্টেট্ ব্যাঙ্ককে এ সমস্ত ঋণপত্র বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয় কৃষি-ঋণ তহবিল থেকে জমি-উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশেষ উন্নয়ন ডিবেঞ্চারের (Special Development Debentures for Land Improvement) সবটুকু বা বহুলাংশ কিনে নিতে হবে।

(২) প্রাদেশিক সরকারকে কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের শেয়ারের অন্ততঃ শতকরা ৫১ ভাগ কিন্‌তে হবে। অধিকতর পরিমাণে ঋণ সরবরাহ করার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য প্রয়োজনক্ষেত্রে আরও বেশী শেয়ার কিন্‌তে হবে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপবিধিতে প্রাথমিক ব্যাঙ্কের অংশীদার হওয়ার মতো প্রয়োজনীয় বিধি থাকবে।

(৩) সাধারণ ভাবে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের উচিত উৎপাদনশীল (Productive) ঋণদাদন করা। অন্যান্য উদ্দেশ্যের চেয়ে উৎপাদনশীল ঋণের ওপর অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। পাঁচ হাজার টাকার বেশী ঋণ উৎপাদন ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে দেওয়া উচিত নয়। ঋণের যথার্থ সদ্ব্যবহার লক্ষ্য করার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করা প্রয়োজন। সরকারী তহবিল গচ্ছিত রাখার উদ্দেশ্যে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারী এজেণ্ট হিসাবে সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

(৪) সরকার কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত সাহায্য দানের জন্যও কমিটি সুপারিশ করেন :—

(ক) ডিবেঞ্চারের আসল ও সুদের টাকা সম্পর্কে সরকারের গ্যারাণ্টি বা পরিশোধের আশ্বাস থাকবে ;

(খ) জমির মূল্য-নিরূপণ ও জমির উন্নতি বিষয়ক পরিকল্পনা পরীক্ষার্থে উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে ;

(গ) স্ট্যাম্প কর, রেজিস্ট্রেশন ফি প্রভৃতি থেকে ব্যাঙ্কগুলিকে অব্যাহতি দিতে হবে ;

(ঘ) ব্যাঙ্কগুলির কাজ যাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে।

(ঙ) অনুন্নত অঞ্চলে যে সকল ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হবে সেগুলিকে বিভিন্ন প্রকার খরচ বহনে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে হবে, যাতে করে বছরের পর বছর লোকসানে কাজ চালাতে না হয়।

সমীক্ষা কমিটির এই সমস্ত সুপারিশের ওপর ভিত্তি করেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমবায় উন্নয়ন কার্য্যক্রম রচিত হয়, এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও উক্ত কার্য্যক্রম বহাল থাকবে।

১৯৫৭—৫৮ সালে ভারতের জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা—

	ব্যাঙ্ক সংখ্যা	সভ্য সংখ্যা	আদায়ীকৃত মূলধন (লক্ষে)	সভ্যদের কর্জ্জ বাকী (লক্ষে)	কর্জ্জদাদন (লক্ষে)	লাভ বা লোকসান (লক্ষে)
প্রাথমিক ব্যাঙ্ক	৩৪৭	৩৭৬,০০০	১, ২৯ (রিজার্ভ ফণ্ড সমেত)	১৩,০৮	২,৫২	লাভ—২০ ক্ষতি—২
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক	১৫	৩০৬ প্রাঃ জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক ২৩৩ অন্যান্য সমিতি ১৫০,০০০ ব্যক্তি বিশেষ	২২৬	১৮-৯২,	৪,৬৮	লাভ—১২

কার্য্য-প্রণালী

শ্রেণী বিভাগ—যুক্ত-রাষ্ট্রীয় (Federal) বা এককেন্দ্রিক (Unitary) এ দু' রকমের জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক হতে পারে। যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শ্রেণীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে থাকে শীর্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Land Mortgage Bank); আর নিম্নস্থানে থাকে প্রাথমিক ব্যাঙ্ক, যারা সরাসরি সভ্যদের ঋণদাদন করে থাকে। এই প্রাথমিক ব্যাঙ্কগুলি এক সঙ্গে মিলে এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠন করে। সরকার আবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিকে প্রয়োজনীয় তহবিল যোগায়। যেখানেই জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক উন্নততর হয়েছে, সেখানেই পরিচালনের ক্ষেত্রে ও আর্থিক ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশও তাই।

আর এককেন্দ্রিক জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক সাধারণ ভাবে কর্জ্জ গ্রহণ করে বা ডিবেঞ্চার বাজারে ছেড়ে সরাসরি বা কোন শাখা-অফিস বা এজেন্টের মাধ্যমে ঋণদাদনের ব্যবস্থা করে। বৃটেন, জাপান, ফ্রান্স, কানাডা প্রভৃতি দেশে এ ধরণের কাজ চলছে। এ ধরণের কাজের একটা অসুবিধা হচ্ছে এই যে জমির উন্নতি-বিষয়ক কর্জ্জের দরখাস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা বা কর্জ্জের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তদারক করা সম্ভব হয় না। কিন্তু এই ব্যবস্থাতে কতকগুলি গুণও রয়েছে, যেমন, ঋণী সভ্যের দেয় সুদের হার বেশ কম থাকে, কেননা প্রাথমিক ব্যাঙ্কের ন্যায় কোন মধ্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে সুদ দিতে হয় না।

যোগাযোগ—বিভিন্ন জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ককে প্রাথমিক ব্যাঙ্কের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি নির্দ্ধারণ করে তাদের উপযুক্ত পরিচালনা, সাহায্য, তদারকী কাজের ও অনুরূপ কাজের ভার নিতে হবে। প্রাথমিক ব্যাঙ্ক দেনী সভ্যদের নিকট হতে যে জামিন স্বরূপ মরগেজ নেয় সেই মরগেজের ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রাথমিক ব্যাঙ্ককে ঋণদাদন করবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিতে প্রাথমিক ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের প্রাধান্য থাকবে; আবার সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক ব্যাঙ্কের কমিটিতেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একজন অন্ততঃ প্রতিনিধি থাকবে। দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ ও স্বল্প মেয়াদী-ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানদের মধ্যেও নিবিড় যোগাযোগ থাকা উচিত। তাই পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটি প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় সমবায় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিতে একই সভ্য কিংবা অন্ততঃ কয়েকজন সভ্য দু'টি ব্যাঙ্কেই থাকার সুপারিশ করেন। উপরন্তু এই কমিটির মতে উভয় প্রতিষ্ঠানের অফিস একই গৃহে অবস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তহবিল—শেয়ারের টাকা ও কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া কর্জ্জের টাকা দিয়ে প্রাথমিক ব্যাঙ্কগুলির তহবিল গড়ে ওঠে। তেমনি শেয়ারের টাকা ডিবেঞ্চারের টাকা, স্থায়ী দীর্ঘ-মেয়াদী আমানত, সরকার থেকে অস্থায়ী ঋণ এনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তার তহবিল গড়ে তোলে। তা ছাড়া, উভয় ব্যাঙ্কই তাদের কারবারের লাভ থেকে তহবিল গড়ে তোলে। শেয়ারের টাকা ও সংরক্ষিত তহবিল বা লাভ থেকে গড়া বিভিন্ন তহবিলের মিলিত টাকার সঙ্গে কর্জ্জ গ্রহণের টাকার নিবিড় সম্বন্ধ থাকে, কারণ ঐ মিলিত টাকার কয়েক গুণ পর্য্যন্ত কর্জ্জ গ্রহণ করা সম্ভবপর, তার বেশী কর্জ্জ গ্রহণ আইনতঃ নিষিদ্ধ থাকে। তাই জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের শেয়ারের টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য, তাদের মোট শেয়ারের

অন্ততঃ শতকরা ৫১ ভাগ সরকার কর্ত্তৃক কেনার জন্য সুপারিশ করেছেন পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটি। প্রাথমিক ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ কোন আমানত গ্রহণ করে না বা ডিবেঞ্চার বাজারে ছাড়ে না। কাজেই প্রকৃত পক্ষে, তহবিল সংগ্রহের ভার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককেই বহন করতে হয়।

ডিবেঞ্চার বাজারে ছেড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অধিকাংশ তহবিল সংগ্রহ করে। যে সময়ের জন্য ঋণ দেওয়া হয়, তার সঙ্গে ডিবেঞ্চারের মেয়াদের সামঞ্জস্য থাকা উচিত। জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ ২০ বছরের মেয়াদে ডিবেঞ্চার বাজারে ছাড়ে অর্থাৎ ২০ বছরের শেষে ডিবেঞ্চারে উল্লিখিত টাকার পরিশোধের দায়িত্ব নেয়। অবশ্য ২০ বছরের আগেও ডিবেঞ্চারের টাকা পরিশোধের কথা উল্লেখ থাক্‌তে পারে। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে, সব সময় ডিবেঞ্চারের সবগুলি বাজারে বিক্রি করা সম্ভব হয় না। তাই পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটি প্রস্তাব করেন যে, ডিবেঞ্চারের মেয়াদ ৫ থেকে ২০ বছরের ভেতর থাকা উচিত; কেননা স্বল্প-মেয়াদের ডিবেঞ্চার বীমা-কোম্পানী, যৌথ-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির পক্ষে কেনা সম্ভবপর ও সুবিধাজনক হয়। তারপর, ডিবেঞ্চারে উল্লিখিত টাকার সুদের হারও কম হওয়া উচিত। স্থানীয় জনসাধারণের হিতার্থে কোন পরিকল্পনার কাজে ঋণ যোগান উদ্দেশ্যে 'পল্লী-ডিবেঞ্চার' (Rural Debentures) চালু করার জন্যও সমীক্ষা কমিটি প্রস্তাব করেন। এ ছাড়া আর এক বিশেষ শ্রেণীর উন্নয়ন ডিবেঞ্চার ছাড়ার জন্য কমিটি সুপারিশ করেন। এই বিভিন্ন শ্রেণীর ডিবেঞ্চারের চাহিদা বাজারে খুব না থাকলে. রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সেগুলির সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাগ কিনে নিতে হবে।

কর্জ্জদাদন—জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে :

(ক) পূর্ব্ব-ঋণ পরিশোধ,

(খ) জমির বা কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি,

(গ) বর্ত্তমান জমির উন্নয়ন বা সুবিধামত চাষ আবাদের জন্য আরও জমি ক্রয়।

জমির উন্নতি বল্‌তে কৃষিকার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের জন্য পুকুর, কূপ ইত্যাদি খনন, পাম্পিং যন্ত্র বসান, বাঁধ নির্ম্মাণ, জমি সমতল করণ, জমিতে স্থায়ী জলসেচ ব্যবস্থা, বন জঙ্গলে পূর্ণ বা পতিত জমি চাষের উপযোগী করা, খণ্ড খণ্ড জমির একত্রীকরণের জন্য জমি ক্রয় ইত্যাদি বুঝায়। ভারতের

সমবায় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি এতদিন পূর্ব্ব-ঋণ পরিশোধের জন্যই ঋণ দিয়ে আস্‌ছে। পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটি কিন্তু বলেছেন যে জমির উন্নয়ন করার জন্য যে কর্জ্জের দরখাস্ত পাওয়া যাবে তার ওপর বেশী নজর দেওয়া উচিত।

ভারতে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির মেয়াদ সর্ব্বত্র সমান নয়। সাধারণতঃ ৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের মেয়াদ থাকে। ১৯৩৯ সালে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ নিয়ামক সম্মেলন মন্তব্য করেন যে মরগেজ ঋণের মেয়াদ জমি উন্নতি-বিষয়ক উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে ২০ বছরের বেশী হওয়া উচিত নয়। সমীক্ষা কমিটিও উক্ত মন্তব্য সমর্থন করেন। কমিটি আরও বলেন যে কম-মেয়াদেও বন্ধকী-ঋণ দেওয়া উচিত; ঋণের উদ্দেশ্যের রকমভেদে মেয়াদ কম বা বেশী হতে পারে। ঋণের মেয়াদ ও ডিবেঞ্চারের মেয়াদের মধ্যে যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

কর্জ্জের জামিন—দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ সাধারণতঃ জমির প্রথম বন্ধক বা মরগেজের ওপর দেওয়া হয় এবং ঋণের পরিমাণ মাথাপিছু বন্ধকী জমির মূল্যের অর্দ্ধেকের সমান হয়। কোন কোন রাষ্ট্রে আবার বন্ধকী জমির ৩৩% এর বেশী ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার দীর্ঘ-মেয়াদী জীবন বীমাও বন্ধকী ব্যাঙ্কে জামিন রাখতে বলা হয়ে থাকে, নিখিল ভারত পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটি মন্তব্য করেন যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণদাদনের পরিমাণ যথেষ্ট নয়, তাই জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক যাতে অধিকতর পরিমাণে ঋণ সরবরাহ করতে পারে তার জন্য জমি-উন্নয়নের পূর্ব্ব মূল্য ও কর্জ্জের টাকা খরচ করার পরে, জমির উন্নয়নের দরুন যে মূল্য হবে সেই মূল্যের তফাত-এর পরিমাণমত ঋণ সম্পর্কে সরকারকে প্রয়োজনীয় গ্যারান্টি দিতে হবে। এই গ্যারান্টিতে যাতে সরকারের কোন ক্ষতি না হয়, তারজন্য ঋণের সদ্ব্যবহার বিষয়ে অধিকতর তদারক প্রয়োজন।

জমির স্বত্ব—জমি বন্ধক দেওয়ার সময় ঋণ গ্রহিতাকে জমির মালিকানা স্বত্ব সম্পর্কে আবশ্যকীয় প্রমাণ দিতে হয়। এই মালিকানা স্বত্ব সঠিকভাবে নিরূপণ করতে ব্যাঙ্কের অনেক সময় লাগে এবং এজন্যে বেশীর ভাগ ঋণ পেতেও দেরী হয়। কাজেই যাতে তাড়াতাড়ি কর্জ্জ বিলি করা সম্ভব হয়, তার জন্য সমীক্ষা কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন :—

(ক) জমির মালিকানার স্বত্ব পরীক্ষার পথ সুগম করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন;

(খ) জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক যাতে প্রাথমিক অনুসন্ধানের পরই অর্থাৎ চূড়ান্ত পরীক্ষার পূর্ব্বেই কর্জ্জ দিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য প্রত্যেক প্রাথমিক ব্যাঙ্ককে ২৫০০০৲ টাকার মত গ্যারান্টি ফাণ্ড সৃষ্টি করতে হবে এবং এই ফাণ্ডের বলেই ঐ ভাবে কর্জ্জদাদন করা যাবে। এই ফাণ্ড কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে এবং প্রাদেশিক সরকার প্রদেশের সকল প্রাথমিক জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের হয়ে কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কে ঐ খাতে প্রথমেই ৫ লাখ টাকা দিয়ে রাখবেন।

বন্ধকী ঋণের জামিন সম্পর্কে আর একটি অসুবিধা হচ্ছে যে, সরকার কর্ত্তৃক এবকম ভূমি সংস্কাব নীতি গ্রহণ (যাতে কবে প্রজা স্বত্ব ব্যহত হয়) ও জমি বিক্রির সুব্যবস্থার অভাব। তাবপব, জমি-মূল্য নিরূপণও একটা বিরাট সমস্যা, অথচ বন্ধকী-ঋণের এটা একটা প্রধান অঙ্গ। জমি-মূল্য নিরূপণ অনেকটা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অভিজ্ঞতা সততা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। জমি-মূল্য নিরূপণ সাধারণতঃ কোন নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের কয়েক বছরের জমি বিক্রীর হিসাবের ভিত্তিতে করা হয় এবং সাধারণতঃ এরকম ক্ষেত্রে বার বৎসরের হিসাব লওয়া হয়।

ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা—যদিও ঋণের জামিন হিসাবে জমি-বন্ধক দেওয়া থাকে, তবু সাধারণতঃ সভ্যদের ঋণ পরিশোধ না হলে তাদের বন্ধকী জমি ব্যাঙ্ক বিক্রী করতে চায় না। তাছাড়া প্রতিক্ষেত্রে জমি বিক্রী করে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থাও ভাল নয়। সন্তোষজনক জামিন পাওয়া সত্ত্বেও দেনী সভ্যের পরিশোধ ক্ষমতার দিকে ব্যাঙ্ক লক্ষ্য রাখে এবং এজন্য বিস্তারিত অনুসন্ধানেব ব্যবস্থা করে। জমির খাজনা, চাষ আবাদের খরচা, ভরণ পোষণ ইত্যাদি বাবদ খরচা বাদ দিয়ে চাষ ও অন্যান্য উৎস থেকে দরখাস্তকারীর নীট আয় বের করা হয়। এইভাবে মোটামুটি আয়ের অঙ্ক থেকে দেনী সভ্যের বিভিন্ন খরচা বাদ দিয়ে পরিশোধযোগ্য টাকার অঙ্ক বা পরিশোধের ক্ষমতা বার করা হয়। এইভাবে পরিষোধ-ক্ষমতা বার করতে গিয়ে গৃহীত ঋণের টাকা ব্যবহার করে যে আর্থিক উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা মোটেই ধরা হয় না, কারণ দীর্ঘ-মেয়াদি-ঋণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ব্ব-ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়ে থাকে। কাজেই আয়ের উন্নতির কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু জমি উন্নয়ন বা চাষ উন্নয়নে যে ঋণ নেওয়া হয়, তাতে আয় বৃদ্ধির বেশ সম্ভাবনা থাকে এবং সেটা হিসাবের মধ্যে ধরা উচিত।

ঋণের সদ্ব্যবহারে তদারকী—উৎপাদন উদ্দেশ্যে যে ঋণ দেওয়া হয়, তার ওপর যথেষ্ট নজর রাখা উচিত। উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যে ঋণ গৃহীত হয় তার সাফল্য নির্ভর করে উৎপাদনের ভাল পরিকল্পনা ও সেই পরিকল্পনার সুপ্রয়োগ এবং ঋণের প্রকৃত সদ্ব্যবহারের ওপর। ভারতে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক অবস্থা এখনও এমন সচ্ছল হয় নি যাতে তারা ঋণের দরখাস্তের কোন জটিল দিক্ পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করতে পারে। কাজেই সংশ্লিষ্ট সরকারের কর্ত্তব্য হচ্ছে, এ ধরনের খুঁটিনাটি পরীক্ষার জন্য সরকারী কৃষি বা সেচ বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করা। তদারকী কাজের জন্য প্রাথমিক ব্যাঙ্ক সরকারী সাহায্যের জোরে সুপারভাইজার নিয়োগ করে। তাছাড়াও তদারকী কাজ ভালভাবে করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হতে উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হওয়া উচিত এবং যতদিন না প্রাথমিক ব্যাঙ্কগুলি তদারকী কাজের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করতে সক্ষম হয় ততদিন ব্যবস্থা চালু থাকা উচিত।

সমীক্ষা কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেন :—

(১) উৎপাদন উদ্দেশ্যে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের যে পরিকল্পনা করা হবে তার যথাযথ প্রচার ব্যবস্থা করা, (২) সরকারের কৃষি, সেচ প্রভৃতি বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা করা এবং (৩) প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলিতে তদারকের জন্য প্রচুর কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা থাকা।

সুদের হার—দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে যতটা সম্ভব কম সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করা উচিত। গ্যাড্‌গিল কমিটি সুপারিশ করেন যে, সুদের হার শতকরা ৪৲ টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সরকারের দেওয়া দান-খয়রাৎ টাকা ব্যতিরেকে অত কম সুদে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণদান সম্ভব নয়। দীর্ঘ-মেয়াদী তহবিল সংগ্রহ করে তার ওপর যে সুদ দিতে হয় তার ওপরই নির্ভর করে এ'রকম মেয়াদের কর্জ্জ দাদনের সুদ। এই দীর্ঘ-মেয়াদী তহবিলের অধিকাংশই আবার বাজারে ডিবেঞ্চার ছেড়ে সংগ্রহ করা হয়। কাজেই ডিবেঞ্চারে বর্ণিত সুদের হারের সঙ্গে 'ব্যাঙ্ক রেট্' বা সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত ঋণের সুদের হারের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য রাখতে হয়। কারণ সরকার ঐ ডিবেঞ্চার পরিশোধ ব্যাপারে গ্যারান্টি দেন। আবার যে কেন্দ্রীয় বন্ধকী ব্যাঙ্ক ডিবেঞ্চার বাজারে ছাড়ে ও প্রাথমিক ব্যাঙ্কের নানা রকম উপকার করে তার দেয় ও প্রাপ্য সুদের মধ্যে যথোচিত পার্থক্য থাকা

উচিত। তা নইলে লেন-দেন কাজ চলবে কি করে? ঠিক সেই কারণেই প্রাথমিক ব্যাঙ্কের পক্ষে ও সুদের দেওয়া নেওয়ার মধ্যে ব্যবধান থাকা উচিত তার নিজের কাজ-কর্ম্ম চালানোর জন্য। প্রশ্ন উঠতে পারে যে এত বেশী সুদের হার যদি হয় তাহলে সমবায় প্রথায় ঋণ না দিয়ে অন্য কোন ব্যবস্থার মারফত ঋণ দিলেই ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা প্রাথমিক ব্যাঙ্ককে সুদ দিতে হয় না এবং সেক্ষেত্রে সুদের হারও কম হয়। এটা খুবই সত্য কথা। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কৃষককে চিরকাল ঐ বাইরের দিকে ঋণের জন্য তাকিয়ে থাকতে হবে এবং তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান থাকবে না বা সে আর্থিক সাচ্ছল্যও লাভ করবে না। পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে যে দৃষ্টান্ত দিয়েছি তা লক্ষণীয়। সেই কারণে বর্ত্তমানে দীর্ঘ-মেয়াদী বন্ধকী ঋণের সুদের হার বাংলাদেশে ৮%, মাদ্রাজে ৬½%, এবং বোম্বাইতে ৩¼% থেকে ৮¼%।

ঋণ দাদনে বিলম্ব—জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণদাদনে বেশ সময় লাগে। এই সময় লাগাটা খুবই স্বাভাবিক; কেননা, জমির মালিকানা স্বত্ব-নিরূপণে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান, জমির মূল্য নিরূপণ, দরখাস্ত-পরীক্ষা প্রভৃতি কাজ সময় সাপেক্ষ। আবার অনেক রাজ্যে সমবায় দপ্তরের সংযোগে দরখাস্ত মঞ্জুরের ব্যবস্থা থাকায় আরও বেশ খানিকটা সময় নষ্ট হয়। দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের জন্য অধমর্ণদের খুব জরুরী প্রয়োজন থাকে না। তাই এই বিলম্ব জনিত অসুবিধা হলে তাতে অসন্তুষ্ট হবার কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু ঋণদাদনে ৪ থেকে ৬ মাসের বেশী সময় লাগা কোনমতেই উচিত নয়।

ঋণ পরিশোধ—পূর্ব্ব-স্থিরীকৃত কালের মধ্যে বাৎসরিক বা ষাণ্মাসিক কিস্তিতে সাধারণতঃ জমি বন্ধকী ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা থাকে।

জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের বিশেষ ক্ষমতা—বিদেশে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের সাফল্যের অন্যতম কারণ হচ্ছে, আদালতের আশ্রয় না নিয়ে অনাদায়ী ঋণ আদায়ের ব্যবস্থার মত কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে এই সব ব্যাঙ্ক। আদালতের আশ্রয় না নিয়ে উৎপন্ন শস্য ও বন্ধকী জমি বিক্রী করে অনাদায়ী টাকা আদায়ের কতকগুলি বিশেষ অধিকার আমাদের দেশের জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকেও দেওয়া হয়েছে।

পরিচালন ব্যবস্থা—অধিকাংশ ক্ষেত্রে, প্রাথমিক জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালনা করে। এই কমিটি সাধারণতঃ নির্ব্বাচিত সভ্য ও নিয়ামক কর্ত্তৃক ও কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী

ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক মনোনীত সভ্য নিয়ে গঠিত হয়। একদিকে নিয়ামক কর্ত্তৃক মনোনীত সভ্যরা পরিচালন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করবে, আবার অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের মনোনীত সভ্য প্রাথমিক ব্যাঙ্ক ও ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করবে। অন্যদিকে আবার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের (Central Co-operative Bank) মনোনীত সভ্য স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রাখ্‌বে জেলার ভিত্তিতে।

কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক পরিচালনার ভার নেয় এবং এই কমিটি ব্যক্তি-সভ্য ও সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক ব্যাঙ্ক —এই দুই তরফ হতে নির্ব্বাচিত সভ্য, নিয়ামক, ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক মনোনীত সভ্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত সভ্য নিয়ে গঠিত হয়। সাধারণতঃ প্রথমাবস্থায় পরিচালন ভার মনোনীত কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটির ওপর দেওয়া হয়।

সরকারী সাহায্য—দেশ-বিদেশের বন্ধকী ব্যাঙ্কের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে বন্ধকী ব্যাঙ্কের সাফল্য অসম্ভব। আমাদের দেশে এ সব ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য সর্ব্বত্র সমান নয়। সাধারণতঃ ডিবেঞ্চারে গ্যারান্টি, স্ট্যাম্প কর থেকে অব্যাহতি, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানদের সংরক্ষিত তহবিল বন্ধকী ব্যাঙ্কের ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগে অনুমতিদান, সাময়িক ভাবে আর্থিক সাহায্য, সরকারী দক্ষ কর্ম্মচারীর ব্যবস্থা, দান-খয়রাৎ ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের সরকারী সাহায্য বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে দেওয়া হয়। নিখিল ভারত পল্লী ঋণ সমীক্ষা কমিটি সরকারী সাহায্যের ব্যাপারে নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছে :—

(ক) সরকার কর্ত্তৃক ব্যাঙ্কের অধিকতর অংশক্রয় ;

(খ) উৎপাদন উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক যে ঋণ দেয় তার ওপর গ্যারান্টি দান ;

(গ) কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের ডিবেঞ্চারের আসল ও সুদের টাকা পরিশোধ সম্পর্কে গ্যারান্টি দান ;

(ঘ) জমির মূল্য নিরূপণের জন্য, জমির উন্নতিকল্পে পরিকল্পনা পরীক্ষার্থে কর্ম্মচারীর ব্যবস্থা ;

(ঙ) স্ট্যাম্পকর, পঞ্জীভুক্ত করার ফি হ'তে অব্যাহতি ;

(চ) অনাদায়ী ঋণ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ;

(ছ) জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যয়ভার বহন ইত্যাদি।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক

১৯১৪ সালে প্রথম প্রাদেশিক বা শীর্ষব্যাঙ্ক মধ্যপ্রদেশ ও বেরারএ স্থাপিত হয়। কৃষিঋণ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কই হচ্ছে রাজ্যের শীর্ষ ব্যাঙ্ক। স্বল্প-মেয়াদি ও মধ্য মেয়াদী ঋণদাদন ব্যাপারে শীর্ষব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। একদিকে প্রাথমিক সমিতির সভ্য ও অন্যদিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও আর্থিক বাজার (money market)—এদের মধ্যে সর্ব্বশেষ যোগসূত্র হিসাবে কাজ করছে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক। প্রাথমিক সমিতির সঙ্গে শীর্ষ ব্যাঙ্কের সরাসরি যোগ থাকতে পারে বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক সমিতি ও শীর্ষব্যাঙ্কের মধ্যে সত্যিকারের সংযোগসাধন করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি।

গঠন প্রণালী—পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাঞ্জাবে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক হচ্ছে অবিমিশ্র শ্রেণীর। এদের সভ্যপদ কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমিতিতে সীমাবদ্ধ। কোন ব্যক্তি-সভ্য এদের নেই। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে ব্যক্তি বা সমবায় সমিতি—উভয়ই প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের সভ্য হতে পারে। বোম্বাই ও মহীশূর রাজ্যেব ন্যায় অনুন্নত অঞ্চলে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক তার শাখা অফিসের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যেই প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ সরাসরি প্রাথমিক সমিতিদের সঙ্গে কাজ কারবার করে না।

কার্য্য কলাপ—রাজ্যে সমবায় সমিতিদের শেষ নির্ভরস্থল হিসাবে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কাজ করে। প্রাথমিক সমিতিদের উদ্‌বৃত্ত তহবিল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে রাখা হয়, আবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্‌বৃত্ত তহবিল প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে রাখা হয়। আগেই বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে সচ্ছল সমবায় ব্যাঙ্কের উদ্‌বৃত্ত তহবিল অসচ্ছল ব্যাঙ্কের ঘাটতি তহবিল পূরণ করে। শুধু কৃষি-ঋণদান সমিতির ক্ষেত্রেই শীর্ষব্যাঙ্কের কারবার সীমাবদ্ধ থাকে না, রাজ্যে অকৃষি সমিতির অর্থের চাহিদাও একে মেটাতে হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় আন্দোলনের আর্থিক ঘাটতি পূরণে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের স্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রদেশের সমবায় আন্দোলনের কতটুকু আর্থিক প্রয়োজনীয়তা আছে তার পরিমাপ করতে হয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে। শুধু তাই নয়, সেই প্রয়োজন মেটাবার যথাযথ ব্যবস্থাও করতে হয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে। কেন্দ্রীয় বা অনুরূপ অন্যান্য ব্যাঙ্ককে তাদের প্রয়োজনের সময় যাতে উপযুক্ত মত

অর্থ যোগান দিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে যথেষ্ট কাঁচা টাকা (fluid resources) মজুত রাখতে হয়। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারেও প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের উপযুক্ত তদারকীর কাজ রয়েছে। তাদের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা বা নীতি প্রণয়ন, তাদের কার্য্যে যোগাযোগ সাধন এবং ব্যাঙ্কিং কার্য্যের সমতা রক্ষা, সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি সুদৃঢ় করা—এই সকল কাজেই প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে অগ্রণী হতে হয়। সমবায়ের মাধ্যমে প্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের ব্যাপারে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের স্থান থাকে পুরোভাগে।

প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের ক্রম বিবর্ত্তন ঃ

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ন্যায় সুরু হতে আরম্ভ করে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের ইতিহাসকেও পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) গঠনকাল (১৯১৩-১৯২০), (২) উন্নতিকাল (১৯২০-১৯২৯), (৩) অবনতিকাল (১৯৩০-১৯৩৯), (৪) যুদ্ধকাল (১৯৪০-১৯৪৬), (৫) যুদ্ধোত্তর ও স্বাধীনতা উত্তর কাল (১৯৪৬ থেকে আজ অবধি)। এই সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মত শীর্ষব্যাঙ্কগুলিও একই অবস্থার সম্মুখীন্ হয়।

সমবায় ঋণ প্রসারের উদ্দেশ্যে ও কৃষকদের স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ সরবরাহে ভারত সরকার 'কৃষি-ঋণ-উপকমিটি' (গ্যাড্‌গিল কমিটি) নিয়োগ করেন। কমিটি সুপারিশ করেন যে প্রত্যেক প্রদেশে সরকারী সাহায্যের দ্বারা পুষ্ট 'কৃষি-ঋণ কর্পোরেশন' স্থাপন করা উচিত। এই কর্পোরেশন ঋণ পাওয়ার যোগ্য প্রত্যেক চাষীকে বিভিন্ন রকমের কৃষি ঋণ সরবরাহ করবে। সমবায় পরিকল্পনা কমিটি (সরাইয়া কমিটি) এই উপ-কমিটির মতের বিরোধিতা করেন। সরাইয়া কমিটি বলেন যে, কৃষি-ঋণ কর্পোরেশনের ন্যায় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে সরকারী সাহায্যদান করলে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই ঐ কর্পোরেশনের সকল কাজ ব্যাঙ্ক করতে পারবে। গ্যাড্‌গিল কমিটি যে পরিকল্পনা দেন সেই অনুসারে বোম্বাই প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক প্রত্যেক ঋণ যোগ্য চাষীকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে। বোম্বাই প্রদেশ কৃষি ঋণ পুণর্গঠন কমিটির (নানাবতি কমিটি) সুপারিশক্রমে, ১৯৪৮ সালে বোম্বাই সরকার প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের শেয়ার কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিখিল ভারত পল্লী ঋণ সমীক্ষা কমিটিও এদের মত সমবায় ঋণদান আন্দোলনের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি-সমূহের শেয়ার সরকার কর্তৃক কেনার সুপারিশ করেন।

সভ্য—প্রাথমিক সমিতির কেন্দ্রীয় সংস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুরূপ সংস্থা হল প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক। কিন্তু ভারতের কোন কোন রাজ্যে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ করে; আবার কোন কোন অঞ্চলে প্রাথমিক সমিতির কাজও করে, যেমন, প্রাথমিক সমিতির সভ্য ছাড়াও কোন ব্যাক্তি বিশেষকে সরাসরি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে। তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কোনো-না-কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই প্রাথমিক সমিতিদের সঙ্গে ঋণদাদন ব্যাপারে যোগাযোগ রাখে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ন্যায় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক দু'রকমের হতে পারে, যথা মিশ্র ব্যাঙ্ক-ও অ-মিশ্র ব্যাঙ্ক। প্রথমোক্ত ব্যাঙ্কের সভ্য সাধারণতঃ সমবায় সমিতি ও ব্যাক্তি বিশেষ হতে পারে, আর অ-মিশ্র ব্যাঙ্কে শুধুমাত্র সমবায় সমিতিই সভ্য হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব পাঞ্জাবের প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক অ-মিশ্র ব্যাঙ্ক। আর অন্যান্য রাজ্যে মিশ্র ব্যাঙ্কের সংখ্যাই বেশী। সমীক্ষা কমিটির মতে, প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে খুব নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক্ ব্যক্তিবিশেষ সভ্য হতে পারে।

পরিচালন-ব্যবস্থা—রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক বা প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের পরিচালনার কাজ বেশ গুরুত্বপূর্ণ; কাজেই পরিচালন কমিটিতে উপযুক্ত লোক থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রথমাবস্থায় এই সব ব্যাঙ্কের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিতে সাধারণতঃ ব্যক্তি-বিশেষের প্রাধান্য ছিল বেশী, কারণ ব্যাঙ্কের অধিকাংশ তহবিলই এরা যোগাত। কিন্তু পরে সমবায় সমিতি সমুহের প্রতিনিধিত্বের প্রাধান্য দেওয়ার নীতি স্বীকৃত হয়। তবুও প্রধান প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও আমানতকারীরা ব্যাঙ্কের পরিচালনার ভার সত্যিকার ব্যাঙ্কিং বিষয়ে পারদর্শী ব্যাক্তিদের ওপর দিতে চেয়েছিলেন। যা হোক, পরে সমবায় সমিতির প্রতিনিধিত্বের প্রাধান্য দিতে গিয়ে ব্যক্তি বিশেষকেও বাদ দেওয়া হয়নি। তবে ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত কাজ-জানা-লোক, অর্থনীতিবিদ এবং দক্ষ ব্যবসায়ী লোকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হত। সমীক্ষা কমিটির মতে, সরকারী অংশীদারীর দরুন সরকার মনোনীত সভ্যের সংখ্যা কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির মোট সভ্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হওয়া উচিত নয়। আর সরকার মনোনীত সভ্যদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নিয়ামক, সরকারের অর্থ-বিভাগের জনৈক প্রতিনিধি ও ব্যাঙ্কিং বা অর্থশাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তি অবশ্যই থাকবেন। কোন কোন ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা থাকার স্বপক্ষেও কমিটি মত প্রকাশ করেন যেহেতু সরকার ব্যাঙ্কের

বেশী শেয়ার নেবেন। কমিটি আরও বলেন যে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার নিয়োগ ব্যাঙ্ক যেন সুবিবেচনার সঙ্গে করে এবং এই নিয়োগ সরকারের অনুমোদনক্রমে করা উচিত। কোন প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি আদর্শ কমিটিরূপে পরিগণিত হবে, যদি তাতে নিম্নলিখিত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকে :

(ক) রাজ্যের প্রত্যেক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি ;

(খ) অন্যান্য যেসব সমবায় সমিতি সভ্য থাকবে তাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ;

(গ) মিশ্র প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে ব্যক্তি সভ্যদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ;

(ঘ) শীর্ষ বিপণন সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির জনৈক সভ্য ;

(ঙ) নিয়ামক, সরকারের অর্থবিভাগের জনৈক প্রতিনিধি ও ব্যাঙ্কিং বা অর্থনীতিবিদ্ সমেত সরকার মনোনীত প্রতিনিধি।

কার্য্যকরী মূলধন—শেয়ার, নিজস্ব তহবিল, আমানত ও কর্জ্জ ইত্যাদি নিয়ে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধন গঠিত হয়। অবশ্য কার্য্যকরী মূলধনের বহুলাংশ আমানত থেকেই আসে। প্রদেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করার জন্য প্রাদেশিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের যথেষ্ট কার্য্যকরী মূলধন থাকা বাঞ্ছনীয়। তা' ছাড়া শেয়ার ও অন্যান্য নিজস্ব তহবিলের ওপর ব্যাঙ্কের বাইরে থেকে দেনা করার ও ধার পাওয়ার ক্ষমতা নির্ভর করে। কাজেই নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ যাতে বাড়ে সেই উদ্দেশ্যে সমীক্ষা কমিটি প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের অংশগত মূলধনের অন্ততঃ শতকরা ৫১ ভাগ সরকার কর্ত্তৃক কিনে নেবার সুপারিশ করেন। ন্যূনতম অংশগত মূলধন সংগ্রহে সক্ষম না হওয়া অবধি শতকরা ৫১ ভাগের বেশী অংশও (শেয়ার) সরকারকে কিনতে হবে। আমানত বা কর্জ্জ গ্রহণ করে তহবিল সংগ্রহের ক্ষমতা বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমবায় আইনে বিধিবদ্ধ থাকে। ভারতে দেখা যায় যে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক নিজস্ব তহবিলের ১২ গুণ পর্য্যন্ত আমানত বা কর্জ্জ গ্রহণ বা দুই ভাবেই মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। রাজ্যে সমস্ত সমবায় সমিতির উদ্বৃত্ত তহবিল রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা উচিত। আমানত ব্যাপারেও প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের প্রধান উৎস হওয়া উচিত রাজ্যের সমবায় সমিতিসমূহ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ নীতি পুরোপুরি এখনও কার্য্যকরী করা সম্ভবপর হয়নি। ১৯৫২-৫৩ সালে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কসমূহে ব্যক্তি-আমানত-কারীরা যে আমানত রাখে তার তিন-চতুর্থাংশ পরিমাণ জমা দেয় সমবায়

সমিতিগুলি। আবার, ১৯৫৫-৫৬ সালের হিসাবে দেখা যায়, সমবায় সমিতি-সমূহের আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭·৮২ কোটি টাকা, কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষ ও অন্যান্য জায়গা থেকে প্রাপ্ত আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮·৮৬ কোটি টাকা। তাই সমীক্ষা কমিটি বলেন প্রয়োজন হলে আইনের জোরে সমস্ত সমবায় কেন্দ্রীয় ঋণ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত তহবিল প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঋণদান নীতি—প্রকৃতপক্ষে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কদের ঋণদানের উদ্দেশ্য নিয়েই প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয়। শুধু কৃষি-ঋণদান সমিতিকেই নয়, অ-কৃষি-ঋণদান সমিতিগুলিকেও প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক যতদূর সম্ভব অর্থ ধার দিয়ে সাহায্য করে। সমীক্ষা কমিটির মতে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের নীতি হওয়া উচিত কৃষি ঋণদাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। অবশ্য অ-কৃষি সমিতিদের চাহিদাও প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে মেটাতে হবে। কারণ প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধন গঠনে অকৃষি সমিতিদের দান কম নয়। সেদিক্ দিয়ে এদের প্রয়োজন মত ঋণদানে বঞ্চিত করা উচিত নয়। যদিও অকৃষি-ঋণদান সমিতি—যেমন পৌর ব্যাঙ্কের (Urban Bank) প্রয়োজনীয় যথেষ্ট মূলধন থাকে, তবু সময় বিশেষে এদেরও ঋণের প্রয়োজন হতে পারে। এ সমস্ত ব্যাঙ্কের ঋণ সরবরাহ করবার জন্য ১৯৫৩ সালে মহারাষ্ট্র সমবায় ব্যাঙ্ক সম্মেলন একটা স্বতন্ত্র শীর্ষ ব্যাঙ্ক গঠনের সুপারিশ করেছিল। শিল্প সমবায় সমিতির ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে, এরা প্রয়োজন মত কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পায় না। তাই বোম্বাইতে শিল্প সমবায় সমিতিগুলি তাদের জন্য নিজস্ব ব্যাঙ্ক স্থাপনে যত্নপর হয়েছে।

ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের কাজ—অর্থনৈতিক মন্দার সময় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলির ঝোঁক ছিল ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের মত কাজ করার দিকে। কারণ কৃষি-ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে ঐ সময় অনেকটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কোন কোন রাষ্ট্রে ব্যক্তিবিশেষ কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের সংশ্রবে এসে অনেক সুযোগ-সুবিধা নিতে থাকে। এই ভাবে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের অনেক কাজই এই কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলি করতে থাকে। আবার যুদ্ধের সময় অনেক ব্যাঙ্ক সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়ন্ত্রিত দ্রব্য বেচা-কেনার ব্যবসায় সুরু করে। এই ভাবে ব্যাঙ্কিং ও জিনিস-পত্র কেনা-বেচার ব্যবসায় যুগপৎ চল্‌'ত থাকে। অবশ্য যুদ্ধোত্তরকালে এই ধরনের ব্যবসায় প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আজ অবধি সমবায় ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের করণীয় কাজ করবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট

মতভেদ চল্‌ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষি-ঋণ বিভাগের পূর্ব্বতন প্রধান কর্ম্মসচীব শ্রী কে. সুব্বারাও এই মত প্রকাশ করেন যে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের কাজে ব্যক্তি বিশেষকে প্রাধান্য দিয়ে পুরোপুরি ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ চালান মোটেই সমীচীন নয়। কিন্তু শ্রী জি. এম. লড্ বলেন, প্রাদেশিক ব্যাঙ্কেব কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিতে ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য নেই বল্‌লেই চলে; বরঞ্চ সংশ্লিষ্ট সমিতির প্রতিনিধিদেরই প্রাধান্য রয়েছে। তাছাড়া প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ব্যক্তি-বিশেষকে যে ঋণদান করে তার পরিমাণ মোট ঋণদানের খুবই কম অংশ। আর মাত্র ৪·৫টি রাজ্যে ব্যক্তি বিশেষকে ব্যবসায়ী ঋণ দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া শ্রী লড্ বলেন যে যেহেতু প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ব্যক্তি-বিশেষ থেকে অধিকতর পরিমাণে আমানত পায় সেজন্য এদেব কিছু পরিমাণ ঋণদান করা হলে কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়।

প্রকৃত পক্ষে, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের কাজ বেশ জটিল। এ ধরনের কাজ করতে গেলে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কে-এ পারদর্শী কর্ম্মচারী আবশ্যক; কিন্তু সমবায় ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা বিবেচনায় এ ধরনের ব্যবসায় সম্ভব নয়। কাজেই শ্রীসুব্বারাও বলেন যে, প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক যতটা সম্ভব সংশ্লিষ্ট সমিতির স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে ও কর্ম্মচারীব সংখ্যা ও দক্ষতা বিবেচনা করে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের করণীয় কাজ করতে পাবে।

সমবায় আন্দোলন উন্নয়নে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের স্থান

সমবায় আন্দোলন উন্নয়নে শীর্ষব্যাঙ্ক হিসাবে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক জগৎ-এর সঙ্গে সমবায় আন্দোলনের যোগাযোগ সাধন ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তহবিলের সমতা রক্ষণ কাজ ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও প্রাথমিক সমিতির নিবিড় যোগাযোগ ও তাদের নীতি নির্দ্ধারণে সহায়তা করা প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের অন্যতম কাজ। সমবায়ের মাধ্যমে জনসাধারণের উন্নতি বিধানে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতির বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক, সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে থাকে। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি করতে গেলে সমবায়ের স্থান যে পুরোভাগে তা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন এবং গ্রাম্য সমবায় সমিতিদের স্বল্প ও মধ্যম-মেয়াদী ঋণদানের ক্ষেত্রে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের স্থান সর্ব্বোচ্চ থাকায় গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নতিতে তার স্থান কোথায় তা সহজেই অনুমেয়। কোন প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের

চিন্তাধারা যদি প্রগতিমূলক হয় তাহলে সে সেই প্রদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট প্রেরণা যোগাতে পারে। বোম্বাই-এ আজ যে সমবায় আন্দোলনের প্রসার ঘটেছে তার মূলে রয়েছে ঐ প্রদেশের প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের নীতির উৎকর্ষ। ঋণ দিয়ে তার তদারকী ও সভ্যদের ফসল বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করা—এই দুইই ঐ ব্যাঙ্ক আরম্ভ করে। সমবায় বিপণন সমিতির প্রসার ঘটে এর ফলেই। এই ভাবে ঋণ পাবার যোগ্য প্রায় সকল কৃষককেই ঐ ব্যাঙ্ক ঋণদাদন করতে সমর্থ হয়েছে। সরকারী সাহায্য ও সরকারী অংশীদারীও এইসব কারণে ঐ ব্যাঙ্ক পায় সর্ব্ব প্রথম।

পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশের ফলে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের কর্ম্মপদ্ধতিতে অনেক পরিবর্ত্তন এসেছে। বর্ত্তমানে প্রাদেশিক সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যুক্তভাবে আলোচনা করে কৃষি ঋণের নীতি নির্দ্ধারণ করবেন। যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তাকে কাজে পরিণত করতে হবে সরকারকে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে। অসচ্ছল প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে সরকার নানারূপ মূলধন ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন এবং প্রয়োজনমত এদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণও করবেন। কিন্তু যেখানে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক সচ্ছল সেখানে সরকার এদের নিয়ন্ত্রণ করবেন না। বরং তার সাথে হাত মিলিয়ে নানারকম নীতিগুলির রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। এরকম ক্ষেত্রে নানারূপ পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের অনেক কমে যাবে এবং প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ঐ সমস্ত নিজের স্কন্ধে বহন করে সরকারকে রেহাই দেবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক

১৯৪২ সাল থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কৃষি-ঋণ সরবরাহ করে আসছে। ১৯৪৯ সাল অবধি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃষি-ঋণ ব্যাপারে সমবায় আন্দোলনের শেষের সম্বল ছিল। কিন্তু ১৯৪৯-এর পর থেকে সমবায় আন্দোলনে ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের নীতি বা কর্ম্ম-পদ্ধতিতে এক বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সম্প্রতি প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতি-সমূহের মধ্যে যোগসূত্ররূপে কাজ করছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের সাহচর্য্যে সমবায় ঋণদান সমিতি সমূহের পুনর্গঠনকল্পে প্রয়োজনীয় নীতি নির্দ্ধারণ করছে; আবার এই পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য রাজ্যসরকার ২০ বছরের অনধিক দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ সরবরাহ করছে। কৃষি-কার্য্য ও শস্য বিপণন

কল্পে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক মারফত স্বল্প-মেয়াদী ঋণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাধারণ সুদের হার থেকে শতকরা দু'টাকা কম হারে ও মধ্যম-মেয়াদী ঋণ শতকরা দেড় টাকা কম হারে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রত্যেক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও তৎসংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মোট কর্জ্জের পরিমাণও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থির করছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক মোট স্বল্প মেয়াদী ঋণদাদনের পরিমাণ ৩৪৮১.২২ লাখ টাকা ও ১৯৫৭-৫৮ সালে ৬,১৩৮·৪৯ লাখ টাকায় দাঁড়ায়। সম্প্রতি জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘ-মেয়াদী) তহবিল থেকে ১৫ মাস থেকে ৫ বছরের মেয়াদে মধ্যম-মেয়াদী ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য এ ধরনের ঋণ পেতে হলে পরিশোধ ব্যাপারে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে সরকারী প্রতিশ্রুতি বা গ্যারান্টি লাভ করতে হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের কাজ-কারবার করে থাকে, আবার সে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কেরও নির্ভরস্থল। এই রকম প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কদেরও নির্ভরস্থল ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের মত রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ককেও তার চল্‌তি আমানত ও দীর্ঘ-মেয়াদী আমানতের অনুপাতে কিছু টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হয়; তবে জমা টাকার পরিমাণ বা অনুপাত তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের পরিমাণ বা অনুপাতের অর্দ্ধেক। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে বিনা খরচায় টাকা প্রেরণের সুযোগ দিচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা হিসাবে স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াও সমবায় ঋণদানের ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের পরিদর্শন ব্যাপারেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছে।

দশম পরিচ্ছেদ

পৌর সমবায় ব্যাঙ্ক

শ্রেণীবিভাগ—অকৃষি ঋণদান সমিতিগুলিকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

(১) পৌর সমবায় ব্যাঙ্ক (Urban Bank)

(২) অন্যান্য অকৃষি ব্যাঙ্ক যথা, অফিস কর্ম্মচারী সমিতি, শ্রমিক ঋণদান সমিতি ইত্যাদি।

পৌর ব্যাঙ্ক—ভারতে প্রাথমিক সমিতিদেব শতকরা ৪ ভাগ হচ্ছে অ-কৃষি ঋণদান সমিতি, যার মধ্যে পৌব ব্যাঙ্কও অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের সভ্যসংখ্যা সমবায় সমিতির মোট সভ্যসংখ্যার শতকবা ১৭½ ভাগ ও কার্য্যকরী মূলধন মোট কার্য্যকরী মূলধনের এক-চতুর্থাংশ। কৃষি ঋণদান সমিতির ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে আমরা তাদের উত্থানপতন লক্ষ্য করেছি। অ-কৃষি ঋণদান সমিতির ক্ষেত্রে তা লক্ষিত হয় না। এদেব উন্নতি বেশ সাবলীলভাবে হয়ে চলেছে। ১৯৩৯ সালের আগে কার্য্যকবী মূলধনের ব্যাপার ছাড়া পৌব ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অ কৃষি ঋণদান সমিতির মধ্যে কোন তফাত ছিল না। কোন অকৃষি ঋণদান সমিতির কার্য্যকবী মূলধন ৫০,০০০৲ হলেই, তাকে পৌর ব্যাঙ্ক বলা হত। বোম্বাই-এ কোন অ-কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতির অন্ততঃ ১৫০০০৲ টাকা আদায়ীকৃত অংশ-তহবিল থাকলে ও সেই সমিতিতে চলতি আমানত গ্রহণের ব্যবস্থা থাকলে তাকে পৌর ব্যাঙ্ক বলা হত। মাদ্রাজ ভিন্ন আর কোনও রাষ্ট্রে এই ভাবে পৌর ব্যাঙ্কেব তফাত-এর ব্যবস্থা ছিল না।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের সমবায় আন্দোলনের যে পর্য্যালোচনা করে তার ১৯৫৪-৫৬ সালের সংখ্যায় পৌর ব্যাঙ্কের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া হয়—"সেই সমস্ত ঋণদান সমিতিকেই পৌর ব্যাঙ্ক বলা হয় যারা বিভিন্ন রকমের আমানত গ্রহণ করে ও আমানতকারীদের ব্যক্তিগত জামিনে কর্জ্জদাদন করে তাদের হুণ্ডী বা বিল ভাঙ্গায় বা আদায় করে এবং অনুরূপ ব্যাঙ্কিং-এর কাজ করে।" এই পর্য্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অ-কৃষি ঋণদান সমিতিগুলিকে দু'ভাগে দেখান হয়েছে—পৌর ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অকৃষি ঋণদান সমিতি। এই অন্যান্য অ-কৃষি ঋণদান সমিতি বলতে "স্থায়ী বা সেভিংস্ আমানত গ্রহণকারী ও নির্দ্দিষ্ট ঋণদাদনকারী সমিতি"কে বুঝায়। ১৯৫৬ সালের ৩০শে জুন, ভারতে পৌর

ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৫৮৫, সভ্যসংখ্যা ১১ লাখ ৩০ হাজার এবং কার্য্যকরী মূলধন ৪৩ কোটি ৯৫ লাখ টাকা। ঐ একই তারিখে সমস্ত রকমের অ-কৃষি ঋণদান সমিতির (পৌরব্যাঙ্ক সমেত) সংখ্যা ছিল ১০,০০৩, তাদের সভ্যসংখ্যা ৩০ লাখ ৭৩ হাজার এবং কার্য্যকরী মূলধন ৮৫ কোটি টাকা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সকলরকমের অকৃষি ঋণদান সমিতির শতকরা ৫৬ ভাগ হচ্ছে পৌর ব্যাঙ্ক। অফিস কর্ম্মচারী সমিতি ও মিল শ্রমিক ঋণদান সমিতির সংখ্যা একই সময়ে ৩৫৫ তে দাঁড়ায়। এই সমিতিগুলির সভ্য সংখ্যা হচ্ছে ৩ লাখ ২৬ হাজার। বিভিন্ন রকমের অ-কৃষি সমিতির অবস্থা নিম্নলিখিত তালিকা হতে প্রতীয়মান হবে :

১৯৫৬ সালের ৩০শে জুন

রাষ্ট্র	সমিতির সংখ্যা	সভ্যসংখ্যা	কার্য্যকরী মূলধন (আনুমানিক)	কর্জ্জদাদন (১৯৫৫-৫৬)
বোম্বাই	১,৭১১	১০ লাখ ৪ হাজার	৪০·৪ কোটি টাকা	৩২·২ কোটি টাকা
মাদ্রাজ	৮৯৫	৬ লাখ ৪৩ হাজার	১৩·১ ”	১৩·০ ”
পশ্চিমবঙ্গ	৪৯৫	৩ লাখ ৬৫ হাজার	৯·৭ ”	১৪·৩ ”
সকলরাষ্ট্রে	১০,০০৩	৩০ লাখ ৭৩ হাজার	৮৫·৭৩ ”	৭২·০৬ ”
পৌর ব্যাঙ্ক				
বোম্বাই	২০৬	৪·২ লাখ	২৭·১ ”	২১·৮ কোটি টাকা
মাদ্রাজ	১৭৬	৩·৪ ”	৭·০২ ”	২২·২ লাখ
পশ্চিমবঙ্গ	৭৮	২২ হাজার	৩৬·৬ ”	৩১·৫৬ কোটি
সকল রাষ্ট্রে	১,৫৮৫	১১·৩৯ লাখ	৪৩·৯ ”	৫·৩ ”

কৃষি ঋণদান সমিতির ক্ষেত্রে বোম্বাই ও মাদ্রাজ শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। উভয় রাষ্ট্রে ভারতের মোট সমিতির শতকরা ২৬ ভাগ, সভ্য সংখ্যার শতকরা ৫৪ ভাগ ও কার্য্যকরী মূলধনের শতকরা ৬৩ ভাগ রয়েছে।

প্রয়োজনীয়তা—ভারতে ৬ কোটি ১৮ লক্ষ লোক বাস করছে শহরাঞ্চলে। পেশা ও কর্ম্ম সংস্থানের উৎস অনুসারে সমবায় ব্যাঙ্ক গড়ে উঠেছে এদিকে ওদিকে। এই সমিতি বা ব্যাঙ্কগুলি সভ্যদের স্বাবলম্বী করে তুলছে, মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করছে, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক না থাকা সত্ত্বেও ব্যাঙ্কিং কার্য্যোন্নয়নে সাহায্য করছে।

ম্যাক্লাগান কমিটি বলেন, পৌর ব্যাঙ্কগুলিকে পুরোপুরি সমবায়িক প্রতিষ্ঠান বলা চলে না, কেননা সভ্য সংখ্যার আধিক্যহেতু যে কোন একজন সভ্য সাধারণ ভাবে অন্যকে জানতে পারে না। তা ছাড়া কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির ওপর সত্যিকারের নজর রাখাও সম্ভব নয়। কাজেই কমিটির মতে এই সমস্ত সমিতি যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক স্থাপনের মূলসূত্র হিসাবে কাজ করছে। এতে সমবায়ের পূর্ণরূপ রাখা সম্ভব নয়। শহরাঞ্চলে এই ঋণ আন্দোলন গড়ে ওঠার মূলে রয়েছে সৎ ও বেতন না নিয়ে কাজ করার মত কতিপয় নিস্বার্থপর ব্যক্তির প্রচেষ্টা।

দায়িত্ব—জার্মাণীতে স্লুজ্ ডিলিজ ১৮৫০ সালে প্রথম অসীম-দায়িত্ব বিশিষ্ট এই ধরণের ব্যাঙ্ক স্থাপিত করেন। কিন্তু ইতালীতে লুজাটি (M. Luzzatti) নামে এক ব্যক্তি সসীম-দায়িত্ব বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক গড়ে তোলেন এবং ব্যাঙ্কগুলি বেশ ভাল কাজও করে। পরে ইতালীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে স্লুজ্ সসীম-দায়িত্ব বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক গঠন করেন। প্রকৃত পক্ষে, যেখানে একে অন্যকে জান্‌বার সুযোগ থাক্‌বে, সেখানেই অসীম-দায়িত্ব প্রয়োগ করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু শহরের অবস্থা অন্যরূপ, সেখানে সভ্যগণ সাধারণতঃ বিভিন্ন শ্রেণী বা পেশাভুক্ত থাকে বলে পারস্পরিক জানা শুনা ও সাহায্য তেমন সম্ভব হয় না। তাই ভারতে সসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক গড়ে উঠ্‌ছে।

আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন—যেহেতু পৌর ব্যাঙ্কগুলি সসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট, সেজন্য এর অংশগত মূলধন এমন হওয়া উচিত, যাতে ব্যাঙ্কের দেনা ও পাওনার মধ্যে একটা ভাল সম্পর্ক থাকে। এইজন্যই ঋণদান সমিতির কর্জ্জ গ্রহণের পরিমাণ নিজস্ব তহবিলের ৮ থেকে ১২ গুণ পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। পশ্চিমবঙ্গে কর্জ্জ গ্রহণের ক্ষমতা আদায়ীকৃত মূলধনও নিজস্ব ব্যবসায়ের বাহিরে খাটানো সংরক্ষিত তহবিলের ১০ গুণ অবধি সীমাবদ্ধ থাকে। এই পৌর ব্যাঙ্কগুলির কম পক্ষে ২০ হাজার টাকার অংশগত তহবিল থাকা বাঞ্ছনীয়। ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের ১১নং ধারানুযায়ী কোন যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কের কমপক্ষে ৫০,০০০৲ টাকা আদায়ীকৃত অংশগত তহবিল থাক্‌তে হবে। অবশ্য যে ব্যাঙ্ক শুধু একটি মাত্র জায়গায় (বোম্বাই ও কলিকাতা ভিন্ন) ব্যবসা করবে, তার বেলাতে এই ন্যূনতম অংশগত তহবিল প্রযোজ্য হবে। পৌর ব্যাঙ্কের প্রতি শেয়ারের মূল্যও সব জায়গায় সমান নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতি শেয়ারের মূল্য হচ্ছে ১০৲ টাকা। কোন কোন ক্ষেত্রে উপবিধি অনুযায়ী শেয়ারের মূল্য কিস্তিতে দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে।

সভ্যপদ—উপবিধি অনুযায়ী সভ্যপদের যোগ্যতা থাকলে যে কেহ সমিতির সভ্য হতে পারে। সভ্যকে সমিতির এলাকাতে বাস করতে হবে। সাধারণতঃ এক ব্যক্তি একাধিক ব্যাঙ্কের সভ্য হবে না। অবশ্য একাধিক ব্যাঙ্কের সভ্য হওয়ার স্বপক্ষে আইনে ব্যবস্থা থাকতেও পারে। কিন্তু এতে অত্যধিক কর্জ্জ-দাদন বা গ্রহণের বিপদ্ আছে। বোম্বাই ও মাদ্রাজে কোন ব্যক্তির একাধিক ব্যাঙ্কে সভ্যপদ লাভের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। অবশ্য সম্প্রতি বোম্বাইতে নিয়ম করা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি একাধিক সমিতির সভ্য হয়, তাকে অঙ্গীকারনামা দিতে হবে যে, সে একটি মাত্র সমিতির কাছ থেকে কর্জ্জ গ্রহণ করবে এবং এই অঙ্গীকারনামার নকল অন্যান্য সমিতিতে দিতে হবে।

সঞ্চয় ও আমানত—এই সমবায় ব্যাঙ্কগুলির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, সভ্যদের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস করিয়ে উদ্বৃত্ত সঞ্চয় আমানত হিসাবে গ্রহণ করা। কোন কোন ব্যাঙ্ক সভ্যদের আমানত দেওয়ার ব্যাপারে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করেছে। মাদ্রাজের 'টাউনসেণ্ড কমিটি' ও এই ধরনের স্বপক্ষে মন্তব্য করেন। কিন্তু যাদের পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না, তাদের এই সমস্ত ব্যাঙ্কের সভ্যপদ নেওয়া সম্ভব হয় না। এইজন্য সাধারণতঃ পৌর ব্যাঙ্কগুলি সভ্যদের ঐচ্ছিক আমানত দানে জোর দেয়, কিন্তু অন্যদিকে, বেতনভুক্ কর্ম্মচারী ঋণদান সমবায় সমিতি আবশ্যিক আমানতে জোর দেয় এবং এভাবে সংগৃহীত তহবিলকে 'সঞ্চয় তহবিল' নাম দেয়। সাধারণতঃ এই সমস্ত আমানতে সুদের হার একটু বেশী থাকে। পৌর ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক দেয় সুদ যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক দেয় সুদের প্রায় সমান। কিন্তু যৌথ ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, লাভের অঙ্ক বাড়ানো; আর এই সমবায় ব্যাঙ্কগুলি সভ্যদের সঞ্চয়ী করে তোলার দিকে বিশেষ জোর দেয়, আর যেটুকু লাভ হয়, তা আমানতদানকারী বা কর্জ্জগ্রহণকারীদের উপকারার্থেই ব্যবহৃত হয়।

কর্জ্জদাদন নীতি—পৌর সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কর্জ্জদাদন নীতি সাধারণতঃ ব্যাঙ্কের উপবিধিতেই লিপিবদ্ধ থাকে; কোন্ কর্জ্জে কি ধরণের জামিন নেওয়া হবে তাও উপবিধিতে বর্ণিত থাকে। এই সমস্ত উপবিধি বর্ণিত ব্যবস্থা সাপেক্ষে কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির কর্জ্জদাদন ব্যাপারে যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। আমানতের শতকরা ৬০ থেকে ৬৫ ভাগ অবধি কর্জ্জদাদন করা চলে। অবশ্য সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নগদ টাকা বা তার সম পরিমাণ সহজ লভ্য তহবিল রাখার ব্যবস্থা করে রাখতে হয়। দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণদান উদ্দেশ্যে স্বল্প মেয়াদী আমানত

ব্যবহার করা চলে না। দীর্ঘ-মেয়াদী সম্পদ অর্থাৎ নিজস্ব তহবিল বা তিন বছরের অধিক মেয়াদে আমানতের ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘ-মেয়াদী কর্জ্জদাদন করা চলে। কর্জ্জদাদন যতটা সম্ভব অধিক সভ্যদের মধ্যে হওয়া উচিত। কারণ তাতে বিপদের সম্ভাবনা খুব কম থাকে। কর্জ্জ গ্রহণকারী কর্ত্তৃক কর্জ্জের প্রকৃত সদ্ব্যবহার, কর্জ্জ পরিশোধের ক্ষমতা ইত্যাদির ওপর নজর দেওয়া উচিত। সাধারণতঃ 'ক্যাশ ক্রেডিট' বা 'ওভারড্রাফ্ট্'এর মাধ্যমে কর্জ্জদাদনের ব্যবস্থা করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসায় উদ্দেশ্যে কর্জ্জ দেওয়া হয়; জরুরী কারণে যেমন বিপদ-আপদেও কর্জ্জ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যে কর্জ্জদাদন করা হয় তার ক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তি জামিন দেওয়াই উচিত, আর বিপদে-আপদে যে ঋণ দেওয়া হয় সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামিন দেওয়া চলে। চিকিৎসার খরচা, ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার খরচা, বিবাহ ইত্যাদি বাবদ খরচা (যা সাধারণতঃ কর্জ্জগ্রহণকারীর ক্ষমতার বাইরে) আপদ্-বিপদ্ উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। জামিনের রকম ভেদে সুদের হারও কম বেশী হয়। কর্জ্জদাদন ব্যাপারে সব সময় নগদ টাকা বা তার সম পরিমাণ সম্পদের দিকে সর্ব্বদা নজর রাখতে হয়। সব চাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে, পৌর সমবায় ব্যাঙ্কগুলি সব সময় উদ্বৃত্ত তহবিলের যথার্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্র খুঁজে পায় না। কেহ কেহ বলেন, কোন ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত অংশগত মূলধনের পরিমাণ ৫০,০০০৲ টাকার বেশী থাকলে এবং অন্ততঃ দশ বছরের পুরানো ব্যাঙ্ক হলে তহবিল বিনিয়োগের ব্যাপারে কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিকে পুরোপুরি ক্ষমতা দেওয়া উচিত। কিন্তু এই ব্যবস্থায় যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কে উদ্বৃত্ত তহবিল বিনিয়োগের সম্ভাবনা থাকতে পারে এবং তা মোটেই নিরাপদ নয়। সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে উদ্বৃত্ত তহবিল কৃষি-উন্নয়নে বিনিয়োগই প্রশস্ত।

অন্যান্য অ-কৃষি ঋণদান সমিতি—পৌরব্যাঙ্ক ছাড়া শহরাঞ্চলে অফিস, খনি-কারখানা ইত্যাদিতে বেতনভুক্ কর্ম্মচারী বা শ্রমিক ঋণদান সমিতি আছে। সাধারণতঃ আমানত বা কর্জ্জগ্রহণ করে এই সমিতিগুলি তহবিল সংগ্রহ করে। মাসিক বেতন বা মজুরীর ওপর ভিত্তি করে কর্ম্মচারী বা শ্রমিক সভ্যের প্রয়োজন আনুযায়ী স্বল্প কর্জ্জদানের ব্যবস্থা রয়েছে এ সমিতিগুলিতে। কোন কোন সমিতি ন্যায্য মূল্যের পণ্য ভাণ্ডার ও চালায় এবং সভ্যদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাহিদানুযায়ী সরবরাহ করে। আবার কোন কোন সমিতি খাবার বা চায়ের দোকান ও চালায়। ১৯৫৬ সালের জুনমাসের শেষে বেতনভুক্ কর্মচারী

ঋণদান সমিতির সংখ্যা, সভ্যসংখ্যা ও কর্জ্জদাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৩,৩৭৭, ৯ লাখ ৩০ হাজার ও ২৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আর শ্রমিক ঋণদান সমিতির সংখ্যা, সভ্যসংখ্যা ও কর্জ্জদাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৫৫, ৩ লাখ ২৬ হাজার ও ৬ কোটি ২৮ লাখ টাকায় দাঁড়ায়। ভারতে বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ২৬ লাখ ; আর অফিস কর্ম্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১০ লাখ। তাছাড়া বিভিন্ন খনিতেও প্রচুর পরিমাণে মজুর কাজ করছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, মোট শ্রমিক সংখ্যার অনুপাতে খুব কমই সমবায় সমিতির সভ্য হতে পেরেছে। শ্রমিক কল্যাণ উদ্দেশ্যে আরও শ্রমিক ঋণদান সমিতি গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শিল্প সমবায় ব্যাঙ্ক

কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও শিল্প সমবায় সমিতিদের ঋণ সরবরাহের ব্যাপারে সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করে থাকে। কৃষি-ঋণদান উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক শিল্প সমবায় সমিতিদেব ও ঋণ যোগাচ্ছে কিন্তু শিল্প সমবায় সমিতিদের ঋণ দিয়ে সত্যিকারের সাহায্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই যথেষ্ট নয়, তাছাড়া এ ধরণের ব্যাঙ্ক স্বভাবতঃই কৃষি-ঋণ ও কৃষি বিপণন উদ্দেশ্যে ঋণের ওপর বেশী জোর দিয়ে থাকে। শিল্প ঋণ সরবরাহ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ও কতকগুলি অসুবিধা রয়েছে, যেমন, ঋণের দরখাস্ত বিবেচনা করা কিছু শক্ত, কারণ শিল্পের ব্যবসায়ের দিক বিবেচনা করতে হলে কারিগরী জ্ঞান কিছু থাকা দরকার যা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালকদের সাধারণতঃ থাকে না। তদুপরি শিল্প সমিতির পক্ষে সন্তোষজনক জামিন দেওয়াও সম্ভবপর নয়। তাই গ্রাম্য কারিগর বা শিল্প সমিতিকে ঋণদান ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বভাবতঃই দ্বিধাবোধ করে। কাজেই অনেকের ধারণা পৃথক শিল্প সমবায় ব্যাঙ্ক সংগঠনই হচ্ছে সমবায় শিল্প সমিতির ঋণ সরবরাহ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।

শিল্প সমবায় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য—শিল্প সমবায় ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্দেশ্য হবে, ব্যক্তিগত কারিগর ও শিল্প সমবায় সমিতিদের এবং যে সব সমবায় সমিতিতে বিভিন্ন কারিগররাও সভ্য শ্রেণীভূক্ত তাদের ও ঋণ সরবরাহ করা ও কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, উৎপন্ন দ্রব্য সংরক্ষণ ও বিপণনের জন্য সভ্যদের এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা।

শিল্প সমবায় ব্যাঙ্ক সর্ব্বপ্রথম বোম্বাই রাজ্য স্থাপন করে। ১৯৫৩-৫৪-সালে বোম্বাই-এর শিল্প সমবায় সমিতির সংখ্যা ভারতের অনুরূপ সমিতির এক চতুর্থাংশ ছিল, সভ্যসংখ্যা ছিল এক তৃতীয়াংশ এবং কার্য্যকরী মূলধন ছিল মোট মূলধনের অর্দ্ধেক। ১৯৫৫ সালে বোম্বাই রাজ্য সমবায় সম্মেলন আরও অনেক শিল্প সমবায় ব্যাঙ্ক সংগঠনের সুপারিশ করেন। ১৯৫৮ সালে শিল্প সমবায় সমিতির ব্যাপারে যে ওয়ার্কিং গ্রুপ নিযুক্ত হয় যা রায়ান কমিটি (Ryan Committee) নামে পরিচিত সেই কমিটি মন্তব্য করেন যে বোম্বাইতে মাত্র ছয়টি কি সাতটি সমবায় ব্যাঙ্ক রয়েছে ; কিন্তু এদের ভেতর শুধু সুরাটে অবস্থিত ব্যাঙ্ক ছাড়া কেউ তেমন আমানত সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়নি।

শিল্প সমবায় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা—নিখিল ভারত পল্লী ঋণ সমীক্ষা কমিটি মন্তব্য করেন যে, শিল্প সমবায় সমিতিদের ঋণদানের উদ্দেশ্যে পৃথক শিল্প সমবায় ব্যাঙ্ক সংগঠনের প্রয়োজন নেই। একই সমবায় ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যতটা সম্ভব কৃষি ও শিল্প ঋণদানের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু শ্রী জি. এম. লড্ তাঁর "ভারতে সমবায় ব্যাঙ্কিং" (Co-operative Banking in India) বই এ শিল্প সমিতির জন্য পৃথক ব্যাঙ্ক সংগঠনের সুপারিশ করেন। পৃথক শিল্প সমবায় ব্যাঙ্ক গঠনের স্বপক্ষে যত যুক্তিই দেখানো যাক্ না কেন এবং যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দিক হতে কৃষি সমিতির উন্নয়নে অধিকতর মনোনিবেশ করার ফলে, তার পক্ষে শিল্প-ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সামর্থ্য থাকা ও লক্ষ্য রাখা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না তবু এ কথা ঠিক যে, একই প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক উভয়প্রকার ঋণের ব্যবস্থা করার অনেক সুযোগ সুবিধাও রয়েছে। পল্লী অঞ্চলে দেখা যায় অধিকাংশ শিল্প কারিগরের একমাত্র না হলেও আংশিক অবলম্বন হচ্ছে কৃষিকার্য্য। এ ধরণের লোকের পক্ষে পৃথক শিল্প সমবায় ব্যাঙ্ক কতকগুলি অসুবিধা ও সমস্যার সৃষ্টি করবে মাত্র। কাজেই এই সব ব্যক্তিরা কৃষি ও শিল্প—এই দুই প্রকার ঋণই একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের মারফৎ সরবরাহ করাতে খুশী হবে। বোম্বাইতে পৃথক সমবায় ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠার পক্ষে কতকগুলি অনুকূল অবস্থা রয়েছে। সমবায় আন্দোলন বোম্বাইতে যতটা উন্নত অন্য কোন প্রদেশে তেমন নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে যদি কৃষি ও শিল্প ঋণ সরবরাহ করতে হয়, তাহলে তার আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে হবে ; সর্ব্বপ্রকার সরকারী সাহায্য (কৃষি ক্ষেত্রেই হোক বা শিল্প ক্ষেত্রেই হোক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে

হবে। শিল্প সমবায় সমিতিদের ঋণদান ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষতিপূরণ ব্যাপারে সরকারী আশ্বাস ও আবশ্যক। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিতে শিল্প-কারিগরদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে হবে। আবার বোম্বাইর শিল্প সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কার্য্য পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এরা ব্যাঙ্ক হিসাবে তেমন আমানত সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় নি ; ঋণ সরবরাহ ব্যাপারে ও এর কার্য্যকলাপ আশাপ্রদ নয়। কেননা এদের অধিকাংশই প্রয়োজনীয় তহবিল গড়ে তুলতে পারেনি। সমবায় আন্দোলনে অগ্রসর রাজ্যসমূহে পৃথক শিল্প সমবায় ব্যাঙ্ক সংগঠনের ব্যাপারে বোম্বাই এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা অদূরদর্শীতার কাজ হবে।

শিল্প সমবায় সমিতি সম্পর্কে রায়ান কমিটির অভিমত—রায়ান কমিটি বলেন যে ঋণ সরবরাহ ব্যাপারে শিল্প সমিতি সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ওপর নির্ভর করবে। ঋণ সরবরাহ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(১) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিতে শিল্প সমিতির উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব ; (২) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে শিল্প-বিষয়ক সাব-কমিটি নিয়োগ ; (৩) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তহবিলের প্রয়োজনীয় অংশ শিল্প সমিতির জন্য পৃথক রাখার ব্যবস্থা ;

(৪) কোন নির্দ্দিষ্ট শিল্পের ঋণ সরবরাহ ব্যাপারে সরকারী গ্যারান্টি।

কমিটি আরও বলেন যে, যদি কোথাও কোন শিল্প সমবায় ব্যাঙ্ক থাকে, তাকে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তার আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করে তুলতে হবে। কমিটির কোন কোন সভ্য সরকারের শিল্প সমিতির অংশীদার হওয়ার স্বপক্ষে মন্তব্য করেন এবং উক্ত মন্তব্য সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েছে। যদি সত্যিকারের অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান্ থাকে, তা হলে কোন স্থানে শিল্প সমবায় ব্যাঙ্ক সংগঠন করা চলবে। নতুন করে এই ব্যাঙ্ক স্থাপনের পূর্ব্বে সংশ্লিষ্ট অবস্থার পরীক্ষা আবশ্যক। বিশেষ করে পৃথক শিল্প ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় অংশগত মূলধন সংগ্রহ ও কারবার উদ্দেশ্যে কোন অঞ্চলে শিল্প সমিতির সংখ্যাধিক্য আছে কি-না, শিল্প সমিতির পরিবর্দ্ধনে অনুকূল অবস্থা আছে কিনা, স্থানীয় অন্য ঋণ-সরবরাহকারী সমবায় প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ পাওয়াতে কোন অসুবিধা আছে কিনা এবং নতুন শিল্প ব্যাঙ্ক স্থাপন করলে, তা আমানত সংগ্রহে সমর্থ হবে কিনা ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় সমবায় ব্যাঙ্কের স্থান

কোনও ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ কোনও অঞ্চলের উদ্বৃত্ত অর্থ সংগ্রহ করে আর সেই অর্থ উৎপাদন বা অনুরূপ উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করে। কাজেই ব্যাঙ্কের কাজ হচ্ছে জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত নিয়ে তা কার্য্যকরী উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো। এখন দেখা যাক্, সমবায় ব্যাঙ্ক কতটা ব্যাঙ্কের করণীয় কাজ করে। সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্যে গ্রাম্য ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। এই সুদীর্ঘ সমবায় ব্যাঙ্কের তালিকায় একমাত্র কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যাঙ্কই সাধারণ ব্যাঙ্কের করণীয় কাজের অধিকাংশই করে থাকে। কিন্তু এদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, কার্য্যকরী মূলধনের নিতান্ত নগণ্য অংশ আমানত। কার্য্যকরী মূলধনের বেশীর ভাগ আসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার থেকে কর্জ্জ হিসাবে। কাজেই প্রধান প্রধান সমবায় ব্যাঙ্কগুলিরও সত্যিকারের আধুনিক ব্যাঙ্কের সমগোত্রীয় হওয়ার মত যোগ্যতা নেই। অন্যান্য সমবায়-ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রেও আমানত গ্রহণ করে বা ডিবেঞ্চার বাজারে ছেড়ে মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে। ঐক কথায় এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে কোন রকমে ব্যাঙ্ক বলা চলে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ এদের সত্যিকারের 'ব্যাঙ্ক' আখ্যা দেওয়া চলে না। এই সমস্ত সমবায় ব্যাঙ্ককে খুব সীমিত ক্ষেত্রে 'ব্যাঙ্ক' বলা চলে।

ব্যাঙ্কিং অবস্থার দু'দিক—দেশের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্ক। ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের ভেতর যৌথ ব্যাঙ্ক, বিদেশী বিনিময় ব্যাঙ্ক, স্টেট্ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনে পরিচালিত হয়, আর সমবায় ব্যাঙ্কগুলি পরিচালিত হয় সমবায় আইনে। অবশ্য এই ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্ক—উভয় প্রকার ব্যাঙ্কই ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে জড়িত।

উভয় প্রকার ব্যাঙ্কের সম্পদ বা তহবিল—১৯৫৩ সালে সমবায় বা ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের মোট তহবিল ও আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,২৫০ কোটি টাকা। এই মোট টাকার শতকরা ১৭ ভাগ হচ্ছে সমবায় ব্যাঙ্কের। ১৯৫৩ সালে তপশীলভুক্ত ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৮৯, অতপশীল ব্যাঙ্কের সংখ্যা

৪৩৭ ও সমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৭৩। যৌথ ব্যাঙ্কের মোট তহবিলের শতকরা ৯০ ভাগ তহবিল সংগ্রহ করে, ৮৯টি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক। সমস্ত সমবায় ব্যাঙ্কের মোট তহবিলের শতকরা ৬৭ ভাগ সংগ্রহ করে ৪৭৩টি বড় বড় সমবায় ব্যাঙ্ক, আর শতকরা ৩৩ ভাগ সংগ্রহ করে অন্যান্য ১২০,০০০ সমবায় ব্যাঙ্ক।

সমবায় ও ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কের অবস্থান—পল্লী ব্যাঙ্কিং কমিটির (১৯৫০) ছোট ছোট শহরের তুলনায় বড় বড় শহরেই ব্যাঙ্কের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। ১৯৫০ সালে ভারতে শহরের সংখ্যা ছিল ২,৪৪৮। তার ভেতর ৮৬৯টি শহরে কোন ব্যাঙ্কই ছিল না। যদিও ৮৬৯টি শহরের মধ্যে ৪৯২টি ছিল জেলা শহর বা মহকুমা শহর। সাধারণতঃ মহকুমা শহরের বাইরে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক নিজেদের অফিস স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করত না। কৃষি-ঋণ সরবরাহ ব্যাপারে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক স্বভাবতঃই এগিয়ে আসত না। কেন না, কৃষি-কায্য বহুলাংশে প্রাকৃতিক অনুকূল অবস্থার ওপর নির্ভর করে; কাজেই কৃষি-ঋণদাদন ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক মোটেই নিরাপদ মনে করেনি বা করে না। তাছাড়া চাষীদের পক্ষে ব্যাঙ্কের সন্তোষজনক জামিন দেওয়াও সম্ভব নয়। ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক শস্য-জামিনকে উৎকৃষ্ট জামিনরূপে মেনে নিতে চায় না; কারণ এতে ঘন ঘন তদারকী ও পরিদর্শন আবশ্যক হয়। তবে কৃষি ক্ষেত্রে ঋণদাদন একমাত্র কৃষিজাত দ্রব্যের জামিনে 'আগাম ঋণেই' সীমাবদ্ধ রয়েছে। পৌর সমবায় ব্যাঙ্কগুলি কিন্তু কতকটা ব্যাঙ্কের কাজ করছে। পল্লী অঞ্চলে গ্রামবাসীদের উপকারার্থে ব্যাঙ্কিং-এর কাজ করছে সমবায় ঋণদান সমিতি ও পোস্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কগুলি। কাজেই গ্রামীণ অর্থনীতির দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, সমবায় ব্যাঙ্ক সত্যিকারের চাষীদের উপকার তথা গ্রামীণ উন্নয়নে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছে পল্লী অঞ্চলে, এবং তাই দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় সমবায় ব্যাঙ্কের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে অধিকতর সুদৃঢ় সমবায় ব্যাঙ্ক সংগঠনই প্রকৃত আদর্শ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সমবায় চাষ

উৎপাদন সমবায়

ভারতে উৎপাদন সমবায় সম্প্রতি কাজ সুরু করেছে। পণ্য-উৎপাদনের কাজ ক্রেতা সমবায় ও উৎপাদন-সমবায়—উভয়েই করে থাকে। তবে ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশসমূহের মত পণ্য-উৎপাদনের কাজ ক্রেতা সমবায় করবে কি-না, সে সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। ভারতের উৎপাদন সমবায়গুলিকে কৃষি-উৎপাদন সমবায় ও অকৃষি-উৎপাদন সমবায়—এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

সাধারণতঃ কৃষি-উৎপাদন সমবায়গুলি হচ্ছে—(১) জোত একত্রীকরণ সমবায়, (২) কৃষি-উৎপাদন সহায়ক সমবায়, (৩) সেচ সমবায়, (৪) সমবায় চাষ, (৫) দুগ্ধ সমবায় ইত্যাদি। কৃষি-উৎপাদন সমবায়গুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে, উৎপাদনকারী হিসাবে চাষীদের কৃষি-সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারে সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য কোনও সমবায় প্রতিষ্ঠান। আবার ছোট-খাটো কুটির শিল্প—যেমন, হস্তচালিত তাঁত, কামারের জিনিসপত্তর, মাদুর তৈরী, মাটির জিনিসপত্তর তৈরী করার জন্য সমবায় হচ্ছে অকৃষি উৎপাদন সমবায়ের অন্তর্গত।

সমবায় চাষ—সাধারণতঃ চার রকমের বৃহদাকার যৌথ চাষেব ব্যবস্থা দেখা যায়, যেমন, সমবায় চাষ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় চাষ-ব্যবস্থা, যৌথ কারবারী চাষ-ব্যবস্থা ও সমষ্টিগত চাষ-ব্যবস্থা। বিদেশের চাষ-ব্যবস্থা, বিশেষ করে সমবায় চাষ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

রাশিয়া—রাশিয়ার রাজতন্ত্রে জার (Tzar)এর রাজত্বকালে, রাশিয়ার চাষ-ব্যবস্থা বল্‌তে গেলে খুবই খারাপ ছিল। এশিয়ার অধিকাংশ দেশের মতো জমিগুলি শতধা-বিভক্ত ছিল। দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল শতকরা ৮ জন। কিন্তু ১৯১৭ সালের রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে। দেশের জমিদারদের সমস্ত জোত-জমা বাজেয়াপ্ত করে চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত চাষ-ব্যবস্থার স্থলে সমষ্টিগত চাষের ওপর জোর দেওয়া হয়। শীঘ্রই বেশ কিছু বৃহদাকার সরকারী চাষ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে; কিন্তু সরকার কর্ত্তৃক এই চাষ ব্যবস্থা বা ক্রেতা সমবায় কর্ত্তৃক চাষ-ব্যবস্থা সত্যিকারের ভাল কাজ করতে পারল না। এই সমষ্টিগত যৌথ চাষকে নাম দেওয়া হল,

'কোলখোজ' (Kolkhoz)। কোলখোজে স্থানীয় চাষী পরিবারবর্গ তাদের জমিজমা ও অন্যান্য কৃষি-উপকরণ একত্র করে নিজেদের নির্ব্বাচিত কমিটির অধীনে কাজ করে। চাষী সভ্যগণ কিন্তু চিরকালের মত তাদের জমির স্বত্ব 'কোলখোজ'কে দান করে দেয়। আবার কৃষি-উৎপাদন সম্পর্কিত যাবতীয় জিনিস—যেমন, গরু, কৃষি-যন্ত্রপাতি ইত্যাদিও সব রাষ্ট্রায়ত্তাধীনে আনা হয়েছে। সভ্যদের সবাইকে জমিতে কাজ করতে হয়। উদ্বৃত্ত উৎপাদন সভ্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়; কিন্তু আয় স্বতন্ত্র এবং সভ্যেরা তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে বাস করে। অবশ্য প্রত্যেক সভ্যেরই কিছু গৃহসংলগ্ন জমি আছে, যদিও তার পরিমাণ খুবই কম। এই জমিতেও তারা চাষাবাদ করে এবং উৎপন্ন শস্য বা শাক-সবজি নিজেরাই ভোগ করে। কোলখোজ-এ আধুনিক যন্ত্রপাতি অত্যাধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। কোলখোজের চাষ-ব্যবস্থায় সরকারের 'মেশিন ট্রাক্টর স্টেশন' (Machine Tractor Station)গুলির একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। এই স্টেশনগুলি ট্রাক্টর ও শস্য উত্তোলনের জন্য যন্ত্রপাতি 'কোল-খোজ'কে কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ভাড়া দেয়। অবশ্য প্রথমে কোলখোজের নিজস্ব ট্রাক্টর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, সভ্যদের মধ্যে এইসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার মত প্রয়োজনীয় দক্ষতা নেই বা এদের মেরামত বা কার্য্যক্ষম অবস্থায় রাখা বহু ব্যয়সাপেক্ষ, তখন সরকার 'মেশিন ট্রাক্টর স্টেশন' চালু করেন। রাশিয়ায় বর্ত্তমানে শতকরা ৯৫ ভাগ জমি এইরূপ সমষ্টিগত ভাবে চাষ হয় এবং সুচারু চাষ ব্যবস্থার জন্য প্রায় ৫ লক্ষ ট্রাক্টর ও অন্যান্য আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি, এইসব 'মেশিন ট্রাক্টর স্টেশনে' রয়েছে। কোলখোজের আয়তন সব জায়গায় সমান নয়। ৬০০ থেকে ৪০০০ একর অবধি জমি নিয়ে এক একটি কোলখোজ কাজ করছে। যে কোন সভ্যের কোলখোজ থেকে চলে আসতে বাধা নেই; তবে জমি কিন্তু আর ফেরত দেওয়া হয় না। যারা জমিতে কাজ করে তাদের দৈনন্দিন কাজের তারতম্য অনুযায়ী মজুরী দেওয়া হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে ভাল কাজের জন্য 'বোনাস' দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। উৎপন্ন শস্যের কিছু অংশ 'কোলখোজ' নিজেই রেখে দেয়, বাকীটা হতে ট্যাক্স, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাশুল দিতে হয় এবং বাকী অংশ বিক্রী করা হয়। এই সমষ্টিগত চাষের মাধ্যমে শস্যোৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে এবং ফলে চাষীদের আর্থিক অবস্থার সম্যক উন্নতি হয়েছে। শিক্ষিত চাষীদের সংখ্যা শতকরা ৮ ভাগ থেকে ৮৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়ার অর্থনৈতিক

ব্যবস্থায় 'কোলখোজ' একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই প্রসঙ্গে 'World Co-operative Movement' বইএ শ্রীমতী মার্গারেট ডিগবির মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইনি বলেছেন, প্রথমে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধাররা চেয়েছিল সমষ্টিগত তথা জমি জাতীয়করণ সম্পূর্ণ করতে। কিন্তু দেখা গেল, এই সরকার প্রণোদিত সমষ্টিগত চাষ ব্যবস্থা সাধারণ চাষী সভ্যদের আকৃষ্ট করতে পারছে না; কেননা বহুকাল ধরে চাষীরা তাদের নিজস্ব ছোট ছোট জমিতে চাষাবাদ করত। তাই নিজ জমির ওপর আসক্তি বা মমত্ববোধ পুরোপুরি ভাবেই বজায় ছিল। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত গৃহ সংলগ্ন কিছু কিছু জমি সভ্যদের দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। অবশ্য জমির পরিমাণ কোন ক্ষেত্রেই ২½ একরের বেশী দেওয়া হ'ল না। তাছাড়া ষাঁড়-বলদ ইত্যাদি রাখারও একটা উর্দ্ধতম সীমা বেঁধে দেওয়া হল। এই ধরনের প্রচেষ্টা সাধারণ চাষীদের খুশী করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু দেখা গেল, চাষীরা নিজেদের জমি বা বলদ ইত্যাদির ওপরই বেশী নজর দিচ্ছে; আর কোলখোজের কাজে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। অবশ্য এই সমস্যা সমাধানে সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করলেও, আজ অবধি তেমন একটা সুরাহা করে উঠ্‌তে পারেন নি।

প্যালেস্টাইন বা ইস্রায়েল—প্যালেস্টাইনে, ইহুদী জাতীয় তহবিলের টাকা দিয়ে জমি কিনে ইহুদী পরিবারকে ৪৯ বছরের মেয়াদে চাষাবাদের জন্য দেওয়া হয়। এ সমস্ত জমিতে ইহুদীরা ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে চাষাবাদ করে। সমষ্টিগত চাষ-ব্যবস্থায় 'কিব্‌বুৎ' (Kibbutz) একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এখানে সভ্যগণ ব্যক্তিগতভাবে কোন সম্পত্তির অধিকারী নন। সমস্ত সম্পত্তির মালিক হচ্ছে 'কিব্‌বুৎ' প্রতিষ্ঠান। একটি কার্য্যকরী কমিটি বিভিন্ন উপ-কমিটি (Sub-Committee)র মাধ্যমে কিব্‌বুতের বিভিন্ন কার্য্যধারা পরিচালনা করে। জমিতে কাজ কবার জন্য সভ্যেরা কোন মজুরী পায় না। তাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও থাকা, খাওয়া, পরা ইত্যাদি 'কিব্‌বুৎ'ই সরবরাহ করে। অবশ্য কোন সভ্য যে কোন সময় 'কিব্‌বুৎ' থেকে সরে আসতে পারে। তখন সে কিছু নিয়ে আসে না। তেমনি 'কিব্‌বুৎ'-এ যোগদানের সময়ও কিছু নিয়ে যেতে হয় না। 'কিব্‌বুতের কাজকর্ম্ম সাধারণতঃ কর্জ্জ করেই চলে। বড় বড় 'কিব্‌বুৎ' আবার বড় বড় কারখানাও চালায়। সেখানে ভোগ্য-পণ্য ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন করা হয়। 'কিব্‌বুতের' উৎপন্ন শস্য বিপণন সমিতিকে বা বিপণন সমিতির মাধ্যমে বা খোলা বাজারে বিক্রী হয়।

ক্লাব, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিও 'কিব্বুৎ'-এ রয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, "প্যালেস্টাইনের সমবায় চাষ এবং রাশিয়ার সমষ্টিগত চাষ ("কোলখোজ') এক নয়। এই দুই দেশের চাষ ব্যবস্থার উৎপত্তি বা কর্ম্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা, কারোর কোন মিল নেই।" মার্গারেট ডিগ্‌বি বলেন, "রাশিয়ার সমষ্টিগত চাষের চেয়ে প্যালেস্টাইনের 'কিব্বুৎ'-এ বরং সাম্যবাদের রূপ পুরোপুরি ফুটে উঠেছে।"

মেক্সিকো—মেক্সিকোতে সমবায় চাষের প্রবর্ত্তনের মূলে রয়েছে সরকারের ভূমি সংস্কারের প্রচেষ্টা। ভূমিহীন চাষী যাতে প্রয়োজনীয় জমি পেতে পারে ও চাষাবাদ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হল রাষ্ট্রপতির ডিক্রী জারিতে। ১৯৩৬ সালে ডিক্রীতে বড় বড় জোতদারদের প্রায় ৩২৫,৩৮০ একর আবাদী জমি ও ৮৭৩,২৭২ একর পতিত জমি দখল করে প্রায় ৩২,০০০ নিম্ন আয় বিশিষ্ট চাষীদের ভাগ করে দেওয়া হয়। তার আগে অধিকাংশ চাষীই ছিল ভূমিহীন বা জমিদারদের অধীনস্থ। আবার, শতকরা ৮০ ভাগ লোক চাষের ওপর নির্ভর করত। জমি ভাগ করে দেওয়ার একটা শর্ত্ত ছিল যে, চাষীদের 'এজিডো' (Ejido) নামে এক সমষ্টিগত চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। 'এজিডো' গঠন করতে গেলে অন্ততঃ ২০ জন পুরুষ চাষীকে সংঘবদ্ধ হয়ে সরকারের কাছে জমি চাইতে হত। 'এজিডোতে' সভ্যগণ জমিতে চাষাবাদ এবং উৎপন্ন শস্য ব্যবহার করতে পারে। জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি কিন্তু হস্তান্তর যোগ্য নয়। চাষাবাদের কাজ যৌথভাবেই চলে এবং অন্যান্য ব্যাপারে সভ্যগণ তাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। নির্ব্বাচিত কমিটির পরিচালনাধীনে 'এজিডো'র কাজ চলে। জমিতে কাজ করার জন্য সভ্যগণ মজুরী পায়; তবে কাজের দক্ষতা অনুযায়ী মজুরীর হারের তারতম্য ঘটে। কর্জ্জের টাকা পরিশোধ করার পর ও বিভিন্ন খরচ করার পর যেটুকু উদ্বৃত্ত আয় থাকে, তা জমিতে যে যত সময় কাজ করেছে সেই সময়ের ওপর ভিত্তি করে সভ্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। 'এজিডো'র অধিকাংশ সভ্যই গরীব ও অশিক্ষিত। প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধানের জন্য সরকারের দুটো বিভাগ রয়েছে, যথা—(১) জাতীয় কৃষি কমিশন (তদারকের জন্য), (২) এজিডোর জাতীয় ব্যাঙ্ক (ঋণ সরবরাহের জন্য)।

সমবায় চাষের প্রয়োজনীয়তা ও বিভিন্ন কমিটির মতামত—

প্রয়োজনীয়তা—ভারতের জনসংখ্যার পরিমাণ দিনদিনই বেড়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে জমির ওপর চাপও বাড়ছে। এই বিপুল জনসংখ্যার খাদ্য

সংস্থানের জন্য খাদ্য-উৎপাদন বাড়াতে হবে। তা'ছাড়া প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ যেমন, বন্যা, অনাবৃষ্টি বা দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির হাত থেকে রেহাই পেতে হলেও যথেষ্ট খাদ্য মজুত রাখা দরকার। দেশের দ্রুত শিল্প উন্নয়নের জন্য খাদ্যশস্য আমদানীতে যে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে, তার সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। ভারতে জমিতে শস্য ফলনও যথেষ্ট নয়। ছোট ছোট বহু জমি ছড়ানো রয়েছে এদেশে। জমির উন্নয়ন বা শস্য অধিক ফলাতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা চাষীদের নেই। উন্নত ধরনের কৃষি-ব্যবস্থা বৃহদাকার খামারেই সম্ভব। কাজেই সমবায় চাষ উপরিউক্ত সমস্যা সমাধানের উপায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায়ের কার্য্যধারা ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে এবং কৃষি-কার্য্য বা চাষ ব্যবসায়ও সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা অর্থনীতিবিদ বা সমবায়ীগণ উপলব্ধি করেছেন।

১৯৩৪ সালেই প্রথম কৃষি-গবেষণা সম্পর্কিত রাজকীয় কাউন্সিল-এর উপদেষ্টা বোর্ড (Advisory Board of the Imperial Council of Agricultural Research) সমবায় চাষের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৯৪৪ সালের বোম্বাই পরিকল্পনাও সমবায় চাষের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। ১৯৪৫ সালে সমবায় পরিকল্পনা কমিটি (Co-operative Planning Committee) বলেন যে, কৃষি-উৎপাদনে কোনরকমের বৃহদাকার চাষ ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং সমবায় যৌথ-চাষই হচ্ছে চারটি বিভিন্ন বৃহদাকার চাষ ব্যবস্থার অন্যতম। ১৯৪৬ সালে ভারত সরকার প্যালেস্টাইনের সমবায় ও সমষ্টিগত চাষ ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করার জন্য একটি দল পাঠান। এই দল প্যালেস্টাইনে সমষ্টিগত চাষের সাফল্যে বিবিধ কারণের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে ভারতে তার প্রয়োগ সম্ভব নয়, কেননা প্যালেস্টাইনের ভূমি-ব্যবস্থা, ইহুদীদের জাতীয় আবাস স্থাপনের সুদৃঢ় প্রচেষ্টা, উচুদরের শিক্ষা ও বুদ্ধি, পর্য্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা ইত্যাদি ভারতে বিরল। প্যালেস্টাইন হতে আগত ভারতীয় দল কিন্তু সমবায় চাষ ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করেন। ১৯৪৭ সালের কৃষি-সংস্কার কমিটি (Agrarian Reforms Committee) বলেন যে, চাষীদের ক্ষুদ্রায়তন জমিগুলি একত্র করে সমবায় যৌথ চাষের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন এদেশে সমবায় চাষ-ব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। মিঃ তারলোক সিং তাঁর বই, "দারিদ্র্য ও সামাজিক পরিবর্ত্তন" (Poverty and Social Change)-এ গ্রামের সমস্ত জমি একত্র করে ১০০

কিংবা ২০০ একরভুক্ত ৫, ৭ বা ১০টি কৃষি-খামার চালু করার কথা বলেন। প্রত্যেক চাষীর জমির মালিকানা পুরোপুরি বজায় থাকবে এবং জমি থেকে যে আয় হবে, তা দু'ভাবে বণ্টন করা হবে—যেমন, জমির মালিকানার জন্য ও জমিতে কাজ করার জন্য।

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বিশেষজ্ঞ ডাঃ অটো শীলার (Otto Schiller) বলেন যে, সমবায় ভিত্তিতে ব্যক্তিগত চাষ ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে বিশেষ প্রযোজ্য।

শ্রীযুক্ত পাতিলের নেতৃত্বে যে ভারতীয় দল চীনদেশে গিয়েছিল, তার অধিকাংশ সভ্যই বলেছেন যে, যদিও চাষী তার মালিকানা বিসর্জন দিচ্ছে, তবু এই ক্ষতির চেয়ে চাষী ঢের বেশী লাভ পাচ্ছে সমবায় চাষ থেকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশের অধিকাংশেরই মত সমবায় যৌথ-চাষের প্রবর্তন করা।

সমবায় চাষের উপকারিতা—

সমবায় চাষ-ব্যবস্থা চাষের খরচা কমিয়ে দেবে ও শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনে ও খাদ্য-শস্যে স্বাবলম্বী হতে গেলে সমবায় চাষ অপরিহার্য্য। চাষীরা ব্যক্তিগতভাবে দামী কৃষি-যন্ত্রপাতি কিনতে সক্ষম হয় না এবং তার ফলে তা ব্যবহার করতে পারে না। কিন্তু সমবায় সমিতির মাধ্যমে তা সম্ভব হয়। চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় ও উৎপন্ন শস্য বিক্রয়ে অনেক সুবিধাও পাওয়া যায়। সমবায় চাষে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যও রয়েছে। চাষীদের ভেতর একটা সামাজিকতা বোধ ও সঙ্ঘবদ্ধতা জেগে উঠবে এবং এভাবে লোভ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি দোষগুলি পরিহারেও সমর্থ হবে। সমিতিতে প্রত্যেক সভ্যের স্বার্থ জড়িত থাকাতে সত্যিকারের চাষীরা আর্থিক দিক হতে অধিকতর সচ্ছল হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই চাষীদের জীবনমান অনেকটা বেড়ে যাবে। সরকারের পক্ষেও কৃষিক্ষেত্রে গবেষণার ফল খুব সহজেই চাষীদের দেখানো সম্ভবপর হবে ও কৃষি-উৎপাদনের সম্বন্ধে একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা করে তা কাজে রূপদানে সরকার সমর্থ হবে। গণতন্ত্র-সম্মত প্রতিষ্ঠান হিসাবে চাষীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নেও সমবায় চাষের একটা বিশেষ অবদান রয়েছে।

ভারতে সমবায় চাষ প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনা—

আমাদের দেশে খাদ্য-শস্যের ঘাটতি বহুদিন ধরে চলে আস্‌ছে। এই ঘাটতি সমস্যার সমাধান করতে হলে বিশাল কৃষি-ভূমির সংস্কার অত্যাবশ্যক। তাছাড়া আশ্রয়প্রার্থীদের ও যুদ্ধ ফেরত লোকদের পুনর্বাসনও প্রয়োজন। সারা দেশব্যাপী প্রায় ৮৯০ লক্ষ একর চাষোপযোগী জমি ছড়িয়ে আছে। এই রকম প্রায় ৬০ লক্ষ একর জমিতে চাষাবাদের জন্য ইতিমধ্যেই সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এবং উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, পূর্ব্ব পাঞ্জাব ও দিল্লীতে সমবায়ের ভিত্তিতে অনেক জমিতে ঔপনিবেশ গড়ে উঠেছে। এই সব জমিতে সমবায় চাষের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। বিবিধ সর্ব্বার্থসাধক নদী-পরিকল্পনা, যথা—দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, হিরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনা, কুশী নদী পরিকল্পনা প্রভৃতিতে প্রায় ১০০ লক্ষ একর জমির সেচ ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গেও বহু জমি উদ্বৃত্ত হবে। এই সব উদ্বৃত্ত জমিতে ও সেচ-সিক্ত জমিতে সমবায় চাষ প্রবর্ত্তনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সব চেয়ে কঠিন সমস্যা দাঁড়িয়েছে দেশের চাষীদের ছোট ছোট জমিগুলি নিয়ে সমবায় চাষের ব্যবস্থা করা। সমবায় যৌথ চাষ সরকার নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন; কাজেই এই সব ব্যক্তিগত মালিকানা-সত্ত্বের জমিগুলিতেও সমবায় চাষের ব্যবস্থা করতে হবে।

সমবায় চাষ প্রবর্ত্তনে অসুবিধা—

ভারতে যদিও সমবায় চাষের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে, তবুও তা প্রবর্ত্তনে অনেক অসুবিধা দেখা যায়।

অশিক্ষিত চাষী পূর্ব্বপুরুষদের সেকেলে চাষ ব্যবস্থা ছেড়ে দিতে রাজী নয়। তাছাড়া সমবায় চাষের গুণ সম্পর্কে চাষীকে পুরোপুরি বুঝিয়ে তোলা শক্ত ব্যাপার। চাষীর জমির প্রতি মমত্ববোধ প্রবল। অহেতুক ব্যক্তিগত মালিকানাবোধ সত্যিকারের সমবায় মনোভাবের পরিপন্থী। গ্রামাঞ্চলে সমবায় সমিতির পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় লোকেরও অভাব। তাই কোথায়ও সমবায় চাষ সমিতি স্থাপিত হলেও তার যথার্থ পরিচালনায় অভিজ্ঞ লোকের অভাব দেখা গেছে। কোথাও কোথাও পরিচালনখাতে এত খরচা হয়েছে যে, অধিকতর উৎপাদন করা সত্ত্বেও তার ফল তেমন ভোগ করা সম্ভব হয়নি। সভ্যদের ভেতর সমষ্টিগত দায়িত্বের অভাব থাকায়,

সমিতির সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহারেও অনেক জায়গায় সমিতির যথেষ্ট লোকসান হয়েছে। তাছাড়া পল্লী অঞ্চলে দলাদলি ত' লেগেই আছে। এই সব দলাদলিও সমবায় সমিতি সংগঠনের বাধার সৃষ্টি করেছে। তারপর সভ্যদের ভেতর সমস্বার্থ না থাকায় সমিতির সাফল্য ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। বলদ-গরুর অপ্রাচুর্য্য, সেচ ব্যবস্থার অভাব, গুদামঘরের অভাব ইত্যাদিও সববায় চাষ উন্নয়নে বাধাস্বরূপ।

সমবায় চাষের রকমভেদ—

ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আগেও সমবায় চাষের প্রবর্ত্তন হয়েছিল। সমবায় পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এদেশে চার রকমের সমবায় চাষের ব্যবস্থা হয়, যথা—

(১) উন্নত প্রথায় চাষ (Better Farming)
(২) প্রজাস্বত্ব সমতুল চাষ (Tenant Farming)
(৩) যৌথ চাষ (Joint Farming)
(৪) সমষ্টিগত চাষ (Collective Farming)।

(১) **উন্নত প্রথায় সমবায় চাষ সমিতি** (Co-operative Better Farming Society) :—সমিতির সভ্যগণ ব্যক্তিগতভাবে তাদের জমির মালিক। তবে সমিতির নির্দ্দেশ অনুযায়ী নিজ নিজ জমিতে উন্নত ধরনের চাষ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে। সমিতি সভ্যদের উন্নত ধরনের বীজ, রাসায়নিক সার, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দিয়ে থাকে। আবার ঋণ, বিপণন, জমি উন্নয়ন, সেচ ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করে থাকে। একসঙ্গে চাষ, জমি পাহারা দেওয়া, বীজ বপন ইত্যাদি কাজও সমিতি করতে পারে। এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য সভ্যগণ সমিতিকে পারিশ্রমিকের মত যথাযথ মূল্য দিয়ে থাকে। এই ধরনের সমবায় চাষে সভ্যগণ নিজ নিজ জমি নিজেরাই চাষ করে, লাভ লোকসান নিজেদেরই হয়। এই ধরনের সমবায় চাষ অনেকটা সেবা সমিতিরই অনুরূপ। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই রকম সমিতিকে সমবায় চাষ-সমিতি বলে ধরা হয় নি।

(২) **প্রজাস্বত্ব সমতুল সমবায় চাষ সমিতি** (Co-op. Tenant Farming Socity)—এই ধরনের সমিতিতে একটা বিরাট জমি বা এলাকা সমিতি কিনে নেয় বা স্থায়ী বা অস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নেয়। তারপর সমস্ত জমি ছোট ছোট প্লটে বা জোতে ভাগ করে সভ্যদের বিলি করা হয়। সভ্যগণ প্রজা হিসাবে কাজ করে। আর সমিতি অনেকটা জমিদারের মত কাজ করে। জমি চাষ করার জন্য সভ্যরা সমিতিতে খাজনা দেয়। সমিতি নিজে চাষাবাদ করে না।

সাধারণ সভা জমিগুলি কি ভাবে চাষ করা হবে, তার পরিকল্পনা ঠিক করে দেয়। সভ্যগণ কিন্তু নিজেরাই খুশীমত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করে। সমিতি ঋণ, বীজ, সার, দামী কৃষি যন্ত্রপাতি সভ্যদের দেওয়ার ব্যবস্থা ও উৎপন্ন শস্য বিপণনের ব্যবস্থা করে থাকে। তবে সভ্যগণ এসব সুযোগ সুবিধা নিতে পারে, নাও নিতে পারে। সমিতির যে লাভ হয় তা যে সভ্য যত খাজনা সমিতিকে দিয়েছে সেই অনুপাতে সভ্যদের ভাগ করে দেওয়া হয়।

(৩) **সমবায় যৌথ চাষ** (Co-operative Joint Farming)—এই ধরনের সমিতিতে ভূমিদার চাষী তাদের জমি একত্রিত করে সমিতির হেফাজতে দিয়ে দেয়। জমির মালিকানা কিন্তু সভ্যদেরই থাকে। জমির চাষাবাদ ইত্যাদি কাজ সমিতি করে থাকে, সভ্যরা জমিতে কাজ করতে পারে এবং তার জন্য মজুরী পেতে পারে। প্রয়োজন হলে কিছু বাইরের মজুরও নেওয়া হয়ে থাকে। সমষ্টিগত ভাবে সমিতি কর্জ্জদাদন, যন্ত্রপাতি সরবরাহ, উৎপন্ন শস্য বিপণন প্রভৃতির ভার নেয়। সমিতির সভ্যপদ স্বেচ্ছাধীন। সমিতি থেকে সভ্যগণ সরেও আসতে পারে। তবে সভ্যের জমি উন্নয়নে সমিতির খরচা হওয়াতে সভ্যকে উন্নয়ন খাতে কিছু খেসারত দিতে হয়। চাষাবাদের খরচ বহনের পরও ও বিভিন্ন তহবিলে টাকা রাখার পর জমির উপর কিছু লভ্যাংশ দেওয়া হয়। এই লভ্যাংশ সমিতির লাভের অংশ হিসাবে বা সভ্যের জমির মূল্য অনুপাতেও দেওয়া হয়ে থাকে। উৎপন্ন শস্য বিক্রীর পর আয় সাধারণতঃ নিম্নলিখিত খাতে ব্যয় হয়:—

(১) চাষাবাদের খরচ, (২) জমি ব্যবহারের জন্য মালিককে অর্থদান (৩) মজুরের মজুরী, (৪) সমিতির পরিচালন খাতে ব্যয়, (৫) সমিতি কর্তৃক অর্থগ্রহণের উপর সুদ। এই সব খরচের পর নীট মুনাফা পাওয়া যায় এবং এই মুনাফার কিছু অংশ সংরক্ষিত তহবিলে রাখতে হয়। আর বাকী অংশ সভ্যগণ মজুরীর অনুপাতে ভাগ করে নেয়। সমিতি সাধারণতঃ শস্য-উৎপাদন পরিচালনা, সমষ্টিগত চাষাবাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়, উৎপন্ন শস্য বিক্রয়, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও জমির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতির কাজ করে থাকে। কি ভাবে জমি চাষাবাদ করতে হবে, উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কি কি করা দরকার ইত্যাদি সমিতিই ঠিক করে দেয়। নিজলিঙ্গাপ্পা কমিটি এই ধরনের সমিতি সংগঠন ও অন্যান্য বিষয়ে বিষদ বিবরণী দিয়েছেন।

(৪) **সমবায় যৌথ খামার** (Co-operative Collective Farming)—এই ধরনের সমিতি বৃহৎ এলাকা নিয়ে জমি সংগ্রহ করে। জমি

সংগ্রহের কাজ সে কিনে, অস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে বা বিনামূল্যেও সমাধা করতে পারে। সমিতিই জমির মালিক। আবার জোতদাররাও তাদের জমি নিয়ে এই ধরনের সমিতি করতে পারে। এক্ষেত্রে জমির মালিকানা জোতদারদের থাকে না—সমিতি পুরোপুরি মালিক হয়ে যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সমবায় যৌথ চাষ সমিতি শুধু যৌথ চাষেরই অধিকারী হয়। জমির মালিকানা সমিতির থাকে না কিন্তু যৌথ খামারের বেলায় ঐ দুটোই অর্থাৎ চাষ ও জমির মালিকানার অধিকার সমিতির থাকে। সভ্যগণ জমিতে চাষাবাদের কাজ করে এবং বিনিময়ে মজুরী পায়। সমিতি তার যাবতীয় খরচ বহন করার পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তার কিছু অংশ সংরক্ষিত তহবিলে রেখে বাকীটা সভ্যদের মজুরীর অনুপাতে ভাগ করে দেয়।

সমবায় যৌথ খামার ও রাশিয়ার যৌথ খামার কিন্তু এক নয়। কারণ, উৎপাদন, মূল্য নির্দ্ধারণ ইত্যাদি ব্যাপারে রাশিয়ার যৌথ খামারকে সরকারী নির্দেশ মেনে চলতে হয়। কাজেই এই ধরনের যৌথ খামারে গণতন্ত্র সম্মত কার্য্য পরিচালন সম্ভব নয়। রাশিয়ার 'কোলখোজে' স্বতঃপ্রবৃত্ত মনোভাব বা গণতান্ত্রিক পরিচালনার স্থান নেই। কিন্তু সমবায় যৌথ খামারে সভ্যপদ ঐচ্ছিক পরিচালন ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক।

সমবায় যৌথ চাষ ও যৌথ খামারের মধ্যে পার্থক্য—

সমবায় যৌথ চাষ সমিতিতে সভ্যদের জমির মালিকানা বজায় থাকে; কিন্তু যৌথ খামারে তা থাকে না। কারণ, খামারই প্রকৃত পক্ষে জমির মালিকানা পায়। খামারে জমি দান করার জন্য আইন অনুযায়ী কিছু পারিশ্রমিক পেতে পারে। কিন্তু সমবায় যৌথ চাষ সমিতিতে জমির মালিকানার জন্য মালিক সভ্যদের লভ্যাংশ দেওয়া হয়; যৌথ খামারে তা সাধারণতঃ সম্ভব নয়। অবশ্য উভয় প্রকার খামারে যৌথ চাষের ব্যবস্থা রয়েছে। সমবায় পরিকল্পনা কমিটি বলেন যে, জমি পাওয়া সম্ভব হলে প্রয়োজন ক্ষেত্রে সমবায় যৌথ খামার বা প্রজাস্বত্ব সমতুল চাষ সমিতি সংগঠন করা যেতে পারে। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন, ভূমিহীন চাষী বা যুদ্ধ ফেরত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে এ ধরনের সমিতি গঠন করা যায়। মাদ্রাজে উপনিবেশ সমিতিগুলি এই ধরনের। ব্যাপকভাবে উন্নত চাষ সমবায় সংগঠনের কথাও কমিটি বলেন। যৌথ চাষ সম্পর্কে কমিটি বলেন যে, এই ধরনের সমিতি সংগঠন খুব শক্ত কাজ। এই সমিতি সংগঠন

সার্থক করতে হলে সরকারকে দান খয়রাৎ ও নানারকম সাহায্য করতে হবে।
১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতের সমবায় চাষ সমিতিগুলির রূপ নীচে দেওয়া হইল :—

সমিতির সংখ্যা

উন্নত চাষ	যৌথ চাষ	যৌথ খামার	প্রজাস্বত্ব সমতুল চাষ সমিতি	মোট
৭৭১	১,১৬৮	৬৮৯	১,৫৬০	৪,১৯৩

সভ্যসংখ্যা—২৩৩,৩৫০। কার্য্যকরী মূলধন—৭·১২ কোটি টাকা।

চাষের জমির পরিমাণ—৪·৫৫ লক্ষ একর।

রাজ্য ভিত্তিতে সমবায় চাষ সমিতির রূপ

রাজ্য	উন্নত চাষ	যৌথ চাষ	যৌথ খামার	প্রজাস্বত্ব সমতুল চাষ সমিতি	মোট	সভ্যসংখ্যা
অন্ধ্র	—	৯	১২	১০৮০	১১০১	১২০,৩০৯
আসাম	২২	২৪	১৪৪	২৬	২১৬	৮,৭৪৫
বিহার	৫	৪০	৬	২	৫৩	১,৫৪১
বোম্বাই	৯১	৮২	২২০	২২৮	৬২১	২১,২১৯
জম্মু ও কাশ্মীর	১	৪	—	—	৫	৫৮২
কেরালা	১৯	৭৪	১০	৩	১০৬	১০,৬৫৪
মধ্যপ্রদেশ	১৪৩	৩৯	১১৪	৬	৩০২	০,৭০৫
মাদ্রাজ	—	১০	১৩	৫৬	৭৯	৬,৪৩৫
মহীশূর	৪৪	১৬	২০	৪৯	১২৯	৮,৩৪০
উড়িষ্যা	—	২১	৪	৩	২৮	৮৮০
পাঞ্জাব	১৪৮	৫৫৮	১	২৯	৭৩৬	১৩,১১০
রাজস্থান	২২	২৬	৭৪	৬৯	১৯১	৩,৮১২
পশ্চিমবঙ্গ	১৫৫	৪২	৪০	২	২৩৯	৯,৭৭৯
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	—	—	—	—	৫	২৬৩
হিমাচল প্রদেশ	৭	—	—	—	৭	২১৯
মণিপুর	—	—	১২	৪	১৬	৬৯৭
ত্রিপুরা	১৭	—	২	২	২১	২,২৬২

উন্নত চাষ বা প্রজাস্বত্ব সমতুল চাষ সমবায় কি সত্যিকারের সমবায় চাষ সমিতি?

সমবায় পরিকল্পনা কমিটি চার রকমের সমবায় চাষের কথা বললেও, সত্যিকারের 'সমবায় চাষ' বল্তে কি বুঝায় এ সম্পর্কে অনেকের মনে সন্দেহ রয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'সমবায় চাষ' বলতে জমি একত্রীকরণ ও যৌথ পরিচালনার উল্লেখ আছে। ১৯৫৯ সালে মুসৌরীতে অনুষ্ঠিত রাজ্য সমবায় মন্ত্রীদের সম্মেলনেও অনুরূপ মন্তব্য করা হয়। কিন্তু নিজ লিঙ্গপ্পা কমিটির মতে 'উন্নত চাষ সমবায়' বা 'প্রজাস্বত্ব সমতুল চাষ সমবায়ে' সভ্যগণ জমি চাষাবাদের ব্যাপারে অনেকটা স্বাবলম্বী—নিজের খেয়াল খুশীমত কাজ করতে পারে। কাজেই এ ধরনের সমিতি উন্নত ধরনের সেবা সমিতিরই নামান্তর মাত্র।

সমবায় ভিত্তিতে ব্যক্তিগত চাষের ব্যাপারে ডাঃ অটো শীলারের পরিকল্পনা—

ডাঃ অটো শীলার পাকিস্তানে কৃষি উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করার জন্য পাকিস্তানে আসেন। ইনি পশ্চিম পাঞ্জাবের চাষ ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও চাষ ব্যবস্থা দেখতে আসেন। তাঁর বিবরণীতে তিনি বলেছেন যে, ভারতের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমবায়ের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত ভাবে চাষ ব্যবস্থা করা চলে। ইনি বলেছেন যে, চাষীর স্বাতন্ত্র্য, নিজের জমিতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজ করার পদ্ধতি, জমির মালিকানা প্রভৃতি বজায় রেখে নিজেদের সমবায় ভিত্তিতে চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরনের সমিতিকে বলা হবে 'ব্যক্তিগত উন্নত ধরনের চাষ সমবায়'। যে সমস্ত কাজ চাষীর ব্যক্তিগত ভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়, তা সমিতিকে করতে হবে, যেমন, কি কি ফসল করতে হবে ইত্যাদির জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনা, জমি বা চাষ উন্নয়নে অর্থ বিনিয়োগ, বৃহদাকার ও দামী কৃষি যন্ত্রপাতি রাখা, পাইকারী হারে দ্রব্যাদি ক্রয়, বা শস্য বিপণন ইত্যাদি। এ ছাড়া যে সব কাজ চাষী তার ছোট ছোট জমিতে করতে সক্ষম তা চাষী নিজেই করবে। অটো শীলারের মতে, উন্নত ধরনের চাষ ব্যবস্থার জন্য সব চাইতে দরকার হচ্ছে জমির সুব্যবস্থা। তাই দরকার হলে ২, ৩ বা ৪ জন ছোট ছোট চাষী তাদের জমি একত্র করে এক একটা চাষ কেন্দ্র গড়ে, একত্রিত ভাবে চাষের ব্যবস্থা করতে

পারে। এই ব্যবস্থায় উন্নত ধরনের চাষ তথা উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হবে। সমস্ত গ্রামের জমিগুলি উপযুক্ত কয়েকটি চাষ কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে। সমিতি চাষীদের বিভিন্ন চাষ কেন্দ্রে জমি চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ভাগ করে দেবে। ধরা যাক, একটা চাষ কেন্দ্রে ১০ একর জমি আছে। যদি কোন চাষীর বিভিন্ন এলাকায় মোট জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ একর, তাকে একটি চাষ কেন্দ্র (Unit of farming) দেওয়া হবে। যদি দুইজন চাষীর জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ একর, তাহলে দুজনাতে অংশীদার হিসাবে কোন এক কেন্দ্রে চাষাবাদ করবে। তবে দেখতে হবে যে, এক একটা কেন্দ্র সত্যিকারের অর্থনৈতিক সাচ্ছল্য বজায় রাখার মত কেন্দ্র হয়। কাজেই এ সব কেন্দ্রে চাষীরা চাষাবাদ করবে আর সমিতি এদের কৃষিকার্য্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করবে। কোনও কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় জমির চেয়ে বেশী জমি কারো থাকলে তাকে কতকগুলি অতিরিক্ত ব্লকে জমি দেওয়া হবে। যে সব চাষীর ২½ একর জমির কম থাকবে, তাদেরও এই সব ব্লকে জমি দেওয়া হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে গ্রামের সমস্ত জমির একত্রীকরণ বা পুনর্বিন্যাসই হচ্ছে অটো শীলারের পরিকল্পনার মূল বস্তু। তাঁর পরিকল্পিত চাষসমিতি কৃষির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহে উন্নত চাষসমিতির (Better farming socitey) কাজ করবে। আবার আধুনিক প্রথায় চাষাবাদের জন্য জমি একত্রীকরণে অনেকটা সমবায় যৌথ চাষ সমিতির কাজ করবে। সমস্যা হচ্ছে, চাষীরা এ ধরনের জমি পুনর্বিন্যাসে রাজী হবে কি না। আইনের আশ্রয় নিয়ে বল প্রয়োগ ছাড়া এ ধরনের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্ভব নয়।

ভারতের কয়েকটি রাজ্যে সমবায় চাষের বিবরণ

বোম্বাই—১৯২১ সালে ডাঃ এইচ. এস. ম্যান্ আহামদনগর ও শোলাপুর জেলায় সর্ব্বপ্রথম সমবায় চাষ প্রবর্ত্তনে যত্নপর হন। তারপর ১৯৪৭-৪৮ সালে বোম্বাইতে ৯৫টি সমবায় চাষ সমিতি গড়ে ওঠে। এদের সব কটাই উন্নত প্রথায় চাষ ও জমি উন্নয়নে কাজ করত। প্রকৃতপক্ষে শ্রী এস. পি. মোহিত, সরাইয়া কমিটিও প্যালেস্টাইনে ভারতীয় দলের সুপারিশ ক্রমে ১৯৪৯ সালে সত্যিকারের সমবায় চাষ ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা হয়। ৫ বছরের ভেতর ১১২টি সমবায় চাষ সমিতি সংগঠনের পরিকল্পনা রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন এবং তার জন্য ২০,৮৯ লক্ষ টাকার (দান ও কর্জ্জ হিসাবে) ব্যবস্থা করেন।

উন্নত চাষ সমবায় এই পরিকল্পনায় স্থান পায় নি। বরঞ্চ এই সমিতিও সর্ব্বার্থ-সাধক সমবায় সমিতিতে পরিবর্ত্তিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৪ সালের শেষে বোম্বাইতে সমবায় চাষ সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬৪। তবে এই ২৬৪টির মধ্যে মাত্র ২০টি সমিতিতে সত্যিকারের জমি একত্রীকরণ ও যৌথ চাষ সম্ভব হয়েছে। সরকারের খাস জমিতে ভূমিহীন চাষী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে ২২৪টি যৌথ চাষ সমিতি সংগঠিত হয়। এই যৌথ চাষ ব্যবস্থায় চাষীরা কিন্তু ভাবত যেন তারা সরকারী খামারে চাষাবাদ করছে, আবার সভ্যদের মজুরী ও ভরণপোষণের ভাতা ও সমিতির মোট উৎপন্ন দ্রব্যমূল্যের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য ছিল না। এজন্য বেশীর ভাগ সমিতিতেই যৌথ চাষের প্রকৃত রূপ ছিল না বললেই চলে। অধ্যাপক কুলকার্নি বলেন যে, সমবায় যৌথ চাষ সমিতি সংগঠন করা খুব শক্ত কাজ। তদুপরি সংগঠিত সমিতির সমবায় প্রকৃতি বজায় রাখা আরও শক্ত। ১৯৫৮ সালের শেষে বোম্বাইতে সমবায় চাষ সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১০টি এবং তার শতকরা ৪১ ভাগ ছিল প্রজাস্বত্ব সমতুল সমবায় চাষ, ৪৪ ভাগ ছিল যৌথ খামার, আর ১৫ ভাগ ছিল সমবায় যৌথ চাষ সমিতি।

মাদ্রাজ—১৯৩৫-৩৬ সালে মাদ্রাজে বহু সমবায় উপনিবেশ গড়ে ওঠে এবং পরে এই সমিতিগুলিই প্রজাস্বত্ব-সমতুল সমবায় চাষ সমিতিতে পরিণত হয়। ১৯৪১ সালে সরকার স্থির করেন যে, সরকারী খাস জমিতে সমবায় চাষ সমিতি সংগঠন করা চলবে। এই সমস্ত উপনিবেশ সমিতিগুলি যুদ্ধ ফেরত ব্যক্তি ও ভূমিহীন কৃষকদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল। ১৯৫৮-৫৯ সালের শেষে মাদ্রাজে ৪৫টি প্রজাস্বত্ব চাষ সমবায় সমিতি ছিল। ১৯৫১ সালে সমবায় যৌথ চাষ ও যৌথ খামার সমিতি সংগঠনে সরকার যত্নপর হন। ১৯৫৫-৫৬ সালে সমবায় সম্পর্কিত মাদ্রাজ কমিটি সুপারিশ করেন যে, সর্ব্বপ্রথমে সরকারী খাস জমিতে যৌথ খামার সমিতি সংগঠন করা প্রয়োজন; কারণ যৌথ চাষ সমিতি প্রথমে কৃতকার্য্য নাও হতে পারে। কিন্তু সরকার ১৯৫৬ সালে সমবায় যৌথ চাষ প্রবর্ত্তনে দৃঢ় সঙ্কল্প হলেন এবং এই বছর তিনটি সমবায় যৌথ চাষ সমিতি সংগঠন করা হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালের শেষে মাদ্রাজে ১০টি সমবায় যৌথ চাষ সমিতি গড়ে ওঠে এবং এই সমিতিগুলি সরকার থেকে ৩ লক্ষ টাকা কর্জ্জ ও এক লক্ষ টাকা দান পায়।

অন্যান্য রাজ্য

মহীশূরে সমবায় চাষ সমিতিগুলি সরকারের খাস পতিত জমিতে গঠন করা হয়েছে। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসের শেষে মোট সমবায় চাষ সমিতির

সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৫টি। এদের মধ্যে ১১টি ছিল সমবায় যৌথ চাষ সমিতি, আর ২১টি যৌথ খামার সমিতি। ১৯৫৯ সালের শেষে পঞ্জাবে সব চেয়ে বেশী সংখ্যক সমবায় চাষ সমিতি ছিল। মোট সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২৮টি। এদের শতকরা ৮৩ ভাগ সমিতি ছিল যৌথ চাষ বা যৌথ খামার সমিতি। এইসব সমিতির অধিকাংশই পশ্চিম পাঞ্জাব হতে আগত উদ্বাস্তু ও যুদ্ধ ফেরত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়।

১৯৪৮ সালে উত্তরপ্রদেশে ২টি সমবায় চাষ সমিতি গড়ে ওঠে। ১৯৫০-৫১ সালে সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫টি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১০০টি সমবায় চাষ সমিতি গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় কিন্তু পরিকল্পিত ১০০টির চেয়ে আরও ৭১টি বেশী সমিতি সংগঠন করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আরও ১০০টি সমিতি গঠন করা হবে বলে ঠিক করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১০০টির বেশী সমিতি সংগঠন করা হয় এবং মোট সমিতি দাড়ায় ৩২২টি।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪০-৪১ সালে দুটো সমবায় চাষ সমিতি গঠন করা হয়, কিন্তু পরে দুটোই অকৃতকার্য্য হয়। ১৯৪৯—৫৩ সালের ভেতর বর্দ্ধমান জেলায় যৌথ চাষ ও যৌথ খামার সমিতি সংগঠন করা হয় এবং এরা ভাল কাজও করে। ১৯৫২—৫৩ সালের শেষে ১০০টি সমতি গড়ে ওঠে এবং ৩০শে জুন ১৯৫৯ সালের ভেতর আরও ১৪২টি সমিতি গড়ে ওঠে। এদের ভেতর ২৪টি যৌথ চাষ সমিতি ও ৪১টি যৌথ খামার সমিতি ছিল। আর ৬টি ছিল মিশ্র প্রকৃতির। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতি বছর ১০০টি করে মোট ৫০০টি সমবায় চাষ সমিতি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরে অবশ্য তার রদবদল হয়। পশ্চিমবঙ্গে সমবায় চাষ উন্নয়নে বাধা সম্পর্কে নিজলিঙ্গাপ্পা কমিটি বলেন যে, কৃষি আয়কর সমবায় চাষ সমিতি সংগঠনে ও সাফল্যের ব্যাপারে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করছে। কেননা সমিতির সভ্যগণের ওপর আয়কর ধার্য্য না করে তা সমিতির ওপর ধার্য্য করা হয়। ছোট ছোট চাষীদের নিজেদের ছোট ছোট জমি চাষাবাদের আয়ের ওপর কোন ট্যাক্স বা কর দিতে হয় না, কিন্তু যখন এই ছোট জমিগুলি একত্র করে কোন সমবায় সমিতিতে দেওয়া হয়, তখন সমিতির ওপর কর ধার্য্য হয়। উত্তর প্রদেশে এ ধরণের সমস্যার সমাধান হয়েছে ব্যক্তিগত চাষীদের ওপর কর ধার্য্য করে এবং সমিতির ওপর তা না করে।

সমবায় চাষের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি

১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে সমবায় যৌথ চাষ দেশের অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত হয়। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও সমবায় যৌথ চাষের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নাগপুরের অধিবেশনে সমবায় চাষ সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর থেকে তার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তির অবতারণা অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ করছেন।

স্বপক্ষে যুক্তি—

(১) ভারত কৃষি প্রধান দেশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির ওপর চাপও বেড়ে যাচ্ছে। অথচ কৃষির ওপর নির্ভরশীল জনসাধারণকে শিল্পে নিয়োগ করে জমির উপর চাপ কমানো যাচ্ছে না। কেননা আমাদের দেশ এখনও শিল্পক্ষেত্রে তেমন উন্নতিলাভ করতে পারে নি। শতকরা ৪০ ভাগ কৃষিজীবী ভূমিহীন। এদের মজুরীও খুব কম। তাছাড়া, এরা সারা বছর ধরে কাজও খুঁজে পায়না। আবাদী জমির মাত্র শতকরা ২০ ভাগ সেচ-ব্যবস্থার সুবিধা পায়। অবশ্য সেচ ব্যবস্থার আরও উন্নতি করা যায় কূপ খনন করে, পুকুর কাটিয়ে, ইত্যাদির সাহায্যে। এসব সম্ভব হতে পারে যদি সংঘবদ্ধ হয়ে চাষাবাদ করা হয় এবং সব চেয়ে ভাল সংঘ হচ্ছে সমবায় সংঘ বা সমবায় চাষ সমিতি। অধিকতর সেচ ব্যবস্থার ফলে একই জমি হতে দুই ফসল বা তিন ফসল ওঠান সম্ভব হবে এবং এ ভাবে চাষীদের বারোমাস কাজে লাগান যেতে পারে।

(২) একমাত্র সমবায় চাষের মাধ্যমেই আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত কৃষিকার্য্য সম্ভব এবং তাতে এক দিকে চাষের খরচ-খরচা অনেকটা কমে যাবে, অন্যদিকে উৎপাদনও অনেকটা বেড়ে যাবে।

(৩) যৌথ সমবায়ের ন্যায় বড খামারে বড় আকারে চাষাবাদের ফল পাওয়া সম্ভবপর হয়। কাজেই সমবায় চাষ ব্যবস্থা যেখানে বহু জমি একত্রীভূত, সেখানে বড আকারে চাষাবাদের ফল পাওয়া যাবে।

(৪) তাছাড়া সমবায় চাষ ব্যবস্থায় বিভিন্ন কর্ম্ম সংস্থানের ব্যবস্থাও হতে পারে, যেমন ফলগাছ, শাক-সবজি ইত্যাদি জন্মান যেতে পারে; পশুপালন, দুগ্ধ সংগ্রহও সম্ভব হয়। গ্রামের রাস্তাঘাট, বাসগৃহ ইত্যাদির পুনর্গঠনও সম্ভব হতে পারে। সমবায় চাষ সমিতি, পুষ্করিণীর জল পরিষ্কার করা, পুরানো কূয়োর সংস্কার ইত্যাদি জনহিতকর কাজও করতে পারে।

(৫) জমি একত্রীকরণে খণ্ডিত জমির বিবিধ অসুবিধা দূর হবে।

পরিকল্পনা কমিশন বলেন, 'ভারতের সমস্যা হচ্ছে আবাদী জমির উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি করা। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, অধিকতর মূলধন বিনিয়োগ ইত্যাদিতেই একমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট জমির চেয়ে বরং বৃহদাকার কৃষিক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সহজ। কেননা, বড় বড় খামারে অযথা বাজে খরচ বাঁচানো সম্ভব হয়। জমির পূর্ণ ব্যবহার যথোপযুক্ত শস্য নির্দ্ধারণ, মাটি সংরক্ষণ, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, উন্নত ধরনের চাষ ব্যবস্থা ইত্যাদিও সম্ভব হয়। তাছাড়া বৃহদাকার কৃষি ব্যবস্থার নানারূপ সুযোগ সুবিধা লাভও সহজ হয়। সুবৃহৎ কৃষি প্রতিষ্ঠান অধিকতর ঋণ ও অর্থ সাহায্য পেতে পারে এবং তা যথার্থ কাজে লাগিয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল পেতে পারে এবং সর্ব্বোপরি দেশের খাদ্য-সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হতে পারে।

সমবায় চাষ প্রবর্ত্তনের বিপক্ষে যুক্তি—

(১) গরীব চাষীর একমাত্র সম্বল হচ্ছে জমি। এই জমি থেকে তার খাবার জোটে ; আবার এই জমি বিক্রী বা বন্ধক রেখে অসময়ে টাকা জোগাড় করে বিপদ কাটায়। কাজেই জমি তার ছেলে-পুলের সমান। সমবায় চাষে তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লোপ পায়, কারণ চাষাবাদ করতে হয় সমিতির নির্দ্দেশ অনুযায়ী। আবার যৌথ খামারে জমি দিলে, জমির মালিকানাও লোপ পায়। তাই চাষীরা সহজে সমবায় চাষে সায় দিতে চায় না।

(২) সমবায় চাষে চাষীদের কার্য্যোদ্যম প্রায় লোপ পায় বললেই চলে, কেননা চাষীদের দিন মজুরের মত সমিতির জমিতে কাজ করতে হয় ;

(৩) জাপানে ব্যক্তিগত চাষে উৎপাদন অনেক বেড়েছে। ভারতেও প্রয়োজনীয় সাহায্যাদি পেলে উৎপাদন বাড়া সম্ভব। সমবায় চাষে জমি একত্রী-করণ না করে সেবা সমিতির মাধ্যমেও ঋণ অন্যান্য চাষীদের পৌছে দেওয়া যায়।

(৪) সমবায় চাষ ব্যবস্থায় কৃষি-পুনর্গঠনজনিত কিছু সংখ্যক চাষীর কর্ম্মচ্যুতিরও সম্ভাবনা রয়েছে। যতদিন পর্য্যন্ত শিল্পোন্নতি সম্ভব না হচ্ছে, ততদিন কর্ম্মসংস্থান সমস্যা থাকবেই।

(৫) অন্যান্য দেশে খুব কম ক্ষেত্রেই সমবায় চাষ কৃতকার্য্যতা লাভ করেছে। সেখানে কৃতকার্য্যতা লাভ করার মূলে রয়েছে প্রকট রাজনৈতিক চাপ বা ধর্ম্মীয় আস্থা। ভারতে এ ধরণের অবস্থা নেই।

(৬) ভারতে যৌথ চাষের অভিজ্ঞতা মোটেই সন্তোষজনক নয়। একদিকে যৌথ চাষ সংগঠনে প্রচুর অসুবিধা রয়েছে, অন্যদিকে অনেকদিন ধরে যৌথ চাষ ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়াও সম্ভব হয় না ; কারণ সব সময় চাষীদের ব্যক্তিগত চাষের দিকে ঝোঁক থাকে এবং সুযোগ পেলেই যৌথ চাষ সমিতি থেকে ফিরে এসে ব্যক্তিগত চাষে মন দেয়।

(৭) তাছাড়া যৌথ চাষ যেখানে কৃতকার্য্য হয়েছে, সেখানে বলপূর্ব্বক বা আবশ্যিকভাবে যৌথ চাষে যোগদানে চাষীদের বাধ্য করেছে। ভারতে এ ধরনের বলপ্রয়োগ বা আবশ্যিক ভাবে যৌথ চাষ চালু করা রাষ্ট্রনীতি বিরোধী।

(৮) আরও একটি বড় সমস্যা হল সমবায় খামার পরিচালনা করার মত দক্ষ কর্ম্মীর অভাব। একদিকে খরচ কমাতে হবে, অন্যদিকে ফসল বাড়াতে হবে। ফলন না বাড়ালে সমবায় খামার করার কোন সার্থকতা নেই। খরচ না কমালে, লাভের গুড় পিপড়ে খাওয়ার মত হবে। কারণ যতটুকু ফলন বাড়ার সুফল পাওয়া যাবে, তার সবটুকুই হয়ত ঐ খরচ খরচা বেশী হওয়ার জন্য সভ্যদের বিশেষ কোন কাজে লাগবে না। ফলে সভারা বিরক্ত হয়ে সমবায় খামার হতে সরে দাঁড়াতে চাইবে। সুতরাং দক্ষ ম্যানেজার না থাকলে এ সব দিকে যথাযথ নজর ও ঠিকমত হিসাব রাখা শক্ত হবে। গ্রামাঞ্চলে এইরূপ দক্ষ ম্যানেজার কি পাওয়া যাবে ? এইটাই বড প্রশ্ন। যদি বাইরে হতে এরূপ ম্যানেজার নিয়োগ করা হয় তার খরচ বেশী হবে এবং সেও সমিতির মঙ্গলের প্রতি এতটা মনোযোগী হবে না। তাই অনেকে মনে করেন যে যতদিন না গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসার হয় এবং এরূপ দক্ষ ম্যানেজার পাওয়া যায় ততদিন সমবায় প্রথায় চাষ ব্যবস্থা চালু করা শক্ত।

বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ সমূহ

কৃষিগবেষণার রাজকীয় কাউন্সিলের উপদেষ্টা বোর্ড (১৯৪৪), সমবায় পরিকল্পনা কমিটি (১৯৪৫) ও প্যালেস্টাইনে প্রেরিত ভারতীয় দলের (১৯৪৭) মন্তব্য পূর্ব্বে আলোচনা করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন সমবায় চাষ প্রবর্ত্তনে বিবিধ ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, "ছোট ছোট বা মাঝারি ধরনের চাষীদের সমবায় চাষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতে হবে।" দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায় চাষ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সুদৃঢ় করতে বলা হয়, যাতে আগামী ১০ বছরে দেশের অধিকাংশ জমিতে সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ হতে পারে।

চীন দেশে প্রেরিত শ্রীযুক্ত পাতিলের নেতৃত্বাধীনে ভারতীয় দল মত প্রকাশ করেন যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেওয়াতে যে ক্ষতিটুকু হয়, তার চেয়ে বেশী লাভ হয় সমবায় চাষ সমিতিতে যোগদান করলে। এই দল নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন :—

১। চাষীরা তাদের জমি একত্রিত করে সমবায় যৌথচাষ প্রবর্ত্তন করবে; আর সরকারী খাস জমিতে যৌথ খামার স্থাপন করতে হবে।

২। সমবায় চাষ সমিতিতে সরকারকে অংশীদার হতে হ'বে।

৩। চীন দেশের ন্যায় এদেশেও সরকারকে নিম্নতম শস্যমূল্য বেঁধে দিতে হ'বে। অন্ততঃ সমবায় চাষ সমিতির উৎপন্ন শস্য নিম্নতম বাঁধা দরে সরকারকে কিনে নিতে হবে।

৪। সরকারের ভূমিসংস্কারের মূল উদ্দেশ্য এরূপ হ'তে হ'বে, যাতে উদ্বৃত্ত জমি তাদেরই দেওয়া হ'বে যারা হাতে নাতে কাজ করে। এক পরিবারে পর্য্যাপ্ত জমি দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা একত্র করে সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা করতে হবে।

ওয়ার্কিং গ্রুপের (নিজলিঙ্গাপ্পা কমিটির) সুপারিশ

সমবায় চাষ বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (১৯৫৯) বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি ৮টি রাজ্যের প্রায় ৩৪টি সমবায় সমিতির কাজ পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাঁরা দেখেছেন যে, অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের বা ভূমিহীন চাষীদের আর্থিক উন্নয়নে সরকার বা সামাজিক কর্ম্মীদের প্রচেষ্টায় যে সব সমিতি গড়ে উঠেছে, তারা তেমন ভাল কাজ দেখাতে পারেনি। আবার যে সব সমিতিতে অধিকাংশ সভ্য চাষাবাদের কাজে যোগদান করেছে সেখানে উৎপাদন বহুলাংশে বেড়েছে। সমবায় চাষ ব্যবস্থায় উন্নত ধরনের কৃষি ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা সম্ভব হয়েছে। উৎপাদন ও কর্ম্মসংস্থান উভয়ই বেড়েছে অনেক সমিতিতে। আবার কোথাও কোথাও সভ্যদের আর্থিক উন্নয়নও ঘটেছে। যারা সভ্য নয়, এরাও সমবায় চাষ সমিতি থেকে যথেষ্ট উপকার পেয়েছেন। ওয়ার্কিং গ্রুপ যে সব সমিতি দেখেছেন, তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বেশ লাভও করেছে। আবার এক-তৃতীয়াংশ সমিতি গত পাঁচ বছর ধরে লাভ করছে। এঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, সভ্যদের ভিতরে খুব শ্লথ ও ধীরভাবে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবোধ জেগে উঠছে। সমিতির উপযুক্ত নেতৃত্ব সম্পর্কে ওয়ার্কিংগ্রুপ বলেছেন যে, গ্রামাঞ্চলে সমবায় চাষ

সমিতিতে কাজ করার মত উপযুক্ত লোকের ঠিক অভাব নেই; তবে কাজের গুণ বিচার করে তার তারিফ করে স্বীকৃতি দেওয়া বা তাদের সুবিধে দেওয়ার অভাবই হচ্ছে একমাত্র সমস্যা। ভালভাবে সমবায় চাষ সমিতির কাজ দেখে মনে হয় যে, ছোট ছোট বা মাঝারি চাষীদের নিয়ে সমবায় চাষ ব্যবস্থা বেশ ভাল ভাবেই চলতে পারে। তবে জনসাধারণ ও সরকারের তরফ থেকে এই প্রচেষ্টার পিছনে লেগে থাকাই সবচেয়ে প্রয়োজন।

প্রধান সুপারিশ সমূহ

সমবায় উন্নত চাষ বা প্রজাস্বত্ব সমতুল চাষ ব্যবস্থাকে 'সমবায় চাষের' ভিতর ফেলা উচিত নয়। যে সব সমিতিতে সমবায় চাষের মূল নীতিটি নেই বা যেখানে পরিচালন ব্যবস্থা খুবই খারাপ, সে সব সমিতিকে তুলে দিতে হবে। সমবায় চাষ সমিতির সংগঠনের কাজ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হলে চলবে না। যে সব চাষী সমবায় চাষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এদের নিয়ে সমিতি সংগঠনে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। চাষীদের ভিতর এই ধরনের সমিতি সংগঠনে সত্যিকারের ইচ্ছা থাকা চাই। সমিতির সদস্য সংখ্যা ১০ বা সমবায় আইনে বর্ণিত সংখ্যা হওয়া উচিত; সমবায় চাষ সমিতির সাফল্যের মূলে রয়েছে সমস্বার্থ বজায় রাখা, নিজেরা জমিতে কাজ করা এবং যতটা সম্ভব সভ্যদের অধিকার দেওয়া প্রভৃতি। কাজেই সমবায় চাষ সমিতি সংগঠন করার সময় এগুলো বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে। আইনের আশ্রয় নিয়ে জোর করে সমিতি গঠন করা উচিত নয়। ঐচ্ছিক সংগঠনই মূলমন্ত্র হ'বে। কোন নির্দ্দিষ্ট গ্রামে একাধিক সমবায় চাষ সমিতি সংগঠন করা চলবে যদি তা আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের জন্যে প্রয়োজন হয়। নিজেরা চাষাবাদ করেন. এমন জমিদারদের সভ্য হিসাবে সাধারণতঃ নেওয়া উচিত হ'বে না। বরঞ্চ তাদের জমি নিয়ে আইন অনুযায়ী খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত হ'বে।

অন্ততঃ পাঁচ বছরের জন্যে জমি সমিতিকে চাষাবাদের জন্যে দিতে হবে। অবশ্য এই পাঁচ বছরের ভিতর অন্য কোন সভ্যকে জমি হস্তান্তর করা চলবে বা সেই জমি সমিতিকে অস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া চলবে। সমবায় চাষ সমিতি সংগঠনে সভ্যদের খণ্ড খণ্ড জমিগুলি একজোতভুক্ত করার (Consolidation) দিকে প্রথমে জোর দেওয়া উচিত নয়। সমিতিতে জমি দেওয়ার বিনিময়ে সমিতির আয় থেকে কিছু পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত। এই

ব্যাপারে অবশ্য সমিতি যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। জমিতে কাজ করার মজুরী কোন ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক মজুরীর বেশী হওয়া উচিত নয়। সমবায় চাষ ব্যবস্থায় ট্রাক্টর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি অব্যবহার্য্য মনে করলে ভুল করা হ'বে। এইসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার আগে সমিতিকে যন্ত্রপাতির উপযোগিতা ও তা ব্যবহারের সুবিধা ইত্যাদি ভাল করে বিবেচনা করতে হ'বে। যদি কার্য্যদক্ষতা ও কর্ম্মসংস্থানের বিবেচনায় যন্ত্রপাতি ব্যবহার অপরিহার্য্য বলে মনে হয় তা হ'লে খুবই ভাল।

যে সব সভ্য জমিতে কাজ করে না, তাদের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিতে রাখা চলবে না। সভ্যদের থেকে কাউকে সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচন করতে পারলে ভাল হয়। হিসাব পত্র ও খাতাপত্র যথাযথ ভাবে রাখার যোগ্যতা সম্পাদকের থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গে সম্পাদককেও জমিতে কোন নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত কাজ করতে হবে। কোন সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিতে (এমন কি যে সমিতিতে সরকার অংশীদার হয়েছেন) সরকার মনোনীত সভ্য থাকা উচিত নয়।

উৎপাদন ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ও পাইলট প্রজেক্টএ অবস্থিত এমন সমিতিকে সরকারী সাহায্য দানের কথাও ওয়ার্কিং গ্রুপ বলেছেন। প্রত্যেক সমবায় চাষ সমিতিতে সরকার কর্তৃক ২০০০৲ টাকার অংশ ক্রয়ের সুপারিশও করেন। উন্নয়ন কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদী ঋণের হিসেবে সরকার কর্তৃক ৪০০০৲ টাকা দেওয়ার কথাও গ্রুপ প্রস্তাব করেন। তাছাড়া গুদাম ও গোশালা তৈরীর জন্যে ৫০০০৲ টাকা (তন্মধ্যে ¼ ভাগ দান ও ¾ ভাগ ধার হিসেবে) সমিতির পরিচালন খাতে প্রথম তিন বছরে মোট ১৮০০৲ টাকা দেওয়ার কথাও গ্রুপ সুপারিশ করেন। কৃষি আয়কর ব্যাপারে সমিতির উপর কর ধার্য্য না করে সভ্যদের উপর তা ধার্য্য করার জন্য গ্রুপ সুপারিশ করেন। জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক থেকেও যাতে সমবায় চাষ সমিতি প্রয়োজনীয় দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ পেতে পারে, তার জন্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের কথা গ্রুপ বলেন।

ভরণপোষণ, উৎসব ও অন্যান্য উদ্দেশ্যেও সমবায় চাষ সমিতি সভ্যদের ঋণদান করতে পারে। অবশ্য এই ঋণদান করার জন্য সমিতির যাতে কোন ক্ষতি না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। ক্ষেতে কাজ করার জন্য মজুরী থেকে বা জমি দেওয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক থেকে অথবা লভ্যাংশ থেকে ঋণের টাকা

কেটে নেওয়া যেতে পারে, চাষ সমিতি সভ্যদের ঋণ দিতে পারে এবং এই ব্যাপারে কোন বাধা থাকা উচিত নয়। কেননা সমিতির সভ্যগণ শেষ পর্য্যন্ত গ্রামের মহাজনদের কাছে ঋণ গ্রহণ উদ্দেশ্যে যেতে পারে।

একথা অনস্বীকার্য্য যে, চাষীরা এখনও সমবায় চাষের উপকারিতা সম্পর্কে ততটা সচেতন হয় নি বা সমবায় চাষ সমিতিগুলো তেমন একটা চমকপ্রদ ফল দেখাতে পারে নি। তাই ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রস্তাব করেছেন যে ৩২০টি জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকে সমবায় চাষ পরীক্ষামূলকভাবে সংগঠনের জন্যে ঠিক করতে হবে। ওয়ার্কিং গ্রুপের ধারণা পাইলট প্রোজেক্টে সমিতিগুলোর কাজ দেখে চাষীরা স্বভাবতঃই ব্যাপকভাবে সমবায় চাষ সমিতি গড়ে তুলতে আগ্রহ প্রকাশ করবে এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ২০,১০০ নতুন সমিতি গড়ে উঠবে। ওয়ার্কিং গ্রুপ হিসেব করেছেন, প্রায় একলক্ষ গ্রাম থেকে তুইলক্ষ চাষী এবং সমবায় চাষ সমিতির প্রায় ২৬০০০ সম্পাদককে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করতে হ'বে এবং তার জন্যে ১৯৬০-৬১ সাল থেকে চার বছরের ভিতর ১৬০টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে হ'বে। কৃষিক্ষেত্র থাকলে ও স্থান সংকুলান হ'লে বর্ত্তমান শিক্ষা কেন্দ্রেও ট্রেনিং এর ব্যবস্থা হ'তে পারে।

সরকার কর্ত্তৃক ওয়াকিং গ্রুপের সুপারিশ গ্রহণ ও তৃতীয় পরিকল্পনা

১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওয়াকিং গ্রুপের প্রধান প্রধান সুপারিশ সমূহ উন্নয়ন সংস্থা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েছে ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাদের রূপ দেওয়া হয়েছে।

সমবায় চাষ সমিতি ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্ত

সমিতি সংগঠন—সমিতির ঐচ্ছিক প্রকৃতি (Voluntary character) বজায় রাখা হবে এবং সমিতি সংগঠনের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ করা হবে না। অন্ততঃ পাঁচ বছরের জন্যে চাষী সভ্যগণকে তাদের জমি সমিতিকে দিতে হ'বে। বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন, কোন সভ্য সমিতির এলাকাভুক্ত গ্রাম থেকে অন্যত্র চলে গেলে পাঁচ বছরের আগেই জমি ফেরৎ দেওয়া যাবে। প্রত্যেক সমিতি এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সর্ত্তাবলী উপবিধিতে সন্নিবেশ করে রাখবে। সভ্যদের বলদ গরু ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি সমিতি নিয়ে সমমূল্যের শেয়ার দিতে পারবে বা আমানত হিসাবে গণ্য করতে

পারবে। সমবায় চাষ সংগঠনের একটা প্রধান শর্ত হিসাবে জমি একত্রিকরণের উপর জোর দেওয়া উচিত হ'বে না।

জমির বা কৃষি সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ করবে, এমন সভ্য নেওয়াই উচিত। নিজে চাষাবাদ করে না, এমন কোন জমিদারকে সভ্য করা উচিত নয়। শারীরিক অসুস্থতা, বার্দ্ধক্য ইত্যাদির বিবেচনায় যারা রীতিমত—ক্ষেত্রে কাজ করতে পারবে না, এদেরকে সভ্যভুক্ত করা যাবে, তবে এই ধরনের জমিদারদের সংখ্যা মোট সভ্যসংখ্যার চারভাগের একভাগের বেশী হ'লে চলবে না। অবশ্য সমবায় আইনে বর্ণিত নিম্নতম সভ্যসংখ্যা নিয়েই সমিতি সংগঠিত হ'তে পারে। কিন্তু সরকার থেকে বিশেষ কোন সাহায্য পেতে হ'লে সমিতির সভ্য ও এলাকার ভিত্তিতে মোটামুটি সন্তোষজনক আয়তন থাকা বাঞ্ছনীয়। এই ধরনের আয়তন সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারই ঠিক করে দেবেন। সাধারণতঃ সেইসব সমাজ উন্নয়ন ব্লকের এলাকাতেই পাইলট প্রোজেক্ট সংগঠন করা হ'বে যেখানে পঞ্চায়েত ও সমবায় ভাল কাজ করছে এবং যেখানে প্রয়োজনীয় নেতৃবৃন্দের অভাব হবে না ইত্যাদি। বর্ত্তমানে ভাল কাজ করছে এমন সমবায় চাষ সমিতির শতকরা ১০টি সমিতিকে এই পাইলট প্রোজেক্টের আওতায় আনা যেতে পারে। আর যে সব সমিতি সত্যিকার সমবায় চাষ সমিতির মূলনীতি গ্রহণ বা কার্যকরী করতে পারে নি, এদের তুলে দিতে হ'বে। সাধারণতঃ চাষীরা চাষ করছে এমন সব জমি নিয়ে, পতিত জমি উদ্ধার করে যে জমি পাওয়া যাবে সেরূপ জমি নিয়ে বা ভূমি সংস্কার আইন প্রয়োগের ফলে যে জমি উদ্বৃত্ত হ'বে সেই জমি নিয়ে সমবায় চাষ সমিতি সংগঠন করা চলবে। অনুন্নত অঞ্চলে বা অনাবৃষ্টি বা বন্যা অধ্যুষিত অঞ্চলের জমি নিয়ে প্রথমে সমবায় চাষ সমিতি গঠন না করাই বাঞ্ছনীয়। পাইলট প্রোজেক্টে অবস্থিত প্রতিটি সমিতির একটি করে সুষ্ঠু শস্য উৎপাদন পরিকল্পনা থাকা উচিত। পরিকল্পনায় শস্য উৎপাদন ছাড়াও পশুপালন, দুগ্ধ সংগ্রহ, কুটির শিল্প প্রভৃতির উন্নয়নও স্থান পাবে।

সমবায় চাষ ও সেবা সমিতির মধ্যে কোনরকম অসামঞ্জস্যের উদ্ভব না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সমবায় চাষ সমিতি এলাকাভুক্ত বা নিকটবর্ত্তী সেবা সমিতির সভ্য হ'বে। স্বল্প মেয়াদী ঋণ সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে বা সেবা সমিতির মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে। শস্য বিপণন প্রভৃতির ব্যাপারে সমবায় চাষ সমিতি সেবা সমিতির সাহায্য নিতে পারবে। নিজেদের জমি সমিতিতে চাষ করতে

দেওয়ার বিনিময়ে সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোট আয় বা নীট আয় (Gross income and Net-income) কিছু টাকা দেওয়া যাবে। তবে কখনো তা আইনে উল্লিখিত পরিমাণ টাকার বেশী হ'বে না। মধ্য মেয়াদী বা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ গ্রহণ উদ্দেশ্যে সভ্যগণ সমিতিকে তাদের নিজ নিজ জমি বন্ধক দেওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ করবে।

সরকারী সাহায্য—

১। ভূমিহীন, প্রান্তিক বা উপপ্রান্তিক (Marginal and Sub-marginal) চাষীদের নিয়ে সংগঠিত সমবায় চাষ সমিতি উর্দ্ধতন পক্ষে ২০০০৲ টাকা সরকার থেকে অংশমূল্য বাবত৽ পাবে। দশ বছরের ভিতর এই টাকা আদায় করা হ'বে। সরকারী অংশীদারীর জন্যে কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিতে সরকার মনোনীত কোন সভ্য থাকবে না।

২। তিন থেকে পাঁচ বছর পর্য্যন্ত পরিচালন খাতে প্রত্যেক সমিতিকে ১২০০৲ টাকা সরকার দান করবেন;

৩। গুদাম বা গোশালা তৈরী করার জন্যেও সরকার প্রত্যেক সমিতিকে ১২৫০৲ টাকা দান হিসেবে ও ৩,৭৫০৲ টাকা ঋণ হিসেবে মোট ৫,০০০৲ টাকা দেবেন।

৪; কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ না পেলে সরকার প্রত্যেক সমিতিকে ৪০০০৲ টাকা কর্জ্জ দেবেন।

অবশ্য উপরিউক্ত সাহায্যাদি একমাত্র পাইলট প্রোজেক্টে অবস্থিত সমবায় চাষ সমিতিই পাবে। সমিতিকে তখনই সমবায় চাষ সমিতি বলা যাবে, যখন চাষীদের একত্রীভূত জমি বা সমিতির নিজস্ব জমি একসঙ্গে চাষাবাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই যৌথ চাষের ক্ষেত্রেও কাকে কাকে সভ্য তালিকাভুক্ত করা হবে সেদিকেও মনোযোগ দেওয়া বাঞ্ছণীয়। আর্থিক সাহায্যের উপযোগী কিনা তা দেখার ব্যাপারে আর একটা জিনিষ দেখা দরকার; সেটা হচ্ছে, সমিতিতে অধিকাংশ সভ্য ক্ষেতে কাজ করছে কি না। ওয়ার্কিং-গ্রুপের সুপারিশ অনুযায়ী ভারতে ৩২০০টি পাইলট প্রোজেক্ট সমিতি সংগঠন করা হ'বে।

ট্রেণিং ব্যবস্থা :—ভারত সরকার স্থির করেছেন যে সমবায় চাষ সম্পর্কিত শিক্ষণ ব্যবস্থার ভার বর্ত্তমান শিক্ষণকেন্দ্রগুলিকে অধিকতর সম্প্রসারণ করে এদের ওপরই দেওয়া হ'বে।

সম্প্রসারণের কাজ—সম্প্রসারণ কাজে যে সব কর্ম্মচারী নিযুক্ত, সমবায়

চাষ সমিতি সংগঠন ও সুষ্ঠু পরিচালনের ক্ষেত্রে সরকার তাদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে বলেছেন যে জমি উন্নয়ন, উৎপাদন পরিকল্পনা প্রভৃতি আবশ্যকীয় কাজে সমিতিকে সাহায্য করতে হ'বে; পশুপালন প্রভৃতি মিশ্রচাষের ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় কার্য্যধারা উদ্ভাবন করে সমিতিকে দিতে হ'বে; স্থানীয় চাহিদা, কাঁচামাল বা অন্যান্য সম্পদের প্রাচুর্য্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর কুটির বা গ্রামীন শিল্প উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা করতে হ'বে ও সমবায় চাষ সমিতির প্রয়োজনে আবশ্যকীয় উপদেশ ও নির্দ্দেশ দিতে হ'বে। তৃতীয় পরিকল্পনায় উপরিউক্ত সরকারী সিদ্ধান্তের সব কটাই স্থান পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ও সমবায় চাষ সমিতি—

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে ৩০০টি সমবায় চাষ সমিতি গঠন করা হ'য়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট সমাজ উন্নয়ন ব্লকে ১৬টি পাইলট প্রোজেক্ট স্থাপন করা হ'বে এবং প্রত্যেক প্রোজেক্টে ১০টি করে সমবায় চাষ সমিতি সংগঠন করা হ'বে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বছরে ২৫টি, দ্বিতীয় বছরে ৩৫টি, তৃতীয় বছরে ৪০টি এবং চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে ৩০টি করে সমবায় চাষ সমিতি সংগঠন করা হ'বে বলে স্থির হয়েছে।

সরকারী সাহায্যাদি ঃ—

১। সরকারী অংশীদারী—মোট ৩.২০ লক্ষ টাকা (প্রতি সমিতিকে ২০০০৲ করে)

২। কার্য্যকরী তহবিল ঋণ হিসেবে মোট ৬.৪০ লক্ষ টাকা (প্রতি সমিতিকে ৪০০০৲ করে)

৩। গুদামঘর বা গোশালা নির্ম্মাণ মোট ৮.০০ লক্ষ টাকা (প্রতি সমিতিকে ৫০০০৲ করে) ৭৫% ঋণ হিসেবে ও ২৫% দান হিসেবে)।

৪। পরিকল্পনাখাতে দান মোট—১.৩৮ লক্ষ টাকা (প্রতি সমিতিকে ১,২০০৲ করে ৪ বছর)।

১ম বছর ৪০০৲ টাকা
২য় বছর ৪০০৲ টাকা
৩য় বছর ২০০৲ টাকা
৪র্থ বছর ২০০৲ টাকা

৫। সমিতির ম্যানেজার ও কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির সদস্যদের শিক্ষণখাতে
মোট ২.৫০ লক্ষ টাকা

সর্ব্ব মোট ২১.৫৮ লক্ষ টাকা

নিবিড় চাষের পরিকল্পনা (Package Scheme)—

আমেরিকার ফোর্ড প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ভারতের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি নতুন পরিকল্পনা চালু করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে "নিবিড় চাষের পরিকল্পনা" বা Package Scheme. এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্যে ভারতের ৭টি রাজ্য নির্ব্বাচিত হয়েছিল, যথা—আসাম, গুজরাট, কেরালা, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ এবং প্রত্যেক রাজ্যের একটি করে জেলাতে এই পরিকল্পনা চালু করা হ'বে বলে স্থির হয়, যথা—আসামের কাছাড় জেলা, গুজরাটের সুরাত জেলা, কেরালার আলেপ্পিন ও পলিঘাট জেলা, মহারাষ্ট্রের কোলাবা জেলা, মহীশূরের মান্দ্যা জেলা, উড়িষ্যার সম্বলপুর জেলা ও পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান জেলা। এসব জেলার মোট আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ৬১ লক্ষ একর এবং সেচ এলাকায় জমির পরিমাণ প্রায় ১০½ লক্ষ একর।

এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্যে কোন নির্দ্দিষ্ট জেলা নির্ব্বাচন করার আগে নিম্নলিখিত অনুকূল অবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়:—

(১) প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা দরকার;

(২) যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের অভাব অর্থাৎ যেখানে বন্যা, অনাবৃষ্টি বা জল নিষ্কাশন ও মাটি সংরক্ষণ সমস্যা প্রকট নয়।

(৩) উন্নত ধরনের গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান যেমন সমবায় সমিতি ও পঞ্চায়েৎ যেখানে কাজ করছে;

(৪) অতি অল্প সময়ের মধ্যে অধিকতর শস্য ফলানর অনুকূল পরিবেশ যেখানে বর্ত্তমান।

উপরিউক্ত অবস্থার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার জেলা নির্ব্বাচন করেন। তাছাড়া পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সম্পূর্ণ ভার থাকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের ওপর। এই পরিকল্পনায় জেলার সমস্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়, তবে স্বভাবতঃই প্রধান খাদ্যশস্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এই পরিকল্পনা অনুসারে সমবায় সমিতি ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে চাষীদের

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যাবতীয় সাহায্য করা হ'বে এবং সমস্ত চাষী পরিবারের উপযোগী গ্রাম, জমি ভিত্তিতে উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হ'বে। নির্ব্বাচিত জেলায় সমস্ত আবাদী জমিতে উন্নত ধরনের বীজ, সার, চাষের ব্যবস্থা করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হ'বে। উৎপাদন পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কৃষি সরঞ্জাম বা উপাদান, যেমন বীজ, সার ইত্যাদি অনেক আগে থেকেই গুদামজাত করা হ'বে। চাষীদের প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ স্বল্প ঋণের চাহিদাও মেটানো হ'বে।

১৯৬০ সালের এপ্রিলের শেষে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার সমস্ত প্রাথমিক কাজ শেষ করে ফেলেছেন, যথা—

(১) পরিকল্পনা রূপায়ণে অতিরিক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ;

(২) কর্ম্মচারীদের ট্রেণিংএর ব্যবস্থা;

(৩) কৃষি-উপাদান বা সরঞ্জাম সংরক্ষণার্থে উপযুক্ত গুদাম নির্ম্মাণ;

(৪) এলাকায় কৃষি ঋণ সরবরাহে সমবায় সমিতিদের বর্ত্তমান অবস্থা এবং পরিকল্পনা রূপায়ণে মোট কৃষি ঋণের পরিমাণ ইত্যাদি।

নির্দ্দিষ্ট জেলার যে সমস্ত গ্রাম নিয়ে পরিকল্পনার কাজ সুরু হ'বে, তাদের বেলাতেও জেলার অনুরূপ অনুকূল অবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়, যেমন—

(১) প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা;

(২) শক্তিশালী সমবায় সমিতি, যে সব গ্রামে শুধু ক, খ বা গ শ্রেণীর ঋণ দান সমিতি আছে, সেখানেই পরিকল্পনার কাজ আগে শুরু করতে হ'বে।

(৩) গ্রামে বন্যা অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের অভাব।

জেলা ও ব্লকের কর্ম্মচারীদের শিক্ষণ-উদ্দেশ্যে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা ছাড়াও নীলখেরীতে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনার কাজে বিভিন্ন সরকারী বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার নিবিড় যোগাযোগ রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক বিভাগের প্রতিনিধিদের নিয়ে রাজ্য ভিত্তিতে একটি 'সংযোগী পরিষদ' (Coordination Committee) স্থাপন করেছেন।

কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে বাজার দর চাষীদের পৌঁছে দেবার জন্যে এই পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে:—

(১) বেতারের পল্লীমঙ্গল বিভাগ মারফৎ দৈনিক বাজার দর জানিয়ে দেওয়া;

(২) সমস্ত বেতারকেন্দ্র থেকে সাপ্তাহিক বাজার দর জানানো;

(৩) পঞ্চায়েৎ ও সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্রে বাজার দর সম্বলিত সাময়িক প্রচার পত্র বিলির ব্যবস্থা ;

(৪) দৈনিক সংবাদ পত্রে প্রধান প্রধান কৃষি দ্রব্যের বাজার দর প্রকাশের ব্যবস্থা ;

(৫) বাজার বা হাটে বাজার দর ইত্যাদি বিভিন্ন বাজারের খবর নোটিশ বোর্ডে লেখার ব্যবস্থা ; এই পরিকল্পনার কাজ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে :—

(১) পরিকল্পনা চালু করার আগে জেলার সম্পদ ও উৎপাদন ব্যবস্থাদির সমীক্ষা ;

(২) পরিকল্পনার কাজ সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফল নিরূপণ করা ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গে এই পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ :—

বর্দ্ধমান জেলায় দামোদর উপত্যকা এলাকায় প্রথমে ১০টি ব্লকের কৃষি উন্নয়নের কাজ সুরু হ'বে বলে স্থির হয়। এই পাঁচ কোটি টাকার পরিকল্পনায় মোট ৬ লক্ষ একর জমিতে নিবিড় চাষের চেষ্টা করা হবে। প্রথম পর্য্যায়ে আড়াই লক্ষ একর জমিতে নিবিড় চাষ (Intensive cultivation) করা হবে। এই পরিকল্পনার ফলে একর প্রতি ১০ মণ করে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। বর্ত্তমানে বর্দ্ধমানে প্রতি একর জমিতে গড়ে ২৭ মণ ধান উৎপন্ন হয়। বরাদ্দ অর্থের মধ্যে গড়ে তিন কোটি টাকা রাজ্যের সমবায় দপ্তরের মাধ্যমে কৃষকদের সার, বীজ ও অন্যান্য কৃষি সরঞ্জাম কেনার জন্যে ঋণ হিসেবে দেওয়া হ'বে। কৃষি দপ্তর বাকী দেড় কোটি টাকা কৃষকদের খামার পরিকল্পনা রচনা ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজের জন্য ব্যয় করবেন। কৃষকদের সাহায্য করার জন্যে এই পরিকল্পনাকালে প্রতি ব্লকে অতিরিক্ত চারজন কৃষি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কৃষি বিপণন সমবায় সমিতি

সমবায় বিপণনের প্রয়োজনীয়তা—

কৃষিজাত দ্রব্য সরাসরি চাষীদের খামার থেকে আমরা পাই না, গ্রামের মহাজন, ছোট ছোট ব্যবসায়ীর মাধ্যমে পাই। তাই আমরা যে দাম দিই আর উৎপাদনকারী কৃষক যে দাম পায় তার ভেতর তফাৎ খুব বেশী অর্থাৎ বেশী দামে আমাদের কৃষিজাত দ্রব্য কিনতে হয়। আর খুব কম দামে চাষীদের বিক্রী করতে হয়। চতুর ব্যবসায়ীদের মতো কৃষকদেব তেমন ব্যবসায় বুদ্ধি নেই; ব্যক্তিগত ভাবে দর কষাকষির সামর্থ্যও নেই। তাই তার উৎপন্ন দ্রব্যের যেটুকু দাম পায়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা চাষীকে আগাম টাকা দেয়, ক্ষেত থেকে নিজেদের দোকানে বা গুদামে সরাসরি ফসল ধবে নিয়ে আসে কম দামে। যতদিন দাম না বাড়ছে, ততদিন ফসল হাত ছাড়া করে না। চাষীদের ফসল উৎপাদনেই ব্যস্ত থাকতে হয় —বিপণনের দিকটা একদম অবহেলা করে বললেই হয়। এর সুযোগ নেয়, ছোট ছোট গ্রাম্য ব্যবসায়ীরা। যতটা কম দরে সম্ভব ততটা কম দরে কৃষিজাত দ্রব্য কিনে মোটা মুনাফা লাভের চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে যায়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন অজুহাতে স্থিরীকৃত দ্রব্যমূল্যের অনেক বেশী নিয়ে নেয়, পাকা রশিদও দেয় না। অবশ্য একথা ঠিক যে, চাষী তার উৎপন্ন শস্য বেশী দিন ধরে রাখতে পারে না। সংসার খরচা, মহাজনদের ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি নানা ব্যাপারে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে ফসল বিক্রী করে দিতে হয়। তা ছাড়া শস্য বেশীদিন ধরে রাখার গুদাম বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেই। বাজারেও সে রকম গুদাম পাওয়া যায় না যেখানে শস্য ধরে রাখা যায়। প্রায় একই সঙ্গে পর্য্যাপ্ত ফসল বাজারে আসে; ফলে দাম যায় অনেক কমে। আবার পল্লী অঞ্চলে ভাল রাস্তাও নেই। পরিবহণের ব্যবস্থাও তেমন সন্তোষজনক নয়। কাজেই অনেক সময় চাষী তার নাগালের কাছে যে সব ছোট ছোট ব্যবসায়ী বা ফড়িয়াদের পায় তাদেরকেই ফসল বিক্রী করে দেয়। গ্রাম্য মহাজনদের হাত থেকে চাষীদের রক্ষা করতে হ'লে যেমন প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ দরকার এবং সেজন্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে অধিকতর ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে তেমনি, গ্রামের ছোট ছোট ব্যবসায়ী বা ফড়িয়াদের হাত থেকে চাষীদের রক্ষা করতে হ'লে এদের বিভিন্ন

রকমের বিপণনের সুযোগ সুবিধে দিতে হ'বে। নতুবা, চাষীরা নিবিড় চাষ করে উৎপাদন বাড়ালেও বা ভাল ফসল তুল্‌লেও সত্যিকারের এদের কোন উপকার হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই চাষীদের সংঘবদ্ধ হ'য়ে নিজেদের উৎপন্ন শস্য বিপণনের ব্যবস্থা করতে হ'বে এবং এই সংঘবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে 'সমবায় সমিতি' সংগঠন উল্লেখযোগ্য।

বিপণন ব্যবস্থা

আমরা দেখেছি, কৃষিজাত দ্রব্য বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে চাষীদের কাছ থেকে খদ্দেরদের কাছে আসে। এই বিভিন্ন স্তরে কতকগুলো কাজ দরকার; যেমন, কৃষিজাত দ্রব্য বিভিন্ন চাষীর কাছ থেকে সংগ্রহ করে দ্রব্যের মান অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা; তারপর যতদিন ভাল দাম না পাওয়া যাচ্ছে, ততদিন কোন গুদাম বা পণ্য সংরক্ষণাগারে রাখা; তারপর বিক্রীর জন্যে গুদাম থেকে বাজারে বা গঞ্জে নিয়ে যাওয়া। কোন লোকসান বা ঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা পেতে হ'লে সংরক্ষিত বা গুদামজাত শস্যের বীমা করাও প্রয়োজন। তারপর এসব শস্য যতদিন বিক্রী না হচ্ছে, ততদিন খরচখরচা চলার মতো চাষীদের কিছু টাকা দেওয়াও দরকার।

কাজেই সু-বিপণন ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত কাজগুলো খুব প্রয়োজন :—

(১) শস্য সংগ্রহ বা একত্রীকরণ,

(২) সংরক্ষণ বা গুদামজাত করণ;

(৩) গুদামজাত শস্য বিক্রী না হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্ত্তী কালের জন্য ঋণ সরবরাহ;

(৪) ঝুঁকি এড়ানোর জন্যে বীমা করা;

(৫) শস্যের মানভেদে পৃথক করণ, বস্তাবন্দী বা প্যাকিং করণ ইত্যাদি;

(৬) হাটে-বাজারে বিক্রী করার জন্যে নিয়ে যাওয়া;

(৭) বিক্রী করণ। এ কাজগুলোর কিছু কিছু চাষীরা নিজেরাই করতে পারে যেমন, (২), (৩) ও (৬) তে লিখিত কাজ, কিন্তু বাকী কাজগুলো এদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। যদি চাষীরা সমবায় বিপণন সমিতি সংগঠন করতে পারে, তাহ'লে সবগুলো কাজ করা সম্ভবপর হয়।

সমবায় বিপণনের সুবিধা—

সু-বিপনণের বিভিন্ন কাজ খুব কম খরচায় সম্ভবপর হয়। সমবায় ব্যবস্থা চাষীদের খুব শক্তিশালী করে তুলতে পারে। বড় জোতদারদের মত সুযোগ

সুবিধেও দিতে পারে ; এক সঙ্গে অনেক জিনিস ঠিক সময়ে বিক্রী করাতে, ভাল দামও পায়। উৎপাদক ও উৎপন্ন দ্রব্য ভোগকারীদের মধ্যে যে সমস্ত মহাজন, ছোট ছোট ফড়িয়া প্রভৃতি ব্যবসায়ী রয়েছে, এদের হাত থেকে গরীব চাষীদের রক্ষা করতে পারে বিপণন সমবায়। খদ্দেররাও সরাসরি চাষীদের নিজস্ব সমবায় প্রতিষ্ঠান থেকে কৃষিজাত দ্রব্য কিনে বেশ উপকৃত হয়, কেননা অনেক কম দামে ভাল জিনিষ পাওয়া যায়। সমবায় ব্যবস্থায়, শস্যের অপচয় দূর হয় ও সাধু ব্যবসায় করার জন্য খুব সহজেই খদ্দের পাওয়া যায়। তা' ছাড়া, চাষী সভ্যদের শস্য-সংরক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করে ও গুদামজাত শস্যের জামিনে কিছু আগাম টাকাও দেয়। কাজেই শস্য বিক্রী না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তবর্তী-কালীন ভরণপোষণ বা অন্যান্য আবশ্যকীয় উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য চাষীরা পায়।

বিপণন সমবায় চাষীদের ব্যবসায়ী বুদ্ধি দিয়ে কৃষি ব্যবসায় পরিচালন সম্পর্কেও যথেষ্ট সাহায্য করে। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শস্য বাজারে ছেড়ে কৃষিজাত দ্রব্য মূল্যের সমতা রক্ষার চেষ্টাও করে সমবায় বিপণন সমিতি।

কৃষিজ বিপণন সমবায়ের সাফল্য—

সমবায়ী বিপণন খুব শক্ত কাজ, কেননা, একদিকে যেমন সভ্যদের সমিতির প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি সমিতির সভ্য হ'লে চাষীদের যে উপকার হবে তা হাতে কলমে দেখাতে হ'বে। কারণ, যদি গ্রাম্য ব্যবসায়ী বা ফড়িয়াদের সংস্পর্শে এসে, চাষীর অধিকতর লাভ বা উপকার হয়, তা' হ'লে সে সমিতির সভ্য হ'তে কেন যাবে? কাজেই বিপণন সমিতি গড়ে তোলার আগে খুব সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমিতিকে সার্থক করে তুলতে হ'লে, দেখতে হ'বে সমিতি সংগঠনের কোন প্রয়োজন আছে কিনা। সমিতি সংগঠিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবসায় সম্ভব হ'বে কি-না এবং সভ্যদের সত্যিকারের উপকার করা যাবে কি-না। তা' ছাড়া সমিতির যথেষ্ট মূলধন, গুদাম ঘর বা অন্যান্য শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, যেসব সমিতি দু একটা নির্দ্দিষ্ট-কৃষিজাত দ্রব্য নিয়ে কাজ করেছে, তারাও সফল হয়েছে। এভাবে একটি বা কোন নির্দ্দিষ্ট শস্য বেশী পরিমাণ নিয়ে কাজ করলে ভাল হয়, তা ছাড়া সমিতির সাফল্যে দক্ষ পরিচালনাও দরকার। পরিচালন-ব্যবস্থার ভার ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের হাতে দেওয়াই সমীচীন,

এসব ব্যক্তিদের যথেষ্ট স্থানীয় প্রভাব প্রতিপত্তি থাকাও বাঞ্ছনীয়। সমিতির প্রধান কার্য্যালয় ও গুদামঘর কোন বাজার বা তার কাছাকাছি কোন জায়গায়, রেল ষ্টেশনের গায়ে বা বড় রাস্তার ধারে অবস্থিত থাকাও উচিত। কারণ তাতে গুদামজাত শস্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে শস্য এনে গুদামজাত করার সুবিধে হয়। কৃষি বিপণন সমিতির সাফল্য নির্ভর করবে অনেকটা শস্য উৎপাদনের জন্যে ঋণ সরবরাহকারী সমিতির সাফল্যের ওপর। কোনও এলাকায় কৃষি ঋণদান সমিতি বিশেষ উন্নত না হওয়া পর্য্যন্ত বিপণন সমিতির উন্নতিও তেমন সম্ভব নয়। কাজেই যেখানে কৃষি বিপণন সমিতি রয়েছে সেখানে বহু ছোট ছোট ঋণদান সমিতি বা একটা বৃহদাকার ঋণদান সমিতি গড়ে তুল্‌তে হবে।

যদি কোন বৃহদাকার ঋণদান সমিতি থাকে তা' হ'লে কোন বাজার বা কাছাকাছি অবস্থিত বিপণন সমিতির সহকারী সমিতি হিসেবে কাজ করবে। এভাবে কোনও বৃহদাকার ঋণদান সমিতি বা সর্ব্বার্থ-সাধক সমিতির মাধ্যমে ঋণদান ও বিপণনের একটা নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হবে। গ্রামের প্রাথমিক ঋণদান সমিতি বা বৃহদাকার ঋণদান সমিতিগুলো শস্যোৎপাদনের জন্য এই সর্ত্তে চাষী সভ্যদের ঋণ দেবে যে, তাদের উৎপন্ন শস্য নিকটবর্ত্তী কোন বিপণন সমিতির মাধ্যমে বিক্রীর ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনটি জিনিস মনে রাখা দরকার। সাধারণতঃ বিক্রীর জন্যে বিপণন সমিতি সভ্যদের কাছ থেকে শস্য সংগ্রহ করবে এবং যতটা সম্ভব শস্য একবারে কিনে না নেওয়াই উচিত। কেননা তাতে অনেক ঝুঁকি নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ ঋণদান সমিতিকে বিপণনের কাজ করলে চলবে না—বিপণন সমিতির পক্ষে শুধু শস্য সংগ্রহ করবে। তৃতীয়তঃ চুক্তি বা আইনের বলে কোন ঋণদান সমিতির সভ্য শস্য উৎপাদন উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়ে তার উৎপন্ন শস্য বিপণন সমিতির মাধ্যমে বিক্রী করতে বাধ্য থাকবে। ১৯৫৫ সালে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত এবং ১৯৫৮ সালে জয়পুরে অনুষ্ঠিত বিপণন ও সমবায় সম্পর্কিত সম্মেলনেও উপরিউক্ত সুপারিশ করা হয়।

অতঃপর কৃষিজাত দ্রব্য বিপণনের সঙ্গে কৃষিকার্য্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের একটা সম্বন্ধ রয়েছে। শস্য বিক্রীর পর সঙ্গে সঙ্গেই চাষীর কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনীয় দ্রব্য দরকার হয়। তাই এইসব জিনিষ, যথা সার ইত্যাদি সরবরাহ করার জন্যে একটি শীর্ষ সমিতি থাকা উচিত; আর শস্য বিপণনের জন্যে প্রাথমিক বিপণন সমিতিই যথেষ্ট। কাজেই দেখা যাচ্ছে,

সমবায় বিপণন সফল করে তুলতে প্রাথমিক ও শীর্ষ সমিতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। শীর্ষ সমিতি ও প্রাথমিক সমিতির মাঝে কোন কেন্দ্রীয় বিপণন সমিতিও থাকতে পারে। তবে বিশেষ কোন আর্থিক সুবিধে পাওয়া গেলেই এ ধরণের সমিতি সংগঠন প্রয়োজন—অন্যথায় নয়। শস্যের ভাল দাম পাওয়ার জন্যে—প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে বা কোন বিশেষ ধরণের কাজের জন্যে (যেমন ধান থেকে চাল তৈরী ইত্যাদি) এ ধরণের সমিতি থাকতে পারে। স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় অঞ্চল বা জেলা ভিত্তিতে এ ধরণের কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করা চলতে পারে।

বিপণন সমবায় সম্পর্কে নিখিল ভারত পল্লীঋণ সমীক্ষা কমিটির অভিমত ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—

সমীক্ষা কমিটি বলেন যে, গ্রামের ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও মহাজনরা গ্রামীন অর্থ নীতিতে একটা প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। মোট কর্জ্জের ৭০ ভাগ চাষীরা এইসব মহাজনের কাছ থেকে নেয়। আবার গ্রাম্য মহাজন ও সহুরে মহাজনদের মধ্যে কৃষিদ্রব্য ব্যবসায়ীর সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে শতকরা ৩৭ ও ৮৩ জন। কাজেই কৃষিঋণ সরবরাহ ও কৃষিজ দ্রব্য বিপণনে মহাজনরা প্রায় একচেটিয়া ব্যবসায় করছে। এমতাবস্থায় কৃষিঋণের সঙ্গে বিপণনের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করেও সমবায়ের মাধ্যমে চাষীদের ঋণদানের ব্যবস্থা করা দরকার। সমীক্ষা কমিটি তাই সমন্বিত ঋণদানের পরিকল্পনার সুপারিশ করেন। এই পরিকল্পনায় সভ্যদের উৎপন্ন শস্য বিপণনের সঙ্গে কৃষি ঋণদান ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হবে। বিপণন সমিতির মাধ্যমে শস্য বিপণনের সর্ত্তেই কৃষিঋণদান সমিতি সভ্যদের কর্জ্জ দেবে, যাতে শস্য বিক্রির পর বিপণন সমিতি ঋণদান সমিতির কর্জ্জের পাওনা টাকা কেটে নিতে পারে। ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত রাজ্য সমবায় মন্ত্রী সম্মেলনে স্থিরীকৃত হয় যে, সমবায়ের ভিত্তিতে গ্রামীন ব্যবসায় সংগঠনই হবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দীর্ঘ মেয়াদী উদ্দেশ্য, তারজন্যে রাজ্য সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরামর্শ ক্রমে সমবায় ঋণদান ব্যবস্থা ও সমবায় বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা রচনা করবেন।

এভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রায় ১৮০০টি কৃষি বিপণন সমিতি গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয় এবং কোন বিপণন সমিতির আদায়ীকৃত অংশগত মূলধনের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকায় দাঁড়ালে, সরকার শতকরা ৫১ ভাগ,

অংশ কিনে নেবেন বলে স্থির হয়। প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে শীর্ষ বিপণন সমিতিও থাকবে। তার কাজ হবে, কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে কৃষি উপকরণ যথা, বীজ, সার ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এ সব শীর্ষ সমিতি ও সরকারী অংশীদারীর জন্যে ৫০ হাজার টাকা সরকার থেকে পাবে। পরিচালন ক্ষেত্রে কর্ম্মচারীদের মাইনে বাবত প্রত্যেক প্রাথমিক বিপণন সমিতির জন্যে প্রথম তিন বছরে কিছু টাকা দান হিসেবে দেওয়ারও ব্যবস্থা হয়। তা ছাড়া প্রাথমিক বিপণন সমিতির গুদাম তৈরীর জন্যে—বিশ হাজার থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ও শীর্ষ সমিতির জন্যে পঁচিশ হাজার থেকে এক লাখ টাকা দেওয়ার ও ব্যবস্থা হয়। এই সমস্ত টাকা সাধারণতঃ জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও পণ্য-সংরক্ষণ বোর্ড হ'তে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত সমিতির জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ হয়:—

১।	মোট প্রাথমিক বিপণন সমিতির সংখ্যা—	১,৮০০
২।	মোট প্রোসেসিং সমিতির সংখ্যা—	২৯
৩।	প্রাথমিক বিপণন সমিতির মোট গুদাম নির্ম্মাণ—	১,৫০০
৪।	মোট শীর্ষ সমিতির সংখ্যা—	২৩

১৯৫৬ সালে কৃষিজাত উৎপন্ন শস্য (উন্নয়ন ও সংরক্ষণ) কর্পোরেসন আইনে সমবায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সাহায্যার্থে 'সমবায় উন্নয়ন ও শস্য সংরক্ষণ বোর্ড' নামে একটি বোর্ড স্থাপিত হয়। বোর্ডের কাজ হচ্ছে, কৃষি বিপণন ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য কাজ, শস্য সংরক্ষণ প্রভৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত পরিকল্পনা রচনা ও তার রূপায়ণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ। ১৯৫৬-৫৭ সালে সমন্বিত পরিকল্পনা রূপায়ণে বোর্ড কর্ত্তৃক মোট দেয় টাকার পরিমাণ ছিল ২ কোটি টাকা। এ সব টাকা সাধারণতঃ ঋণ ও দান হিসাবে দেওয়া হয়। একই খাতে ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট দেয় টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩·৬৬ কোটি টাকা। ১৯৬০-৬১ সালের শেষে সমস্ত বাণিজ্য কেন্দ্রে সমবায় বিপণন সমিতি গড়ে তোলার ব্যবস্থাও করা হয়; তা' ছাড়া বাজারে যত কৃষিজ দ্রব্য বিক্রী হয়, তার শতকরা ১৫ ভাগ সমবায়ের আওতায় আনারও ব্যবস্থা হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট ১০৬৫টি প্রাথমিক বিপণন সমিতি সংগঠন করা হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিপণন ও অন্যান্য কৃষি কাজের ব্যবস্থা

(১) মোট প্রাথমিক বিপণন সমিতি সংগঠন— ৫৮০

(২) মোট সমবায় চিনির কল সংগঠন— ৩০

(৩) মোট সমবায় তূলা সমিতি সংগঠন—। ৪৮

(৪) মোট অন্যান্য বিপণন সম্পর্কিত সমিতি সংগঠন— ৭৯০

(৫) মোট পল্লী গুদাম তৈরী করা হবে— ৯০০০

(৬) তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সমবায়ের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য বিপণন করা হ'বে মোট বিপণনের শতকরা ২০ ভাগ—

(৭) তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে সমবায়ের মাধ্যমে অর্থকরী শস্য বিপণন করা হ'বে—মোট বিপণনের শতকরা ৩০ ভাগ।

সমন্বিত ঋণ পরিকল্পনায় কৃষিঋণ ও কৃষিজদ্রব্য বিপণনের একটা যোগাযোগ সাধন করা সম্ভব হ'বে, সন্দেহ নেই। কেননা, উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী চাষীকে তার উৎপন্ন শস্য সেখানকার বিপণন সমিতির মাধ্যমে বিক্রী করতে হ'বে এই সর্ত্তে কৃষিঋণদান সমিতি তাকে ঋণ দেবে। বিপণন সমিতি তার গুদামজাত শস্য ভাল দামে বিক্রীর ব্যবস্থা করবে এবং বিক্রী করে যে টাকা পাওয়া যাবে তা' থেকে ঋণদান সমিতির প্রাপ্য টাকা বাদ দিয়ে বাকী টাকা চাষীকে দেবে। তারপর এই আদায়ী টাকা সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অথবা ঋণদান সমিতিকে দিয়ে দেবে। এভাবে ঋণদান সমিতির কর্জ্জের টাকা আদায় করতে তেমন কোন অসুবিধা হবে না; তা'ছাড়া বিপণন সমিতিরও এর দরুন ব্যবসা বাড়ানোর বিশেষ সুবিধা হবে।

যদি বিপণন সমিতির যথেষ্ট অর্থ না থাকে, তা' হ'লে চাষীদের শস্যের জামিনে আগাম টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। এভাবে পরিকল্পনা কার্য্যকরী করাও সম্ভব নয়। ছোট ছোট পল্লীঋণদান সমিতিগুলোকে পুনর্গঠিত করে বড় করতে না পারলে এবং এদের পক্ষে বেশী ঋণ দিয়ে ও বেতনভুক্ত কর্ম্মচারী রেখে, সর্ব্বোপরি সভ্যদের উৎপন্ন শস্য গুদামজাত করার জন্যে গুদাম তৈরী করা সম্ভব না হ'লে, এধরনের পরিকল্পনা সফল করা সম্ভব নয়। মাদ্রাজে গত বিশ বছর ধরে 'নিয়ন্ত্রিত ঋণ' নামে এধরনের একটা পরিকল্পনা চালু করা হ'য়েছে। মাদ্রাজের বিভিন্ন জেলায় এই পরিকল্পনা, বিশেষ করে অর্থকরী শস্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ সফল হ'য়েছে।

কৃষি বিপণন সমিতির সংগঠন, দৈনন্দিন কাজ ও পরিচালন ব্যবস্থা

সংগঠন—বিপণন সমিতি সফল করে তুলতে হ'লে কোন্ কোন্ দিক বিবেচনা করা দরকার তা' আগেই আলোচনা করা হ'য়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৮০০টি বিপণন সমিতি গঠন করা হ'বে বলে স্থির হয়। সত্যিকারের প্রয়োজন বোধ করলে, চাষীরাই বিপণন সমিতি গড়ে তোলার জন্যে এগিয়ে আসবে; কিন্তু এদের ভেতর উদ্যোগের অভাব থাকায় সমবায় কর্ম্মীকেই অগ্রণী হ'তে হ'বে।

এলাকা—স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিপণন সমিতির এলাকা স্থির করতে হ'বে। শস্যের রকমভেদে এলাকাও বড় বা ছোট হ'তে পারে; যেমন, ধান বিপণন সমিতির এলাকা একটা তালুকের সমান হ'তে পারে; আবার অর্থকরী শস্য—যেমন, পাট, তুলা ইত্যাদি বিষয়ক বিপণন সমিতির এলাকা একটি জেলা বা এসব শস্য উৎপন্নের সমস্ত এলাকা নিয়ে থাকতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অন্ততঃ পাঁচটি বৃহদাকার ঋণদান সমিতির এলাকা নিয়ে একটি বিপণন সমিতি করার কথা ছিল; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এক একটি থানা নিয়েই এক একটি সমিতি গঠন করা হচ্ছে।

সভ্য—বৃহদাকার ঋণদান সমিতি, সেবা সমিতি বা অন্যান্য পল্লীঋণদান সমিতি, সর্ব্বার্থসাধক সমবায় সমিতি, বিপণন সমিতির সভ্য হ'তে পারে। সাধারণতঃ ব্যবসায়ীদের সভ্য করা উচিত নয়। তবে বিপণন সমিতির সঙ্গে এসব ব্যবসায়ীদের সর্ব্বদা লেন্‌দেন্‌ থাকলে এদের সভ্য করা যেতে পারে। কিন্তু এধরনের সভ্য সংখ্যা যতটা সম্ভব খুব কম থাকবে এবং এই সভ্যদের সমিতির পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে বা মুনাফায় ভাগ বসাতে দেওয়া চলবে না।

উদ্দেশ্য—বিপণন সমিতির উদ্দেশ্য হ'বে—

(১) সভ্যদের উৎপন্ন শস্যের সুবিপণন;

(২) গুদাম ভাড়া নিয়ে বা তৈরী করে সভ্যদের উৎপন্ন শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ও গুদামজাত শস্যের জামিনে সভ্যদের কিছু আগাম টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা;

(৩) বিভিন্ন কু-প্রথা—যেমন, ধল্‌তা বা কম ওজন ইত্যাদির হাত থেকে চাষীদের রক্ষা করা;

(৪) সভ্যদের উৎপন্ন শস্য সংগ্রহ করে তা একত্রিত করা, মাল নির্দ্ধারণ করা ইত্যাদি;

(৫) সভ্যদের বীজ, সার ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

মূলধন—সাধারণতঃ শেয়ার বিক্রী করে, আমানত সংগ্রহ করে, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা সরকার থেকে কর্জ্জ নিয়ে, সরকার থেকে এককালীন দান নিয়ে, ঋণপত্র বাজারে ছেড়ে, গুদাম ঘরের পত্র (Warehouse Receipt) বা গুদামজাত শস্যের জামিনে ঋণ সংগ্রহ করে এবং মুনাফা থেকে বিভিন্ন তহবিল তৈরী করে বিপণন সমিতি কার্য্যকরী মূলধন জোটায়।

বিপণন সমিতির সাধারণতঃ চার রকমের ঋণ প্রয়োজন হয়ঃ—

(১) উপৎপাদন উদ্দেশ্যে বা গুদামজাত শস্যের জামিনে সভ্যদের ঋণ দেওয়ার জন্যে;

(২) কারবারের চলতি খরচার জন্যে স্বল্প মেয়াদী ঋণ;

(৩) সভ্যদের উৎপন্ন শস্য সংগ্রহ করার জন্যে বা গুদামজাত শস্য উৎকৃষ্ট বাজারে বিক্রী করার প্রয়োজনে মোটর ট্রাক কেনার জন্যে মধ্য মেয়াদী ঋণ;

(৪) আর কোন দামী যন্ত্রপাতি কিনবার জন্যে বা সমিতির অফিস গৃহ বা অন্যান্য কাজ করার জন্যে—যেমন, তৈলবীজ থেকে তৈল বার করা, দুধ থেকে মাখন, দই ইত্যাদি তৈরী করার জন্যে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের প্রয়োজন হয়।

গোড়ার দিকে বিপণন সমিতিকে ধার কর্জ্জ করেই কাজ চালাতে হয়। এজন্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিপণন সমিতির প্রাথমিক অর্থসমস্যা মেটাবার জন্যে দীর্ঘ মেয়াদী সরকারী ঋণ ও এককালীন দান, গুদামজাত শস্যের জামিনে স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া থেকে ঋণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ও আদায়ীকৃত অংশগত মূলধনের অর্থ থেকে দশগুণ অবধি টাকাও ঋণ হিসাবে পাওয়া যেতে পারে।

কাজ—সমিতি রেজিষ্ট্রি হওয়ার পর, প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করা হলে, গুদাম তৈরী বা ভাড়া করা হয়। তারপর সভ্যদের কাছ থেকে উৎপন্ন শস্য সংগ্রহ করে গুদামজাত করা হয়। খাদ্য শস্য সাধারণতঃ কয়েকমাস গুদামে রেখে উৎকৃষ্ট বাজারে উৎকৃষ্ট মূল্যে বিক্রী করা হয়। সভ্যের মজুত শস্যের জামিনে শস্যের মোট চলতি বাজার মূল্যের শতকরা ৭৫৲ টাকা আগাম হিসাবে সভ্যকে দেওয়া হয়। গুদামজাত শস্যের জামিনে স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকেও বিপণন সমিতি ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোন সভ্যের বিপণন সমিতিতে মজুত শস্যের বিবরণী পত্রের জামিনেও সভ্যকে কিছু আগাম টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে। সমন্বিত পল্লীঋণ পরিকল্পনায় কৃষিঋণদান সমিতির অধমর্ণ

সভ্যকে স্থানীয় বিপণন সমিতির মাধ্যমে শস্য বিক্রীর ব্যবস্থা করতে হয়। ঋণদান সমিতির সভ্যগণ তাদের উৎপন্ন সস্য সরাসরি বিপণন সমিতি বা ঋণদান সমিতিতে সুবিধামত জমা দিতে পারে, বিপণন সমিতিও এই শস্য তার আঞ্চলিক সংস্থাকে দিয়ে দিতে পারে। নতুবা যদি বিপণন সমিতি কোন অর্থকরী শস্য নিয়ে কাজ কারবার করে, তা' হ'লে এইসব শস্যের পাইকার বা রপ্তানীকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে বিক্রীর ব্যবস্থা করে। আগেই বলা হয়েছে বিপণন সমিতির পক্ষে সভ্যদের কাছ থেকে শস্য একবারে নগদ টাকায় কেনার ঝুঁকি নেওয়া মোটেই সমীচীন নয়। ডেনমার্ক, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিপণন ব্যবস্থা খুব উন্নত। এসব দেশেও চাষীদের শস্য একেবারে কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা নেই। বিপণন সমিতি সম্ভব হ'লে হিম ঘরের ব্যবস্থা বা ধান থেকে চাল তৈরী করার মত ব্যবস্থা বা অনুরূপ কিছু ব্যবস্থা করতে পারে। বিপণন সমবায় সমিতির সংগঠন, কার্য্যাবলী ও পরিচালন ব্যবস্থায় ডিগ্‌বী ও গ্রেট্‌ন রচিত "কৃষি দ্রব্য উৎপন্নকারীদেব জন্যে সমবায় বিপণন" বই-এ কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ রয়েছে। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :—

১। সত্যিকারের প্রয়োজন অনুভব না করা পর্য্যন্ত কোন বিপণন সমিতি সংগঠন করা উচিত নয়। বর্ত্তমান বাজার ব্যবস্থার অধিকতর উন্নতি সাধনেই বিপণন সমিতি গড়ে তোলা উচিত ;

২। কোন নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে সমবায় বিপণন সমিতি সংগঠন করা উচিত। যতটা সম্ভব শস্য বিশেষের ভিত্তিতে সমিতি গঠন করা শ্রেয়: ;

৩। যে শস্য নিয়ে সমিতি কাজ করবে, একমাত্র সেইসব শস্য উৎপাদনকারীদেরই সভ্যপদ থাকবে। সভ্যশ্রেণীভুক্তির সময় বাহ্যিক হিতৈষীদের সম্পর্কে সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয় ;

৪। সমিতির কাজের প্রথম বছরেই 'আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের' মত কিছু আশা করা ঠিক নয়। কেননা বাজার দরের আবহাওয়া, বিদেশী বাজার, রাজনীতি প্রভৃতির জন্যে প্রথম থেকেই উল্লেখযোগ্য তেমন কাজ দেখানো সম্ভবপর নয়। প্রথম বছরের কাজে নিরুৎসাহ হলেও চলবে না;

৫। বিপণন সমিতির পক্ষে গুদামজাত সমস্ত শস্য একসঙ্গে বিক্রী করা বা কোন ব্যক্তি বিশেষকে বিক্রী করা উচিত নয়। নিজস্ব মূলধন যতটুকু আছে তার বেশী টাকার শস্য সরাসরি সম্পূর্ণ দাম দিয়ে কেনার ব্যবস্থাও থাকা উচিত নয়;

৬। প্রথমেই বিরাট আকারে ব্যবসায় শুরু করা ঠিক নয়।, তেমনি কখনও সামান্য মুনাফায় কাজ চালানো উচিত নয় ;

৭। সভ্যদের সঙ্গে সমিতির কড়া চুক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা তাতে নিশ্চিত ভাবে কতটুকু ব্যবসায় হবে তা বোঝা যায় এবং বাজারেও ব্যবসায়ীরা শস্যমূল্য বাড়াতে বা কমাতে পারে না ;

৮। সব সময় সমিতির সভ্যদের সমিতির কাজ সম্পর্কে অবহিত করতে হ'বে। তাতে সমিতির কাজে সভ্যগণ অধিকতর উৎসাহী হ'বে ;

৯। সমিতির কর্ম্মচারীদের কাজে যথেষ্ট তদারকও বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক কর্ম্মচারীর ওপর কোন নির্দ্দিষ্ট পৃথক দায়িত্ব অর্পণ করে দিতে হ'বে। সমিতির পরিচালকদের সঙ্গে হিসাব নিরীক্ষক বা সমিতি পরিদর্শকের মধ্যে বন্ধুভাব থাকাও বাঞ্ছনীয়।

ভারতে সমবায় বিপণন সমিতিগুলোর অবস্থা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ও যুদ্ধোত্তর কালে বিপণন সমিতির প্রধান কাজ ছিল নিয়ন্ত্রিত দ্রব্য সরবরাহ করা। বীজ, সার কৃষি যন্ত্রপাতি ও দৈনন্দিন আবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য নিয়ে সমিতিগুলো কাজ করত। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিপণন সমিতির সত্যিকারের কাজ ব্যাহত হয়। ১৯৫১-৫২ সালে দ্রব্যমূল্য বিনিয়ন্ত্রণের ফলে বিপণন সমিতি নিজস্ব কাজে মন দিতে শুরু করে। কতকগুলো সমিতি কিন্তু বিনিয়ন্ত্রণের ধাক্কা মোটেই সামলাতে পারেনি।

১৯৫৬ সালের ভেতর ১৯টি প্রাদেশিক সমিতি ও ২৩৫৪টি কেন্দ্রীয় বিপণন সমিতি সংগঠিত হয়। এসব সমিতি গড়ে তোলার পেছনে প্রাথমিক সমিতিদের যোগাযোগ সাধন ও কাজে নানারকম সাহায্য করার উদ্দেশ্য থাকলেও তা সফল হয়নি। অধিকাংশ প্রাথমিক সমিতি স্বাধীন ভাবে কাজ করত। আংশিক ভাবে সমিতির সাফল্যে কতকগুলো সাধারণ অসুবিধার দরুন ও আংশিকভাবে বাইরের ব্যবসায়ীদের অশোভন কাজ-কর্মের জন্যে একমাত্র বোম্বাই মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্য ছাড়া অন্য কোথাও সমবায় বিপণন তেমন সফলকাম হ'তে পারেনি।

বোম্বাইতে সমবায় বিপণন সমিতির তুলা বিক্রয় সমিতিগুলো খুব ভাল কাজ করছে। মোট বিপণন সমিতির চার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে তুলা বিক্রয় সমিতি (১৯৫৫-৫৬) ; তারপর ফল, শাক-শব্‌জী সমিতিও উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৯

সালে বোম্বাই রাজ্য বিপণন সমিতি গঠিত হলেও প্রাথমিক সমিতিদের তেমন কাজে আনতে পারেনি। কৃষিঋণ ও বিপণনের উৎকৃষ্টতম যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে একটি মাত্র জেলাতে। সেখানে সমবায় বিপণন সমিতি মোট উৎপন্ন শস্যের শতকরা ৩০ ভাগ তুলো নিয়ে কারবার করতে পেরেছে।

১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে বোম্বাইতে ২০৬টি প্রাথমিক বিপণন সমিতি গড়ে ওঠে। এদের ব্যবসায় তুলো, শাক-শবজী ফল, তৈলবীজ লংকা জোয়ার প্রভৃতিতে সীমাবদ্ধ। গুদামজাত শস্যের জামিনে মোট দাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ লাখ টাকা। ২৭ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি, সার, বীজ ইত্যাদিও সভ্যদের সরবরাহ করে। ১৯৫৮-৫৯ সালের শেষে বোম্বাইতে ২১৩টি বিপণন সমিতি ছিল।

মাদ্রাজে বিপণন সমিতিগুলো কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কোন একটি শস্য নিয়ে ব্যবসায় করছে না। যার যার এলাকায় উৎপন্ন বিভিন্ন শস্য নিয়েই এদের কারবার। ‘নিয়ন্ত্রিত ঋণ’ ব্যবস্থায় কৃষিঋণ ও বিপণনের যোগাযোগও সুন্দরভাবে রক্ষা করা হচ্ছে। অবশ্য এধরনের পরিকল্পনার কাজ একমাত্র অর্থকরী শস্য নিয়েই ভাল চলছে, কিন্তু খাদ্য শস্যের ক্ষেত্রে বিপণন সমিতির কাজ মোটেই সন্তোষজনক নয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে, ১০৮টি ক্ষুদ্রায়তন ঋণদান সমিতি ও কৃষি ব্যাঙ্ক বিপণন সমিতির সভ্য হতে পেরেছে। তাদের মোট ঋণদানের পরিমাণ ১ কোটি ১১ লাখ টাকা। ১৯৫৮-৫৯ সালের শেষে মাদ্রাজে প্রাথমিক বিপণন সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৯টি।

উত্তর প্রদেশেও সমবায় বিপণন সমিতি মোটামুটি ভালই কাজ করছে। সেখানে আখ, ঘি, গম ইত্যাদি নিয়ে সমিতির কাজ চলছে। ১৯৫৮-৫৯ সালের শেষে উত্তর প্রদেশে বিপণন সমিতির সংখ্যা ছিল ৬২০টি। ১৯৫৮-৫৯ সালের শেষে ভারতে মোট ১৭টি প্রাদেশিক বিপণন সমিতি ছিল এবং এদের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬.৪৯ কোটি টাকা। তা' ছাড়া ৪৫৪টি কেন্দ্রীয় সমিতিও ছিল। এদের কার্য্যকরী তহবিলের পরিমাণ ছিল ৯.১৮ কোটি টাকা। আর প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ছিল ২৩৮০ টি। তার মধ্যে ৭৬৬ টি সরকার থেকে সরকারী অংশীদারী বাবত অংশগত মূলধন পেয়েছে ১.৪৪ কোটি টাকা। এসব প্রাথমিক সমিতি ছাড়াও ৮৩৮২ টি আয় সরবরাহ সমিতি (কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক মিলে), ২৩৩৪ টি সরবরাহ ইউনিয়ন, ৮৮ টি তুলা

চিনির সমিতি ও ৫০ টি চিনির কলও ছিল। চালের কল, কফি তৈরী, প্রভৃতি সমিতির সংখ্যা ছিল ৭৪০টি।

১৯৫৭-৫৮ ও ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতের বিপণন সমিতির অবস্থা নিম্নলিখিত তালিকা হ'তে প্রতীয়মান হ'বে :—

[টাকার অঙ্ক কোটিতে]

		১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯
১।	সমিতির সংখ্যা—	১,৮৯৯	২,৩৮০
২।	সভ্য সংখ্যা—	৫৪১,২৮৯	৯৬৮,২৩৯
৩।	অংশগত মূলধন—	২'২২	৩'৬৯
৪।	সংরক্ষিত তহবিল—	১'৬০	২'২৫
৫।	কর্জ্জ গ্রহণের পরিমাণ—	৫'৩৫	৮'৫৩
৬।	কার্য্যকরী তহবিল—	৯'১৭	১৪'৪৭
৭।	সভ্যদের কর্জ্জদাদন—	৯'৩২	১২'২০
৮।	দ্রব্য ক্রয়—	১০'৬১	১৫'৬০
৯।	দ্রব্য বিক্রয়—		
	মালিক হিসাবে—	৪'৭৬	৯ ৮৩
	এজেণ্ট হিসাবে—	১১'৩৩	১৬'৮৮

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় বিপণন

পশ্চিম বঙ্গে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় একটি প্রাদেশিক শীর্ষ সমিতি ও মোট ১১৩টি প্রাথমিক সমিতি গঠন করা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩৫ টি প্রাথমিক সমিতি গঠন করা হবে। প্রাথমিক সমিতিদের গুদাম ছাড়া আরও ১০০টি পল্লী গুদাম (Rural Godown) তৈরী করার প্রস্তাব রয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রত্যেক সমিতিকে নিম্নলিখিত সাহায্য দেওয়া হবে :—

১। সরকারী অংশীদারী বাবত ২৫,০০০৲ টাকা।

[এই খাতে মোট খরচ হ'বে ৬'৮৪ লাখ টাকা]

২। গুদাম তৈরীর জন্যে প্রত্যেক সমিতিকে দেওয়া হ'বে ২৫০০০৲ টাকা (৭৫% ঋণ ও ২৫% এককালীন দান)

[এই খাতে মোট খরচ হ'বে ৮'২৫ লাখ টাকা]

৩। প্রত্যেক সমিতিকে পরিচালন-খাতে দেওয়া হবে— ৪,৫০০৲ টাকা
(দান হিসাবে)

[এই খাতে মোট খরচ হবে—১'৪১ লাখ টাকা]

৪। প্রত্যেক সমিতিকে দ্রব্যমান নির্দ্ধারণের জন্যে উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগের জন্যে— ৪,০০০৲ টাকা
(দান হিসাবে)

(মাত্র ১২টি ভাল সমিতিকে দেওয়া হ'বে)

[এই খাতে মোট খরচ হবে—০'৪৮ লাখ টাকা]

৫। উপরের ১২টি সমিতি যাতে দ্রব্যমান নির্দ্ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি কিন্‌তে পারে তার জন্যে প্রতি সমিতিকে— ১,৫০০৲ টাকা

[এই খাতে মোট খরচ হবে—০'১৮ লাখ টাকা]

৬। ১০০টি পল্লী-গুদাম নির্ম্মাণের ব্যয়— ১০'০০ লাখ টাকা

(প্রতি সমিতিকে ১০,০০০৲ করে)

৭। শীর্ষ সমিতিকে গুদাম তৈরীর জন্যে দেওয়া হবে— ১'০০ লাখ টাকা
(৭৫% ঋণ ও ২৫% দান হিসাবে)

৮। শীর্ষ সমিতিকে সরকারী অংশীদারীর জন্যে— ২'০০ লাখ টাকা

৯। শীর্ষ সমিতির পরিচালন খাতে দান করা হবে— ০'২০ লাখ টাকা

১০। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে সব সমিতিকে পরিচালন খাতে সাহায্য করা হ'য়েছে এদের দান করা হ'বে আরও— ২'০৪ লাখ টাকা

১১। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে সমিতিতে সরকারী অংশীদারীর টাকা দেওয়া হয়েছে এদের আরও দিতে হবে— ১৭'২২ লাখ টাকা

মোট খরচ— ৫০'১২ লাখ টাকা

৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আর একটি হিম ঘর তৈরীর ব্যবস্থাও রয়েছে, তৃতীয় পরিকল্পনায়। তা'ছাড়া একটি চিনির কলও স্থাপন করা হবে। সরকার তাতে শেয়ার কিন্‌বেন ২৫ লাখ টাকার।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শিল্প সমবায়

কুটির শিল্প বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রয়োজনীয়তা

কুটির শিল্প, গ্রাম্য শিল্প ইত্যাদি ভারতে নতুন শিল্প নয়। বহুকাল ধরে পল্লী অঞ্চলে বা শহরাঞ্চলে এই ধরনের ছোট ছোট শিল্পের কাজ কর্ম্ম চলছে। পূর্ব্বে গ্রামগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্যে খ্যাত ছিল। কারিগররা বিভিন্ন শিল্পের কাজ করত, আর খদ্দেররা যোগাত মাল-মসল্লা। কাজেই বিভিন্ন শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্য বিপণনের সমস্যা একদম ছিল না। কিন্তু বৃটিশ রাজত্বে সমস্যা দেখা দিল—বড় বড় কারখানার জিনিসপত্তরে বা বিদেশ থেকে আমদানী জিনিস পত্তরে দেশ ছেয়ে গেল—শহর, গ্রাম সর্ব্বত্র। হতভাগ্য গ্রামের নিখুঁত কারিগরের ভাগ্যে জুটলো বিপর্য্যয়—শুরু হ'ল গ্রামীন স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি আর শহুরে আধুনিক বিজাতীয় অর্থনীতির সংঘাত। এই প্রতিযোগিতার পাল্লায় গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ কারিগর সম্প্রদায় চুরমার হ'য়ে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেল। নিজ নিজ পেশা ছেড়ে কেউ গেল শহরে কলকারখানায় কাজ করতে, কেউবা হলো পুরোপুরি চাষী—যুগযুগান্তর ধরে যে পেশার আশ্রয় নিয়েছিল, তার হ'লো বিসর্জ্জন।

বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সরকার গ্রামের কুটির বা ক্ষুদ্র শিল্পগুলো বাঁচিয়ে তুলতে প্রাণপণে লেগে গেল। ১৯৫১ সালের আদম-সুমারীর পর থেকে এই ধরনেব ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি হয়। দেখা গেছে যে, ভারতের মোট জনসংখ্যার ২·১ ভাগ লোক বড় বড় কারখানায় কাজ করে, আর ৮·৪ ভাগ এই সব ছোট ছোট শিল্পে কাজ করে। জাতীয় দ্রব্যমূল্যে কুটির শিল্প ও অন্যান্য ছোট ছোট শিল্পের দান ৯১১ কোটি টাকা। আর বড় বড় কারখানার দান হচ্ছে মাত্র ৬২৪ কোটি টাকা। কাজেই সরকার এই ক্ষুদ্র শিল্পের পুনরুত্থানে যত্নপর হন।

দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে এইসব শিল্পের প্রয়োজনীয়তা কম নয়। তা' ছাড়া অনেক চাষীই সারা বছর কাজ খুঁজে পায় না। যে ক'মাস চাষ চলে, পেট ভরে। যখন কাজ থাকে না তখন প্রায় উপোস করে। তাই এদের কর্ম্ম-সংস্থানের জন্যে চাষাবাদ ছাড়াও খুব সহজে কম পুঁজিতে কাজ করতে পারে, এমন ছোট ছোট শিল্পের পুনরুত্থান বা প্রবর্ত্তন দরকার। দেশের দ্রুত

শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আয় বৃদ্ধি ও তার জন্যে ভোগ্যপণ্যের চাহিদাও বেড়ে যাচ্ছে। এই ভোগ্যপণ্যের চাহিদা অনেকটা এই ছোট ছোট শিল্প মেটাতে পারে। তা'ছাড়া এসব শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণও পল্লীঅঞ্চলে সম্ভব হ'বে এবং তাতে মুষ্টিমেয় সংখ্যক শহরের অর্থসম্পদ না বেড়ে পল্লীঅঞ্চলে বিভিন্ন পল্লীবাসীর হাতে তা ছড়িয়ে পড়বে। বড বড় শহরের জনসংখ্যার চাপও কমে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। পরিকল্পনা কমিশনের মতে "গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, কর্ম্ম-সংস্থান বাড়ানো, আর বাড়ানো জীবন-মান এবং এভাবে একটা সুশৃঙ্খল হিতকর গ্রামীণ অর্থনীতির সূচনা করা।"

বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পের সংজ্ঞা—

কুটির শিল্প—এসব শিল্পের কাজ বাড়ীতে বসেই ছোট আকারে করা যায় এবং এসব শিল্পে ফ্যাক্টরী আইন প্রযোজ্য নয়। তা'ছাড়া কারিগরদের এসব শিল্পের কাজই একমাত্র পেশা।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প—এই ধরনের শিল্পে কারখানার মালিক মজুর দিয়ে জিনিসপত্র তৈরী করায় এবং বাইরে থেকে আনা মজুরের সংখ্যাও ৫০এর বেশী নয়। এসব শিল্পে কিন্তু ফ্যাক্টরী আইন প্রযোজ্য নয়।

গৃহ শিল্প (Home Industry)—এই সব শিল্পের কাজ সাধারণতঃ কারিগরদের পরিবারের লোকেরা তাদের অবসর সময়ে করে থাকে।

গ্রাম্য শিল্প (Village Industry)—গ্রামের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি স্থানীয় কাঁচামালের সাহায্যে তৈরী করে গ্রামবাসীদের জন্যে বা স্থানীয় চাহিদা মেটাবার জন্যে যে সব শিল্প রয়েছে, তাদের গ্রাম্য শিল্প বলা হয়।

কুটির বা ছোট ছোট শিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের সমস্যা

কারিগরদের সমস্যা সাধারণতঃ তিনটি :—কাঁচামাল, মূলধন ও বিপণন সমস্যা। কারিগরদের প্রধান প্রয়োজন কাঁচামালের। তারপর উৎপাদন উদ্দেশ্যে অর্থের প্রয়োজন হয় এবং উৎপাদন ও বিক্রী—এই দুইএর মধ্যবর্ত্তী সময়ে ভরণ-পোষণের জন্যেও অর্থের প্রয়োজন হয়। তা' ছাড়া যন্ত্রপাতি কেনার জন্যও মূলধন দরকার। উৎপন্ন দ্রব্য বিপণন সমস্যাও কম নয়। কাজেই ছোট ছোট শিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনের প্রয়োজন। মূলধন সমস্যা মেটাবার জন্যে তাদের বেশীর ভাগই গ্রামের

মহাজনদের ওপর নির্ভর করতে হয়। অবশ্য ব্যবসায়ী-ব্যাঙ্ক ও সমবায় ঋণদান সমিতি থেকেও মূলধন পাওয়া যায়। ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলোর মূলধন সৃষ্টি হয় জনসাধারণ যে স্বল্প মেয়াদী আমানত এসব ব্যাঙ্কে রাখেন তা দিয়ে। তাই স্বল্প মেয়াদী আমানত ফেরত দেওয়ার সমস্যা থাকায় ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলো দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিতে পারে না। এরা শিল্পদ্রব্য বন্ধক রেখে একমাত্র স্বল্প মেয়াদী ঋণ দিতে পারে। কিন্তু পণ্যদ্রব্য বিপণন সমস্যার জন্যে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ সম্ভব হয় না। অবশ্য সমবায় ঋণদান সমিতিগুলো থেকে কারিগররা প্রয়োজনীয় ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু ঋণদান সমিতির কাজকর্ম তেমন সন্তোষজনক নয়, কাজেই প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের জন্যে কারিগরদের গ্রাম্য মহাজনদের কাছে না গিয়ে উপায় থাকে না।

গ্রামের মহাজনদের কবল থেকে কারিগরদের রক্ষা করতে হ'লে, অন্য কোথাও থেকে এদের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে হ'বে। যদি কারিগররা একত্র হ'য়ে কোন সংস্থার সৃষ্টি করে তা' হ'লে এই সংস্থার মাধ্যমে তাদের সব সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। বহুদিক হ'তে যাচাই ও বিচার করে দেখা গেছে যে সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত সংস্থাই হচ্ছে উপযুক্ত সংস্থা।

দেশের শিল্পী কারিগররা এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে, তাই তাদের পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি তারা মিলিত হ'য়ে সমবায় সমিতি গঠন করে, তা' হ'লে কাঁচামাল সরবরাহ, ঋণ সংগ্রহ বা বিপণন ব্যবস্থা-সব কিছু সম্ভব। তা' ছাড়া সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী সাহায্যও সহজে পাওয়া সম্ভব হয়। এজন্যেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায় ভিত্তিতে গ্রামের ছোট ছোট শিল্পগুলোর উন্নয়নের ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি হস্তচালিত তাঁতশিল্প ছাড়া অন্য কোন শিল্পের তেমন আশাপ্রদ উন্নতি হয় নি।

১৯৪৭ সাল অবধি একমাত্র হস্তচালিত তাঁত শিল্পেরই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে; এমন কি ১৯৫৩-৫৪ সালে ভারতের মোট শিল্প সমবায়গুলোর শতকরা ৬৬টি ছিল হস্তচালিত তাঁত সমবায়। ১৯৫৩-৫৪ সালে ভারতের মোট হস্তচালিত তাঁত সমিতির এক চতুর্থাংশ ছিল একমাত্র বোম্বাই প্রদেশে এবং ঐরূপ সমিতির মোট সভ্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ও মোট কার্য্যকরী তহবিলের অর্দ্ধেক ছিল ঐ প্রদেশে। মাদ্রাজে সমবায় তাঁতশিল্প গড়ে তোলার সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টা হয় ১৯০৫ সালে। ১৯০৫ সালের পর থেকে কিন্তু আর এক সমস্যা দেখা দিল। তাঁতীদের

সমবায় সমিতির শেয়ার কেনার মতো সামর্থ্য ছিল না। ১৯২৩ সালে ভারত সরকার হস্তচালিত তাঁত সমবায়কে অর্থ সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাঁতীদের সমবায় সমিতি সংগঠনে উৎসাহিত করেন এবং এভাবে সারা ভারত-ব্যাপী বহু তাঁতী সমিতি গড়ে উঠে। ১৯০৫ সালে বোম্বাই সরকারও তাঁতীদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। একই সময়ে মাদ্রাজে প্রাথমিক তাঁতী সমিতিদের কাজ তদারক ও তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করার উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় বিপণন সমিতি গড়ে ওঠে ও তার জন্যে তিনজন উপনিয়ামকও নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সাল অবধি ভারতে তাঁত সমবায়ের তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি বললেই চলে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ছোট ছোট শিল্পগুলোর উন্নয়নের জন্যে ৪৩·৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। এই বরাদ্দ অর্থের অধিকাংশই তাঁতশিল্প উন্নয়নে খরচা হয়। এই সময়ে ছোট শিল্পোন্নয়নে অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে সংগঠনিক উন্নয়ন, অর্থ সাহায্য, শিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থা, সরকার কর্তৃক ছোট ছোট শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয়, নতুন উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন শিল্প উন্নয়ন উদ্দেশ্যে (১) সর্ব্ব ভারতীয় হস্তচালিত তাঁত বোর্ড (১৯৫২), (২) সর্ব্ব ভারতীয় হস্তশিল্প বোর্ড (১৯৫৩), (৩) সর্ব্ব ভারতীয় খাদি ও গ্রাম্য শিল্প বোর্ড (১৯৫৩), (৪) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বোর্ড (১৯৫৪), (৫) কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড (১৯৪৯) [১৯৫২ সালে পুনর্গঠিত] ও (৬) ছোবরা শিল্প বোর্ড (Coir Board) (১৯৫৪) এই ছ'টি বোর্ড গঠিত হয়।

উপরিউক্ত বোর্ডগুলোর কাজ সাধারণত :—

(১) সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে আনুষঙ্গিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও উন্নয়ন ;

(২) রাজ্য সরকার সমূহের নীতি অনুমোদন ;

(৩) রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন শিল্প সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা উপদেশ দান ;

(৪) সংশ্লিষ্ট শিল্পোন্নয়নে গবেষণা এই বোর্ডগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প সংগঠন ও উন্নয়নের ভার অর্পিত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর। আর বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নীতি বা পরিকল্পনা কার্য্যে রূপায়িত করার ভার দেওয়া হয় বিভিন্ন রাজ্যসরকারকে। আর বোর্ডগুলো উপরিউক্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি না তার তদারক করেন।

এই সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ১৯৫৩ সালের খাদি ও হস্তচালিত তাঁতশিল্প উন্নয়ন আইনে 'সেস্ ফণ্ড'এর প্রবর্ত্তন। মিলে তৈরী বস্ত্রাদির ওপর অধিকতর শুল্ক ধার্য্য করে, তা' এই ফণ্ড বা তহবিলে জমা করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির শিল্প, গ্রাম্য শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প উন্নয়নে একটা বিরাট কার্য্যসূচী গ্রহণ করা হয়। ১৯৫৫ সালে কার্ভে কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির অধিকাংশ সুপারিশ সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হয় ও তা' দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যথাযথভাবে সন্নিবেশ করা হয়। বিভিন্ন কুটির ও ছোট ছোট শিল্প উন্নয়নে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এসব শিল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল যে, "ছোট ছোট শিল্পের জন্যে সরবরাহ ও বিপণন সমবায় সমিতি গড়ে তোলা দরকার। কোন কোন শিল্পে উৎপাদন সমবায়ের প্রচুর ভবিষ্যৎ রয়েছে।···সমবায় বিপণন সরবরাহ ও উৎপাদন সমিতি সংগঠনে প্রত্যেক রাজ্যের শিল্পদপ্তরকে আরও সুদৃঢ় করে তুলতে হ'বে। কার্ভে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যদি কোন সুনিশ্চিত বাজারের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার চেষ্টা হয়, তা' হ'লে সরবরাহও বিপণন উদ্দেশ্যে বহু শিল্প সমবায় সংগঠনের প্রয়োজন হ'বে।"

কমিটির হস্তচালিত তাঁত শিল্পের ঋণ সাহায্য সম্পর্কিত সুপারিশক্রমে ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হ'তে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। তা' ছাড়া দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে "শিল্প সমবায় সম্পর্কিত ওয়ার্কিং গ্রুপ" বা "রায়ান কমিটি" নিয়োগ। ওয়ার্কিং গ্রুপের বিবরণী ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয় ও ১৯৫৯ সালে সরকার গ্রুপের অধিকাংশ সুপারিশই গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ছোট শিল্প উন্নয়নে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তাদের মধ্যে, (১) বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের সাধারণ উৎপাদন পরিকল্পনা, যেমন, কি ধরনের ধুতি বা সাড়ী, কাপড়ের মিল তৈরী করবে, আর কি ধরনের ধুতি সাড়ী হস্তচালিত তাঁতশিল্প তৈরী করবে ইত্যাদি; (২) ঘানি শিল্পের উন্নয়ন; (৩) যে সব কারিগর চামড়া বা জুতা তৈরী করছে, এদের সাহায্যার্থ বড় বড় চামড়ার কারখানার সম্প্রসারণ বা বৃদ্ধি একদম বন্ধ করে দেওয়া; (৪) ঢেঁকি শিল্পের উন্নয়নে বড় বড় চালের কারখানা করতে না দেওয়া; (৫) কৃষি সমবায় ও কুটির বা অন্যান্য ছোট শিল্পের সমবায়কে সমপর্য্যায়ে আনা; (৬) ছোট শিল্পের

ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির উন্নয়নে উপযুক্ত গবেষণার ব্যবস্থা; (৭) ছোট শিল্পকে কারিগরি সাহায্য করার জন্যে বিভিন্ন জায়গায় ছোট শিল্প সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান (Small Industries Service Institute) স্থাপন; (৮) হস্তকলা শিল্পদ্রব্য ও তাঁতের বস্ত্রাদি বিক্রয়ার্থে বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শিল্প সমবায় গঠন ও পরিচালন

শিল্প সমবায়ের রকমভেদ—প্রথমদিকে শিল্প সমবায়গুলোর কাজ ছিল সভ্যদের ঋণ যোগান। ১৯৩০ সাল অবধি শুধু এই ধরনের সমিতিই ছিল। কিন্তু এরপর থেকে কোন রাজ্য বিশেষ করে বোম্বাইতে শিল্প সমবায়দের কাজ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল—ঋণ সরবরাহ ও ঋণ-ছাড়া অন্যান্য কাজে। ঋণদান ক্ষেত্রে, শিল্প সমবায়গুলো কৃষিঋণদানের জন্য গঠিত সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ওপর নির্ভর করত। শিল্প সমবায়দের এ ধরনের ঋণ সরকারের পক্ষে নিখিল ভারত পল্লীঋণ সমীক্ষা কমিটিও সুপারিশ করেছেন। আর অন্যান্য কাজের জন্যে কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতির মতো সর্ব্বনিম্নস্তরে প্রাথমিক শিল্প সমবায়, মধ্যবর্তী স্তরে জেলা বা কেন্দ্রীয় শিল্প সমবায় ও সর্ব্বোচ্চস্তরে শীর্ষ সমিতি গড়ে ওঠে। তবে আজকালকার শিল্প সমবায়গুলো ঋণ, উৎপাদন, বিপণন প্রভৃতি বিভিন্ন কাজ এক সঙ্গেই করছে।

ওয়ার্কিং গ্রুপ দেশের কতকগুলো শিল্প সমবায়ের কাজ অনুসন্ধান করে দু'রকম শিল্প সমবায় দেখতে পেয়েছেন, যেমন, কতকগুলো সমিতি নিজেরাই দ্রব্য উৎপাদন করে, বিক্রীর ব্যবস্থা করে এবং যা লাভ লোকসান হয় তা' তাদের নিজেদেরই থাকে। আবার কতকগুলো সমিতি রয়েছে সেবা জাতীয় সমিতি, যাদের কাজ হচ্ছে, সভ্যদের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরবরাহ করা, কারিগরী সাহায্য ও পণ্যদ্রব্য বিপণনের ব্যবস্থা করা। আবার, শিল্প উৎপাদন সমিতিগুলো দু'রকমের হ'তে পারে, যেমন, কতকগুলো সমিতিতে উৎপাদনের কাজ সভ্যদের বাড়ীতে হ'য়ে থাকে। আর কতকগুলো সমিতিতে সমিতির নিজস্ব কারখানায় উৎপাদনের কাজ করা হয়। তাঁতী সমিতিগুলোতে উৎপাদনের কাজ সভ্যদের বাড়ীতে হ'য়ে থাকে। কিন্তু মোটর গাড়ীর কোন অংশ তৈরী করার জন্য গঠিত সমিতিতে বা খেলার সরঞ্জাম তৈরী করার সমিতিতে উৎপাদনের কাজ সমিতির কারখানাতেই চলে। যেখানে ভারী বা ব্যয় বহুল যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, সেখানে সমিতির কারখানায় উৎপাদনের কাজে

অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু কুটির শিল্পের বেলায় এ কথা প্রযোজ্য নয়, কেননা এক্ষেত্রে খুব সাধারণ যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয় এবং সভ্যদের এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারে তেমন কোন অসুবিধেও হয় না। তাই কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে সভ্যদের যার যার বাড়ীতে উৎপাদনের কাজে অনেক সুবিধা হয়।

আবার সেবা জাতীয় শিল্প সমবায় দু'রকমের হ'তে পারে, যেমন, প্রাথমিক সমিতি ও কেন্দ্রীয় বা শীর্ষ সমিতি। প্রাথমিক সমিতির এলাকা সীমাবদ্ধ থাকে। এরা সভ্যদের কাঁচামাল যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরবরাহ করে; আর তা'ছাড়া পণ্যদ্রব্য বিক্রীরও ব্যবস্থা করে। আর কেন্দ্রীয় বা শীর্ষ সমিতিগুলোর (যাদের সভ্য প্রাথমিক সমিতিগুলো) এলাকা সাধারণতঃ বড় থাকে, আর তা'ছাড়া এরা কতকগুলো অতিরিক্ত বিশেষ ধরনের কাজও করে, যেমন, কারিগরী সাহায্য, পরিবহণের ব্যবস্থা, বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালন ইত্যাদি। অবশ্য প্রাথমিক সমিতিগুলোও এ ধরনের কাজ করতে পারে।

সভ্যপদ—

সভ্যপদ সম্বন্ধে ওয়ার্কিং গ্রুপ বলেছেন যে, সাধারণতঃ প্রত্যেক শিল্পের জন্যে পৃথক সমিতি থাকবে। যেখানে কারিগরের সংখ্যা খুব বেশী রয়েছে, এ ধরনের কোন বিশেষ এলাকা (যেমন কোন শহর, গ্রাম বা একাধিক গ্রাম) থেকে সভ্য সংগ্রহ করতে হ'বে। কেননা তা'তে প্রয়োজন বোধে (যেমন সাধারণ সভায় যোগদান করার জন্যে) সভ্যগণ প্রধান কার্য্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে। সভ্যদের সমস্বার্থ থাকা বাঞ্ছনীয়। যেমন ধরা যাক, চামড়ার কাজ জানা কারিগর ও মাটির জিনিসপত্র তৈরী করার কাজ জানা লোকদের একই সমিতির সভ্য করা উচিত নয়, কেননা, তারা একে অপরের প্রয়োজন বা স্বার্থ বুঝতে পারবে না বা যথাযথ ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে পারবে না। তা'ছাড়া এরকম ক্ষেত্রে একই সমিতির দুই বা ততোধিক বিভাগ থাকা অসম্ভব নয় এবং যদি একটি বিভাগ লাভে চলে এবং অপরটিতে লোকসান হয় সেক্ষেত্রে এক বিভাগের লাভ আর এক বিভাগের ক্ষতিপূরণ করতে থাকবে যা সাধারণ সভ্যদের মনঃপূত না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।

সভ্য নির্ব্বাচনে শুধু কার্য্যদক্ষতা দেখলেই চলবে না, সত্যিকারের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে কি-না তা'ও দেখতে হবে। উপযুক্ত নেতৃত্ব, মূলধন, পরিচালন দক্ষতা ইত্যাদির জন্যে কারিগর ছাড়াও কিছু সংখ্যক

অন্য লোককে সহানুভূতিশীল বা পৃষ্ঠপোষক হিসাবে সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। ওয়ার্কিংগ্রুপ বলেছেন যে, এ ধরনের সভ্যের সংখ্যা মোট সভ্যসংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগের বেশী হওয়া উচিত নয়। ওয়ার্কিংগ্রুপ আরও বলেছেন ছোট শিল্পক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে কাজ করছে এমন প্রতিষ্ঠানকেও সমবায় সমিতিতে পরিণত করা যেতে পারে, তবে এ ধরনের সমিতিতে শিল্প-মালিককেও সভ্য হতে হ'বে এবং তা'কে তার জন্যে বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধা দিলে চল্‌বে না। কোনও ব্যক্তিগত মালিকানাবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সমবায় সমিতিতে পরিণত করার কতকগুলো সুবিধাও রয়েছে, যেমন, বাড়ী, জমি, যন্ত্রপাতি, সুদক্ষ কারিগর প্রভৃতি সহজেই পাওয়া যায়। উপরন্তু এইসব প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা ও সর্ব্বোপরি 'সুনাম' প্রভৃতিও অতি সহজেই পাওয়া যায়। এ ধরনের সমবায়ে মালিক তার ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে সমিতিতে একটা প্রধান স্থান অধিকার করবে বলে ধারণা করা উচিত নয়। কারণ ওয়ার্কিংগ্রুপ বলেছেন প্রতিষ্ঠানের মালিককে সমবায় সমিতির সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সভ্যদের অশেষ উপকার হয়েছে।

ওয়ার্কিংগ্রুপ আরও বলেছেন, এমন অনেক ছোট-ছোট শিল্পের মালিক রয়েছে, যারা কিছু কারিগর নিয়ে কাজ করছে; কিন্তু ব্যবসা ক্ষেত্রে তেমন সুবিধা করে উঠ্‌তে পারে নি। এই ধরনের মালিক ও কারিগরদের নিয়ে শিল্প সমবায় গঠন করা উচিত। ওয়ার্কিংগ্রুপের উপরিউক্ত সুপারিশগুলো ভারত সরকার ১৯৫৯ সালে পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন। সমিতির ম্যানেজার বা প্রশাসনিক সমস্ত কর্ম্মচারীকেই সভ্য করা চল্‌বে।

সভ্য সম্পর্কে ওয়ার্কিংগ্রুপ আরও দুই শ্রেণীর সভ্যের কথা বলেছেন, যথা, "এসোসিয়েট সভ্য" ও "নমিন্যাল" বা নামেমাত্র সভ্য। সমিতির বড় রকমের কোন অর্ডারের কাজ সম্পন্ন করার জন্যে যে অতিরিক্ত কারিগর নিয়োগ করতে হয় বা যারা সমিতিতে শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজ শেখে এবং এমন কি নাবালকদেরও সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা চলবে। তবে এ ধরনের 'এসোসিয়েট' সভ্যদের প্রত্যেককে একটি শেয়ার কিনলেই চলবে, কিন্তু মজুরী বা বোনাস ছাড়া সমিতিতে আর কোন অধিকার থাকবে না। আবার কাঁচামাল কেনার ব্যাপারে বা পণ্যদ্রব্য বিক্রীর ব্যাপারে অনেক মাল সরবরাহকারী বা খদ্দেরদের সঙ্গে সমিতিকে লেন-দেন করতে হয়। সমিতির স্বার্থের খাতিরে এসব খদ্দের

বা সরবরাহকারীদের সামান্য শেয়ার বিক্রী করে সভ্যভুক্ত করার প্রয়োজন আছে। এরা নামেমাত্র সভ্য (Nominal member) থাক্‌বে; সমিতিতে এদের কোন অধিকার থাক্‌বে না।

সমিতি রেজিষ্ট্রি করার আগে সমিতির সমবায় প্রকৃতি পরীক্ষা—

শিল্প সমবায়ের সমবায় প্রকৃতি বজায় রাখার ব্যাপারে ওয়ার্কিংগ্রুপ বলেন যে, সমিতির শেয়ার যতটা সম্ভব কারিগররা কিনবে এবং এরাই সমিতির কার্য্যনির্বাহক কমিটিতে থাকবে। এতে মালিক ও শ্রমিক (কারিগর)-এর সম্পর্ক একই রকম থাকবে; 'এক ব্যক্তি এক ভোট'—এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না। যদিও ব্যক্তিগত দক্ষতার ভিত্তিতে প্রত্যেক সভ্যকে মজুরী দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে; তবু সমিতির লভ্যাংশ তাদের কেউ অতিরিক্ত দাবী করতে পারবে না। ধরা যাক্‌ সমিতির ম্যানেজার, হিসাব রক্ষক বা কেরাণী বিভিন্ন হারে মাইনে বা মজুরী পাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে মাইনের অনুপাতে সমিতির লভ্যাংশ দাবী করতে পারবে না। সমিতির লাভ করার ব্যাপারে যার যতটা দান সেই অনুপাতেই লভ্যাংশ পাবে। উৎপাদন সমিতিতে মজুরী প্রাপ্তির অনুপাতে ও সেবা জাতীয় সমিতিতে সমিতির কাছ থেকে মোট ক্রয় বা সমিতিকে মোট বিক্রয় মূল্যের অনুপাতে লভ্যাংশ বণ্টনের ব্যবস্থা থাকবে।

ওয়ার্কিংগ্রুপ শিল্প সমবায়ের আর্থিক স্বাবলম্বিতার সম্ভাবনা সম্পর্কে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। গ্রুপ বলেছেন যে সমিতির স্বাবলম্বী হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা ভাল করে বিবেচনা না করে সমিতি রেজিষ্ট্রি করা উচিত নয়। কাজেই সমিতি রেজিষ্ট্রি করার আগে নিম্নলিখিত বিষয়ে অনুসন্ধান করা দরকার:—

(১) একই এলাকা থেকে সভ্যদের পাওয়া যাচ্ছে কি না;

(২) উৎপন্নদ্রব্য বিক্রীর জন্যে উপযুক্ত বাজার পাওয়া যাচ্ছে কি না; সমিতি থেকে বাজারের দূরত্ব ইত্যাদিও নিরূপণ করতে হ'বে;

(৩) কাঁচামাল পাওয়া যাবে কি না, কি পরিমাণে পাওয়া যাবে, দামই বা কত ইত্যাদি;

(৪) কাঁচামাল আনয়নে বা উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহণ ব্যবস্থা আছে কি না এবং তার খরচা;

(৫) সমিতির কত মূলধন দরকার ; সমিতি গঠন করলে প্রয়োজনীয় মূলধন পাওয়া যাবে কি না বা কোত্থেকে পাওয়া যাবে ;

(৬) কাঁচামালের দাম, মজুরী বাবত ও অন্যান্য খরচা ধরার পর এক একটি দ্রব্য তৈরী করার কত খরচা পড়বে ;

(৭) কি দরে পণ্যদ্রব্য বিক্রী করা যাবে এবং তাতে কি ধরনের লাভ থাকবে ;

(৮) নিকটবর্ত্তী এলাকার একই ধরনের শিল্পের কাজ কেমন চলছে ;

(৯) মাসিক কতটা মাল উৎপন্ন হবে ও মাল বিক্রীতে কত লাভ থাকবে, তা হিসেব করে বের করতে হ'বে। তারপর দেখা দরকার সমিতি মোটামুটি লাভ করতে পারবে কিনা, যাতে করে সংরক্ষিত তহবিলে কিছু টাকা রাখা যায় এবং অংশীদারদের অন্ততঃ শতকরা ৩৲ হারে লভ্যাংশ দেওয়া যায় ও কারিগর সভ্যদের কিছু লভ্যাংশ দেওয়া যায়। অবশ্য, মধ্য-মেয়াদী বা দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের কিস্তির টাকা ও তার সুদের টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা প্রভৃতি রাখতে হ'বে।

যদি উপরিউক্ত বিষয়ে অনুসন্ধানের পর দেখা যায় যে, প্রথমদিকে তেমন সন্তোষজনক লাভ না হ'লেও, আগামী চার বছরের ভেতর মোটামুটি ভালই লাভ করবে, তা' হলে সমিতির স্বাবলম্বী হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায় ও সমিতি রেজিষ্ট্রি করতে বাধা থাকে না। অন্যপক্ষে, যদি দেখা যায় যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সমিতির স্বাবলম্বী হওয়ার মত কোন সম্ভাবনা নেই, তবে সমিতি রেজিষ্ট্রি না করাই শ্রেয়।

অধিকাংশ ছোট ছোট শিল্পের ব্যাপারে উপরিউক্ত বিষয়গুলো যাচাই বা অনুসন্ধান করা তেমন শক্ত কাজ নয়। কিন্তু এমন অনেক ছোট ছোট শিল্প আছে, যাদের বেলায় অত কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। কেন না, কর্ম্মসংস্থান প্রভৃতি জনহিতকর উদ্দেশ্যেই এধরনের শিল্পকে জিইয়ে রাখতে হয়, যেমন খাদি শিল্প, ঢেঁকি শিল্প ইত্যাদি ; তা ছাড়া হস্তচালিত তাঁতশিল্প বাঁচিয়ে রাখার জন্য ও লক্ষ লক্ষ তাঁতিদের কর্ম্মসংস্থানের জন্যই এসব শিল্পের উৎপন্নদ্রব্য যাতে বেশী হয়, তার জন্য সরকার দান সাহায্য করে থাকেন। যেমন কাপড়ের ওপর টাকায় '১৯ নয়া পয়সা, হস্তচালিত তাঁতের কাপড়ের ওপর '১২ নয়া পয়সা ও ঘানির তৈলের ওপর মণ প্রতি ২'৫০ নয়া পয়সা রিবেট দেওয়া। এসব শিল্পের বেলায়

পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ব্যয় বা লাভের অঙ্ক নিরূপণ করার সময় এধরনের সরকারী সাহায্যের কথাও বিবেচনা করতে হ'বে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এসব শিল্প সমবায় সরকারী সাহায্য পুষ্ট হয়েও যদি বছরের পর বছর লোকসান দেয়, তা' হলে এদের রেজিষ্ট্রি না করাই ভাল।

সমিতির পরিচালন ব্যবস্থা—

অন্যান্য সমবায় সমিতির মতো শিল্প সমবায়েরও পরিচালনের ভার থাকে একটি কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির ওপর। কমিটির সদস্যগণ সমিতি সদস্য কর্ত্তৃকই নির্ব্বাচিত হ'য়ে থাকে। কোন কোন রাজ্যে নির্ব্বাচিত মোট সদস্যের অর্দ্ধেক সমবায় নিয়ামক কর্ত্তৃকও মনোনীত হয়। আবার কোন কোন রাজ্যে কোন কোন বিশেষ উন্নত শিল্প সমবায়ের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির সব সদস্যই সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হয়েছে। ওয়াকিংগ্রুপ বলেছেন, কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিতে কারিগর সভ্য বা সহানুভূতিশীল সভ্যদের প্রতিনিধি থাকা বাঞ্ছনীয়। কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার $\frac{১}{৪}$এর বেশী বা তিনজন সহানুভূতিশীল সভ্যদের প্রতিনিধি থাকা উচিত নয়। যুদ্ধ ফেরত ব্যক্তিদের বা উদ্বাস্তুদের কর্ম্ম সংস্থান উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতির মতো যে সব শিল্প সমবায়ে বিভিন্ন স্বার্থের সভ্য রয়েছে তাদের বেলায় প্রথম তিন বছরের জন্যে কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির সমস্ত সভ্যদের মনোনীত করবেন। অবশ্য এক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ অনুমতি দরকার। ভারত সরকার ওয়াকিংগ্রুপের এই সুপারিশ গ্রহণ করেছেন।

সমিতি পরিচালনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্ম্মচারী সম্পর্কে ওয়াকিংগ্রুপ বলেছেন যে, শিল্প সমবায়ের কাজ সমবায় ঋণদান সমিতির মতো সহজ নয়। শিল্প সমবায়ের কাজ ক্রেতা সমিতি বা বিপণন সমিতির চেয়েও জটিল। কেননা শিল্প সমবায়ে হিসাবপত্র খুব যত্ন সহকারে রাখা এবং বিশেষ করে দ্রব্য উৎপাদন সম্পর্কিত হিসাব ভাল ভাবে রাখা দরকার। সর্ব্বদা বাজার দরের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখা, অর্ডার সংগ্রহ করা ও খদ্দেরদের সন্তোষজনক ভাবে অর্ডারের মাল সরবরাহ করা, কারিগরদের কাজের তদারক করা ইত্যাদি বেশ কঠিন কাজ। কোন কোন সমিতিতে অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত ম্যানেজার আছে বটে। কিন্তু অধিকাংশ সমিতিই আশানুরূপ মাইনে দিতে পারে না বলে সুযোগ্য লোক পায় না। তাই ওয়াকিংগ্রুপ বলেছেন, সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটিতে প্রয়োজনীয় সাহায্য করার জন্যে একজন দক্ষ ম্যানেজার ও যথেষ্ট

কর্ম্মচারী থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি সরকারী অর্থ সাহায্যে অন্য কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে অভিজ্ঞ লোককে রাখা সম্ভব হয়, তা' হ'লে সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দিতে হ'বে। ওয়ার্কিংগ্রুপের এই সুপারিশ ভারত সরকার মেনে নিয়েছেন। তা' ছাড়া কোন কোন রাজ্যে শিল্প সমবায়ে সরকারের সমবায় দপ্তরের কোন কর্ম্মচারীকে ম্যানেজার হিসাবে নিয়োগের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা'ও খুব ভাল এবং অন্যান্য রাজ্যেও এই ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে, আবার কোন সমিতি সরকার প্রেরিত ম্যানেজারের মাইনে দিতে অক্ষম হ'লেও বিনা খরচায় সে সমিতিতে ম্যানেজার দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে কয়েক বছর বাদে সমিতিকেই ম্যানেজারের মাইনে দিতে হ'বে বলে প্রয়োজনীয় শর্তাদি আরোপ করতে হ'বে। যতদিন এই ধরনের ম্যানেজার সমিতিতে থাকবে, ততদিন সমিতির কাছ থেকে পেন্সন বা অবসরকালীন ভাতা বা ছুটির মাইনে বাবদ কোন টাকা আদায় করা চলবে না। সরকারী ম্যানেজার থাকাকালীন সমিতি অন্য কাউকে ট্রেণিং দিয়ে ম্যানেজারের কাজ করার মত তৈরী করে নেবে।

কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির সমস্যা—ভাল জিনিস তৈরী করতে হ'লে ন্যায্য মূল্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভাল কাঁচা-মালের প্রয়োজন হয়। কাঁচামাল ভাল না হ'লে শিল্পজাত দ্রব্য ভাল হ'তেপারে না। আবার জিনিস ভাল না হ'লে এই প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রীও কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় দেখা গেছে, কারিগরদের তৈরী মাল বিক্রী করে, কাঁচামালের দামও পাওয়া যায় নি। কারিগরদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ী ও মহাজনদের কাছ থেকে বাজে কাঁচামাল খুব চড়া দামে কিন্‌তে হয়। শিল্প সমবায়ের ক্ষেত্রে সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে, কেননা, কারিগর সভ্যরা বাজার থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী মজুরী দাবী করে। এ ভাবে সমিতিকে যথেষ্ট লোকসানে ব্যবসা চালাতে হয়। তবে যেখানে শীর্ষ সমিতি প্রাথমিক সমিতিদের কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারে সেখানে প্রাথমিক সমিতিদের কাজ খুবই সুবিধাজনক হ'তে পারে সন্দেহ নেই। এরকম কিছু ক্ষেত্রে হ'য়েও ছিল। কিন্তু কাঁচামালের বিনিয়ন্ত্রণের পর অধিকাংশ শীর্ষ-সমিতির কাঁচামাল সরবরাহের কাজ একদম বন্ধ হ'য়ে যায়। যে সব শীর্ষ-সমিতি এর ভেতরে যদিও কিছু কিছু কাঁচামালের ব্যবস্থা করত, তবু দাম বাজার দর থেকে অনেকটা চড়া থাকাতে প্রাথমিক সমিতিদের তেমন উপকার হ'ত না।

কাজেই এদের পক্ষে বাজারের ব্যবসায়ীদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কাঁচামালের সমস্যা সমাধান কল্পে ওয়ার্কিংগ্রুপ নিম্নলিখিত সুপারিশ করেছেন :—

(১) প্রধান প্রধান কেন্দ্রে সমবায় বয়ন মিল স্থাপন ;

(২) আমদানী সম্পর্কিত লাইসেন্স ব্যাপারে শীর্ষ-সমিতিকে অগ্রাধিকার দান ;

(৩) শীর্ষ-সমিতি কর্তৃক বাজার দরে সুতা বিক্রয় ;

(৪) নিয়ন্ত্রিত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য যথা, ইস্পাত, লোহা ইত্যাদি বণ্টনের ব্যাপারে শিল্প সমবায়দের অগ্রাধিকার দান ;

(৫) শীর্ষ-সমিতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত দ্রব্য বিক্রয় ;

(৬) বিপণন সমিতির মতো বড় বড় শিল্প সমবায়কেও কাঁচামাল ও পণ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্যে গুদাম তৈরীর প্রয়োজন হয় এবং তা করার জন্যে প্রয়োজনীয় সরকারী ঋণ। ভারত সরকার (৩), (৪) ও (৬)নং সুপারিশ পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন ; আর (১), (২) ও (৫)নং সুপারিশ আংশিক গ্রহণ করেছেন। ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত সুপারিশের ভিত্তিতে তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

যন্ত্রপাতির সমস্যা—মান্ধাতা আমলের বা বাজে যন্ত্রপাতি ব্যবহার শিল্প সমবায়ের কার্য্যোন্নতির একটি প্রধান অন্তরায়। বর্ত্তমানে জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থা (National Small Industries Corporation) যন্ত্রপাতি ধার দেওয়ার ব্যাপারে শিল্প সমবায়কে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। তা' ছাড়া যন্ত্রপাতির মূল্যের ওপর সুদের হারও কম নিচ্ছেন। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা এলাকায় নারী শিল্প সমবায় সমিতিকে এই সংস্থা সেলাইকলও সরবরাহ করেছেন, হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জন্যে আজকাল ডবি, রীড্, ড্রপ্ বাক্স, হিণ্ডস প্রভৃতি উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি দান হিসাবে সরকার দিচ্ছেন। খাদি ও গ্রাম্য শিল্প কমিশন (Khadi and Village Industries Commission) গ্রাম্য শিল্প উন্নয়নে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয় বা সরবরাহের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করছেন। গ্রাম্য তৈল শিল্প, হাতে কাগজ তৈরীর শিল্প, চর্ম শিল্প, সাবান তৈরীর শিল্প প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পকেও কমিশন উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করছেন বা যন্ত্রপাতি কেনার জন্যে ঋণ ও দান হিসেবে অর্থ সাহায্য করছেন।

ওয়ার্কিংগ্রুপ উপরিউক্ত বিবিধ সাহায্য চালিয়ে যেতে ও উন্নত ধরনের

যন্ত্রপাতি সরবরাহ ব্যাপারে অতিরিক্ত সাহায্যের সুপারিশ করেন এবং গ্রুপের এই সুপারিশ ভারত সরকার মেনে নিয়েছেন।

মূলধন সমস্যা—শিল্প সমবায়ের দু' রকম মূলধন প্রয়োজন হয়। জমি কেনা, কারখানা তৈরী করা বা যন্ত্রপাতি কেনার জন্যে দীর্ঘ মেয়াদী মূলধন দরকার হয়। আর কাঁচামাল কেনা, মজুরী দেওয়া, মালপত্র কিছুদিন ধরে রাখার জন্যে স্বল্প মেয়াদী মূলধন দরকার হয়। শিল্প সমবায় সাধারণতঃ সভ্যদের কাছে শেয়ার বিক্রী করে, সভ্য বা অন্য কারুর কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে, কর্জ্জ করে, এক-কালীন দান বা সমিতির লাভ থেকে তৈরী বিভিন্ন তহবিলের টাকা দিয়ে কাজ চালায়।

শেয়ার—অনেক কারিগরের পক্ষে শেয়ারের টাকা দেওয়া সম্ভবপর হয় না, যেহেতু এদের সামর্থ্য নেই বললেই চলে। তাই কারিগররা যাতে কোন সমিতির প্রয়োজনীয় শেয়ার কিনতে পারে তার জন্যে হস্তচালিত তাঁত বোর্ড (Handloom Board) সেস্ ফণ্ড থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সরাসরি তাঁতীদের দেবার জন্যে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করেন। যদি কোন কারিগর নিজে তার ক্রীত শেয়ার মূল্যের শতকরা ১২'৫০ টাঃ দিতে পারে তা হ'লে সরকারের কাছ থেকে বাকী ৮৭'৫০ টাঃ ধার হিসাবে পেতে পারে এবং এই ধার সুবিধামত কতকগুলি কিস্তিতে শোধ করতে পারে। ওয়াকিংগ্রুপ সব রকমের শিল্প সমবায়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থাদানের সুপারিশ করেন ও তা' মেনে নেন।

আমানত—সভ্য ও অন্য কারুর কাছ থেকে আমানতের পরিমাণও মোটেই সন্তোষজনক নয়। সরকার থেকে যে সব এককালীন দান পাওয়া যায় তাও যথেষ্ট নয় আর তা ছাড়া, লাভ থেকে বিভিন্ন তহবিলের টাকার অঙ্কও তেমন সন্তোষজনক নয়। কাজেই শিল্প সমবায়ের একমাত্র ভরসা শেয়ারের টাকা ও কর্জ্জ গ্রহণ। কর্জ্জের ব্যাপারে স্বভাবতঃই সমবায় ব্যাঙ্কের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু কর্জ্জদানে সমবায় ব্যাঙ্কগুলোর কাজও তেমন অশাপ্রদ নয়। দেখা গেছে, একমাত্র মাদ্রাজ, বোম্বাই, উড়িষ্যা ও দিল্লীতে শিল্পসমবায়গুলো প্রয়োজনীয় ঋণ পেয়েছে সমবায় ব্যাঙ্কগুলোর কাছ থেকে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলো শিল্পসমবায়কে কর্জ্জ দিতে চায় না কতকগুলো কারণে। শিল্প সমবায়ের সমস্যা এদের ভাল করে জানবার কথা নয়, তা ছাড়া কৃষিউন্নয়নের কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকায় স্বভাবতঃই শিল্পসমবায়কে ঋণ

দিতে দ্বিধা বোধ করে। অবশ্য আজকাল সমবায় ব্যাঙ্কের মতিগতি অনেকটা বদলে গেছে।

যাতে সমবায় ব্যাঙ্কগুলো শিল্প সমবায়ের প্রয়োজনীয় ঋণসরবরাহ করতে পারে তার জন্যে ওয়ার্কিংগ্রুপ কতকগুলো বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছেন, যেমন, (১) সমবায় ব্যাঙ্কে শিল্পসমবায়ের প্রতিনিধিত্ব; (২) শিল্প সমবায়দের ঋণদান জন্য বিশেষ সাব কমিটি নিয়োগ; (৩) শিল্প সমবায়দের ঋণ দেওয়ার প্রয়োজনীয় অর্থ পৃথক করে রাখা; (৪) শিল্প সমবায়কে ঋণ দেওয়ার জন্য সমবায় ব্যাঙ্কের কোন ক্ষতি হলে, সেই ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা; (৫) শিল্প-ঋণ সরবরাহের উত্তম ব্যবস্থার জন্য পৃথক কর্ম্মচারী নিয়োগ ও সরকার কর্ত্তৃক তাদের ব্যয়ভার বহন ইত্যাদি।

ওয়ার্কিংগ্রুপ মনে করেন যে, শিল্প সমবায়দের অর্থসাহায্যের ব্যাপারে নির্দ্দিষ্ট কোন সংস্থার প্রয়োজন। যতদিন তা সম্ভব না হচ্ছে ততদিন শিল্পে সরকারী সাহায্য সম্পর্কিত আইনের (State Aid to Industries Acts) বলে সরকারকে ঋণ যোগাতে হবে। দরকার হলে এককালীন কিছু দানের ব্যবস্থাও করতে হবে। সরকার কর্ত্তৃক বর্ত্তমান ঋণদান ব্যবস্থা হচ্ছে—

(১) কার্য্যকরী মূলধনের জন্যে বা কোন সম্পত্তি ক্রয় উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া;

(২) ব্যক্তিগত কারিগর-শিল্পী হিসাবে এসব ঋণের টাকার ওপর শতকরা ৩ টাকা হারে সুদ দিতে হয়। আর কারিগরদের নিয়ে শিল্প সমবায়দের বেলায় সুদের হার হচ্ছে শতকরা ২.৫০ টাঃ;

(৩) জমি, বাড়ী মজুতমাল, এমন কি ঋণের টাকায় কেনা কোন সম্পত্তির জামিনে ও বন্ধকী সম্পত্তিমূল্যের শতকরা ৫৭৲ টাকা হিসাবে ঋণ দেওয়া হয়;

(৪) এ ধরনের কর্জ্জের টাকা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার যথাক্রমে ৩ : ১ অনুপাতে দিয়ে থাকে এবং কর্জ্জ দেওয়ার জন্যে যদি কোন লোকসান হয়, তবে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার নিজেদের কর্জ্জদানের অনুপাতে বহন করবেন।

বোম্বাইতে সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সব রকমের ঋণ শিল্প সমবায়কে দেওয়া হচ্ছে।

খাদি ও গ্রাম্য শিল্প কমিশনের (Khadi & Village Industries Commission) পরিকল্পনানুযায়ী শিল্প সমবায় ও রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থাদের ঋণ দেওয়া হয়। যেমন ঢেঁকি শিল্পের জন্যে চাকী ও ঢেঁকি তৈরী এবং মজুত করার জন্যে ঋণ ও এককালীন দান দুই-ই দিয়ে থাকেন। তা' ছাড়া ধান

মজুত করার জন্যেও তিন বছরের জন্যে ঋণ দিয়ে থাকেন। প্রথম বছরের ঋণের কোন সুদ দিতে হয় না, কিন্তু চর্ম্মশিল্প, ছোট রকমের দিয়াশলাই শিল্প, ঢেঁকি শিল্পের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা রয়েছে।

কতকগুলি বিশেষ শর্তে ওয়ার্কিংগ্রুপ বোম্বাইয়ের মতো শিল্প সমবায় ব্যাঙ্ক সংগঠনের সুপারিশও করেন। সরকার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ন্যায় এসব শিল্প সমবায় ব্যাঙ্কের অংশীদার হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পের সাহায্য বিষয়ক পরিকল্পনায় স্টেট্ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া বা অন্যান্য তপশীল ভুক্ত ব্যাঙ্ক শিল্প সমবায়কে ঋণ দিতে পারে।

নিখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত বোর্ড (All India Handloom Board) তাঁতী সমিতির সভ্যদের কার্য্যকরী তহবিল হিসাবে তাঁত পিছু ৩০০্ টাকা ঋণ দিচ্ছেন ; কিন্তু ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ও সরকারী গ্যারান্টিতে ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক সুদের হারের চেয়ে শতকরা ১·৫০ টাঃ কমে কার্য্যকরী তহবিল হিসাবে ঋণ দিচ্ছেন। তাঁত পিছু এই ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ৩০০্ টাকা।

বিপণন সমস্যা—শিল্প সমবায়ের সাফল্যের মূলে রয়েছে, শিল্পজাত দ্রব্যের বিপণনের সুব্যবস্থা। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন প্রভৃতির পেছনে প্রচুর টাকা খরচ করতে পারে এবং তার ফলে অধিক বিক্রয় ব্যবস্থা করতে পারে, কিন্তু ছোট ছোট কারিগর বা শিল্প সমবায়ের পক্ষে তা স্বভাবতঃই সম্ভব নয়। তা' ছাড়া এদের তৈরী জিনিসের মানও সব সময় ঠিক থাকে না এবং এজন্যে অনেক সময় বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের তৈরী জিনিসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারে না। সঠিক বাজার দরও এদের পক্ষে সব সময় রাখা সম্ভবপর হয় না। তারপর বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মত এরা অনেকদিন মাল ধরেও রাখতে পারে না। যত শীঘ্র সম্ভব মাল বিক্রী করে দিয়ে অর্থ চাহিদা মেটায়। ফলে মালের দামও আশানুরূপ পায় না।

ছোট ছোট শিল্পের বিপণন ব্যবস্থার সাফল্যের জন্যে খরিদ্দারের রুচি অনুযায়ী মাল তৈরী করা উচিত। বাজারে সুনাম অর্জ্জন করতে হ'লে কারিগরদের তৈরী জিনিসপত্রের গুণ বা মান বাড়াতে উৎসাহিত করাও উচিত। স্থানীয় বা পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যে সব মালের চাহিদা খুব বেশী, সে সব মাল তৈরী করতে হ'বে। নির্দ্দিষ্ট অর্ডার মাফিক মাল তৈরী করতে পারলে আরও ভাল হয়। সমিতি গোড়া থেকে এমন ভাবে কাজ করবে, যাতে কয়েক বছর পরে সরকারী দান ইত্যাদি আর না নিতে হয়।

বিপণন ক্ষেত্রে, তাঁতী সমিতিদের নিখিল ভারত হস্তচালিত তাঁতবোর্ড যে সমস্ত সাহায্যের ব্যবস্থা করছেন, তা নীচে দেওয়া গেল :—

(১) শীর্ষ ও প্রাথমিক সমিতিগুলো যাতে অধিক সংখ্যক বিক্রয় কেন্দ্র খুলতে পারে তার জন্যে বিক্রয় কেন্দ্র পিছু (ক) ৪,০০০৲ টাকা স্থায়ী খরচার জন্যে, (খ) প্রথম দু'বছর চলতি খরচার সবটুকু, তৃতীয় বছরে চলতি খরচার শতকরা ৭৫ ভাগ, চতুর্থ বছরে শতকরা ৫০ ভাগ টাকা দান ;

(২) তাঁত বস্ত্রের চাহিদা বাড়ানোর জন্যে রাজ্য সরকার ও শীর্ষ তাঁত সমিতি কর্ত্তৃক অন্যান্য রাজ্যে বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দান ;

(৩) তাঁত সমিতির বস্ত্রাদি বিক্রী করার জন্যে ফেরীওয়ালা নিয়োগ ও তার মাহিনার অর্দ্ধেক বা ৫০৲ টাকা (যেটা কম হয়) দান হিসাবে দেওয়ার ব্যবস্থা ;

(৪) পল্লী অঞ্চলে বিক্রীর জন্যে ভ্রাম্যমাণ গাড়ীর ব্যবস্থা ;

(৫) তাঁত সমিতির তৈরী বস্ত্রাদি বিক্রয়ে রিবেট বা ছাড় দানের ব্যবস্থা ;

(৬) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপন প্রচার, প্রদর্শনী, নিখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত-সপ্তাহ পালন ইত্যাদির ব্যবস্থা।

এই তো গেল আভ্যন্তরীণ বিক্রী ব্যবস্থা। রাজ্যের বাইরে তাঁতবস্ত্র বিক্রীর ব্যবস্থাও রয়েছে। যে সব তাঁতবস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হ'বে, তার বিক্রয় মূল্যের ওপরও টাকায় এক আনা রিবেট দেওয়া হয়। এই রিবেট সাধারণতঃ সমবায় সমিতি বা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়।

তাঁতবস্ত্র বিক্রীর জন্যে কলম্বো, ব্যাঙ্কক্, এডেন, সিঙ্গাপুর ও কুয়ালালামপুরে বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হ'য়েছে। কোন কোন অঞ্চলের জন্যে বিশেষ ধরনের একশ্রেণীর কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। আবার সম্প্রতি সংগঠিত "নিখিল ভারত হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র বিপণন সমবায় সমিতি" (All India Handloom Fabric Marketing Co-operative Society) বিভিন্ন রাজ্যে ও বিদেশে তাঁতবস্ত্র বিক্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

খাদি ও গ্রাম্য শিল্প কমিশনও অনুরূপ বিপণন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কমিশন খাদি ও গ্রাম্য শিল্পদ্রব্যের উৎকৃষ্ট বিপণনের জন্যে প্রদর্শনী, বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন, বিক্রেতার প্রয়োজনীয় শিক্ষণ ব্যবস্থা, দ্রব্যের কলাকুশলতার উৎকর্ষ

সাধন ইত্যাদির ব্যবস্থা করছেন। বড় বড় শহরে "খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনও" স্থাপন করেছেন। দেশের সর্ব্বত্র অনুমোদিত "খাদি ভাণ্ডার"ও স্থাপন করা হ'য়েছে। খাদি কমিশন খাদি বস্ত্র বিক্রয়ের সুবিধার জন্যে খুচরা বিক্রয়ে টাকায় ০'০৩ নয়া পয়সা করে বিক্রয় প্রতিষ্ঠানকে এককালীন দান হিসাবে টাকা দিচ্ছেন।

আগের বছরের তুলনায় বর্ত্তমান বছরে অন্ততঃ শতকরা ১০ ভাগ বিক্রী বাড়াতে পারলে উর্দ্ধতন পক্ষে ৩২,০০০৲ টাকা অতিরিক্ত এককালীন দান হিসাবে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আবার খরিদ্দারদের ও খাদিবস্ত্র ক্রয়ের ওপর টাকায় ০' ১৯ নয়া পয়সা রিবেট দেওয়া হয়।

কুটির শিল্প দ্রব্য বিপণন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ওয়ার্কিংগ্রুপ বলেছেন যে, শিল্প সমবায়ের প্রধান প্রধান দ্রব্যগুলোর সঠিক মান বজায় রাখা, প্রচার বিজ্ঞাপন, বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজনীয় ছোট ছোট জিনিস শিল্প সমবায়ের দ্রব্যাদি রপ্তানী, ইত্যাদির ব্যাপারে বৃহদায়তন শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প সমবায়ের যোগাযোগ থাকা উচিত। ওয়ার্কিংগ্রুপের এই সুপারিশ সরকার মেনে নিয়েছেন এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তৃতীয় পরিকল্পনায় সংযোজিত করা হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শিল্প সমবায়ের অবস্থা—

বোম্বাই—১৯৫৭-৫৮ সালে একমাত্র তাঁত সমিতি ছাড়া অন্যান্য শিল্প সমবায়ের উন্নয়নে বোম্বাই শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। প্রাথমিক তাঁত সমিতিগুলো জেলা শিল্প সমবায় সংস্থার সভ্য এবং জেলা সংস্থাগুলো আবার রাজ্য শিল্প সমবায় সংস্থার সভ্য। অধিকাংশ সমিতি উৎপাদন ও বিক্রয় সমিতি হিসাবে কাজ করে। ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে তাঁত সমিতির মোট সংখ্যা দাঁড়াল ৮৪৫টি, সভ্য সংখ্যা ১ লাখ ও ৩৫টি জেলা সংস্থা। ব্যক্তিগত ভাবে কারিগররা ও শিল্প সমবায়গুলো উৎপাদন ও বিপণন ব্যাপারে জেলা-সংস্থার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পায়। অ-ঋণ-ক্ষেত্রে, এসব জেলা সংস্থা কাজ করেছে, ঋণদান ক্ষেত্রে শিল্প সমবায় ব্যাঙ্ক গড়ে উঠেছে।

তাঁত সমিতি ছাড়া অন্যান্য শিল্প সমবায়ের সংখ্যা ১৯৫৭-৫৮ সালে দাঁড়ায় ১৯৮০ টি। এসব সমিতির সভ্য সংখ্যা ছিল ১'০৯ লাখ। এসব সমিতির মধ্যে শ্রমিক চুক্তি সমিতি, বন শ্রমিক সমিতি, চর্ম্মশিল্প, তৈলকার সমিতি উল্লেখযোগ্য।

মাদ্রাজ—শিল্প সমবায়ের মধ্যে তাঁত সমিতি মাদ্রাজে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। এই সমিতি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত এবং এই উন্নতির মূলে রয়েছে, সরকারী সাহায্য। প্রাথমিক সমিতিগুলো মাদ্রাজ রাজ্য হস্তচালিত তাঁত শিল্প সমবায় সমিতির সভ্য। এই শীর্ষ সমিতি আর্থিক দিক দিয়ে বেশ সচ্ছল। ১৯৫৭-৫৮ সালে এই সমিতি ৫টি সমষ্টিগত বুনন কেন্দ্র, ২টি বস্ত্র বুননের কারখানা, ৪টি রং করার কারখানা ও ৫টি নমুনা তৈরীর কারখানা স্থাপন করে। ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে রাজ্যের সমবায় সমিতিভুক্ত তাঁতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১·৮৫ লাখ। ১৯৫৭-৫৮ সালে তাঁত সমিতিগুলো ৯·৩৮ কোটি টাকার বস্ত্রাদি উৎপন্ন করে এবং ১০·৯৮ কোটি টাকার বস্ত্রাদি বিক্রী করে। কারিগর সভ্যদের যে মজুরী দেওয়া হয়, তা' থেকে সঞ্চয় তহবিলে কিছু টাকা কেটে নেওয়া হয় এবং এভাবে সঞ্চয় তহবিলে টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪ লাখ টাকা। সরকার তাঁতীদের জন্য ১২টি গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং ১,২১৮টি গৃহ তৈরী করে দেয়। তাঁত সমিতি ছাড়া অন্যান্য শিল্প সমবায়ের মধ্যে ৩টি সমবায় বয়ন মিল উল্লেখযোগ্য।

উত্তরপ্রদেশ—১৯৫৭-৫৮ সালে উত্তর প্রদেশে মোট ১,১৪৬টি তাঁত সমিতি ছিল। শুধু তাঁত সমিতির জন্যে পৃথক কোন শীর্ষ সমিতি ছিল না। তবে উত্তর প্রদেশে শিল্প সমবায় সঙ্ঘ লিঃ নামক সমিতি সব রকমের শিল্প সমিতির চাহিদা মেটাত। অন্যান্য শিল্প সমবায়ের সংখ্যা ছিল ৩৩৮টি।

অন্ধ্র—মাদ্রাজ রাজ্য ভাগ হওয়ার পর ১৯৫৩ সালে 'অন্ধ্র হস্তচালিত তাঁত সমবায় সমিতি' গড়ে ওঠে। ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট তাঁত সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৭৫টি। ঐ বছরে ৫৮২টি অন্যান্য শিল্প সমবায়ও ছিল। এসব শিল্প সমবায়ের মধ্যে চর্ম্ম শিল্প সমবায়, ঘানি শিল্প সমবায় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ভারতের শিল্প সমবায়গুলির অসুবিধা—গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বিভিন্ন শিল্প সমবায়ের কাজ বেশ পুরাদমেই চল্‌তে শুরু করে ; তবে সরকার থেকে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য না পেলে এদের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হত কিনা সন্দেহ।

সাধারণতঃ শিল্প সমবায়গুলির নিম্নলিখিত অসুবিধাসমূহ উল্লেখযোগ্য :—

(১) কারিগরদের মধ্যে উদ্যমের অভাব ;

(২) তাঁতী বা অন্যান্য শিল্পী কারিগরদের সমিতির প্রতি তেমন সহানুভূতি

নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিতিতে বাজে জিনিস দিয়ে বা সমিতির প্রাপ্য টাকা শোধ না করে সমিতিকে বিপদে ফেলে ;

(৩) মিলের কাপড়ের চেয়ে তাঁতের কাপড়ের উৎপন্ন মূল্য অনেক বেশী, কাজেই মিলের কাপড়ের সঙ্গে তাঁতের কাপড়ের প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হয় না ;

(৪) তাছাড়া দক্ষ কারিগরের অভাব ও সমিতির প্রয়োজনীয় তদারকীরও অভাব ;

৫। শিল্প সমবায়ের সভ্যরা বিচ্ছিন্ন ভাবে নানা জায়গায় বাস করে, তাই সমিতির কাজ সুষ্ঠু ভাবে চালানো কঠিন হয়ে পড়ে।

অসুবিধা দূরীকরণের উপায়—দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এসব অসুবিধা দূর করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। তবে সব চাইতে প্রয়োজন হচ্ছে কারিগরদের মধ্যে সমবায়ী মনোভাবের সৃষ্টি করা। একমাত্র সমাজিক কর্ম্মী, বে-সরকারী সমবায়ী ও সমবায় দপ্তরের কর্ম্মচারীরা এই সমবায়ী মনোভাব জাগিয়ে তুলতে পারেন। খরিদ্দারদের মধ্যে স্বদেশী ভাব ও ছোট ছোট শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহারের মনোভাব যাতে গড়ে ওঠে তার জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত। সাংগঠনিক ও কারিগরী অসুবিধা দূর করার দায়িত্ব নিতে হ'বে সরকারকে। এ কথাও স্মরণ রাখতে হ'বে যে চিরকাল সরকারী সাহায্য পাওয়া যেতে পারে না বা তাতে সমিতির সত্যিকারের উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়, তাই যত শীঘ্র সম্ভব প্রত্যেক শিল্প সমবায় সমিতির নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড়াতে হবে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ক্রেতা সমবায়

ক্রেতাদের সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

বর্ত্তমান অর্থনীতিতে মানুষ উৎপাদনকারী ও ভোগকারী দুই-ই। কেউবা দ্রব্য উৎপাদন করেই যাচ্ছে, ভোগ করছে অন্যে। যেমন, বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় কারিগররা বিভিন্ন শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন করছে, কিন্তু এসব কিনে নিচ্ছে অন্যরা। চাষীদের মধ্যে অনেকে যেটুকু খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে হয়ত সবটুকুই তারা খেয়ে ফেলে। আবার কেউবা উৎপন্ন শস্যের খানিকটা বিক্রী করে দিচ্ছে। কল-কারখানার শ্রমিকরা যে সব জিনিস উৎপন্ন করে, সেগুলো ওরা নিজেরা ভোগ করে না। ওদের চাহিদা মেটাতে হয় অন্য কোন উৎস থেকে। খাদ্যদ্রব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল উৎস উৎপাদক। কিন্তু উৎপাদক ও সর্ব্বশেষ ক্রেতার মাঝে বহু মধ্যস্থ লোক, ব্যবসায়ী কাজ করছে। এসব মধ্যস্থ ব্যক্তি ও মুনাফাখোরদের হাত থেকে রক্ষা পেতে হ'লে বা ন্যায্য মূল্যে ভাল জিনিস পেতে হ'লে ক্রেতাদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বা ক্রেতা সমবায়ের প্রয়োজন আছে। ক্রেতারা একক ভাবে কোন সুবিধাই করে উঠতে পারে না।

ধনতন্ত্রবাদে ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে উৎপাদনের ব্যবস্থা চলে না। বাজারের অবস্থানুযায়ী ব্যক্তিগত স্বার্থে উৎপাদনকারী দ্রব্য উৎপাদন করে। যে উৎপাদনে ক্রেতাদের স্বার্থ দেখা হয় না, শুধু মাত্র উৎপাদনকারীর ব্যক্তিগত স্বার্থটাই বড় করে দেখা হয়, তাকে জনহিতকর উত্তম উৎপাদন ব্যবস্থা বলা চলে না। আমরা জানি, ধনতন্ত্রবাদে পুজিঁবাদী উৎপদানকারী কোন দ্রব্য উৎপাদন বা সরবরাহ একচেটিয়া করে দ্রব্য মূল্য সহজেই বাড়াতে পারে বা বিজ্ঞাপন প্রচার প্রভৃতির মাধ্যমে ক্রেতাদের নিকৃষ্ট দ্রব্যও বিক্রী করতে পারে। তা ছাড়া পুজিঁবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় অপচয়ও প্রচুর হয়। স্বভাবতঃই উৎপাদন ও উপভোগে বৈষম্য দেখা যায়। যখন উৎপাদনকারী দেখছে, খুব বেশী দ্রব্য উৎপাদিত হয়েছে, তখন উৎপাদন কমিয়ে দিচ্ছে; প্রয়োজন হ'লে শ্রমিকদের অধিকাংশকেই ছাড়িয়ে দিচ্ছে। কাজেই ধনতন্ত্রবাদসম্মত উৎপাদন ব্যবস্থায় দু'টো প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অপচয় ও কর্ম্মচ্যুতি। যখন ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য উৎপন্ন হয় তখন বেশী বা কম উৎপাদনের প্রশ্ন থাকে না। আর সেখানে মুনাফার শ্যেনদৃষ্টিও থাকে না। এ ধরনের ব্যবস্থা সম্ভব হ'তে

পারে, যদি ক্রেতারা সংঘবদ্ধ হয়ে ক্রেতা সমবায় গঠন করে এবং সমিতির মাধ্যমে ভোগ্য পণ্য উৎপাদনেরও ব্যবস্থা করে, অথবা যদি দুই শ্রেণীর সমবায় সংগঠন করা হয়, যেমন উৎপাদন উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর সমবায় ও ক্রেতাদের জন্যে আর এক শ্রেণীর সমবায় সংগঠন করা হয় এবং সাথে সাথে এদের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ সাধন করা হয়।

ক্রেতা সমবায় থেকে কি কি সুবিধা পাওয়া যায়—

(১) জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের খরচা কমে যায় ;

(২) ভাল জিনিষপত্তর ন্যায্য মূল্যে পাওয়া যায় ;

(৩) আয় বৃদ্ধি ও কর্ম্ম সংস্থান বৃদ্ধি সম্ভব হয় ;

(৪) সমবায় বিপণির কর্ম্মচারীদের কর্ম্ম ব্যবস্থার অধিকতর উন্নতি ও অধিকতর অর্থ আয়ের ব্যবস্থা সম্ভব হয় ;

(৫) শিল্পে গণতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হয় ; ইত্যাদি।

রচডেল পাইওনিয়ার্স বা রচডেলের উদ্যোগী সভ্যগণ—

১৮৪৪ সালের ২১শে ডিসেম্বর ইংল্যাণ্ডের মাঞ্চেস্টারের অন্তর্গত রচডেল (Rochdale) শহরের ২৮ জন তন্তুবায় পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম সমবায় বিপণি স্থাপন করে। এই সমবায় বিপণির নাম হচ্ছে, "রচডেল ইকুইটেবল্ পাইওনিয়ার্স সোসাইটি"। এই সমবায় সমিতি সত্যিকারের পুরোপুরি সফলকাম হয়েছিল। ব্যবসায় চালাতে বা সমিতির কার্য্য পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে চালাতে যে সব নীতি এঁরা মেনে চলেছিলেন, সেগুলোই সমবায়ের মূলনীতি ও ক্রেতা সমবায়ের সাফল্যের মূল কারণ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাঁরা যে আটটি নীতি মেনে চলেছিলেন, সেগুলো বিশদ ভাবে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। রচডেলের উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা যাক।

রচডেল সমিতির আগেও ইংল্যাণ্ডে সমবায় সমিতি ছিল এবং এসব সমিতি রচডেল সমিতির অনুসৃত নীতিগুলোর সব কটাই মেনে চল্‌ত। কিন্তু রচডেলের সমিতি এই নীতিগুলো সনদ্ হিসাবে আইনতঃ ভাবে গ্রহণ করেছিল।

রচডেল সমিতির উদ্দেশ্য

(১) সভ্যদের পারিবারিক আর্থিক অবস্থা উন্নয়ন ও সমিতি উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। তার জন্যে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সভ্যের কাছ থেকে ১ পাউণ্ড করে চাঁদা নিয়ে একটা বিরাট মূলধনের সৃষ্টি করা ;

(ক) খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্রাদি বিক্রীর জন্যে একটি সমবায় বিপণি স্থাপন ;

(খ) সভ্যদের গৃহ-সংস্থানের ব্যবস্থা ;

(গ) কর্ম্মহীনদের কর্ম সংস্থানের জন্যে দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা ;

(ঘ) কর্ম্মহীন সভ্যদের ও কম মজুরী পাওয়া ব্যক্তিদের চাষাবাদের কাজে লাগিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা ;

(ঙ) স্বয়ংসম্পূর্ণ কলোনী স্থাপন করে উৎপাদন, বণ্টন, শিক্ষা ব্যবস্থা ;

(চ) সমিতির উন্নতি সাধনে নিজস্ব হোটেল স্থাপন।

রচডেল উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় নীতি—

নিম্নলিখিত ব্যবসায় নীতি মেনে চলে রচডেল উদ্যোক্তারা সফলকাম হয়েছিলেন :—

১। সমবায়ের একটা প্রধান নীতি হচ্ছে, স্বয়ংসম্পূর্ণতা। নিজ শক্তিই বড় শক্তি। উদ্যোক্তাগণ অন্যের ওপর নির্ভর না করে নিজেদের সংগৃহীত অর্থেই কারবার চালাত। কাজেই সমিতির লাভ বা উদ্বৃত্ত পুরোপুরি থাকত, সুদ হিসেবে এক পেন্সও দিতে হ'ত না ;

২। প্রত্যেক দ্রব্যের সঠিক ওজন ও খাঁটি সরবরাহ এদের ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল। এর পেছনে এদের সাধুতা যে পুরোপুরি ছিল, তা'তে সন্দেহ নেই ;

৩। এরা বাজার দরে জিনিসপত্র বিক্রী করত ; বাজারের অন্যান্য দোকানদারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেনা দামের চেয়েও কম দরে কোন দিনই জিনিস বিক্রী করত না ;

৪। ধারে কোনদিন মাল কিনত না বা বিক্রী করত না। নগদ টাকায়ই কারবার চলত। তাই কোন সময়ে পাওনা অনাদায়ী হওয়ার ভয় ছিল না ;

৫। মোট কেনার ওপর রিবেট দিয়ে সভ্যদের সহানুভূতি আরও বেশী করে আকৃষ্ট করত ;

৬। সর্ব্বোপরি সভ্যদের চারিত্রিক উৎকর্ষ ব্যবসায়ের উন্নতির মূলে ছিল। প্রথমেই এরা অঙ্গীকার করেছিল যে, তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র শুধু মাত্র তাদের নিজস্ব সমিতি থেকেই কিনবে, বাইরের দোকান থেকে এক পেন্সেরও মাল কিনবে না। এই প্রকৃষ্ট সমবায় মনোভাব এদের গোড়া থেকেই ছিল। যদি এরা স্বার্থপর হ'ত, যদি সমিতির দোকান থেকে মাল না কিনে বাইরের

দোকান থেকে কিনত, তা হ'লে তাদের সমবায় বিপণি সফল হতে পারত কিনা সন্দেহ।

ক্রেতা সমিতিকে সার্থক করে তুলতে উপরিউক্ত ব্যবসায় নীতিগুলো আর যে আটটি প্রধান প্রধান নীতি প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে তা' ছাড়া আরও কতকগুলো জিনিস দরকার; সেগুলো হচ্ছে—

(১) ক্রেতা সমিতিকে সভ্যদের মাল কেনার ওপর বা শেয়ারের টাকার ওপর লাভের অংশ দিতে হ'বে। তাই সমিতির প্রতি বছর কিছু লাভ হওয়া চাই ;

(২) পরিচালনা সৎ ও সুদক্ষ হওয়া দরকার। সস্তা বাজার থেকে মাল কেনা, সঠিক দাম নির্দ্ধারণ, সঠিক ওজন সম্পর্কে সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবার আয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে সমিতির খরচাদি করা দরকার ;

(৩) সমিতির মজুত মালের ওপর কড়া নজর রাখা প্রয়োজন। মাল বিক্রীর ও মজুত মালের হিসাবের খাতা হাত নাগাদ রাখা ও মাঝে মাঝে মজুত মালের পরীক্ষাও দরকার ;

(৪) আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী না হওয়া পর্য্যন্ত কারবার বাড়িয়ে যাওয়া;

(৫) সভ্যদের যে সব জিনিসপত্তর কেনার দরকার হয়, যে সব মাল সহজেই বিক্রী করা যাবে, সেই রকম মালই সমিতিকে বিক্রী করতে হ'বে ;

(৬) বিক্রেতা কর্ম্মচারীকে বোনাস বা মোট বিক্রীর ওপর একটা লাভের অংশ দিয়ে বিক্রী বাড়াতে হ'বে।

ভারতের ক্রেতা সমবায় সমিতির ইতিহাস

ভারতের সমবায় আন্দোলনে ক্রেতা সমবায় সমিতি অন্যান্য সমিতিদের মত তেমন নাম করতে পারেনি। ১৯০৪ সালে ভারতে যে সমবায় আইন পাশ হয়, তাতে ঋণদান সমিতি ছাড়া অন্য কোন সমিতি গড়ে তোলার ব্যবস্থা ছিল না। ১৯১২ সালের আইনেই প্রথম ঋণদান ছাড়া অন্যান্য সমিতি গড়ে তোলার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ১৯১২ সালের আগেই ১৯০৪ সালে মাদ্রাজে একটি ঋণদান সমিতি ক্রেতা সমিতির কাজ করতে থাকে। এই সমিতির নাম হচ্ছে "ট্রিপ্লিক্যান আর্বান কো-অপারেটিভ্ সোসাইটি"। ১৯১২ সালের আইন পাশ হওয়ার পর এই সমিতির ঋণদান শাখা বন্ধ ক'রে পুরোপুরি ক্রেতা সমিতি হিসেবে কাজ করছে। এই সমিতিই বর্ত্তমানে ভারতের বৃহত্তম ক্রেতা সমিতি। ১৯৫৬ সালের

শেষে মাদ্রাজ শহরের বিভিন্ন স্থানে এই সমিতির মোট ৫৯টি শাখা অফিস ছিল। সভ্যসংখ্যা ছিল ২৫,৩৫৭ এবং মোট দ্রব্য বিক্রীর অঙ্ক ছিল ২৯ লাখ টাকা।

১৯২৯ সালে ভারতে নানা রকমের ১৯ হাজার সমিতির মধ্যে মাত্র ৩২০টি ছিল ক্রেতা সমিতি। ১০ বছর পর এই সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৪৭। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বেশ কিছু ক্রেতা সমিতি গড়ে ওঠে। সাধারণ লোকদেরও এই ধরনের সমিতি গঠন করার বেশ ঝোঁক দেখা যায়। কারণ, অনেক দরকারী জিনিসপত্তর কণ্ট্রোলের আওতায় এসে পড়ে। সরকারও কণ্ট্রোলের জিনিস কেনা-বেচায় সমবায় সমিতিকে সুবিধা দেন। এ সময় সব চাইতে বেশী সমিতি গড়ে ওঠে মাদ্রাজে, তারপর বাংলাদেশে। ১৯৩৮-৩৯ সালে মাদ্রাজে ৮৫টি ও ১৯৪৪-৪৫ সালে ১,৩৪৬টি ক্রেতা সমিতি গড়ে ওঠে।

তারপর ১৯৪২ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে অনেক বিপণন ও ক্রেতা সমিতি গড়ে ওঠে এবং বেশ মুনাফাও পেতে থাকে। কিন্তু সমিতিগুলোর সুদিন বেশীদিন থাকেনি। যেই কণ্ট্রোল উঠে গেল, অমনি অধিকাংশ সমিতির কাজ একরকম বন্ধ হয়ে যায়। যে সব সমিতি এ দুর্দ্দিনেও টিকে ছিল তাদের অধিকাংশই ছিল কারখানার শ্রমিকদের বা অফিস কর্ম্মচারীদের সমিতি।

১৯৫২ সালের পর থেকে সমিতিগুলোর সম্প্রসারণের স্থলে পুনর্গঠনের কাজ চলতে থাকে। যে সব সমিতির পুনর্গঠনের কোন সম্ভাবনা রইল না, এদের তুলে দিতে হয়। ১৯৫৬, ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ এই তিন বছরে সমিতির সংখ্যা শতকরা ১৫টি করে কমে যায়। যে সব সমিতি যুদ্ধের দরুণ পাওয়া লাভ পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়নি, যাদের কিছুটা ব্যবসায় বুদ্ধি ছিল, তারা কিন্তু টিকে গেছে। পাইকারী হারে সমিতি উঠে যাওয়ার কারণ শুধু কণ্ট্রোল উঠে যাওয়া নয়— ক্রেতা সমিতি বাজারের দোকানগুলোর সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারছে না। অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বোম্বাই, অন্ধ্র, পশ্চিমবঙ্গের ক্রেতা সমিতিগুলোতে মাল বিক্রীর পরিমাণ বেড়ে গেছে। তার কারণ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকার সমিতিগুলোকে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করেছেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে সারা ভারতে মোট ৭৬টি কেন্দ্রীয় সমবায় ক্রেতা সমিতি (Wholesale Stores) গড়ে ওঠে। এদের অধিকাংশই হচ্ছে মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, বোম্বাই ও উত্তরপ্রদেশে। আবার কতগুলো রাজ্য—যেমন, বিহার, মধ্যপ্রদেশ মহীশূর, উড়িষ্যা, রাজস্থান ও হিমাচল প্রদেশে কোন কেন্দ্রীয় ক্রেতা সমিতি ছিল না। একমাত্র মাদ্রাজেই ক্রেতা সমিতি ও বিপণন সমিতির মধ্যে একটা সুন্দর যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে।

বিশেষ করে হস্তচালিত তাঁতদ্রব্য কেনা বেচায় ও বিপণন সংঘের মাধ্যমে সাময়িকভাবে ধান ক্রয় করে।

নিম্নলিখিত তালিকা হ'তে ১৯৫৭-৫৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্য্যন্ত ভারতের ক্রেতা সমিতির অবস্থা বোঝা যাবে :—

[টাকার অঙ্ক লাখে]

প্রাথমিক ক্রেতা সমিতি—	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
সমিতির সংখ্যা	৬,২৭৫	৬,৮৫৭	৭,১৬৮
সভ্যসংখ্যা (হাজারে)	১৩,৩৩	১৩,৭৬	১৩,৯০
মোট দ্রব্য ক্রয়	২১,৮০	২৬,২৩	৩৭,৮০
মোট দ্রব্য বিক্রয়	২২,৬৪	২৭,০৮	৩৯'০০
লাভ	৪১	৪৯	৭'৬
লোকসান	৪০	৪০	২৭
পাইকারী বা কেন্দ্রীয় ক্রেতা সমিতি—			
সমিতির সংখ্যা	৭৬	৬২	৬৫
সভ্যসংখ্যা (হাজারে)	২৪	২৩	১২'৩
মোট দ্রব্য ক্রয়	৫,৮৮	৯,৪	৮,৪৭
মোট দ্রব্য বিক্রয়	৬,০০	৬,৯৯	৮,৯৯
লাভ	৭	৪'৬	৫
লোকসান	১০	১'৮	১'৯

ভারতে ক্রেতা সমিতির অকৃতকার্যতার মূল কারণ

১। সমিতির প্রতি সভ্যদের সহানুভূতির অভাব ও সভ্যগণ কর্তৃক জিনিসপত্তর ক্রয়ের ওপর রিবেট দেওয়ার ব্যাপারে সমিতির অসামর্থ্য ;

২। সমিতি সভ্যদের ধারে মাল বিক্রী করতে পারে না। বাজারের দোকানগুলো ধারে মাল বিক্রী করে বলে, এদের সঙ্গে ক্রেতা সমিতির পাল্লা দেওয়া সুকঠিন হয়ে পড়ে ;

৩। অসাধু ও দুর্ব্বল পরিচালন ব্যবস্থা। অধিকাংশ স্থলে আয়ের ওপর লক্ষ্য না রেখে ব্যয় ;

৪। সস্তা বাজার থেকে মাল না কেনা ; স্তূপীকৃত মজুত মালের বিপণনের

দিকে নজর না রাখা। অনেক সময় দেখা গেছে, ক্রেতা সমিতির বিক্রয় মূল্য বাজার দরের চেয়ে অনেক বেশী ;

৫। ব্যবসায় সংগঠন ও পরিচালন ব্যবস্থায় অনভিজ্ঞতা এবং বাজারের দোকানগুলোর তীব্র প্রতিযোগিতা ;

৬। বিক্রয়-কর সমস্যা। বাজারের দোকানগুলো বিক্রয় কর ফাঁকি দিতে পারে এবং তার জন্যে কিছুলাভ আয়ত্ত করতে পারে। কিন্তু সমবায় সমিতির পক্ষে তা সম্ভব নয় ;

৭। গ্রামাঞ্চলে দ্রব্য-চাহিদার অভাব ;

৮। নিজস্ব তহবিল পর্য্যাপ্ত পরিমাণ না থাকা।

সভ্যদের সহানুভূতির অভাব বলে অনেক সময় অনেকে অভিযোগ করে থাকে এবং এই সহানুভূতির অভাবই হচ্ছে ক্রেতা সমিতির অকৃতকার্য্যতার অন্যতম প্রধান কারণ একথাও বলা হয়ে থাকে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও বিবেচ্য যে, যদি সভ্যদের ক্রমাগত সমিতির দোকান থেকে বাজার দরের চেয়ে বেশী দামে জিনিস-পত্তর কিনতে হয় এবং যদি এর পরিবর্তে কোন সুযোগ-সুবিধা (যেমন কেনার ওপর রিবেট বা শেয়ারের ওপর লভ্যাংশ ইত্যাদি) দেওয়া না হয়, তাহলে সভ্যদের সহানুভূতি কোত্থেকে আসবে? কাজেই সভ্যদের পুরোপুরি সহানুভূতি পেতে হলে রিবেট বা লভ্যাংশ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হ'বে। সভ্যদের আকৃষ্ট করতে হ'লে উপযুক্ত ক্ষেত্র বিশেষে নিয়ামকের অনুমোদনক্রমে সভ্যদের আদায়ীকৃত অংশগত মূলধনের কিছু অংশ অবধি ধারে জিনিসপত্তর বিক্রীরও ব্যবস্থা থাকা দরকার। ইংল্যাণ্ড ও ডেনমার্কেও এই ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে।

ক্রেতা সমিতির অসাফল্যের কারণ সম্পর্কে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেছেন, "দেশে অনুন্নত জীবনমান জনিত ক্রয়ের চাহিদায় অপর্য্যাপ্ততা ক্রেতা সমবায় সমিতির কার্য্যোন্নতির প্রধান অন্তরায়। বিদেশ থেকে যে সৌখীন দ্রব্যের আমদানী হয় তা নিয়ে সমিতি খুব ভাল কাজ করতে পারে, তাতে আয়ও থাকে প্রচুর। কিন্তু সামান্য কতকগুলি শহরাঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও এরূপ দ্রব্যের তেমন চাহিদা নেই। দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নতি বিষয়ক পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায় এবং তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতাদের জীবনমান অনেকটা বেড়ে যাবে এবং এভাবে ক্রেতা সমিতির লাভজনক ব্যবসায়ের এলাকাও সম্প্রসারিত হ'বে বলে আশা করা যায়।"

ক্রেতাসমবায় বিষয়ক আলোচনা চক্র (Seminar)

১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইতে ক্রেতা সমবায় সম্পর্কে একটি আলোচনা চক্র বসে। এই আলোচনা চক্র তিনটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ক্রেতা সমবায়ের বিবিধ সমস্যা আলোচনা করে ও সমাধান কল্পে কতকগুলো বিশেষ সুপারিশ করে। প্রথম দল বলেন, ক্রেতা সমবায়দের কাজে যে সব অসুবিধা দেখা দেয়, তা হচ্ছে, (১) খুব কম সভ্যসংখ্যা ও পর্য্যাপ্ত কাযকরী তহবিলের অভাব; (২) ব্যবসায় বুদ্ধি না থাকাতে বাজারের দোকানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে না পারা; (৩) শিক্ষিত কর্ম্মচারীর অভাব; এবং (৪) সমিতির প্রতি সভ্যদের সহানুভূতির অভাব।

প্রথম সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে দলটি সভ্যসংখ্যা ও কার্য্যকরী মূলধন বাড়ানোর জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেন। তাছাড়া প্রাথমিক ক্রেতা সমিতির জন্যে ২,৫০০ সরকারী অংশীদারী হিসাবে অর্থসাহায্যেরও সুপারিশ করেন। দ্বিতীয় সমস্যা সমাধান কল্পে দোকানের অবস্থান, সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার ব্যবস্থা ও বিক্রী ব্যবস্থা উন্নয়নের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাছাড়া মধ্যবর্ত্তী লোক বা দালালদের এড়িয়ে কাজ করতে হ'লে উৎপাদন সমবায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখারও সুপারিশ করা হয়। দলটির মতে তৃতীয় সমস্যার সমাধান হ'তে পারে, যদি অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী নিয়োগ করে, বিক্রীর অনুপাতে মুনাফার একটা অংশ দেওয়া যায়। ব্যবসায় সংগঠন ও পরিচালন বিষয়ে অধিকতর সুষ্ঠু শিক্ষণ এবং প্রথম কয়েক বছর প্রত্যেক সমিতির পরিচালন ব্যয়ের অর্দ্ধেক সরকার কর্ত্তৃক বহনেরও সুপারিশ করা হয়। সভ্যদের সহানুভূতির অভাবজনিত সমস্যা দূরীকরণে দলটি বাজার দরে মাল বিক্রী, মাল বিক্রীর ওপর রিবেট এবং উপযুক্ত পরিমাণ মাল বিক্রীর ব্যবস্থা প্রভৃতির সুপারিশ করেন।

ক্রেতা সমিতির কার্য্যোন্নয়নে সরকারের কর্ত্তব্য সম্পর্কে দলটি বলেন যে, ক্রেতা সমিতির ক্ষেত্রে আয়কর রেহাই, বিদেশ থেকে দ্রব্য আমদানীতে অধিকতর সুযোগ সুবিধা দান, আমদানীকৃত দ্রব্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ, সরকারী ব্যবসায়ে ক্রেতাসমবায়দের অগ্রাধিকার দান করা উচিত। এসব সমিতির জন্য সরকার কর্ত্তৃক স্টেটব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া বা অন্য কোন সংস্থা থেকে অর্থ সাহায্যের কথাও তাঁরা বলেন। তাঁরা আরও বলেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনায় ১২,০০০ খুচরা ক্রেতা সমবায় ও ২০০টি পাইকারী বা কেন্দ্রীয় ক্রেতা সমবায় সমিতি সংগঠন

করতে হবে। আর গ্রামাঞ্চলে সেবাসমিতিগুলো ক্রেতা সমিতির কাজ করবে। সমিতির কার্য্যদক্ষতা বাড়ানোর জন্যে দ্বিতীয় দল বলেন যে সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটি ও কার্য্যপরিচালক কর্ম্মচারীর নিজ নিজ কাজের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য বোধ থাকবে এবং একে অন্যের দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। তা'ছাড়া ক্রেতা সমিতির কাজের সঙ্গে মহিলাদের আরও জড়িত থাকা বাঞ্ছনীয় এবং তার জন্যে সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্যে 'মহিলা উপদেষ্টা পরিষদ' থাকা উচিত।

দ্রব্য ক্রয়, বিক্রয় ও বিক্রয়মূল্যসম্পর্কে তৃতীয় দল প্রত্যেক জেলায় একটি করে শক্তিশালী সরবরাহ বিপণন সমিতি গঠন করার সুপারিশ করেন, কেননা তাতে দ্রব্য সংগ্রহ ও সরবরাহের সমস্যা অনেকটা দূর হ'বে। তা'ছাড়া ক্রেতা সমিতির সঙ্গে কৃষি বিপণন সমিতি ও শিল্প সমবায় সমিতির নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনও সম্ভব হ'বে। প্রাথমিক ক্রেতা সমিতির উন্নয়ন, এদের কাজে যোগাযোগ রক্ষা, আর সেবা সমিতির মাধ্যমে ক্রেতাদের লেন দেন এর উন্নয়নও সম্ভব হ'বে। বিক্রী বাড়ানোর জন্যে দলটি সভ্যদের আমানতের ওপর ভিত্তি করে বা যেখানে মাসিক বেতন বা স্থিরীকৃত মজুরীর ব্যবস্থা রয়েছে সেখানেও ধারে বিক্রীর ব্যবস্থা থাকতে পারে। আর দ্রব্য মূল্য নির্দ্ধারণ ব্যাপারে তাঁরা বলেন যে, দ্রব্য বিক্রয় মূল্য এমন ভাবে ঠিক করতে হ'বে যা'তে ক্রয়মূল্য বা বাজার দর যেটাই কম হোক না কেন তার ওপর যেন খানিকটা লাভ থাকে।

ক্রেতা সমবায়ের ভবিষ্যৎ—ক্রেতা সমবায়ের সম্প্রসারণের পক্ষে ভারতে যথেষ্ট অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সারা দেশে ন্যায্য মূল্যের দোকান, সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতাদের আগের দর কষা-কষির যে একটা খারাপ অভ্যাস ছিল তা অনেকটা কমে গেছে। ক্রেতা সমবায় গড়ে ওঠার পক্ষে এটা সত্যিই সুলক্ষণ। বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনায় বহু লোকের কর্ম্ম সংস্থান ও ব্যক্তিগত আয় বেড়ে যাচ্ছে। আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের কেনার ক্ষমতাও বেড়ে যাচ্ছে। তা' ছাড়া শহরাঞ্চলে শিক্ষা সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে ও শহুরে লোকদের জীবনমান অনেকটা বেড়ে গেছে। চা-বাগান, বড় বড় মিল, ফ্যাক্টরী, কারখানা বা খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিয়ে ক্রেতা সমবায় গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত হয়েছে। তা' ছাড়া সরকারী বা বে-সরকারী অফিসগুলোতে কর্ম্মচারীদের নিয়ে ক্রেতা সমবায় গঠন করা হচ্ছে।

ক্রেতা সমবায় সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ (Recommendations of the Committee on Consumers' Co-operation).

ভারতে ক্রেতা সমবায়ের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির সুপারিশ কল্পে ডাঃ পি, নাটেশন্-এর নেতৃত্বে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড (National Co-operative Development and Ware Housing Board) ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটির বিবরণী ১৯৬১ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়।

ক্রেতা সমিতির সংগঠন, তহবিল, ব্যবসায় পরিচালন প্রভৃতি বিষয়ে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ এই কমিটি করেছেন।

সংগঠন—(১) সমিতি সংগঠনের সময় সমিতির আয়তন ও আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা সম্পর্কে যথেষ্ট নজর দেওয়া দরকার। কোন এলাকায় লোকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, জীবনমান, ক্রেতাদের কি কি জিনিসের চাহিদা, সম্ভাব্য ব্যবসায়ের পরিমাণ, পরিচালন ব্যবস্থায় অনুকূল পরিবেশ ইত্যাদি খুব ভাল করে দেখতে হ'বে। সাধারণতঃ কোন ক্রেতা সমিতিকে যত শীঘ্র সম্ভব, নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড়াতে হ'বে। সমিতির আয়তন ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা সম্পর্কে কমিটি বলেন যে, শহরাঞ্চলে একটি প্রাথমিক সমিতির অংশগত মূলধন থাকবে ৫০০০্ টাকা, কার্য্যকরী তহবিল ১৫ থেকে ১৬ হাজার টাকা, বার্ষিক ব্যবসায়ের পরিমাণ ১ লাখ টাকা, আর সভ্যসংখ্যা ২৫০ জন। আর জেলা ভিত্তিতে পাইকারী বা কেন্দ্রীয় ক্রেতা সমিতির অংশগত মূলধন থাকবে ৫০ হাজার টাকা, কার্য্যকরী মূলধন ২ লাখ টাকা, সভ্যসংখ্যা প্রায় ১০০টি প্রাথমিক সমিতি ও বার্ষিক ব্যবসায়ের পরিমান প্রায় ১২ লাখ টাকা। আর, শীর্ষ সমিতির সভ্য থাকবে, ২০০টি প্রাথমিক সমিতি, অংশগত মূলধন থাকবে এক লাখ টাকা, কার্য্যকরী তহবিল ৫ লাখ টাকা; আর বার্ষিক ব্যবসায়ের পরিমাণ ৩০ লাখ টাকা।

(২) (ক) প্রাথমিক ক্রেতা সমিতি সংগঠন করার আগে দেখতে হবে যে সমিতিতে যারা সভ্য হতে চায় তারা ক্রেতা সমবায়ের মূলনীতি ও ব্যয়পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কি না; (খ) সমিতি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না; (গ) স্থানীয় চাহিদা ও সম্পদের ভিত্তিতে সমিতির কার্য্যসূচীর একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করা দরকার; (ঘ) সমিতি রেজিষ্ট্রী করার আগে উদ্যোক্তারা প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে কি না, দক্ষ পরিচালনার

উপযুক্ত কর্মচারী পাওয়া যাবে কি না, দৈনন্দিন কাজে তদারক করার মতো লোক পাওয়া যাবে কি না, তাও দেখতে হবে।

(৩) ক্রেতা সমবায়ে মহিলাদের অধিকতর অংশ গ্রহণও প্রয়োজন এবং তারজন্য অধিকতর মহিলা সভ্যভুক্তি, ক্রয় কমিটিতে ও কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিতে মহিলা নিয়োগ; নিখিল ভারত মহিলা পরিষদ, মহিলা কল্যাণ সমাজ প্রভৃতি মহিলা সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদিও দরকার।

(৪) গ্রামাঞ্চলে সেবা সমিতির মাধ্যমে ক্রেতা সমবায়ের কাজ করা। যে সব জিনিসের দাম খুব বেশী ওঠা নামা করে না যেমন, লবণ, দেশলাই, কেরোসিন তেল, চিনি ইত্যাদি নিয়ে সেবা সমিতি কাজ করবে। দুর্ব্বল সমিতিদের পুনর্গঠন ও নতুন সমিতি সংগঠনও দরকার।

(৫) স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ক্রেতা সমবায় ব্যাপকভাবে গড়ে তোলা দরকার;

(৬) প্রাথমিক সমিতি সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে পাইকারী বা কেন্দ্রীয় সমিতিও সংগঠন করতে হবে।

মূলধন—

(১) প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতির প্রতিটি শেয়ারের মূল্য যথাক্রমে ১০৲ ও ১০০৲ টাকার বেশী হ'বে না।

(২) ভাল সুদে সভ্যদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহের জন্য ক্রেতা সমিতির আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে; সভ্যদের কাছ থেকে জিনিসপত্তর কেনা বাবত প্রতি মাসেই কিছু কিছু আমানত নেওয়ার প্রথা চালু করাতে হ'বে।

(৩) ক্রেতা সমিতির আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে সরকারকে সমিতির অংশীদার হ'তে হ'বে নিম্নলিখিত হারে :—

(ক) নতুন বা পুনর্গঠিত প্রাথমিক সমিতিতে ২,৫০০৲ টাকা পর্যন্ত;

(খ) শীর্ষ পাইকারী সমিতিতে ৫০,০০০৲ পর্য্যন্ত।

(৪) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক যা'তে তাদের কার্য্যকরী মূলধনের কিছু অংশ ক্রেতা সমিতিদের অর্থসাহায্যের জন্য আলাদা করে রাখে তার জন্যে সরকারী প্রচেষ্টাও দরকার; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করবেন। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক অর্থসাহায্য করতে অক্ষম হ'লে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বিপণন সমিতির মতো ক্রেতা সমিতিকেও অর্থ সাহায্য করবে।

ব্যবসায় পরিচালন (জিনিসপত্তর কেনা-বেচা) :—

(১) ক্রেতাদের চাহিদা নিরূপণ করার জন্য সভ্যদের নিয়ে মাসিক বা ত্রৈমাসিক সভার ব্যবস্থা করা, খদ্দেরদের জন্য প্রস্তাব বই (Suggesstion Book) রাখা, মহিলা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ;

(২) যে সমস্ত জিনিস খুব কাটতি হয়, সেগুলো নিয়েই সমিতি প্রথমে কাজ করবে এবং পরে সুবিধে মত খদ্দেরদের সুবিধের জন্যে বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রীর ব্যবস্থা করবে ;

(৩) প্রয়োজনীয় তহবিল থাক্‌লে, সমিতি তৈলবীজ থেকে তেল তৈরী, ধান থেকে চাল, গম থেকে আটা তৈরীর ব্যবস্থাও করতে পারে ও একসঙ্গে অনেক জিনিস সস্তা দরে বাজার থেকে কিনতে পারে ;

(৪) বিদেশ থেকে জিনিস আমদানীর ব্যাপারে ক্রেতা সমবায়কে অগ্রাধিকার দিতে হ'বে ; এক বছর ধরে কাজ করছে, এমন সমিতিকে আমদানীর সুবিধে দিতে হ'বে ;

(৫) সাধারণতঃ নগদ টাকায় জিনিসপত্তর বিক্রী করতে হবে। তবে যেখানে মাইনে বা মজুরী থেকে খুব সহজে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে ধারে বিক্রীরও ব্যবস্থা থাকতে পারে ;

(৬) ক্রেতা সমবায়ে অধিক খদ্দের জোটানোর জন্য সভ্য ছাড়া অন্যান্যদেরও জিনিসপত্তর কেনার ওপর রিবেট দেওয়া উচিত। এই রিবেটের টাকা না দিয়ে, ওদের নামে শেয়ারের টাকা হিসেবে জমা করে পরোক্ষভাবে এদেরকেও সভ্যভুক্ত করা যেতে পারে।

সরকারী সাহায্য :—

সরকারী অংশীদারী ছাড়াও কমিটি নিম্নলিখিত সরকারী সাহায্যের সুপারিশ করেন :

১। প্রাথমিক সমিতির দোকান ও গুদাম তৈরী বাবত—১৫০০০৲ পর্য্যন্ত (৭৫% ঋণ ও ২৫% দান) ;

২। শীর্ষ পাইকারী ক্রেতা সমিতির প্রধান কার্য্যালয়ে গুদাম তৈরীর জন্য ৫০,০০০৲ ও শাখা গুদাম তৈরীর জন্য ২৫,০০০৲ পর্য্যন্ত (৭৫% ঋণ ও ২৫% দান) ;

৩। যতদিন নিজস্ব গুদাম তৈরী না হচ্ছে, ততদিন গুদাম ভাড়ার অর্ধেক

দান (উর্দ্ধতন পক্ষে ৫০০৲ প্রাথমিক সমিতির ক্ষেত্রে ও ৯০০৲ শীর্ষ পাইকারী সমিতির ক্ষেত্রে)।

৪। মাল কেনা-বেচার সুবিধের জন্য শীর্ষসমিতি যাতে ট্রাক ইত্যাদি কিনতে পারে, তার জন্য সরকার দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেবেন।

৫। সরকার প্রথম তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য কয়েকটি বিশিষ্ট ক্রেতা সমিতিকে পরিচালন খাতে নিম্নলিখিত হারে দানের ব্যবস্থা করবেন :

(ক) প্রাথমিক সমিতি—১,৮০০৲ পর্য্যন্ত ;

(খ) শীর্ষ পাইকারী সমিতি—১২,০০০৲ পর্যন্ত।

৬। পাইকারী সমিতি প্রাথমিক সমিতিকে যে মাল বিক্রী করবে, তার ওপর কোন বিক্রয় কর আদায় চলবে না। তেমনি নতুন ক্রেতা সমিতি থেকে প্রথম তিন বছর কোন 'অডিট ফি' আদায় করা উচিত নয়।

৭। সরকারী ভোগ্যপন্যের চাহিদা ক্রেতা সমিতি থেকে সংগ্রহ করবে। আর সরকারী অফিস ও বেসরকারী অফিসে যাতে ক্রেতা-সমিতি গড়ে ওঠে, তারজন্য সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন।

পরিচালন খাতে দান ও সরকারী অংশীদারী সম্পর্কে কমিটির সুপারিশ সরকার মেনে নিয়েছেন। তাছাডা বিদেশ থেকে দ্রব্য আমদানী সম্পর্কে কমিটির সুপারিশক্রমে, মাত্র এক বছর ধরে কাজ করছে, এমন সমিতিকেও আমদানীর লাইসেন্স দেওয়া হবে বলে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ক্রেতা সমবায়

তৃতীয় পরিকল্পনায় ক্রেতা সমবায় সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কতগুলি সমিতি স্থাপন করা হবে এবং তাদের কি রকম সাহায্য দেওয়া হবে তা নিম্নে দেওয়া হল :—

কত সমিতি স্থাপন করা হ'বে— প্রাথমিক ক্রেতা সমিতি— ভারতে	পশ্চিমবঙ্গ	প্রতি সমিতিতে সরকার কত টাকা শেয়ার নেবে*	কর্ম্মচারীর বেতনবাবদ সাহায্য (তিন হতে পাঁচ বছরে)	কার্য্যকরী মূলধনের জন্য সাহায্য
২২০০	৬০	২৫০০৲	১৮০০৲	৪০০০৲
কেন্দ্রীয় ক্রেতা সমিতি—৫১	১	২৫০০০৲	৩০০০৲	×

* সমিতি যতটা শেয়ার নিজে তুলবে সরকার সেই সমিতির ততটা পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করবে, অবশ্য সরকার কর্তৃক ক্রীত সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ উপরে লিখিত অঙ্কের বেশী হবে না।

চীনাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে ক্রেতা সমবায় সমিতি স্থাপনের পরিকল্পনা ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে করেছেন সেগুলি সেইরূপ শহরে স্থাপন করা ঠিক হয় যার লোকসংখ্যা অন্ততঃ ৫০ হাজারের কম নয়। প্রতি শহরে অন্ততঃ ১টি কেন্দ্রীয় বা হোলসেল সমিতি এবং অন্ততঃ ২০টি প্রাথমিক সমিতি তার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। ভারতে এই রকম শহর আছে মোট ২৫০ এবং পশ্চিমবঙ্গে আছে মোট ৩৪টি। প্রথমতঃ ভারতে মোট ২০০টি কেন্দ্রীয় (এবং ৪০০০ প্রাথমিক সমিতি) স্থাপন করা হবে। পরে এই সংখ্যা আরও বাড়ান যেতে পারে। কলিকাতার মত বড় বড় শহরে দুইটি কেন্দ্রীয় সমিতিও স্থাপন করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপিত হবে সেই রকম ২৭টি শহরে এবং প্রাথমিক সমিতি ৫৪০টি। তাদের যেরূপ সাহায্য করা হবে তা নিম্নে দেওয়া হল :—

৫০ হাজার লোকসংখ্যা বিশিষ্ট যে শহরে ক্রেতা সমিতি স্থাপন করা হবে

	সরকার কর্তৃক শেয়ার ক্রয়	কর্ম্মচারীর বেতন বাবত সাহায্য	ঋণ এবং সাহায্য —
কেন্দ্রীয় সমিতি (প্রত্যেকটিতে)	১ লক্ষ টাকা	১০ হাজার	ট্রাক কেনা ইত্যাদির জন্য ১ লক্ষ টাকা (তন্মধ্যে ২৫ হাজার টাকা সাহায্য) এবং ক্যাশ ক্রেডিট্ ২ লক্ষ টাকা
প্রাথমিক সমিতি (প্রত্যেকটিতে)	২৫০০ টাকা	২ হাজার	×

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শ্রমিক সমবায়

কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। বাসগৃহ সমস্যা, পানীয় জলের সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা, অনুন্নত জীবনধারণ সমস্যা এদের জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। এসব সমস্যার সমাধান হ'তে পারে যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা একসঙ্গে মিলে সমবায় সমিতি গঠন করে।

সাধারণতঃ শ্রমিক সমবায়ের যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হচ্ছে,—

(১) একই কাজ-জানা শ্রমিকেরা একই কাজ করার জন্য সমিতি গঠন করে।

(২) ঠিকাদারীর ব্যবসায় চালায়, চুক্তি অনুযায়ী নিজেরাই কাজ করে—নিজেরা মাল-মশ্‌লা জোগাড় করে আনে।

(৩) তাদের কাজ দেওয়ার জন্যে কোন ঠিকাদার যাবে না। নিজেরাই মজুর, আবার নিজেরাই ঠিকাদার। অবশ্য চুক্তি অনুযায়ী কোন কাজ হচ্ছে কিনা তা বিভাগীয় কর্মচারীরা নিশ্চয়ই দেখবেন।

(৪) যে যতটা কাজ করছে, সে অনুপাতে মজুরীও পাচ্ছে ; আর কোন কাজ সম্পাদন করার পর যেটুকু টাকা পাওয়া যাচ্ছে, তা নিজেরা ভাগ করে নিচ্ছে।

অনেক রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ও সহরাঞ্চলে শ্রমিক সমবায় সংগঠিত হয়েছে। ১৯৫৮ সালে এদের সংখ্যা ছিল ১৩০৪টি, যেমন—

রাজ্য	সমিতি সংখ্যা	সভ্য সংখ্যা
পাঞ্জাব	৭১৮	৭১৫০৪
বোম্বাই	২৯৮	
মাদ্রাজ	২১	২,৬৩৬
অন্ধ্র	১২৪	১৪,৫৬০
কেরালা	৩৮	সংখ্যা পাওয়া
উড়িষ্যা	৯	যায় নাই
দিল্লী	১০	
রাজস্থান	৭৬	
হিমাচল প্রদেশ	১০	
মোট :	১৩০৪	

উপরের তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মোট সমিতি সংখ্যার অনেক বেশী রয়েছে একমাত্র পাঞ্জাবেই। সমিতিগুলো মোট ২·৩১ কোটি টাকার কাজ করতে পেরেছে। শ্রমিক সমবায়গুলো নানা রকমের হতে পারে—

যথা, (১) শ্রমিক চুক্তি সমিতি (Labour Contract Society)
(২) বন শ্রমিক সমিতি (Forest Labours' Society)
(৩) পরিবহন সমিতি (Transport Society)
(৪) সমবায় কারখানা (Co-operative Workshop)

(১) শ্রমিক চুক্তি সমিতি—এ ধরনের সমিতি প্রধানতঃ শ্রমিকদের দর কষাকষি বা মজুরীর হার উন্নয়নের জন্যে সংগঠিত হয়। শ্রমিকদের সামগ্রিক কর্ম্ম সংস্থানের অভাব হয়। তা' ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে শ্রমিকদের পক্ষে ঠিকাদারদের কাছ থেকে প্রয়োজনানুযায়ী মজুরী পাওয়াও সম্ভব নয়। কাজেই সমবায় সমিতি সংগঠনে ও তার মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করে আশানুরূপ মজুরী পাওয়া সম্ভব হয়। শুধু মাত্র সরকারের বিভিন্ন নির্ম্মাণ কার্য্য পরিকল্পনায় যেমন, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, গৃহ নির্ম্মাণ, রাস্তাঘাট মেরামত ইত্যাদি কাজেই সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। বে-সরকারী কাজও যাতে সমিতি পেতে পারে, তারও ব্যবস্থা করতে হ'বে। সুখের বিষয়, সরকারের বাস্তু বিভাগ শ্রমিক সমিতিকে গৃহ নির্ম্মাণ, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতি কাজে অগ্রাধিকার দান করছেন।

(২) বন শ্রমিক সমিতি—এ ধরনের সমিতি সাধারণতঃ আদিবাসী বা অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের জন্যই সংগঠিত হয়ে থাকে।

সরকারী বন জঙ্গলের ঝোপ-ঝাড় এসব সমিতিকে ইজারা দেওয়া হয়। সমিতি এসব বনের বিভিন্ন বন-দ্রব্য বিক্রয় করে। এ ভাবে যে মুনাফা সাধারণতঃ ঠিকাদারদের পকেটে যেত তা সমিতিতেই থাকে এবং সভ্যেরা লাভবান হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে বোম্বাইতে মোট ২৭৫টি, অন্ধ্র প্রদেশে ২৬টি ও উড়িষ্যায় ১টি এ ধরনের সমিতি ছিল। অধিকাংশ সমিতিই লাভে কাজ করছে। বোম্বাইর ২৭৫টি সমিতির মধ্যে ১৬৮টি বনের ইজারা পেয়েছে এবং এই সমিতিগুলো মোট ১ কোটি ৬৩ লাখ টাকার বনজ দ্রব্য বিক্রী করেছে। উড়িষ্যা রাজ্য সরকার উড়িষ্যা বন শ্রমিক সমিতিকে ২৭ হাজার টাকা ঋণ ও ১২ হাজার টাকা দান হিসেবে সাহায্য করেছেন।

(৩) **পরিবহন সমিতি**—১৯৫৭-৫৮ সালে বিভিন্ন রাজ্যে পরিবহন সমিতির সংখ্যা ও সভ্য সংখ্যা নীচে দেওয়া হল :

রাজ্য	সমিতি সংখ্যা	সভ্য সংখ্যা
পাঞ্জাব	২৭৮	৭,৮৪৩
রাজস্থান	৬০	১,২১৭
পশ্চিমবঙ্গ	৪০	২,০৬৯
বোম্বাই	৪০	৭,৫৩১
মধ্যপ্রদেশ	২০	৪৭৫
মাদ্রাজ	৭	৩০৯
কেরালা	৫	—
অন্ধ্র প্রদেশ	৪	২৪০

পাঞ্জাবে সব চাইতে বেশী পরিবহন সমিতি রয়েছে এবং এদের কাজও খুব ভাল চল্‌ছে।

(৪) **সমবায় কারখানা**—এই সব কারখানা সাধারণতঃ যুদ্ধ-ফেরৎ লোকদের জন্যই গড়ে ওঠে। মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে এ ধরনের কারখানা গড়ে উঠেছে। মাদ্রাজে ৭টি কারখানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও ভোগ্য পণ্য উৎপাদন করছে। আর বোম্বাইতে ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে এ ধরনের সমিতি ছিল মোট ৭টি।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

গৃহ সংস্থান সমবায়

প্রয়োজনীয়তা—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গৃহসমস্যা একটা বিরাট সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। ইউরোপীয় দেশগুলোতে যুদ্ধের তাণ্ডব লীলায় অনেক বাড়ীঘর ধূলীসাৎ হয়েছে, লক্ষ লক্ষ লোক হয়েছে গৃহহীন, যুদ্ধের বিষময় ফলাফল এদেশেও অনুভূত হয়েছে। গৃহনির্ম্মানের উপকরনাদি দুস্প্রাপ্য হয়ে ওঠে সামরিক চাহিদায় অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে। তাছাড়া সাধারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, দেশ বিভাগের ফলে স্বাভাবিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অপেক্ষা আরও লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়া, শহরাঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পোন্নয়নের ফলে পল্লী অঞ্চল থেকে সহরাঞ্চলে জনসমাগম, গৃহনির্ম্মাণের দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্যাও দেখা দিয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানে গৃহসংস্থান সমবায় অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে। এ ধরনের সমবায়ে আর্থিক ও সামাজিক দুই সুবিধেই পাওয়া যায়। কেননা, তাতে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ প্রশস্ত হয় এবং একসঙ্গে সমষ্টিগত ভাবে জমি ও গৃহনির্ম্মাণের মাল-মশ্‌লা কেনাতে অযথা অনেক খরচা বেঁচে যায়; তা'ছাড়া মুনফা-জনিত কোন দুরভিসন্ধিও এই সমবায়ে থাকতে পাবে না। প্রকৃতপক্ষে অনেক দেশে সমবায় সমিতি বিভিন্ন উপায়ে গৃহনির্ম্মাণের খরচা কমাতে পেরেছে ও গৃহক্রয়েচ্ছু সভ্যদের প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করতে পেরেছে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বড়বড় গৃহনির্ম্মাণ সমবায়গুলো এ ধরনের কাজে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে। তাছাড়া সমবায় যা সমষ্টিগত ভাবে মাল-মশ্‌লা কেনা, গৃহনির্ম্মাণে শ্রমিক নিয়োগ, সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত গৃহ নির্ম্মাণের পবিকল্পনা ইত্যাদিও সম্ভব হচ্ছে সমবায়ের মাধ্যমে। অল্পদামে, দালাল বা কণ্ট্রাক্টারদের মুনাফা না দিয়ে সভ্যদের গৃহসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে।

গৃহসংস্থান সমবায়ের রকমভেদ—সাধারণতঃ গৃহসংস্থান সমিতি তিন রকমের হতে পারে, যেমন—

(১) ব্যক্তিগত মালিকানা সমিতি (Individual ownership):—এধরনের সমিতি, সভ্যদের গৃহনির্ম্মাণে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করে। সমিতি

সাধারণতঃ নিজে গৃহ নির্ম্মাণ করে না। বাড়ী তৈরী হয়ে গেলে, সমিতির ঋণ শোধ না করা পর্য্যন্ত সভ্যকে ঐ বাড়ী তার সমিতিতে বন্ধক রাখতে হয়। অবশ্য কখনো কখনো সমিতি বাড়ী তৈরী করে সভ্যদের কিস্তিবন্দীতে টাকা শোধ দেওয়ার ব্যবস্থা করে এবং এইভাবে বাড়ী বিলি করে দেয়। যখন কোন সভ্য সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে দিতে পারে তখন সে সেই বাড়ীর মালিক হয়ে পড়ে।

(২) প্রজাস্বত্ব সমতুল মালিকানা সমিতি (Tenant ownership) :—এধরণের সমিতি নিজে বাড়ী তৈরী করে এবং তা সভ্যদের ভাড়ার ভিত্তিতে বিলি করে দেয়। বাড়ীর মালিকানা কিন্তু সমিতির থাকছে। সভ্যরা বাড়ী দখল করা মাত্র বাড়ীর সম্পূর্ণ দাম দিয়ে দিতে পারে বা কিস্তীবন্দীতেও তা দিতে পারে। বাড়ীর সম্পূর্ণ দাম দেওয়া হয়ে গেলে, কোন সভ্য সমিতির কাছ থেকে সামান্য ভাড়ার বিনিময়ে বাড়ীর লীজ বা বন্দোবস্ত পায়। যতদিন সভ্য থাকবে ততদিন তাকে এই সামান্য ভাড়া দিয়ে যেতে হবে। লীজ এর চুক্তিতে সমিতির অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে বাড়ী ভাড়া দেওয়া বা বিক্রীকরা চলবে না বলে কতকগুলো বিধি নিষেধ থাকে।

(৩) প্রজাস্বত্ব সমতুল সহ-অংশীদারী সমিতি (Tenant Co-partnership) :—এই সমিতি জমির মালিক হয় এবং সেই জমির উপর বাড়ীও তৈরী করে নিজে। সভ্যদের প্রয়োজন অনুযায়ী এদের ঘর বিলি করা হয়। প্রথমে সভ্যেরা সকলে মিলে গৃহনির্ম্মাণের মোট খরচের $\frac{1}{8}$ বা $\frac{1}{2}$ ভাগ দিয়ে দেয়, সভ্যদের দেওয়া এই টাকা সভ্যদের শেয়ারখাতে জমা করা হয়। তারপর সমিতি গৃহনির্ম্মাণের বাকী টাকা সরকার বা অন্য কোথাও থেকে সংগ্রহ করে। বাড়ী তৈরী হয়ে যাবার পর সভ্যগণ নিজ নিজ ঘরে বাস করে। যে টাকা সরকার বা অন্য কোথাও থেকে ধার করা হয় তার সবটুকুই সভ্যদের শেয়ার হিসাবে বিলি করে এবং কিস্তি বন্দীতে ঐ টাকা আদায় করা হয়। কর্জ্জের টাকা পরিশোধ হয়ে গেলে, কোন সভ্য বিনা ভাড়ায় সমিতির প্রজা বা ভাড়াটে হিসাবে বাড়ীতে বস-বাস করে। প্রজাস্বত্ব সমতুল মালিকানা সমিতিতে সভ্যকে বরাবর সমিতিকে ভাড়া দিয়ে যেতে হবে; কিন্তু এই প্রজাসত্ব সমতুল সেই অংশীদারী সমিতিতে, যতদিন কর্জ্জের টাকা শোধ না হ'বে, ততদিনই শুধু সমিতিকে ভাড়া দিতে হ'বে।

ভারত সরকারের বিভিন্ন গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনা

১। সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত শিল্পের শ্রমিকদের গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনা—

এই পরিকল্পনায় ভারত সরকার রাজ্য সরকারকে ঋণ ও দান হিসাবে অর্থ সাহায্য করেন। বড় মিল, কারখানার শ্রমিকদের গৃহ-নির্মাণের জন্যই এই অর্থ সাহায্য। সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার, আইন সঙ্গত গৃহ-নির্মাণ বোর্ড, শিল্প-মালিক বা শ্রমিকদের পক্ষভুক্ত গৃহ-নির্মাণ সমিতি এইসব বাড়ী তৈরীর ভার নিতে পারেন। জমি ও বাড়ী বাবত মোট ব্যয়ের অর্দ্ধেক ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়। এই ঋণের ওপর সুদের হার হচ্ছে শতকরা টা ৪.৫০ ন. প এবং সম্পূর্ণ ঋণের টাকা ২৫ বছরের সমকিস্তিতে দেয়। আর জমি ও বাড়ীর মোট খরচার শতকরা ১২.৫০ ন. প. দেওয়া হয় দান হিসাবে। তৈরী বাড়ী শ্রমিক ছাড়া অন্য কাউকে ২৫ বছরের ভিতর দেওয়া চলে না। সমবায় সমিতির বেলায় মোট খরচের শতকরা ২৫৲ দেওয়া হয়, দান হিসেবে। ১৯৫৭ সালের ৩১শে মার্চ অবধি এই পরিকল্পনায় ৮৯,০০০টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। সমবায় গৃহ সংস্থান সমিতি এর ভিতর শতকরা ২টি বাড়ী তৈরী করেছে।

২। নিম্নআয় বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের জন্য গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনা—

এই পরিকল্পনায় ভারত সরকার নিম্ন আয় বিশিষ্ট লোকদের জন্য গৃহ নির্মাণের বাবত রাজ্য সরকারকে ঋণ দেন। রাজ্য সরকারকে শতকরা ৪½ টাকা হার সুদে ও ৩০ বছরের মেয়াদে ঋণ দেওয়া হয়। আর রাজ্য সরকার ব্যক্তি বিশেষকে বা সমবায় সমিতিকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে। সাধারণতঃ মাথা পিছু ৮০০০৲ বা গৃহ নির্মাণের মোট খরচার শতকরা ৮০ টাকার বেশী দেওয়া হয় না। যাদের আয় বছরে ৬০০০৲ টাকার বেশী নয়, একমাত্র এদেরকেই এই ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। শতকরা ৫৲ হার সুদে ৩০ বছরের সমকিস্তিতে এই ঋণের টাকা পরিশোধ করতে হয়।

ভারতে গৃহ-সংস্থান সমবায়ের অগ্রগতি—

ভারতে একমাত্র বোম্বাই রাজ্যে সর্বপ্রথম গৃহসংস্থান সমবায় গড়ে ওঠে ১৯০৫ সালে। আজও গৃহ-সংস্থান সমবায়ে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্য সব চাইতে উন্নত।

নিম্নলিখিত তালিকা হ'তে ভারতের গৃহ-সংস্থান সমিতিগুলোর কার্য্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে :

কেন্দ্রীয় গৃহ-নির্মাণ অর্থ সংস্থান সমিতি :—

	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
১। সংখ্যা	৫	৫	৬
২। সভ্য সংখ্যা	১,৪১৯	১,৭১৭	১,৮১২
৩। আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন	৮৬,২৬	৯১,৯৯	৯৭,২৬
৪। ঋণ গ্রহণ	১৭৪,২৯	৩০৮,৫৪	৫৬৪,৮৩

প্রাথমিক গৃহ-সংস্থান সমিতি :

	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০
১। সমিতি সংখ্যা	৪,১৭২	৪,৭৩৯	৫,৫৫৮
২। সভ্যসংখ্যা (হাজারে)	২,৪৮	২,৮০	৩,২০
৩। আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল	৭'৯২	৯,০৮৮৮	১,০৫,১০
৪। ঋণ গ্রহণ	২৪'৫০	৩,২২৪,৩৮	৩,৮০৮,৩২
(সরকার থেকে)	(১০'২৬)	(১,১৬,৫০)	(১,২৮১'৪৮)
৫। ঋণ বাবত পাওনা	১'০৩৭	১,২৪৩'৫৫	১,৪৫২'৯৭

গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যের প্রাথমিক গৃহ-সংস্থান সমিতিগুলোর অবস্থা (১৯৫৯-৬০) ;

	গুজরাট	মহারাষ্ট্র	মাদ্রাজ	অন্ধ্র
১। সমিতি সংখ্যা	১৫১৬	১২০৫	৪৮৯	৩১৫
২। সভ্য সংখ্যা	৪৬,৮২৫	৬৪,৩০৬	৩৯,১৭৯	২৯,৬৮৪
৩। অংশগত মূলধন	৮৫,৫৬	৩৮০'৪১	১৭৫'৭৯	৮৭'৩০
৪। নির্মিত গৃহের সভ্য সংখ্যা	১২২২	৯৮৬	১৩২	৬৬৫
৫। বিভিন্ন সমবায় বিভক্ত বাড়ী তৈরী	১৪৭৩	২৯৭৭	৬৭৬	৭৭১

১৯৫৭-৫৮ সালে ভারতে গৃহ সংস্থান সমবায় পূর্ব বৎসরের চেয়ে শতকরা ৩৫টি করে বেড়ে যায় এবং বোম্বাইতে মোট সমিতি শতকরা ৪৮টি গড়ে ওঠে, ভারত সরকারের দুটো গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট ১২০ লাখ টাকা গৃহ সংস্থান সমিতিগুলোকে দেওয়া হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে আবার অনুন্নত সম্প্রদায়ের গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনায় ৭৮৮টি সমিতি গড়ে ওঠে। মাদ্রাজে ১৯৫৯-৬০ সালে ৪৮৯টি সমিতি গড়ে ওঠে। আবার পল্লীগৃহ নির্মাণ পরিকল্পনায় প্রতি সভ্যকে ৪৮০০৲ টাকা অবধি গৃহনির্মাণ উদ্দেশ্যে সরকার থেকে ঋণ দেওয়া হয়। বোম্বাইতে ১৯৫২ সালে একটি প্রাদেশিক গৃহ সংস্থান সমিতিও গড়ে ওঠে এবং তার অর্দ্ধেক শেয়ার সরকার কিনে নেন। পাঞ্জাবেও পল্লী গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা চালু করা হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালের শেষে পাঞ্জাবে পল্লী গৃহ-সংস্থান সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৮টি এবং ঐ বছরে বিভিন্ন সমিতি মোট ৪১০টি গৃহ নির্মাণ করে, পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের নিয়েই এ ধরনের সমিতি গড়ে ওঠে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমিতি জমি কিনে ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করে ও রাস্তাঘাট তৈরী করে, সভ্যদের মধ্যে বিলি করে। তা'ছাড়া সমিতি গৃহের নক্সা তৈরী করতে, বা অন্যান্য ব্যাপারেও সভ্যদের সাহায্য করে। রাজ্য সরকার সমিতির সভ্যদের ব্যক্তিগত ভাবে গৃহ নির্মাণ ঋণ দেন। পশ্চিমবঙ্গেও এ ধরণের বহু সমিতি গড়ে উঠেছে। পূর্ববঙ্গ হতে আগত উদ্বাস্তুদের নিয়েই এসব সমিতি স্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শহরাঞ্চলে গৃহ-সংস্থান বাবদ মোট ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। জনসাধারণ, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাজ্যে গৃহ সংস্থান কর্পোরেশন স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। পল্লী অঞ্চলে গৃহ-সংস্থান বাবতও মোট ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় গৃহ সংস্থান বাবত মোট ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। পল্লীগৃহ নির্মাণ পরিকল্পনায়ও ৪ থেকে ৬ টি পাশাপাশি গ্রাম নিয়ে স্বাবলম্বী ভিত্তিতে গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তার জন্য প্রায় ২০০০ গ্রাম ইতিমধ্যে স্থির করা হয়েছে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

মহিলা সমবায় সমিতি (Women's Co-operatives)

১৯৫৮ সালে বিভিন্ন রাজ্যে মহিলা সমবায়ের হিসেব নীচে দেওয়া গেল।

রাজ্য	সমিতি সংখ্যা	সভ্য সংখ্যা
পাঞ্জাব	৬১৩	১৮,৪০৮
বোম্বাই	৬৭	৮,৪৬৯
মহীশূর	৪৩	৫,৪১৩
উত্তরপ্রদেশ	১১৬	৩,৩৫১
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩৬	৩,৭১৪
উড়িষ্যা	৪০	২,০০৫
দিল্লী	৮০	১,৬১৭
পশ্চিমবঙ্গ	২১	১,১৮৭
কেরালা	২২	২,৬৬৬
রাজস্থান	১৯	১,০৩১
মধ্যপ্রদেশ	১০	২৯৩
বিহার	৮	২৯৩
ত্রিপুরা	২১	৫২৯

মহিলা সমিতির সংখ্যা সব চাইতে বেশী পাঞ্জাবে ৬২৩টি সমিতির মধ্যে ৩৮০টি হচ্ছে সঞ্চয় সাহায্যকারী সমবায়, ১৫৭ টি শিল্প সমবায় ও ৫৭টি ঋণ ও পুনর্বাসন সমবায়। একমাত্র পাঞ্জাবেই মহিলা সমিতির কাজ দেখাশোনার জন্য পৃথক একদল মহিলা সমবায় কর্ম্মচারী রয়েছে। মাদ্রাজে একটি মহিলা দুগ্ধ সমিতি রয়েছে। এই সমিতি১৯৫৬ সাল থেকে কাজ সুরু করেছে। তা'ছাড়া একটি কেন্দ্রীয় কুটির শিল্প সমবায়ও রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে মহিলা সমিতিদের কাজ হচ্ছে সূচীশিল্প প্রভৃতি। বোম্বাইতে মহিলা সমিতির সভ্যসংখ্যাও কার্য্যকরী মূলধন ৪৬৬,১৮৩ ও ১'১২ লাখ টাকা থেকে যথাক্রমে ৬৭,৮৪৯ ও ১'৪৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে (১৯৫৭-৫৮)। ১৯৫৭-৫৮ সালে, এই সব সমিতি প্রায় ৬ লাখ টাকার দ্রব্য তৈরী করেছে। পরিবার কল্যাণ সমবায় সমিতি, পুনায় একটি দিয়াশলাইর কারখানা চালাচ্ছে; আবার আর একটি সমিতি রেডিও তৈরীর কারখানা চালাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে, মহিলা সমিতিগুলো সভ্যদের

সঞ্চয়, স্বাস্থ্য ও সাধারণ উন্নয়নে কাজ করছে। কেরালায় মহিলা সমিতি, ধান ভাঙিয়ে চাল করছে, হস্ত শিল্পের কাজও করছে। পশ্চিমবঙ্গের মহিলা সমিতিগুলোর অধিকাংশই বিভিন্ন শিল্পের কাজ করছে।

মহিলা সমবায় সংগঠন সম্পর্কে স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে;

ক। সমবায় আন্দোলনে মহিলাদের স্থান কোথায়?

খ। মহিলাদের মধ্যে কি কি ধরনের সমিতি সংগঠন করা যেতে পারে?

গ। মহিলাদের জন্যে পৃথক কোন সমবায় সমিতি থাকা কি উচিত?

প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে যে, সুদূরপ্রসারী সমবায় আন্দোলন মহিলাদের বাদ দিয়ে সার্থক হয়ে উঠ্‌তে পারে না। উন্নয়নে মহিলাদের একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি মহিলাদের জন্যে সংগঠন করা যেতে পারে যেমন:—

১। **সঞ্চয় সাহায্যকারী সমবায়**—পারিবারিক ক্ষেত্রে মহিলাদের সঞ্চয়শীলতা কম নয়। এই সঞ্চয়শীলতার অনুশীলনে পারিবারিক অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়;

২। **গৃহ-সংস্থান সমবায়**—গৃহ ব্যবস্থায়, গৃহ সৌন্দর্য্য আনয়নে মহিলাদের যথেষ্ট কাজ করার আছে। মহিলাদের নিয়ে গৃহ-সংস্থান সমবায় স্বভাবতঃই গড়ে উঠতে পারে;

৩। **ক্রেতা সমবায়**—দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদার রকমভেদ মহিলারা পরিবারিক আবেষ্টনীতে থেকে স্বভাবতঃই ভাল বুঝতে পারে। তা'ছাড়া দ্রব্যের বিশুদ্ধতা ও অবিশুদ্ধতা তাদের রান্নারও রকমভেদের সৃষ্টি করে। আর দ্রব্যমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধিতে এদের পারিবারিক বাজেট ওলট্ পালট্ হয়ে যায়। যেহেতু ক্রেতা সমবায়কে বেশীর ভাগ নিত্যপ্রয়োজনীয় পারিবারিক দ্রব্য নিয়ে ব্যবসায় করতে হয়, মহিলাদের পক্ষে ক্রেতা সমিতি চালানো আরও সহজ হয়। তা'ছাড়া সমবায় খাবার দোকান, রান্নাঘর প্রভৃতি চালাতে মহিলারাই একমাত্র সিদ্ধহস্ত। সঞ্চয় সাহায্যকারী সমবায়ের ক্ষেত্রে এদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বরোদার কেদাবাগ নওয়াপুরা মহিলা সমবায় ১৯১৫ সালে সংগঠিত হয়। মাত্র চার আনা করে মাসে সভ্যদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে স্বরু করে আজ এর আদায়ীকৃত অংশগত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০,৭৯৩ টাকা ও সভ্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০০০। আর একটি সমিতি পাঞ্জাবে ১৯৪১ সালে ২৪ জন সভ্য নিয়ে স্থাপিত হয়। ১৯৫৩ সালে তার সভ্যসংখ্যা

দাঁড়িয়েছে ১৯৩ জন মহিলা ও অংশগত মূলধন ৪৮,৯০০৲ টাকা। খুব কম সুদে সভ্যদের বিবাহ, সেলাই কল কেনা, ছেলে-মেয়ের লেখা-পড়া করার জন্য ঋণ দেওয়া হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে এই সমিতির অংশগত মূলধন দাঁড়িয়েছে ১ লাখ টাকায়।

৪। **শিল্প সমবায়**—অম্বর চরকা, সেলাইর কাজ, বুননের কাজ, বেতের কাজ,মশ্‌লা তৈরীর কাজ, খেলনা তৈরী, সূচী শিল্পের কাজ খুব সহজেই মহিলারা সমবায়ের মাধ্যমে করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার কাছে কামারহাটীতে মহিলা সমবায় শিল্পাশ্রম চিনামাটির বাসন তৈরী, তাঁতের কাপড় তৈরী, কাপড় ছাপানো, শিল্পকলার কাজ ইত্যাদিতে উল্লেখযোগ্য কাজ করছে।

৫। **শিক্ষা সমবায়**—শিক্ষা ক্ষেত্রেও মহিলারা অনেক কিছু করতে পারে। 'বাল মন্দির' প্রভৃতি সমবায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মহিলারা চালিয়ে যাচ্ছেন।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, কোন সমিতিতে পুরুষ ও মহিলা সভ্য থাকাতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু কোন সমিতির কার্যোন্নয়নে মহিলাদের অধিকতর অংশগ্রহণ প্রয়োজন বোধ হ'লে মহিলাদের পৃথক সমিতিও থাকতে পারে। তেমনি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থায় একমাত্র মহিলাদেরই স্থান থাকতে পারে। সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে অধিকতর মহিলার অংশগ্রহণই একমাত্র কাম্য এবং তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। শিল্প সমবায় বিষয়ক ওয়ার্কিংগ্রূপ ও ক্রেতা সমবায় বিষয়ক কমিটিও শিল্প সমবায়ের ব্যাপক সম্প্রসারণে ও ক্রেতা সমবায়ের সাফল্যে মহিলাদের এসব সমবায়ে অধিকতর অংশগ্রহণের সুপারিশ করেছেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

অন্যান্য সমবায় সমিতি

(১) বীমা সমবায়

সাধারণতঃ তিন রকমের বীমা প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে, যথা—

(১) রাষ্ট্রীয় বীমা প্রতিষ্ঠান; (২) বে-সরকারী বীমা প্রতিষ্ঠান ও (৩)সমবায় বীমা প্রতিষ্ঠান। বীমা প্রতিষ্ঠান তিনটি প্রধান বিষয়ে জনগণের সেবা করে থাকে :

(ক) বীমার মূল্যের ক্ষতিপূরণ ;

(খ) বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঝুঁকি নেওয়া ও এই ঝুঁকি নেওয়ার খরচা সমভাবে বণ্টন ;

(গ) ক্ষতি দূরীকরণে ও সম্পত্তি বা জীবনরক্ষায় প্রয়োজনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করা।

সমবায় বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা—

(১) সমবায় বীমা সমিতিতে প্রত্যেক সভ্য একদিকে শেয়ারের মালিক, আবার অন্যদিকে, সমিতির খদ্দের; সামাজিক কর্মী হিসাবে সভ্যদের সেবাই সমিতির একমাত্র লক্ষ্য।

(২) যৌথ কারবারের ন্যায় সমবায় সমিতির মুনাফাজনিত মনোভাব থাকে না। যেটুকু উদ্‌বৃত্ত হয়, তার অধিকাংশই সভ্যদের ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে।

(৩) বীমা সমবায়ের বীমা করার খরচ ও অনেক কম, পরিচালন ব্যবস্থাও গণতন্ত্র সম্মত।

(৪) দেশের সমবায় আন্দোলনেও একটা প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করার দায়িত্ব রয়েছে বীমা সমবায়ের।

মাদ্রাজে ভারতের প্রথম বীমা সমবায় (অগ্নিবিষয়ক) গড়ে ওঠে ১৯১৪ সালে। তারপর উড়িষ্যা ও হায়দ্রাবাদেও এ ধরণের এক একটি সমিতি গড়ে ওঠে। ১৯৫৬ সালে বীমা ব্যবসায় জাতীয় করণের আগে ভারতে সমবায় বীমা ব্যবসায় মোটামুটি ভালই চলছিল। বোম্বাইতে ১২টি সমিতি, মাদ্রাজে ৩টি, হায়দ্রাবাদে ২টি, উড়িষ্যায় ৩টি ও পশ্চিমবঙ্গে ৯টি সমিতি গড়ে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গের বীমা সমিতিগুলোর সব ক'টাই জীবন-বীমা ব্যবসায় করত। ১৯৫৭-৫৮ সালে জীবন বীমা ছাড়া অন্যান্য ৬টি সমিতি গড়ে ওঠে। অন্ধ্র, বোম্বাই, বিহার, মাদ্রাজ—এই চারটি রাজ্যে একটি করে ও উড়িষ্যাতে দুটো সমিতি গড়ে ওঠে। হায়দ্রাবাদের সমবায় সাধারণ বীমা সমিতি বেশ ভাল কাজও করে। ১৯৫৬-৫৭ সালে এই সমিতি মোট ৪৬ হাজার টাকা লাভ করে। ১৯৪৯ সালে বোম্বাইতে নিখিল ভারত সমবায় অগ্নি ও সাধারণ বীমা সমিতি (All India Co-operative Fire and General Society Ltd.) নামে একটি বীমা সমিতি স্থাপিত হয়। ১৯৫৮ সালে এর নাম বদ্‌লে ইউনিয়ন সমবায় বীমা সমিতি (Union Co-operative Insurance Society) রাখা হয়। এই সমিতি বোম্বাইতে ৬টি শাখা অফিস ও বোম্বাইএর বাইরে অন্যান্য রাজ্যে ৪টি শাখা অফিস স্থাপন করেছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে এই সমিতির মোট ৫.১৯ লাখ টাকার পলিসি ছিল ও একই বছরে মোট লাভের পরিমাণ দাঁড়ায় ১.৯১ লাখ টাকা।

সমবায় বীমা সমিতিগুলো নিম্নলিখিত কাজ করছে :

(১) জীবন বীমা (২) অগ্নিবীমা

(৩) চুরি ডাকাতিতে দ্রব্য হানিজনিত বীমা; (৪) এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নগদ টাকা নিয়ে যাওয়ার বিপজ্জনিত বীমা

(৫) জন্তু বীমা—গরু-বলদ, ঘোড়া মহিষ ইত্যাদির বীমা ব্যবস্থা সম্প্রতি "ইউনিয়ন সমবায় বীমা সমিতি" করেছে। তেমনি শস্যবীমার ব্যবস্থা করতে পারলে চাষীদের খুব উপকার হ'বে। কেননা তাতে অনাবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদির দরুণ ফসল না হলেও চাষীর তেমন বিপদের আশঙ্কা থাকবে না।

(২) সর্ব্বার্থসাধক সমবায় সমিতি

১৯৩৭ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কই সর্ব্বপ্রথম এ ধরণের সমবায়ের রূপ দিয়েছেন। ১৯২৯—৩০ সালের পৃথিবীব্যাপী মন্দার পর দেশের সমবায় ঋণদান আন্দোলন চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়। অধিকাংশ সভ্য ঋণ পরিশোধ করতে না পারায়, পাইকারী হারে সমিতি তুলে দেওয়া হয়। ১৯৩৭ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেন, যে, শুধু ঋণদানে সমিতির কাজ সীমাবদ্ধ থাকলে, সমিতির পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব। তাই গ্রামের সমবায় সমিতিকে ঋণদান ছাড়াও চাষীর জীবনের অত্যাবশ্যকীয় কাজের ভার নিতে হবে অর্থাৎ সমিতিগুলোকে সর্ব্বার্থ-সাধক

সমবায় সমিতি হিসেবে কাজ করতে হ'বে। স্বল্প-মেয়াদী ঋণ দেওয়া থেকে সুরু করে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা, চাষী সভ্যদের উন্নত বীজ, সার সরবরাহ করে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা, জমি একত্রী-করণে চাষ ব্যবস্থা, উন্নতধরণের কৃষি-যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা, দৈনন্দিন দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প উৎকর্ষতার ব্যবস্থা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বর্জ্জনে যথাযথ ব্যবস্থা, সভ্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কাজও সমিতি করবে।

তারপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুপারিশক্রমে মাদ্রাজে ঋণদান সমিতিগুলো বহুবিধ কাজ করতে সুরু করে। অবশ্য সমিতির নাম বদলানো মাদ্রাজে প্রয়োজন বোধ হয়নি। উত্তরপ্রদেশেও গ্রাম্য কৃষি ঋণদান সমিতিগুলো ঋণছাড়া অন্যান্য কাজ করতেও সুরু করে এবং এজন্য অসীমদায়িত্ববিশিষ্ট সমিতিগুলোকে সর্ব্বার্থসাধক সমবায় সমিতিতে পরিণত করা হয়। অনেকের ধারণা, সর্ব্বার্থ সাধক সমিতি যে কোন কাজই করতে পারবে। এ সম্পর্কে সমবায় পরিকল্পনা কমিটি (১৯৪৫) ও নিয়ামকদের পঞ্চদশ সম্মেলন (১৯৪৭) সুপারিশ করেন যে, প্রাথমিক ঋণদান সমিতিগুলোকে পুনর্গঠিত করে সভ্যদের আর্থিক উন্নতি বিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে উৎসাহিত করা হ'বে। নিখিলভারত পল্লীঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশক্রমে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে বৃহদাকার ঋণদান সমিতি সংগঠিত হয়েছে, এদের কাজও অনেকটা সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতির মতো।

সমীক্ষা কমিটি কিন্তু ঋণদান সমিতিগুলোকে বিশেষ কোন দক্ষ নৈপুণ্যের কাজ বা যে সব কারবারে ঝুঁকি নিতে হয় সে রকম কাজ নিতে বারণ করেন। অবশ্য গ্রামাঞ্চলে ছোট এলাকা নিয়ে সেবা সমিতি সর্বার্থসাধক সমবায়ের কাজ করবে।

সর্ব্বার্থসাধক সমবায়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি

স্বপক্ষে যুক্তি—সর্ব্বার্থসাধক সমবায় সমিতি চাষীর জীবনের প্রতিটি অপরিহার্য্য কাজ করে ; তাই সমিতি ও সভ্যদের ভিতর একটি নিবিড় যোগাযোগ সাধন করে সমিতির প্রতি সভ্যদের সহানুভূতির মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দেয়। কোনও এক বিভাগের লোকসান, অন্যবিভাগের লাভে ঢাকা দেওয়া খুব সহজ হয়। তাতে সমিতির মোটামুটি অবস্থার তেমন কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। কিন্তু অন্যপক্ষে শুধু ঋণদান সমিতির পক্ষে কোনও বছরের লোকসান, পরবর্তী

বছরের লাভ দিয়ে শুধু মুছে ফেলা যেতে পারে। বৃহত্তর এলাকা নিয়ে কাজ করতে সমিতির পরিচালন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও কম খরচায় সম্ভব হয়।

বিপক্ষে যুক্তি—সর্ব্বার্থসাধক সমিতিতে বহুবিধ কারবার থাকায়, স্বভাবতঃই বহুবিধ হিসেবেই বই পত্তর রাখতে হয় ও সেগুলো যথাযথভাবে লেখার জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত কর্মী দরকার হয়। গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের শিক্ষিত কর্মী পাওয়া সহজসাধ্য নয়, আবার সমিতির কোন বিভাগে লোকসান হ'লে তা পূরণ করা সম্ভব নাও হতে পারে; ফলে সমিতির আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হতে পারে।

সমিতির উদ্দেশ্য—সর্ব্বার্থসাধক সমিতির উদ্দেশ্যের মধ্যে ঋণ সরবরাহ, চাষী সভ্যদের সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ, কুটির বা ছোট ছোট শিল্পের প্রসারের ব্যবস্থা, কৃষিজ দ্রব্য বিপণনের ব্যবস্থা, গরুর খাদ্য সরবরাহ, দুগ্ধ সংগ্রহ ও সরবরাহ, যৌথ চাষের ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রিত দ্রব্য কেনা-বেচা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সর্ব্বার্থসাধক সমিতিগুলোর বর্ত্তমান অবস্থা—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেও কোন কোন রাজ্যে বিশেষ করে মাদ্রাজে ঋণদান সমিতি ঋণদানছাড়া অন্যান্য বহুবিধ কাজ করতে সুরু করে। যুদ্ধের সময় রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত দ্রব্য বিক্রী করার ভার এ সব সমিতিকে দেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে, উত্তরপ্রদেশে ৪১,৬৬০টি সমিতি ছিল। অধিকাংশ সমিতি এখন নামেই সর্ব্বার্থসাধক, কাজে নয়, কেননা এদের প্রধান কাজই হচ্ছে এখন ঋণদান। অবশ্য বিভিন্ন দ্রব্য কেনা-বেচাও করছে অনেক সমিতি। এ সব সমিতির কাজ কমে যাওয়া বা অকৃতকার্যতার কারণ হচ্ছে, শিক্ষিত কর্মীর অভাব ও তজ্জনিত অদক্ষ পরিচালনা, সভ্যদের উৎসাহের অভাব ইত্যাদি।

দুগ্ধ সরবরাহ সমবায়

শহরের দুগ্ধের চাহিদা মেটাবার জন্য দুগ্ধ সরবরাহ সমিতি ও ইউনিয়ন প্রায় প্রতি রাজ্যেই গঠিত হয়েছে। সমবায় পরিকল্পনা কমিটি সুপারিশ করেছিলেন যে প্রতি ৩০ হাজার লোকসংখ্যা বিশিষ্ট সহরের ৩০ মাইলের মধ্যে যে সব গোয়ালা থাকে তাদের নিয়ে দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠন করা উচিত। গ্রামে যেখানে অন্য কোন সমবায় সমিতি আছে এবং যদি ঐ সমিতির অধিকাংশ সদস্য দুগ্ধ উৎপাদনে রত বা ইচ্ছুক থাকেন তাহলে এই সমিতিও দুগ্ধ সরবরাহের কাজ করতে পারে। যেখানে তা নেই সেখানে গোয়ালাদের দ্বারা নূতন

সমিতি গঠিত হতে পারে। সমিতি গঠন করার আগে প্রতি সমিতি প্রত্যহ অন্ততঃ কতটা পরিমাণ দুধ কমপক্ষে সরবরাহ করবে তা ঠিক করা উচিত। পরিকল্পনা কমিটির মতে তা অন্ততঃ ৩০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হওয়া দরকার। মাসের প্রথমে প্রতি শ্রমিক সমিতি তার কেন্দ্রীয় সমিতি বা দুগ্ধ সমবায় ইউনিয়নকে জানিয়ে দেবে যে সেই সমিতি কতটা দুধ সারা মাস দিতে পারবে। প্রাথমিক সমিতি সভ্যদের স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেবে। ঐ ঋণ দিয়ে সভ্যরা গবাদি পশুর খাদ্য ক্রয় করবে বা গবাদি পশু কিনবে বা ঐ রকম কাজ চালাবে। প্রাথমিক সমিতির সম্পাদকের উপস্থিতিতে দুধ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। সরকার গোশালা করার জন্য অর্থ সাহায্য করবে। সভ্যদের ঋণ দেওয়ার জন্য যে টাকার দরকার সমিতি তা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক হতে বা দুগ্ধ সরবরাহ ইউনিয়ন হতে ধার করতে পারে।

গ্রাম্য প্রাথমিক দুগ্ধ সরবরাহ সমিতিগুলিই দুগ্ধ সরবরাহ ইউনিয়ন গঠন করে। সমবায় পরিকল্পনা কমিটির মতে প্রতি ইউনিয়নে অন্ততঃ ৩০টি প্রাথমিক সমিতি অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। ইউনিয়নের প্রধান কাজ হল গ্রাম্য সমিতি হতে দুধ যোগাড় করা ও তা শহরে আনার ব্যবস্থা করা। তারপর তাকে একত্রিত করে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিশুদ্ধ করার ব্যবস্থা করে শহরে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ নিয়ে উপযুক্ত কলকারখানা বসিয়ে ইউনিয়নকে কাজ করতে হবে। সমবায় পরিকল্পনা কমিটি এইরূপ ৩০০টি ইউনিয়ন প্রথম পাঁচ বছরে স্থাপন করার সুপারিশ করেন।

১৯৫৩-৫৪ সালের সংখ্যাতত্ত্ব হতে দেখা গেছে যে সারা ভারতে ৬৫টি ইউনিয়ন এবং ১৪৭৩টি প্রাথমিক দুগ্ধ সরবরাহ সমিতি ছিল। তাদের সভ্য সংখ্যা ছিল ১,২২,৬৪৯জন এবং তারা প্রায় ২ কোটী টাকার মত দুধ বিক্রী করেছিল। ১৯৫৪ সালে মাদ্রাজে ২০টি ইউনিয়ন এবং ৫৬০টি প্রাথমিক সমিতি ছিল। বোম্বাই প্রদেশে ৭টি ইউনিয়ন এবং ১১৮টি প্রাথমিক সমিতি এবং পশ্চিমবঙ্গে একটি ইউনিয়ন এবং ১৫৩টি প্রাথমিক সমিতি ছিল। পশ্চিমবঙ্গের এই ইউনিয়নটির নাম কলিকাতা দুগ্ধ সরবরাহ ইউনিয়ন। ১০৫৩-৫৪ সালে ৯৪টি প্রাথমিক সমিতি এই ইউনিয়নের সভ্য ছিল। ইউনিয়ন এই বৎসর ৭½ লক্ষ টাকার মত দুধ বিক্রয় করেছিল।

তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন ও হিসাব পরীক্ষা

একবিংশতি পরিচ্ছেদ

আইন, নিয়মকানুন ও উপবিধি অনুসারে একটি সমিতির কার্য্যকলাপ, সাধারণ বিধিব্যবস্থা ও আর্থিক অবস্থার পরীক্ষার নামই তত্ত্বাবধান (Supervision)। সাধারণ সভ্য ও পরিচালকবর্গের নৈতিক ও ব্যবসাগত কার্য্যকলাপের মান উন্নয়নেও এইরূপ তত্ত্বাবধান সাহায্য করে। তত্ত্বাবধানের কাজ কেবলমাত্র দোষ ত্রুটি প্রদর্শনেই শেষ হয় না। ঐ সকল দোষত্রুটির সংশোধন এবং প্রতিবিধানের দায়িত্ব তার অন্তর্গত। ইহা সমবায় সংস্থাগুলিকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করে ও তাদের কর্মদক্ষতা বাড়াতে চেষ্টা করে। তত্ত্বাবধান সমবায় নীতি ও কার্য্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেয়।

এই তত্ত্বাবধানের কাজ কোথাও সরকার দ্বারা পরিচালিত হয় আবার কোথাও একটি বিশেষ ধরনের সমবায় তত্ত্বাবধান সংস্থার দ্বারা সম্পন্ন হয়। কোথাও কোথাও দুই প্রকার ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে। মাদ্রাজ ও অন্ধ্র প্রদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর এই তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পিত আছে : নিখিল ভারত পল্লীঋণ সমীক্ষা কমিটিও এই প্রকার সুপারিশ করেন। বোম্বাই এ সরকারী এবং বে-সরকারী উভয় ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে।

উত্তম তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয় নীতি

উত্তম তত্ত্বাবধান সম্পর্কে ১৯৩৩ সালের বোম্বাই তত্ত্বাবধান কমিটির বিবরণীতে বলা হয়েছে যে—"একটি আদর্শ সমবায় সমিতিতে সাধারণ সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত যে কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি থাকে তার ওপর যদি এই সমিতির সকল কার্য্যকলাপ উপযুক্ত ভাবে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া থাকে তাহলে সমবায় সমিতির বাহির হতে কোন তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন থাকে না, এরূপ ক্ষেত্রে সৎ এবং কর্ম্মদক্ষ লোকদের দ্বারা ক্রমাগত আভ্যন্তরীন তত্ত্বাবধানের কাজ চলতে থাকে।" এই আদর্শ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব। গ্রাম এলাকায় অফিস চালানোর উপযুক্ত পরিচালকের অভাব, ব্যাপক নিরক্ষরতা, সমিতি সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্বন্ধে চেতনাহীনতা, স্বার্থান্বেষীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত সৎ সাহসের অভাব ও বৃহত্তর স্বার্থের জন্য বিন্দুমাত্র আত্মত্যাগ

বিমুখতা—এইরূপ কারণ ও অবস্থা বর্ত্তমান আছে বলেই সমিতিগুলির সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান প্রয়োজন হচ্ছে। কর্জ্জদাদন এবং তার অপব্যবহার যাতে না হয় তা দেখাশুনার জন্য তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন। সমিতির সভ্যগণ যাতে নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ করে তা দেখার জন্য এবং অমিতব্যয়িতা ও অপচয় নিবারণের জন্য, তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে। উপরন্তু সভ্যদের শুধুমাত্র হিসাব-নিকাশ ঠিক রাখা শেখালেই চলে না। তাদের সমবায়ের নীতিগত আদর্শ এবং সমবায় সমিতির প্রকৃত কাজ সম্বন্ধেও ক্রমাগত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। তাই তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

তত্ত্বাবধানের প্রকৃত কাজ কি তা অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হিসাব পরীক্ষক অথবা ব্যাঙ্কের পরিদর্শক একটি সমিতির যতটুকু কাজ করতে পারেন, তত্ত্বাবধান দ্বারা তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ হয়। তত্ত্বাবধায়ক কেবল আইন, নিয়ম ও উপবিধি অনুসারে একটি সমিতির কার্য্যাবলী পরীক্ষা অথবা কর্জ্জদাদনকারী ব্যাঙ্ককে প্রদত্ত জামিনই পরীক্ষা করে না, তত্ত্বাবধানের সুষ্ঠু কাজ ও পরিচালনার দরুণ সমবায় সমিতির সভ্য এবং পরিচালকরা সমবায়ের নীতি, গ্রাম্য ঋণ ও অসীম দায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করে। একমাত্র তত্ত্বাবধায়কই সব সময়ে সমিতিকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও অভিজ্ঞ পরামর্শ দিতে পারে এবং যথা সময়ে সময়োচিত কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করে সমিতিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে। তাই তত্ত্বাবধান শুধু দোষত্রুটির সংশোধন ও প্রতিবিধান করে থাকে। সমিতির দৈনন্দিন কার্য্য নির্ব্বাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্ব্বদা সাহায্য করা, অর্থনৈতিক বিষয়ে উপদেশ দেওয়া, ব্যবসায় ও সমবায় ক্ষেত্রে নির্দ্দেশ দেওয়া তত্ত্বাবধায়কের কাজ।

সুশিক্ষিত, উপযুক্ত বেতনপ্রাপ্ত, উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সুদক্ষ তত্ত্বাবধায়কই এরকম তত্ত্বাবধানের ভিত্তি স্বরূপ। সে একাই প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রামে সরবরাহ করতে পারে। তারপর সমিতির উন্নতির জন্য গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিদের কর্ম্মপ্রেরণা যোগাতে পারে এবং তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা সে সকল অঞ্চলের সংস্কারমূলক কাজ সহজতর হতে পারে।

তত্ত্বাবধায়কের কর্ত্তব্য—

তত্ত্বাবধায়কের কর্ত্তব্য বিষয়ে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে মাদ্রাজ সমবায় সমিতি বিষয়ক কর্ম্মলিপিতে (Madras Coop. Manual) যে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে তা এখানে বলা হচ্ছে—

"তত্ত্বাবধায়কের উপর যে সব সমিতির দায়িত্ব দেওয়া থাকে, সেই সমিতিগুলি তাদের নিজস্ব উপবিধি এবং তত্ত্বাবধায়ক সংঘের (Supervising Union) উপবিধি ও সমবায় নীতি অনুযায়ী কাজ করছে কিনা তা তার দেখা উচিত। প্রত্যেক সমিতির পঞ্চায়েৎ সদস্য সমবায় নীতি যাতে সম্পূর্ণ বুঝতে পারে এবং একতা এবং ন্যায়পরতার সঙ্গে কাজ করে এবং সময় সময় রেজিষ্ট্রার বা তত্ত্বাবধায়ক সংঘ যে সব নির্দ্দেশ দেয় তা যথাযথভাবে পালন করে, সে সব বিষয়ে তত্ত্বাবধায়কের নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক সমিতির পঞ্চায়েতের সদস্যদেরও উচিত তত্ত্বাবধায়ককে যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব ততটুকু সাহায্য করা।"

তত্ত্বাবধায়কের অন্যান্য কর্ত্তব্যগুলি নীচে দেওয়া হল :—

(১) সমিতি পরিদর্শন—তত্ত্বাবধায়কের উচিত অন্ততঃ প্রতি তিনমাস অন্তর একবার সমিতি পরিদর্শন করা। অল্পক্ষণ স্থায়ী পরিদর্শনের দ্বারা সমিতির বিশেষ কোন উপকার সাধিত হয় না। যথেষ্ট সময় ধরে সমিতির কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করা উচিত এবং যাতে সময়মত সমিতির নথিপত্র হাত-নাগাদ (up-to-date) পাওয়া যায় সেজন্য সমিতি পরিদর্শন করা হবে এখবর পূর্ব্ব হতে সমিতিকে দেওয়া প্রয়োজন। সভ্যদের সাধারণ সভায় সকলের সঙ্গে মিলিত হওয়া ছাড়াও মাঝে মাঝে সভ্যদের বাড়ীতে গিয়ে, ব্যাক্তিগতভাবে খোজখবর নিয়ে কর্জ্জের টাকার কত বাকী তার অঙ্ক হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন এবং বকেয়া টাকা বা কিস্তি খেলাপের টাকা শীঘ্র পরিশোধের জন্য তাগিদ দেওয়া দরকার। সকলের বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্য সব সময়েই চেষ্টা করা উচিত। সমিতির কর্জ্জের দরখাস্ত সমিতি পরিদর্শনের সময়েই লেখা উচিত, মঞ্জুরীকৃত টাকা যাতে সঙ্গে সঙ্গে দাদন করা হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রখা উচিত। সমিতির কাজকর্ম্ম দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং গ্রামবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হিসাবে সমিতিকে গড়ে তুলতে হবে। মিলিত কর্ম্ম প্রচেষ্টায় সভ্যদের আগ্রহশীল করে তুলতে হবে এবং তার ফলে নূতন সভ্য ভর্ত্তির পথ সুগম হবে। যাতে তা সম্ভব হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামে সমবায়কে এমনভাবে আকর্ষনীয় করে গড়ে তুলতে হবে যাতে লোকেরা সমবায় আন্দোলনে যোগদান করে এবং সমবায় কর্ম্মপদ্ধতির উপর আস্থাশীল হয়। নষ্ট সমিতিগুলি যাতে পুনর্গঠিত হয় সে দিকেও তাকে চেষ্টা করতে হবে।

(২) হিসাবপত্র বই, খতিয়ান এবং অন্যান্য হিসাব পরীক্ষা —তত্ত্বাবধায়কের কর্ত্তব্য নগদ টাকা ঠিক আছে কিনা সে হিসাব দেখা। খরচের বই-এর সঙ্গে সমিতির অন্যান্য বইগুলি মিলিয়ে তাকে পরীক্ষা করতে হবে যে অন্যান্য খতিয়ানগুলিতে আদান প্রদানের হিসাব ঠিকমত লেখা হয়েছে কিনা, যে টাকা সমিতিতে নেওয়া বা সেখান থেকে দেওয়া হয়েছে তার রসীদ পরীক্ষা; সুদের হিসাব ঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা তা দেখা তত্ত্বাবধায়কের কর্ত্তব্য। ঋণের টাকা প্রকৃত লোককে সঠিক উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে কিনা, উপযুক্ত জামিন নেওয়া হয়েছে কিনা এবং ঋণের টাকা যে উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যেই খরচ করা হয়েছে কিনা, তা দেখাও তার কর্ত্তব্য। সভ্যদের সামর্থ্য ও সুবিধামত ঋণ পরিশোধের সময় যাতে নির্দ্ধারিত হয় তাও তাকে দেখতে হবে। পদাধিকারী পঞ্চায়েৎ বেনামী ঋণের টাকা যাতে লেন দেন না করেন তত্ত্বাবধায়ককে তাও পরীক্ষা করতে হবে। হিসাব পরীক্ষার সময় বা সমিতি পরিদর্শনের সময় যে সব দোষত্রুটি দেখতে পাওয়া যায় সেই সব ত্রুটি যদি সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করা সম্ভব হয় সেই চেষ্টা করতে হবে এবং আবশ্যক হলে সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যও তাকে তৈরী করতে হবে। কোন টাকার আদান প্রদান পঞ্চায়েৎ সভা বা বিশেষ ক্ষেত্রে সভ্যদিগের সাধারণ সভার অনুমোদন ছাড়া করা উচিত নয় এবং তা যাতে না হয় সে দিকে নজর রাখতে হবে। সভার কার্য্য-বিবরণী বইয়েতে যাতে সভার সিদ্ধান্তগুলি সহজ ও পরিষ্কার ভাষায় লেখা হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। যে খরচ বারবার করার প্রয়োজন হয়, সে সম্বন্ধে সভার সিদ্ধান্ত থাকা উচিত এবং তা যাতে গ্রহণ করা হয় সে দিকে তত্ত্বাবধায়কের দৃষ্টি থাকা উচিত। খরচের প্রারম্ভেই ঐ সম্বন্ধে সময়মত একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণই যথেষ্ট।

(৩) নগদ হিসাবের বিবরণ—হিসাব পরীক্ষার পর তত্ত্বাবধায়ক তার পরীদর্শন দিন পর্য্যন্ত জমা খরচের হিসাব (Cash account) তৈরী করবেন।

দোষত্রুটি সংশোধন—সাধারণতঃ দেখা যায় বিভিন্ন হিসাব পরীক্ষক ও পরিদর্শক সমিতির একই দোষত্রুটির কথা বারবার তাদের বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করেন। তার ফলে দোষত্রুটি দূরীকরণের চেষ্টা কমে যায়। হিসাব পরীক্ষক সাধারণতঃ সমস্ত দোষত্রুটির কথা তার বিবরণীতে লেখেন। সংক্ষিপ্তভাবে এই দোষত্রুটির বিবরণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে সংশোধন করানর উদ্দেশ্যে পাঠান হয়। সমিতিতে বসেই তত্ত্বাবধায়ক যে সব ত্রুটি সংশোধন করতে পারে,

তা তাকে করতে হবে ও প্রতিবিধানযোগ্য বিষয়গুলি বা অনুরূপ বিষয়, যা তখনই তার দ্বারা সংশোধিত হওয়ার নয়, সে সম্বন্ধে পরিচালক মণ্ডলীকে সংশোধনের জন্য অনুরোধ করতে হবে। পরবর্ত্তীকালে ঐ সকল দোষত্রুটির কতদূর সংশোধন হয়েছে তাও তাকে পরীক্ষা করতে হবে।

(৫) তদন্ত বিবরণী প্রস্তুতকরণ—তত্ত্বাবধায়ক তাঁর নিজের জেলায় প্রচলিত ভাষায় অথবা ইংরাজীতে তদন্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন। বিবরণীতে সমিতির উন্নতির জন্য পঞ্চায়েতদের যে পন্থা অবলম্বন করা উচিত তা সংক্ষিপ্তভাবে লেখা থাকবে। তদন্তের একটি নকল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে পাঠাতে হবে।

(৬) সাধারণ সভা আহ্বান—তত্ত্বাবধায়ক হিসাব পরীক্ষা অথবা হিসাব বই সংক্রান্ত বিষয়ে এবং গলদ দূর করবার জন্য বড় আকারের সমিতি ছাড়া অন্য সমিতিতে বেশী সময় ব্যয় করবেন না। সমিতির সভ্যগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনার দিকে তাঁর বেশী নজর দিতে হবে। সাধারণতঃ সমিতির সাধারণ সভ্যেরা সমিতি পরিচালনার দায়িত্ব পঞ্চায়েতের ওপর দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকে এবং নিজেরা সমিতির কাজে বিশেষ যত্ন নেয় না। তত্ত্বাবধায়কের উচিত সমিতির সভ্যগণ যাতে সমিতি পরিচালনার ব্যাপারে যত্নপর হয় সেজন্য চেষ্টা করা এবং সভ্যগণ সমবায় নীতি সম্বন্ধে যাতে অবহিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। এই কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে করতে হলে তিনি যে সমিতি পরিদর্শন করেন, সেই সমিতির সাধারণ সভা তার ডাকা উচিত হবে এবং সেই সভায় যাতে অধিকসংখ্যক সভ্য হাজির হয় সেজন্য চেষ্টা করতে হবে।

এই সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করা উচিত ঃ

(ক) পরিদর্শনের তারিখ পর্য্যন্ত নগদ হিসাব বই-এর আদান প্রদানগুলি পড়ে শোনান;

(খ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধের কিস্তি খেলাপগুলি এবং তার জন্য যে শাস্তির ব্যবস্থা আছে সেগুলি এই সভায় বুঝিয়ে দেওয়া;

(গ) ঐ সভায় কিস্তি-খেলাপীদের নামের তালিকা পাঠ করা;

(ঘ) উপস্থিত সভ্যগণের কাছে সমিতির পরিচালন সংক্রান্ত দোষত্রুটির কথা সতর্কতা ও নিপুণতার সঙ্গে এমনভাবে উপস্থাপিত করা যাতে পঞ্চায়েৎ সভ্যগণের মনে কোন রকম আঘাত না দিয়ে সমিতির বিষয়ে তাদের আরও উৎসাহিত করা যায়। পঞ্চায়েতের গুরুতর ত্রুটি-বিচ্যুতি সাধারণ সভ্যদের নজরে আনা আবশ্যক। যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি খুব গুরুতর হয় অথবা পঞ্চায়েৎ

ঐ ত্রুটি দূর করতে না চান তাহলে অবশ্যই এ বিষয়ে সাধারণ সভ্যগণকে এমন ভাবে প্রভাবিত করতে হবে যাতে কোন প্রকার বিরোধের সৃষ্টি না হয়। সব সময় সভ্যগণের মধ্যে সদ্ভাব যাতে বজায় থাকে তার জন্য তত্ত্বাবধায়ক চেষ্টা করবেন।

(ঙ) সমিতির কার্য্যকলাপ সংক্রান্ত চিঠি পত্রের উত্তর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, সমবায় ইউনিয়ন অথবা সমবায় বিভাগ যে সব চিঠি লিখেছে তার যথাযথ উত্তর দেওয়া হয়েছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সমবায় ইউনিয়নের নির্দ্দেশ পালন করা হয়েছে কিনা লক্ষ্য রাখতে হবে।

(চ) আদায়ের কাজ:—তত্ত্বাবধায়ক পঞ্চায়েৎগণকে বকেয়া টাকা আদায় করতে সাহায্য করবেন। তিনি নিজে টাকা লেনদেন করবেন না। কিন্তু দেখতে হবে যাতে আদায় করা টাকা তৎক্ষণাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়। সভ্যগণের খেলাপী টাকা আদায়ের জন্য তিনি মোকদ্দমা দাখিল করার এবং বকেয়া টাকা আদায় করার দরখাস্ত করতে সাহায্য করবেন।

(ছ) দেনা সম্পত্তির তালিকা পরীক্ষাকরণ:—প্রতি বছর সমিতির সভ্যগণের দেনা সম্পত্তির তালিকা পরীক্ষা করে তা যাতে সঠিক ভাবে লেখা থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং সাধারণ সভার কার্য্য বিবরণীর নকল সমবায় ইউনিয়ন অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে পাঠাবেন।

(জ) সমিতির বর্ত্তমান উপবিধির রক্ষণ:—নিয়ামক দ্বারা অনুমোদিত ও পরিদর্শন সময় পর্য্যন্ত সংশোধিত উপবিধির নকল সমবায় ইউনিয়ন অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যালয়ে যাতে রাখা হয় তত্ত্বাবধায়ক সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। নিম্নলিখিত কাজগুলি তত্ত্বাবধায়কের সাধারণ কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

রাজ্য সমবায় আন্দোলনে তত্ত্বাবধায়কের স্থান

সকল রাজ্যে তত্ত্বাবধায়কের অবস্থা সমান নয়। মাদ্রাজ, অন্ধ্র, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি কতকগুলি রাজ্যে কেন্দ্রীয় অর্থসরবরাহকারী সমিতি তত্ত্বাবধায়কের কর্ত্তব্য সম্পাদন করে। অন্যান্য রাজ্যে সরকারী অথবা বে-সরকারী সংস্থাগুলি ঐ দায়িত্ব পালন করে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম এবং

মহীশূর রাজ্যে সরকারী কর্ম্মচারীরা প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতির তত্ত্বাবধানে সাহায্য করে। পাঞ্জাব ও রাজস্থানে সমবায় বিভাগের উপর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আছে। উত্তর প্রদেশে রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন তত্ত্বাবধানের কাজ করেন। বোম্বাই রাজ্যেরও তত্ত্বাবধায়কগণ বিভাগীয় কর্ম্মচারী। কিন্তু তাদের কাজ রাজ্য তত্ত্বাবধায়ক পর্ষদ পরিচালনা করে। এই পর্ষদ সরকারী এবং বেসরকারী সভ্য নিয়ে গঠিত।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা তত্ত্বাবধান পছন্দ করে, কারণ গৃহীত ঋণের টাকা ঠিকমত খাটানো হয়েছে কিনা এবং ঠিকমত পরিশোধ হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক লক্ষ্য রাখতে পারে। কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ওপর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকা অনেকেই পছন্দ করেন না। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমবায় মনোভাব গড়ে ওঠার দিকে লক্ষ্য না রেখে আর্থিক লেনদেনের দিকেই লক্ষ্য রাখবে। উপরন্তু যে সকল সমিতির কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে কোন ধার থাকেনা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সেগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য নজর দেয়না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় বিভাগ দ্বারা তত্ত্বাবধান হওয়া আপত্তিজনক মনে করে, কারণ হিসাব পরীক্ষার কাজ আইনত ঐ বিভাগুলির দায়িত্ব, সেজন্য তাদের হিসাব পরীক্ষার বিবরণীতে তত্ত্বাবধানজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি যথাযথভাবে লেখা না থাকাই সম্ভব। সমবায় হচ্ছে গণআন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রসার জনগণের উপর নির্ভরশীল এবং সেজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মনে করে যে কেন্দ্রীয় অর্থসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া উচিত। অন্ধ্র এবং মাদ্রাজ রাজ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ দুই-তৃতীয়াংশ সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতিগুলির প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। ঐ প্রকার উন্নততর অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত এবং কোন রাজ্যে সমবায় আন্দোলনের উন্নতি অথবা প্রগতির সম্ভাবনা না দেখা গেলে রাজ্য সরকার সমিতি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অথবা সমবায় ইউনিয়নগুলির উপর ন্যস্ত নাও করতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা অনুরূপ কেন্দ্রীয় সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয়েও আত্মনির্ভরশীল সমিতিও থাকতে পারে যারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রভৃতির উপর নির্ভর করে না। এইরূপ সমিতিগুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর না থাকাই উচিত। তা থাকলে ঐ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এইরূপ ক্ষেত্রে সরকারের সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারীরা তত্ত্বাবধান করলে যথেষ্ট সুফল আশা করা যেতে পারে।

পরিদর্শন ঃ—

পরিদর্শনের দ্বারা সমবায় সমিতির আর্থিক অবস্থা এবং কার্য্যকলাপ পরীক্ষা ও অনুধাবন করা সম্ভবপর। ঘন ঘন পরিদর্শন হলে কার্য্যনির্ব্বাহ পদ্ধতি সংক্রান্ত দোষত্রুটি ধরা পড়ে এবং সমিতির কাজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে রচনা করা সম্ভব হয়।

১৯৫৪-৫৬ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমবায় আন্দোলন সংক্রান্ত পুস্তিকায় বলা হয়েছে যে, নিয়মতান্ত্রিক ও সুসংবদ্ধ পরিদর্শনের একই রকম প্রথা সকল রাজ্যে নেই। বিশেষ ধরনের সমবায় সমিতির কয়েকটিক্ষেত্রে যথাযথ পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকলেও প্রাথমিক সমিতিগুলির ক্ষেত্রে নিয়মিত বা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পরিদর্শনের ব্যবস্থা কোথাও নেই। পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে সমিতি ইচ্ছামত বেছে নেওয়া হয়। বর্ত্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতকগুলি সমিতির ব্যাপারে নিয়মিত পরিদর্শনের একক প্রথা চালু করেছেন। সে সমিতিগুলি হচ্ছে সেই সমস্ত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এবং শীর্ষ ব্যাঙ্ক, যারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হতে ঋণ গ্রহণ করে।

সমিতির পরিদর্শনকে সমিতির কর্ম্মধারার নিয়মিত তদন্ত, বোঝায়। শুধুমাত্র পরিদর্শনের জন্য পৃথক কর্ম্মচারীর ব্যবস্থা থাকা উচিত ও পরিদর্শনের জন্য নিয়মিত ও গঠনমূলক পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করাও প্রয়োজন।

হিসাব পরীক্ষা ঃ—

সমবায় সমিতি সমূহের হিসাব পরীক্ষা করা বা তার ব্যবস্থা করা নিয়ামকের বাধ্যতামূলক কর্ত্তব্য। নিয়ামক এই হিসাব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সমিতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারেন এবং সমিতি ঠিকমত কাজ করছে কিনা সে সম্বন্ধেও অবহিত হন। সমবায় আন্দোলনের সুষ্ঠু প্রসারের জন্য নিয়ামকের যে প্রশাসনিক দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য নিয়ামকের হিসাব পরীক্ষার দায়িত্ব থাকা উচিত। কতকগুলি রাজ্য যেমন উত্তর প্রদেশ বা পাঞ্জাব অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। স্যার ম্যালকম্ ডার্লিং ১৯৫৭ সালে হিসাব পরীক্ষার দায়িত্ব নিয়ামকের উপর থাকা উচিত এই মর্ম্মে সুপারিশ করতে গিয়ে বলেন—"হিসাব পরীক্ষার দায়িত্ব নিয়ামকের উপর থাকা উচিত নয় এই রকম ভ্রান্ত ধারণা কোন কোন ক্ষেত্রে করা হয়েছে। যেহেতু সমবায় বিভাগ সমিতির পরিচালনার ওপর লক্ষ্য রাখে সেজন্যই এই ধারনার উৎপত্তি। সমিতির

পঞ্চায়েৎ-সমিতিতে নিয়ামক এবং অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীরা সময় সময় মনোনীত হন এবং কতকগুলি রাজ্যে সমবায় বিভাগ কিছু কিছু সমিতির তত্ত্বাবধান করে থাকে। ক্রমশঃ সরকারী কর্ম্মচারীকে পঞ্চায়েৎ হতে সরিয়ে আনার নূতন নীতি গ্রহণ করায় এবং পল্লীঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির উপর তত্ত্বাবধানের কাজ দেওয়ার প্রস্তাব থাকায় একই ব্যক্তি হিসাব লেখা এবং হিসাব পরীক্ষা দুই কাজই করছে—এই সমালোচনার কোন ভিত্তি নেই। বেসরকারী সংস্থা দ্বারা নিপুণভাবে সমিতির পরিদর্শন এবং সমবায় বিভাগের ওপর হিসাব পরীক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করা বিশেষ বাঞ্ছনীয়।"

বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং উড়িষ্যা রাজ্যে বিভাগীয় হিসাব পরীক্ষক ছাড়াও বেসরকারী হিসাব পরীক্ষক এবং চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্টগণও সমবায় সমিতির হিসাব পরীক্ষা করে থাকে। এই সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মন্তব্য নিম্নে দেওয়া গেল :—

"সমবায় সমিতির ভাল হিসাব পরীক্ষা সমবায় নীতি এবং সমবায় সমিতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। বেসরকারী হিসাব পরীক্ষার অসুবিধা এই যে তারা কেবলমাত্র হিসাব পরীক্ষাই করে, সমিতি—সমবায় নীতিতে কাজ করছে কিনা সে সম্বন্ধে কিছু লক্ষ্য করে না। সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য নিয়ামক দায়ী, সেইজন্য তাঁর কর্ত্তব্য সম্পাদনে তাঁকে সাহায্য করা উচিত। বিভাগীয় হিসাব পরীক্ষকের উপর হিসাব পরীক্ষার সমস্ত দায়িত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটি বিশেষ জোর দিয়ে এ কথা বলেছে যে, বিভাগীয় হিসাব পরীক্ষার নীতিকে পরিবর্ত্তন করে বেসরকারী হিসাব পরীক্ষা চালু করা চলবে না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন শীর্ষ সমিতিগুলি, অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি এবং যে সকল সমিতি ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত, সেখানে এই নীতির ব্যতিক্রম করা চলবে এবং বেসরকারী হিসাব পরীক্ষা হবে বিভাগীয় হিসাব পরীক্ষার পরিপূরক। যদি কখনও কোন কোন বৃহদাকার সমিতির অত্যধিক এবং বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য বিশেষজ্ঞ হিসাব পরীক্ষকের নিয়োগ প্রয়োজন হয়, তখনও এই সমিতি সমূহে সরকারী বিভাগ পুনরায় হিসাব পরীক্ষা করবে।"

সাধারণতঃ সুপারিশ করা হয় যে একজন বিভাগীয় হিসাব পরীক্ষক বৎসরে সর্ব্বাধিক বৃহদাকার সমিতি ২০টি বা ক্ষুদ্রাকার ৪৫টি সমিতির হিসাব পরীক্ষা

করবে। কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক কর্মচারী না থাকায় ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যে এর চেয়ে বেশী সংখ্যক সমিতির হিসাব পরীক্ষার ভার একজন হিসাব পরীক্ষকের উপর দেওয়া হয়। বোম্বাইতে ৭২টি বৃহদাকার অথবা ৮৪টি ক্ষুদ্রাকার সমিতি, মধ্যপ্রদেশে ১০০টি কৃষি-ঋণদান সমিতি, পশ্চিম বাঙ্গলায় ৫০টি কৃষি-ঋণ এবং অন্যান্য সমিতি ২৯টি, রাজস্থানে ৫০টি কৃষি-ঋণ এবং ৩৪টি অন্যান্য সমিতির হিসাব পরীক্ষার ভার একজনের ভাগে সারা বৎসরে দেওয়া হয়। প্রায় অধিকাংশ রাজ্যেই ১৯৫৭—৫৮ সালে হিসাব পরীক্ষার কাজ বাকী থেকে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে দুই বছর ধরে বহু সমিতির হিসাব পরীক্ষা হয় নাই। উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারী না থাকায় এবং কিছু কিছু সমিতির খাতাপত্র না পাওয়ার ফলে এবং হিসাব পরীক্ষকদের ওপর অন্যান্য কাজের চাপ বেশী হওয়ায় এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। কর্মচারীর সংখ্যা উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করলে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে।

সমিতিগুলির সুষ্ঠু, নিপুণ এবং নিয়মিত হিসাব পরীক্ষার জন্য শাসন-বিভাগীয় কর্মচারী এবং হিসাব পরীক্ষা বিভাগীয় কর্মচারী পৃথকীকরণ প্রয়োজন। এই নীতি বেশীর ভাগ রাজ্যেই কাজে পরিণত করা হয়েছে।

হিসাব পরীক্ষা, তত্ত্বাবধান এবং পরিদর্শনের মধ্যে পার্থক্য :—

অধ্যাপক কুলকার্নি নিম্নে বর্ণিত ভাষায় হিসাব পরীক্ষা, পরিদর্শন এবং তত্ত্বাবধানের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে বলেছেন—"হিসাব পরীক্ষা এবং পরিদর্শনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্তটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের কার্য্যাবলীর ভিত্তিতে করা হয় এবং সেই হিসাবে মাসের পর মাস চলতি হিসাবে হতে পারে, বা একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে সম্পূর্ণও হতে পারে। পরিদর্শন করার কাজ একটু বিশেষ ধরণের। তা কখনও কখনও সমিতির বিপদজনক পরিস্থিতিতে ঋণদাতার অনুরোধে করা হয়। হিসাব পরীক্ষা, তত্ত্বাবধান এবং পরিদর্শনের পার্থক্য সময়ের উপর নির্ভর করে। তত্ত্বাবধান সব সময়ের জন্য, হিসাব পরীক্ষা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে এবং পরিদর্শন, আইন মাফিক কখনও কখনও করা হয়। হিসাব পরীক্ষক সমিতির হিসাব পরীক্ষা করে এবং সমিতির সঠিক আর্থিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে নিয়ামকের কাছে সেই অবস্থা জ্ঞাপন করে। কিন্তু পরিদর্শনের উদ্দেশ্য সাধারণভাবে বলতে গেলে সমিতির কাজ ভালভাবে চলছে

কিনা দেখা। পরিদর্শন এখন অর্থ-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কাজ বলে ধরা হয়েছে এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শকের কর্ত্তব্য হবে ঋণগ্রহীতার ঋণগ্রহণের ক্ষমতা আছে কিনা লক্ষ্য করা; যথোপযুক্ত জামিন দেওয়া হয়েছে কিনা এবং সভ্যগণ সমিতির প্রতি কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে কিনা, তা দেখা। সংক্ষেপে বলতে গেলে হিসাব পরীক্ষক নিয়ামকের, এবং পরিদর্শক সমবায় অর্থ সরবরাহ-কারী প্রতিষ্ঠানের শিকারী কুকুরের ন্যায়। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক, সমিতির সাহায্যকারী। এই তিনটি কথা,—হিসাব পরীক্ষা, পরিদর্শন এবং তত্ত্বাবধান সমবায় সাহিত্যে হাল্কাভাবে ব্যবহার করা হয়। ফলে সব সময়ে তাদের পার্থক্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায় না।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

ভারতের সমবায় শিক্ষা

সমবায় শিক্ষা কি তা সম্যক বোঝা একটু শক্ত ব্যাপার। সমবায়কে অনেকে শিল্প বিজ্ঞান বলে থাকেন। অতএব এ কাজে সভ্যদের পূর্ব্ব হতে কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার। ইংল্যাণ্ড ও জার্ম্মানীতে সমবায় আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয় নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে এবং সমবায় সমিতি তাদের সভ্যদের সমবায় বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার কাজে অগ্রণী হওয়ায় এই সমবায় শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। সভ্যদের মধ্যে সমবায় শিক্ষা প্রসারের জন্য সমিতিগুলি তাদের নীট মুনাফা থেকে কিছু অংশ এই উদ্দেশ্যে পৃথক করে রেখে দিত। নিরক্ষরতা ভারতের সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতিতে বিরাট বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে। গ্রামাঞ্চলে সমিতির সম্পাদকের কাজ করবার মত একজন শিক্ষিত লোক পাওয়াও কঠিন, সেজন্য অনেক সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা অন্য কোন ঐ ধরণের লোককে ঐ সমিতির কাজ চালাবার জন্য নিযুক্ত করা হয়। কালক্রমে সেই লোকই সমিতির সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে দাঁড়ায়। সমিতিতে হিসাব নিকাশ এবং তাদের কাজ পরীক্ষা করার কোন লোক না থাকায় নানা রকম অন্যায় ও নীতি বিরুদ্ধ কাজ সংগঠিত হয়ে থাকে, সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য সভ্যদের মধ্যে সমবায় শিক্ষার প্রসার প্রয়োজন। ভারতের সমবায় আন্দোলন পর্য্যবেক্ষণের জন্য যে সমস্ত কমিটি এ পর্য্যন্ত নিযুক্ত হয়েছে তারা সকলেই সমবায় শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করে। ১৯২৮ সালের রাজকীয় কৃষি-কমিশনও সমবায় শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একমত হয় এবং এই কমিটি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে যে সভ্যদের, সমবায় কি ও তার নীতি কি, সে সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ভারতের সমবায় আন্দোলনের অনগ্রসরতার প্রধান কারণ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়। যে তিনটি মূল নীতির উপর সমবায় প্রতিষ্ঠিত, সমবায় শিক্ষা যে তার অন্যতমরূপে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় স্বীকৃত হয়েছে, তা পূর্ব্বে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ব্বে কোন কোন রাজ্যে সমবায় শিক্ষার যে কিছু ব্যবস্থা ছিল তা সাধারণতঃ বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের জন্যই করা হয়েছিল। বিভাগীয় কর্ম্মচারী ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে এ সুযোগ অতি অল্পই ছিল, আবার কতকগুলি রাজ্যে সমবায় শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এই শিক্ষা ব্যবস্থার কোনরূপ পাঠ্য তালিকা বা

শিক্ষণ সমাপ্তির কোন নির্দ্দিষ্ট সময় একইভাবে সকলরাজ্যে নির্দ্ধারিত ছিল না। কোন কোন রাজ্যে শিক্ষাকাল ৩ মাস, আবার কোথাও ১২ মাস পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের জন্য কোন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা পূর্ব্বে ছিল না। সাধারণতঃ গেজেটেড কর্ম্মচারীদের শিক্ষা দেওয়া হত না। পল্লী-ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া ১৯৫১ সালে বিভিন্ন রাজ্যে সমবায় আন্দোলনের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে। অধিকাংশ রাজ্যেই কর্ম্মচারীদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত না থাকায় এবং শিক্ষিত কর্ম্মচারীর সংখ্যা অল্প থাকায় সমবায় কৃষি-ঋণের প্রসার সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯৫২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সর্ব্বভারতীয় প্রথায় সমবায় শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের জন্য পুণাতে সমবায় শিক্ষাদান কলেজে (Co-operative Training College) ৬ মাসের এবং মধ্যবর্ত্তী পর্য্যায়ের কর্ম্মচারীদের ১২ মাসের জন্য দুই রকমের শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত হয়। বিভাগীয় পরিদর্শক শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের মধ্যবর্ত্তী পর্য্যায়ে ফেলা হয়। উপরোক্ত ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত নয় বলে প্রতীয়মান হওয়ার ফলে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সমবায় শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সমবায় শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায় দপ্তর ও সমবায় সমিতির বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের শিক্ষার খরচ বাবদ ১০ লক্ষ টাকা সাহায্য বরাদ্দ করা হয়; কিন্তু তা মোট খরচের আংশিক সাহায্য মাত্র।

সমবায় শিক্ষা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটি :—

১৯৫৩ সালে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে সমবায় শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন ও খাদ্য-কৃষি-মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সমবায় শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়। যে সকল ব্যক্তি সমবায় বিভাগে অথবা বিভিন্ন রাজ্যের সমবায় সমিতিতে নিযুক্ত আছেন বা হবেন তাদের শিক্ষার পরিকল্পনা ও বিধি ব্যবস্থার ভার এই কমিটির ওপর দেওয়া হয়েছে। স্থির হয়, এই কমিটি উচ্চ এবং মাধ্যমিক পর্য্যায়ের সমবায় কর্ম্মচারীদের শিক্ষার বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কমিটি হিসাবে কাজ করবে। নিম্ন পর্য্যায়ের সমবায় কর্ম্মীদের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনার কাজও এই কমিটি করবে এবং সে ক্ষেত্রে কমিটি ভারত সরকারের

কমিটি হিসাবে কাজ করবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই উদ্দেশ্যে খরচের জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ভারত সরকার ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে সমবায় শিক্ষা বিষয়ক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি কেবলমাত্র বিবরণী দেওয়ার জন্য উপদেষ্টা কমিটিই নয়; তা কাজ করার জন্য একটি স্থায়ী কমিটি। এই কমিটি কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী এবং বেসরকারী ব্যক্তি নিয়ে গঠিত।

শিক্ষা ব্যবস্থা :—

সমবায় শিক্ষা ও শিক্ষণ পরিকল্পনা দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় :—

(১) সমবায় বিভাগ ও সমবায় সমিতিগুলির কর্ম্মচারীদের বিভিন্ন পর্য্যায়ে শিক্ষাদান।

(২) সমবায় সমিতির সভ্য এবং ভাবী সভ্যদের ও পঞ্চায়েৎ কমিটির সভ্যদের শিক্ষাদান।

প্রথমোক্ত শিক্ষাপদ্ধতি সমবায় শিক্ষা বিষয়ক কেন্দ্রীয় কমিটির উপর ন্যস্ত। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের শিক্ষার ভার দিল্লীস্থিত নিখিল ভারত সমবায় ইউনিয়ন, রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও জেলা সমবায় ইউনিয়ন প্রভৃতির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে ও তাদের নির্দ্দেশ দিয়ে এই পরিকল্পনার রূপায়ণে সাহায্য করে।

কর্ম্মচারী-শিক্ষা ও সমবায়-শিক্ষা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটি :—

কেন্দ্রীয় কমিটি সমবায় বিভাগ ও সমবায় সমিতির সর্বস্তরের কর্ম্মচারীদের শিক্ষার জন্য সুসমন্বিত একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে যারা শিক্ষা পাবে তাদের তিনটি পর্য্যায়ে ভাগ করা হয়েছে—উচ্চ, মাধ্যমিক ও নিম্ন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালে গ্রাম্য ঋণ, বিপণন প্রভৃতি সমিতির জন্য ৩০ হাজার প্রশাসনিক এবং বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল।

সমবায় শিক্ষা বিষয়ক কেন্দ্রীয় কমিটি সমবায় বিভাগীয় ও সমবায় সমিতির কর্ম্মচারীদের শিক্ষার জন্য পাঁচ দফা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, যথা :—

(১) উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের শিক্ষা ব্যবস্থা।

(২) মাধ্যমিক পর্য্যায়ের কর্ম্মচারীদের শিক্ষা ব্যবস্থা।

(৩) উন্নয়ন পরিকল্পনা সংস্থার কর্ম্মচারীর শিক্ষা ব্যবস্থা।

(৪) সমবায় বিপণন সমিতি এবং জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রভৃতির জন্য বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীর শিক্ষার ব্যবস্থা।

(৫) নিম্ন পর্য্যায়ের কর্ম্মচারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা।

(১) উচ্চপদস্থ সমবায় কর্ম্মচারীদের শিক্ষাব্যবস্থা :—

উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বল্‌তে যে সকল কর্ম্মচারী রাজ্যের সমবায় বিভাগের ব্যবস্থাপনার ও নির্দ্দেশনার কাজে নিযুক্ত থাকেন, যথা সহকারী নিয়ামক, উপনিয়ামক, জেলা হিসাব পরীক্ষক এবং প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপক (ম্যানেজার) প্রভৃতি। তাঁদের শিক্ষণ পুনা সমবায় কলেজে হয়ে থাকে। পাঠ্যক্রম ৬ মাসের, তার মধ্যে ৪ মাস পুঁথিগত শিক্ষণ এবং ২ মাস হাতে কলমে কাজ যেমন, সমিতি পরিদর্শন ইত্যাদি। প্রতি বছর ৮০ জন শিক্ষার্থীকে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার শেষে এই কলেজ হতে ৬০০ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে শিক্ষা দেওয়ার কথা ছিল।

(২) মাধ্যমিক পর্য্যায়ের সমবায় কর্ম্মচারীদের শিক্ষাব্যবস্থা :—

সমবায় পরিদর্শক, সমবায় সহকারী পরিদর্শক এবং সমবায় ব্যাঙ্কের সহকারী ব্যবস্থাপক এই মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এদের জন্য ৫টি আঞ্চলিক শিক্ষা কেন্দ্র নিম্নলিখিত স্থানে অবস্থিত ছিল :—

(ক) পশ্চিমাঞ্চলে——পুণা

(খ) দক্ষিণাঞ্চলে——মাদ্রাজ

(গ) পূর্ব্বাঞ্চলে——রাঁচি

(ঘ) উত্তরাঞ্চলে——মিরাট

(ঙ) মধ্য-অঞ্চলে——ইন্দোর।

এই আঞ্চলিক শিক্ষণকেন্দ্রের শিক্ষাকাল ১১ মাসের। তার মধ্যে সাড়ে ৬ মাস পুঁথিগত এবং সাড়ে ৪ মাস হাতে কলমে শিক্ষার জন্য ধার্য্য আছে। প্রত্যেক শিক্ষণকালে (৬ মাসে) প্রতিটি কেন্দ্র ৪০-৫০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেয়। মাদ্রাজ কেন্দ্রের জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হতে শিক্ষার্থী নেওয়া হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে পাঠ্যকালের শেষে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং

সকল শিক্ষার্থীকে সমবায় শিক্ষণের উচ্চ পর্য্যায়ের উপাধিপত্র (Higher Diploma in Co-operation) দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার শেষে প্রায় ১৬০০ শিক্ষার্থীকে এই ভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

(৩) উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্ম্মচারীদের শিক্ষাব্যবস্থা :—

মাধ্যমিক পর্য্যায়ের সাম্প্রসারনিক (Extension) কর্ম্মীদের শিক্ষাদানের জন্য ৮টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। যথা ;—

(ক) হায়দ্রাবাদ

(খ) গোপালপুর (উড়িষ্যা)

(গ) কোটা (রাজস্থান)

(ঘ) ভাবনগর (গুজরাট)

(ঙ) তিরুপাতি (অন্ধ্র প্রদেশ)

(চ) ধুরি (পাঞ্জাব)

(ছ) ফৈজাবাদ (উত্তর প্রদেশ)

(জ) কল্যাণী (পশ্চিমবঙ্গ)

তিরুপাতি ছাড়া আর সমস্ত জায়গাতে শিক্ষাকাল ১১ মাস। তিরুপাতিতে শিক্ষাকাল সাড়ে ৩ মাস। প্রতি দলে প্রায় ৫০ জন শিক্ষার্থী থাকে এবং প্রতি কেন্দ্রে এরূপ দুটি দলের এক সাথে শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৫৯ সাল পর্য্যন্ত ১৯৪৫ জন শিক্ষার্থী শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ৪০০০ কর্ম্মচারীদের শিক্ষা দেওয়া। ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই হতে মাধ্যমিক পর্য্যায়ের ৫টি আঞ্চলিক শিক্ষাকেন্দ্র ও সাম্প্রসারিক কর্ম্মীদের জন্য স্থাপিত ৮টি শিক্ষাকেন্দ্র একই পর্য্যায়ে রূপান্তরিত হয়েছে। এই ১৩টি শিক্ষা-কেন্দ্রের পরিচালন ভার কেন্দ্রীয় কমিটির হাত হতে জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের একটি বিশেষ কমিটির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

(৪) বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীদের শিক্ষা ব্যবস্থা :—

মাধ্যমিক পর্য্যায়ের প্রায় সমস্ত আঞ্চলিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে সমবায় বিপণন সম্বন্ধে শিক্ষার জন্য বিশেষ ধরনের পাঠ্যক্রম খোলা হয়েছে। পুনা, মাদ্রাজ এবং মিরাটের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে কর্ম্মরত কর্ম্মীদের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এই শিক্ষাকাল ৪ মাস। নবাগত কর্ম্মীদের জন্য অপর ২টি শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার

ব্যবস্থা আছে এবং এই শিক্ষাকাল ৬ মাস। ১৯৫৯ সাল পর্য্যন্ত সর্ব্বমোট ৬৯০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনাকালে আশা করা গিয়েছিল যে মোট ১২০০ জন বিপণন সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষদের শিক্ষা দেওয়া হবে। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাস থেকে মাদ্রাজ আঞ্চলিক শিক্ষা কেন্দ্রে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে।

(৫) নিম্ন পর্য্যায়ের কর্ম্মচারীদের শিক্ষা ব্যবস্থা :—

পূর্ব্ব বর্ণিত নিম্ন পর্য্যায়ের সমবায় কর্ম্মচারীগণ নিম্ন-পর্য্যায়ের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে শিক্ষালাভ করে থাকে। ১৯৬১ সালে সারা ভারতে এরূপ শিক্ষাকেন্দ্র ৬২টি ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বাংলাদেশে ৪টি শিক্ষাকেন্দ্র বডগুল, ঝাড়গ্রাম, উত্তরপাড়া ও কালিম্পংএ স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে উত্তরপাডার শিক্ষাকেন্দ্রটি তারও ২০ বৎসর আগে স্থাপিত হয়েছিল এবং এখানে সর্ব্ব পর্য্যায়ের কর্ম্মচারীদের শিক্ষা দেওয়া হত। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বিভাগীয় এবং বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলির শিক্ষার্থীদের জন্য একই ধরণের পাঠ্য বিষয় স্থির হয়েছে এবং এই শিক্ষাকালের নির্দ্দিষ্ট সময় সমস্ত কেন্দ্রগুলিতেই ৬ মাস। মাদ্রাজের শিক্ষা ব্যবস্থা কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। সেখানে সরকারী বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের এবং বেসরকারী সমবায় সমিতির কর্ম্মীদের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষাকেন্দ্র আছে। বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলি রাজ্য সরকার পরিচালনা করেন এবং অন্য কেন্দ্রগুলি স্বতন্ত্র সমবায় সমিতির পরিচালনায় থাকে এবং রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলির তত্ত্বাবধান করেন। বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের শিক্ষাকাল ১২ মাস এবং অন্যান্যদের ১১ মাস। মাদ্রাজ এবং অন্ধ্র প্রদেশ সর্ব্ব ভারতীয় নীতি অনুযায়ী পাঠ্য বিষয়গুলি গ্রহণ করে নাই। নিম্ন পর্য্যায়ের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে শিক্ষাকাল শেষ হওয়ার পর পরীক্ষা লওয়া হয় এবং কৃতী শিক্ষার্থীদের প্রসংশাপত্র দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে বৎসরে প্রায় ৭৫০০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ১৯৫৯ পর্য্যন্ত ২২ হাজারেরও বেশী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

২। সভ্যদের শিক্ষা ও সর্ব্বভারতীয় সমবায় ইউনিয়ন :

আমাদের দেশে সমবায় অন্দোলনের অকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ সভ্যদের মধ্যে সমবায় নীতি সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব। সেইজন্যই সভ্যগণের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে যথেষ্ট রয়েছে। সর্ব্ব ভারতীয় সমবায় ইউনিয়নের

(যার নাম পরবর্ত্তী কালে জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন হয়েছে) পৃষ্ঠপোষকতায় যে শিক্ষা পরিকল্পনা রচিত হয়েছে নিম্নে তা দেওয়া হল :—

(ক) প্রাথমিক সমিতির পরিচালকবর্গ, যথা—সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি ব্যক্তিদের সমবায় নীতি ও তার ব্যবহারিক রূপ, সমবায় আইন ও সমবায় নিয়ম (রুল), হিসাব রাখার পদ্ধতি ও সমিতির অন্যান্য কাজ চালানোর উপায় সম্বন্ধে এমন শিক্ষা দেওয়া, যাতে তারা নিজেরাই সমিতির অবস্থার পরিবর্ত্তন করে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

(খ) পঞ্চায়েৎ সভ্যদের তাদের কর্ত্তব্য ও সাধারণ সভ্যদের প্রতিনিধিরূপে করনীয় কাজগুলি সম্বন্ধে ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের প্রকৃত সমবায়ী মনোভাবাপন্ন করে তোলা। উপরন্তু সমিতির সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারে তাদের অবদান সম্বন্ধেও সজাগ করে তোলা।

(গ) সাধারণ সভ্য এবং ভাবী সভ্যদের সমবায়মূলক উন্নয়ন পরিকল্পনার সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া এবং সভ্যদের কর্ত্তব্য ও সমিতির উপর তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধেও সজাগ করে তোলা।

পরিকল্পনার রূপায়ণ :—

উপরোক্ত পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করবার জন্য প্রতি রাজ্যে একজন করে সমবায় উন্নয়ন কর্ম্মচারী আছেন। প্রতি জেলায়, যেখানে জেলা সমবায় ইউনিয়ন স্থাপিত হয়েছে সেখানে একজন করে জেলা সমবায় শিক্ষক আছেন। প্রতি জেলার কার্য্যক্রম, তত্ত্বাবধান ও নির্দ্দেশনার ভার অবশ্য রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন কর্ম্মচারীর উপর দেওয়া থাকে। জেলার সমবায় শিক্ষক জেলা সমবায় ইউনিয়নের নির্দ্দেশমত সভ্যদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রাথমিক সমিতির পঞ্চায়েতের অবৈতনিক পদাধীকারীদের জন্য বৎসরে ৫ সপ্তাহ থেকে ৬ সপ্তাহ স্থায়ী এমন দুইবার শিক্ষাক্রম সংগঠন করেন। পঞ্চায়েৎ সভ্যদের জন্য এক সপ্তাহব্যাপী ১০টি শিক্ষা শিবির ও সমিতির ভাবী সভ্যদের জন্য ৩০টি তিন দিন ব্যাপী পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে মাত্র ৭টি জেলায় এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৯৫৮-৫৯ সালে মোট ১৩৭টি জেলায় তা গ্রহণ করা হয়। সর্ব্বভারতীয় সমবায় ইউনিয়নের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত সরকার ১৯৬০ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে ৩১৮টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন যাতে প্রতি জেলায় একটি করে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং সেই রকম

ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। আশা করা হয়েছিল যে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ সরকারী ও বে-সরকারী কর্ম্মচারীকে শিক্ষা দেওয়া যাবে।

কেন্দ্রীয় সরকার সর্ব্ব ভারতীয় সমবায় ইউনিয়ন ও রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পরিদর্শন ও পরিচালন কাজে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের মাহিনা ও ভাতার খরচ বহন করেন। শিক্ষকদের মাহিনা ও ভাতার খচর, তাঁদের শিক্ষণ খরচ এবং পুস্তিকা প্রকাশের খরচও কেন্দ্রীয় সরকার বহন করে থাকেন। রাজ্য সরকার অফিস পরিচালক ও পঞ্চায়েৎগণকে প্রতিদিন শিক্ষাক্লাশে যোগ দেওয়ার জন্য ১৲ টাকা করে দৈনিক ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

ভারত সরকার কর্ত্তৃক ১৯৫৯-৬০ সালে ৭.৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। ভারতের মোট ৩৫৮টি জেলায় এই শিক্ষা প্রণালী চালু হলে সরকারী সাহায্য বাবত প্রায় ১২ লক্ষ টাকা দরকার হবে অনুমিত হয়।

জনগণের উৎসাহ বর্দ্ধনে পরিকল্পনাধীন ইউনিয়ন পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলির ভূমিকা

নূতন সমাজ উন্নয়নের কাজে সমবায়ের যে প্রধান ভূমিকা রয়েছে তা সার্থক করা যেতে পারে যদি জনগণ এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা হয়েছে :—

(১) **শিক্ষা শিবীর**—সমিতির সাধারণ সভ্য ও ভাবী সভ্যদের জন্য তিন দিনের যে পাঠক্রম নির্দ্ধারিত হয়েছে তাতে সমবায়ের নীতি ও ব্যবহারিকরূপ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীদের ভেতর পরস্পর আলোচনা দ্বারা শিক্ষালাভই ইহার রীতি।

(২) **সভা ও সম্মেলন**—সভা ছাড়া অন্যান্য অনেক সম্মেলন আহ্বান করে সেখানে সমবায় সমিতির প্রতিনিধি ও জনসাধারণকে আমন্ত্রন করে তাদের কাছে সমবায়ের আদর্শ প্রচার করা হয়।

(৩) **নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ পালন**—প্রতি বছর নভেম্বর মাসে এই উৎসব পালন করা হয়। সমবায় পতাকা উত্তোলন করে ও সমবায় সমিতির মাধ্যমে নানাপ্রকার গঠনমূলক কাজ করে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা হয় যাতে তারা সমবায় আন্দোলনে দলে দলে যোগদান করে এবং সমবায় সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করে।

(৪) **সাহিত্য**—সর্ব্বভারতীয় সমবায় ইউনিয়ন এবং ভারত সরকার সমবায় সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বই প্রকাশ করে সমিতির সভ্যদের তথ্যমূলক সংবাদ সরবরাহ করেন।

(৫) **চলচ্চিত্র ও প্রাচীর পত্রের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা**:—সরকার তরফ থেকে সমবায় বিষয়ে নানাপ্রকার শিক্ষামূলক চিত্র চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করা হয় এবং নানাবিধ প্রাচীরপত্র দ্বারাও সমবায় শিক্ষার প্রচার হয়ে থাকে।

সমাজ সেবার জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন—সর্ব্ব সেবা সংঘ, ভারত সেবক সমাজ। এমন কি যে সব রাজনৈতিক দল সমবায় সম্বন্ধে আগ্রহশীল তাদের এবং দেশের জনসাধারণকে সমবায় সম্বন্ধে আগ্রাহান্বিত করা উচিত এবং তারা যাতে দলে দলে সমবায়ে যোগদান করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রত্যেকেরই উচিত সামাজিক জীবনে দশের উন্নতির জন্য ও বৃহত্তর স্বার্থ সাধনে সমবায়ের আশ্রয় গ্রহণ করা। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ও দেশের যুবক দলকে সমবায় মন্ত্রে দীক্ষিত করার দায়িত্ব রয়েছে সমবায় আন্দোলনের এবং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার। সমবায় সম্বন্ধে জানা ও সমবায় শিক্ষা এক কথা নয়। কাজের মধ্য দিয়ে সমবায়কে গ্রহণ করাই প্রকৃত শিক্ষা। স্কুল, কলেজে সমবায় ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করে, স্কুল কলেজে বই-এর মাধ্যমে সমবায় বোঝান যায় এবং এর ব্যবহারিক রূপকে জানা যায়। এই বিষয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের ও প্রাধান্য দেওয়া দরকার। আশা করা যায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠ্য ধারাতেও অদূর ভবিষ্যতে সমবায় পৃথক একটি বিষয় হিসাবে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

শিক্ষাকেন্দ্রের পরিকল্পনা—

পুণায় সমবায় শিক্ষা কলেজে, ৫টি আঞ্চলিক শিক্ষাকেন্দ্র ও ৮টি উন্নয়ন ব্লক বিষয়ক কর্ম্মচারীর শিক্ষাকেন্দ্র যে যে, স্থানে স্থাপিত সেগুলি সেই সকল স্থানীয় কমিটির দ্বারা পরিচালিত হয়। সমবায় শিক্ষাবিষয়ক কেন্দ্রীয় কমিটির উপর এই শিক্ষা কেন্দ্রগুলির-নিয়ন্ত্রণভার ন্যস্ত ছিল। ১৯৬২ সালের জুলাই মাস হতে জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের বিশেষ কমিটির উপর এই নিয়ন্ত্রণভার ন্যস্ত হয়েছে।

পূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উচ্চ ও মধ্য পর্য্যায়ের শিক্ষাকেন্দ্র এবং বিপণন ও দীর্ঘ মেয়াদী ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা বিভাগের ব্যয় ভার বহন করতেন। ব্লক পর্য্যায়ের কর্ম্মচারীদের শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যয় ভার বহন করেন কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার নিম্ন পর্য্যায়ের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির আংশিক খরচ বহন করতেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনাধীন পাঠ্যধারাতে শিক্ষাকালীন শিক্ষার্থীদের ভাতা, বিনা মাহিনায় শিক্ষা, বিনাভাড়ায় শিক্ষাকেন্দ্রে থাকা, হাতে কলমে কাজ শেখার সময় যাতায়াতের খরচ, শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদানের সময় ও শিক্ষা শেষে ফিরিবার সময় যে রাহা খরচ হয়, সেই খরচ দেওয়া হয়।

গ্রাম সেবক ও গ্রামসেবিকার শিক্ষা :

জাতীয় উন্নয়ন সংস্থার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাজোন্নয়ণ ও পুনর্গঠন ব্যাপারে গ্রামসেবক ও সেবিকাদের শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাদের শিক্ষার ভেতর সমবায় সম্বন্ধেও যথেষ্ট শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে। সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্য হাতে কলমে কাজ, আলোচনা, ভাষণ ইত্যাদির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সমবায়ের প্রচার :

জনসাধারণের ভিতর সমবায়ের প্রচারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। কোন কোন রাজ্যে সরকারী ব্যবস্থা, আবার কোথাও কোথাও বেসরকারী ব্যবস্থা চালু আছে। মাদ্রাজে রাজ্য সমবায় ইউনিয়ণ ও বোম্বাইতে প্রাদেশিক সমবায় ইউনিয়ণ (এখন মহারাষ্ট্র সমবায় ইউনিয়ণ)—এরা মাদ্রাজ সমবায় পত্রিকা ও বোম্বাইতে ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করত। অন্ধ্র, হায়দ্রাবাদ, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও উড়িষ্যায় রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন দ্বারা সমবায় প্রত্রিকা প্রকাশ হয়ে থাকে। ত্রিবাঙ্কুর কোচিন ও মহীশূর রাজ্যে সমবায় ইউনিয়ন সমবায় পত্রিকা প্রকাশ করে। আসাম ও পেপসুতে সমবায় বিভাগের মাধ্যমে সমবায় প্রচার হয়ে থাকে।

সমবায় শিক্ষাবিষয়ক পর্য্যবেক্ষণ দলের সুপারিশ :

ভারত সরকার সমবায় শিক্ষা বিষয়ক পর্য্যবেক্ষণ দল (Study Team on Co-operative Training) গঠন করেন। এই দল ১৯৬১ সালে ভারত সরকারের নিকট একটি বিবরনী পেশ করেন। এই দল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন ও বহু সরকারী ও বেসরকারী সমবায় কর্ম্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বিবিধ সমস্যা সম্বন্ধেও বিশেষ অনুসন্ধান চালান। নিম্নে এই দলের কতকগুলি সুপারিশ দেওয়া গেল :—

(১) সমবায় শিক্ষাকে কলেজে শিক্ষার একটি অঙ্গ হিসাবে গণ্য করা উচিত।

(২) সমবায় শিক্ষার ভার সমবায় আন্দোলনকেই গ্রহণ করতে হবে।

(৩) একটি জাতীয় পর্ষদ গঠন দ্বারা সমবায় শিক্ষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়। সমবায় শিক্ষাবিষয়ক কেন্দ্রীয় কমিটির আবশ্যকতা আর থাকবে না।

(৪) সর্ব্বভারতীয় সমবায়িক ইউনিয়ন শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলিকে কার্য্যকরী করবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করবে।

(৫) নিম্ন পর্য্যায়ের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির সংখ্যা উক্ত বিবরণী পেশ করার সময় পর্য্যন্ত ৬২টি ছিল। সুপারিশে বলা হয় যে, এই সংখ্যা বাড়িয়ে ১২০টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। নিম্ন পর্য্যায়ের সরকারী কর্ম্মচারী, গ্রাম্য সমিতির কর্ম্মচারী ও পদাভিষিক্ত পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি ব্যক্তিদের শিক্ষা এই সব কেন্দ্রেই হবে।

(৬) মধ্য পর্য্যায়ের ১৩টি শিক্ষাকেন্দ্রের জায়গায় ১৫টি খুলতে হবে। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলি সমবায় শিক্ষা কলেজ নামে অভিহিত হবে। এই শিক্ষা-কেন্দ্রগুলির প্রশাসনিক ভার উপযুক্ত রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের ওপর ন্যস্ত থাকবে। যে সব রাজ্যে সমবায় ইউনিয়ন দুর্ব্বল সেখানে রাজ্য সরকারের ওপর শিক্ষাকেন্দ্রের ভার দেওয়া থাকবে। যে সব অঞ্চলে রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন গড়ে ওঠেনি, সেখানে রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করে, এই শিক্ষা প্রণালীকে সজাগ করে তুলতে হবে।

(৭) যে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নেই—যেমন, আই. এ. এস কর্ম্মচারী, সিভিল অফিসার, কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারী শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারী এবং ব্লক উন্নয়ন কর্ম্মচারী—প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সমবায় শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এই সব কর্ম্মচারীদের ক্ষেত্রে পর্য্যবেক্ষকদল সমবায় শিক্ষার কথা বলেছেন। সমবায় শিক্ষার উৎকর্ষের জন্য এবং গভেষণামূলক শিক্ষার জন্য সমবায় শিক্ষালয় গড়ে তোলার জন্য কমিটি সুপারিশ করেন।

(৮) সমবায় বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনের জন্য এবং গবেষণামূলক কাজের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার সুপারিশ করা হয়েছে। বিভাগীয় এবং সমবায় সমিতির পুরানো কর্ম্মীদের সমবায়ী মনোভাব গড়ে তোলার পাঠ্য ধারা থাকবে এবং সমবায় শিক্ষাকেন্দ্রগুলির কর্ম্মীদের জন্য সমবায় আন্দোলনের নূতন ধারা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার জন্য আবশ্যকীয় পাঠ্যধারা থাকবে।

উপরোক্ত সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য হাতে কলমে কাজ শেখার ও গবেষণা-কাজেরও ব্যবস্থা এই শিক্ষাকেন্দ্রে থাকবে।

(৯) রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন কর্ত্তৃক সমবায় সম্বন্ধে পত্রিকা ও বই প্রকাশ বাঞ্ছনীয় এবং উক্ত খরচের কিছু অংশ সরকারী সাহায্যের দ্বারা পূরণের সুপারিশ করা হয়। সমবায় সমিতিগুলির উপর নীট মুনাফার শতকরা ১ ভাগ কররূপে ধার্য্য করার ব্যবস্থা সম্বন্ধেও বলা হয়েছে।

(১০) উপরোক্ত উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করার জন্য সভ্যদের শিক্ষাব্যবস্থাকে মোটামুটি ৩ ভাগে ভাগ করা উচিত। সভ্য, ভাবী সভ্য ও অফিস পরিচালকবর্গ —এই তিন ভাগ। শিক্ষার ব্যবস্থা যাতে গ্রাম বা বাড়ী থেকে বেশী দূরে না হয়, সেজন্য একজন ভ্রাম্যমান শিক্ষক থাকবেন এবং তিনি তত্ত্বাবধায়ক ও উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্ম্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করেই স্থান নির্ব্বাচন করবেন। শিক্ষাকাল প্রত্যেক কেন্দ্রে এক-সপ্তাহকাল হবে। যে সব জেলায় গড়ে ৭০০ সমবায় সমিতি আছে, সেখানে ভবিষ্যতে ২।৩ বছরের মধ্যে কমপক্ষে ৪জন ভ্রাম্যমান শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত হবে বলে পর্য্যবেক্ষণদল সুপারিশ করেন। এর দ্বারা প্রচুর সংখ্যক সমবায়ীদের শিক্ষা দেওয়া যাবে।

(১১) শিক্ষকতা করবার কাজে উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা, সমবায় সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা ও গ্রামীণ কাজে দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি নিয়োগ করা উচিত। পর্যবেক্ষণদল সুপারিশ করেন যে, এমন ধরনের লোক শিক্ষাকাজে নিযুক্ত করতে হবে যারা নূতন নূতন চিন্তাধারা প্রবর্ত্তনে সক্ষম। এই সব কাজে অবসর প্রাপ্ত কর্ম্মীদের নিয়োগ সম্বন্ধে এই দল বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেছেন। উপযুক্ত ব্যক্তি এই কাজে যাতে ব্রতী হন এজন্য ঐ সব ব্যক্তিদের ভাতা, ঘর ভাড়া প্রভৃতি দেওয়ার সুপারিশও করা হয়েছে।

সরকার কর্ত্তৃক পর্য্যবেক্ষণদলের সুপারিশ গ্রহণ

১৯৬১ সালে অক্টোবর মাসে রাজ্য সমবায় মন্ত্রীদের এক সভায় পর্য্যবেক্ষণ দলের সুপারিশগুলি আলোচিত হয়। এই সভা পর্য্যবেক্ষণদলের সুপারিশগুলির সহিত মোটামুটি একমত হন। তাঁরা ঠিক করেন যে সমবায় শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব সমবায় প্রতিষ্ঠান সমূহের উপরই ন্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাধ্যমিক নিম্ন পর্য্যায়ের শিক্ষণকেন্দ্রগুলির পরিচালন ব্যবস্থা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের হাতে অর্পিত করা হোক্ বলে স্থির হয়। কিন্তু যে সমস্ত রাজ্যে সমবায় ইউনিয়ন

বেশ দৃঢ় নয়, সে সমস্ত রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষণকেন্দ্রগুলির পরিচালনার ভার জাতীয় ইউনিয়ন গ্রহণ করবেন। শিক্ষণকেন্দ্রগুলি পরিচালনার জন্য কেন্দ্রে ও রাজ্য সমূহে জাতীয় ও রাজ্য ইউনিয়নের অধীনে একটি করে বিশেষ কমিটি থাকবে এবং ঐ কমিটিগুলি শিক্ষণকেন্দ্রগুলি পরিচালনা করবেন। এই সকল কমিটির গঠন স্ব স্ব ক্ষেত্রে যথাক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার অনুমোদন করবেন।

সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং তদনুসারে ১৯৬২ সালের জুলাই মাস হতে সমবায় শিক্ষা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির (Central Committee for Co-oprative Training) বিলোপ সাধন করা হয়। বর্ত্তমানে কয়েকটি মাধ্যমিক শিক্ষণকেন্দ্রের পরিচালনা সুসংগঠিত রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের বিশেষ কমিটি গ্রহণ করেছেন। এই কেন্দ্রগুলি নিম্নলিখিত স্থানে অবস্থিত— মাদ্রাজ, পুনা, ভাবনগর ও গোপালপুর (উড়িষ্যা)। অন্যান্য ৯টি কেন্দ্র জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের বিশেষ কমিটি পরিচালনা করছেন। পশ্চিম বাঙ্গলায় অবস্থিত কল্যাণী মাধ্যমিক কেন্দ্রটির পরিচালনা জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন গ্রহণ করেছেন এবং ৮টি নিম্ন পর্য্যায়ের শিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে আছে। পরে ঐ নিম্ন পর্য্যায়ের শিক্ষণকেন্দ্রগুলির পরিচালনভার রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের বিশেষ কমিটির হাতে অর্পিত হবে।

শিক্ষণকেন্দ্রের পাঠ্যতালিকা

শিক্ষণকেন্দ্রের পাঠ্যতালিকার সময়োপযোগী করে পরিবর্ত্তনের জন্য একটি "ওয়াকিংগ্রুপ" বা কার্য্যবিশেষজ্ঞ সংস্থা ১৯৬২ সালে গঠন করা হয়। এই সংস্থা বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষণকেন্দ্র পরিদর্শন করে তাঁদের সুপারিশ ১৯৬৩ সালে দাখিল করেছেন এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষণ কেন্দ্রের পাঠ্যতালিকার পরিবর্ত্তন করা হচ্ছে। এই সংস্থার সুপারিশক্রমে মধ্য পর্য্যায়ের শিক্ষণকেন্দ্রগুলির শিক্ষণকাল ১১ মাসের পরিবর্ত্তে ৮ মাস করা হবে স্থির হয়েছে। উপরন্তু পাঠ্যতালিকা অনেক কম করা হয়েছে। হাতে কলমে শিক্ষণকাজ (Practical training) তিনমাস হবে স্থির হয়। তার মধ্যে দেড়মাস শিক্ষণকালের শেষ দেড়মাসের মধ্যে সন্নিবেশিত হবে। এই সময়টুকু শিক্ষার্থীরা কোন সমবায় সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে বা সমবায় বিভাগের কোন চর্ম্মচারীর সঙ্গে সংযুক্ত থেকে কাজ শিখ্‌বেন। পূর্ব্বে সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা (End-of-Course Examination) বাতিল করা হয়েছিল। তা পুনরায় প্রবর্ত্তন করার কথা ওয়াকিংগ্রুপ্‌ সুপারিশ করেন।

ত্রয়োবিংশতি পরিচ্ছেদ

সমবায় ও রাষ্ট্র

সমবায়ের মূল নীতি হচ্ছে আত্মনির্ভরতা। তাই আমাদের দেশে পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটির বিবরণী প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় সাহায্য করা উচিত কিনা এবং তার কোন প্রয়োজন আছে কিনা সে সম্বন্ধে অনেক যুক্তিতর্ক ও মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে সরকারী সাহায্য ছাড়াই সমবায় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানী ও ফ্রান্সে। সমবায় সংস্থা গড়ে ওঠার জন্য, সরকার থেকে আইনগত সুবিধাগুলি অথবা কতকগুলি সাহায্য যেমন, ষ্ট্যাম্প ফি, আয়কর প্রভৃতি থেকে মুক্তি বা অনুরূপ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার বহু পূর্ব্বেই এই সব দেশে সমবায় আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং সরকারী সাহায্যের জন্য তারা উৎসুক ছিল না। চিন্তা করে দেখতে গেলে দেখা যায় যে নীতিগত দিক দিয়ে সমবায়ে কোন প্রকার বাহিরের সাহায্য নেওয়া উচিত নয়; কারণ এখানে সভ্যরা একত্রিত হয়ে, পরস্পরের সহযোগিতায় নিজেরা নিজেদের সমস্যাগুলি দূর করবে। যেমন একটি ঋণদান সমিতিতে যাদের অর্থ আছে তারা আমানত হিসাবে সমিতিতে রাখবে এবং যাদের প্রয়োজন তারা সেই সঞ্চিত টাকা থেকে টাকা নিয়ে তাদের কাজ চালাবে। এইরূপে সমিতি গড়ে উঠবে ও তারা কাজ চালাবে। ভারতে সমবায় আন্দোলনে সরকারী সাহায্য যে একান্ত প্রয়োজন তা অনুমান করা সহজ, কারণ ভারতে জনগণের অধিকাংশই নিরক্ষর, অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর। কাজেই জনগণের জীবন যাত্রার মান বাড়াতে এবং অন্যান্য সমস্যাগুলির সমাধান করতে হলে সমবায়ের ভিত্তিই হল একমাত্র পথ। কিন্তু সমস্যা হল এই যে সমবায় সমিতি চালাতে হলে ব্যবসায় গত নীতির সঙ্গে পরিচিত থাকা ও ব্যবসায়ে দক্ষতা থাকা প্রয়োজন যা আমাদের জনগণের নেই, ফলে সমিতি গড়ে তুলে, তারা কিছুসংখ্যক চতুর লোকের কবলে পড়ে অথবা নিজেরা কাজকর্ম্ম ভালভাবে না জানার ফলে সমিতিকে সার্থক করে তুলতে পারে না। কাজেই সমবায়ের মাধ্যমে দেশের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিধান করতে হলে সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন।

একমাত্র সমবায়ের মাধ্যমে দেশের শান্তি ও স্থিতি বজায় রাখতে পারা যায় এবং সমাজে সর্ব্বহারার দলকে বাঁচতে সাহায্য করে, দেশ থেকে বিপ্লব দূর করতে

পারে। যদি একথা সত্য হয়, তবে রাষ্ট্রকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে হবে, যাতে সমবায় আন্দোলন সার্থক হয়ে উঠে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করতে পারে। বস্তুতঃ এই আন্দোলনকে প্রথম থেকেই সরকারী সাহায্য করা হচ্ছে এবং ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন শুরু হওয়ার পর সরকারী সাহায্য আরও অধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সাহায্য করা সম্বন্ধে যে সমস্ত বিরুদ্ধ মতবাদ আছে তা অস্বীকার করে সমীক্ষা কমিটি স্পষ্টভাবে এই কথাই বলেছেন যে, রাষ্ট্রের সাহায্য সমবায় আন্দোলনে অপরিহার্য্য এবং বিভিন্ন রকমের উপযুক্ত সরকারী সাহায্য এই আন্দোলনে স্থায়ীভাবে দরকার।

এখন এই নীতিই রাষ্ট্রীয় নীতিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারী সাহায্যের নামে এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোন রকম অবৈধ নিয়ন্ত্রণ না এসে পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখাই দরকার হয়ে পড়েছে। ১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংঘের এক কমিটিতে একটি প্রস্তাবে এ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল তা এখানে উদ্ধৃত করা হল :—

"সমবায়ের ক্ষেত্রে সরকারের প্রধান কাজ হল, সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করার জন্য সক্রিয় ভাবে সাহায্য করা এবং উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারী তরফ থেকে সমিতির উপর অযথা বিধি নিষেধ আরোপ করে সমিতির আত্মনির্ভরশীলতা ও স্থানীয় প্রচেষ্টা ব্যাহত করা চলবে না। উপরন্তু সরকারী তরফ থেকে এমন পারিপার্শ্বিক অবস্থা গড়ে তুলতে হবে যাতে সমবায় আন্দোলনের উন্নতি হয় এবং তা স্থায়ী হয়।"

সমবায় সমিতির বিভিন্ন আইন ও নিয়ম অনুসারে রেজিষ্ট্রার বা নিয়ামকের উপর তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন, হিসাব পরীক্ষা ইত্যাদির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং দরকার হলে অসৎ কর্ম্মীদের শাস্তি দেওয়া ও কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতাও নিয়ামককে দেওয়া হয়েছে। এই সব ক্ষমতাগুলির ভুল অর্থ করে অনেকে মনে করেন সমবায় আন্দোলনে সরকারী নিয়ন্ত্রণের মাত্রা অত্যধিক। কিন্তু এই ধারনা সত্য নয়; কারণ হিসাব পরীক্ষা, তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন প্রভৃতি কাজগুলিকে কখনই সরকারী নিয়ন্ত্রণ বলে গণ্য করা যায় না। আইনে লেখা যে শাস্তিমূলক বিধির ব্যবস্থা থাকে তার ব্যবহার অতি অল্পক্ষেত্রেই করা হয়ে থাকে।

সমীক্ষা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে রাষ্ট্রকে অধিকমাত্রায় সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে শেয়ার বা অংশগত

মূলধন যোগান দিতে হবে। সমবায় সমিতির আর্থিক দুর্ব্বলতা দূর করবার জন্য এবং একচেটিয়া স্বার্থের বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে যে একচেটিয়া স্বার্থ বর্তমান, তার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করার শক্তি যোগাবার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক শেয়ার যোগান, কারিগরি সাহায্যদান ও পরিচালনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী সমবায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ভারতের উদ্দেশ্য। কাজেই এটা অনস্বীকার্য্য যে রাষ্ট্রীয় সাহায্য ছাড়া বর্তমান অবস্থায় ভারতে সমবায় আন্দোলনের সফলতা অসম্ভব। সমীক্ষা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্র যে সমস্ত বিশেষ ধরণের সমবায় সমিতিগুলিতে অংশগ্রহণ করছে সেইসব সমিতির পরিচালকবর্গের মধ্যে যিনি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি স্বরূপ মনোনীত থাকবেন তিনি সমিতির সাধারণ দৈনন্দিন কার্য্যনির্ব্বাহ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবেন না। সরকারী প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রথা ক্রমশঃই কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সমবায় ঋণ সম্বন্ধে মেহেতা কমিটি (১৯৬০) সরকারী প্রতিনিধি মনোনয়নের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং সরকারও তা মেনে নেন।

বিভিন্ন ধরনের সরকারী সাহায্য

আইনগত বিধান—বিভিন্ন রাজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্য সরকার নানা ধরণের সমবায় আইন প্রনয়ণ বা প্রচলিত আইনের সংশোধন করেছেন। তাছাড়া কোন কোন রাজ্যে জমির আয়তন টুকরা টুকরা করে ছোট যাতে না করা যায় তার জন্য এবং মহাজনদের অত্যাচার দূর করার জন্যও আইন প্রনয়ণ করা হয়। যেমন ঋণ পরিশোধ সাহায্য আইন, মহাজনী আইন ইত্যাদি।

রাজস্ব নীতি—(১) সরকার সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আয়কর থেকে এবং মুনাফা ও ডিভিডেণ্ডের উপর যে কর ধার্য্য করা যায় তা থেকে মুক্তি দিয়ে থাকে।

(২) ষ্ট্যাম্প ডিউটি, সমিতির বা সভ্যদের সমিতির কাজের জন্য দলিল রেজিষ্ট্রারী করবার ফি প্রভৃতি হতেও অব্যাহতি দেন।

বিচার বিভাগীয় সুবিধা—(১) সমিতির শেয়ার অথবা তার উপর প্রাপ্য কোন অর্থ কোনক্রমেই কোর্ট হতে দায়াবদ্ধ বা বিক্রয় করা যাবে না।

(২) কতক কতক ক্ষেত্রে সমিতির দেনা সরকারী দেনা অপেক্ষা অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যেমন, সমিতির টাকা নিয়ে ফসল উৎপাদনক্ষেত্রে।

আর্থিক সুবিধাদান—(১) সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রচুর কর্ম্মচারী রাখা হয়েছে এবং সমবায় সংস্থাগুলির তত্ত্বাবধান ও পর্য্যবেক্ষণ—এই সব কাজ

বিভাগীয় কর্ম্মচারীদ্বারা বিনা খরচায় হয়ে থাকে। কতকগুলি রাজ্যে কিছু কিছু সমিতিকে হিসাব পরীক্ষার ফি হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

(২) ১৯৫৩-৫৪ সালে ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫·০৬ কোটি টাকা। সমীক্ষা কমিটির সুপারিশের ফলে এই ঋণের দাদনের পরিমাণ বছর বছর ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

(৩) বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য সরকার সমীক্ষা কমিটির সুপারিশের অনেক পূর্ব্ব থেকেই সে সব জায়গার সমবায় সমিতি হতে কিছু কিছু শেয়ার নিত। ১৯৫৩-৫৪ সালে বোম্বাই রাজ্য সবকার কর্ত্তৃক এরূপ মূলধন যোগানর মোট টাকার অঙ্ক ছিল প্রায় ১৭·৭৫ লক্ষ টাকা। সমীক্ষা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে সমবায়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক অংশ গ্রহণ, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫৮-৫৯ সালে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড, বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে সমবায় সমিতির শেয়ার কেনার জন্য ১·৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন।

অর্থ সাহায্য ও দান—সমিতি পরিচালনার খরচ, কৃষি-যন্ত্রপাতি ক্রয়ের খরচ, গুদাম ঘর নির্ম্মাণ ও কলকব্জা স্থাপনের খরচ প্রভৃতির জন্য সরকারী অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। গুদাম নির্ম্মাণ, ম্যানেজারদের মাহিনা বাবত উপরি উক্ত পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড ১৯৫৮-৫৯ সালে ৬৭ লক্ষ টাকা দিয়েছে।

গ্যারান্টি বা জামিনের আশ্বাস প্রদানঃ—কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক যে সব ঋণপত্র বাজারে ছাড়া হয় অনেক রাজ্য সরকার সেই সব ঋণপত্রের আসল ও সুদ দুইএর জন্যই গ্যারান্টি দিয়ে থাকে। কতক কতক রাজ্যের রাজ্য সরকার যে সব বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক টাকা দাদন করে তাদের ক্ষেত্রেও গ্যারান্টি দিয়ে থাকেন। শীর্ষ সমবায় ব্যাঙ্ক ও সমবায় তাঁত-শিল্পকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সব অর্থ ঋণ দেয় তার ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার গ্যারান্টি দিয়ে থাকেন।

অন্যান্য সাহায্য—(১) বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য সমিতির ধার দেওয়া। অনেক ক্ষেত্রে তাদের মাহিনা প্রভৃতি সরকার বহন করেন।

(২) বাস্তুহারা সমিতিগুলিকে নানা প্রকার সাহায্য সরকার দিয়ে থাকে। যেমন—পুনর্ব্বাসন কাজের জন্য জমি দান, অল্প মূল্যে বাড়ী ঘর তৈরীর মাল মশলা সরবরাহ ইত্যাদি।

(৩) কারিগরি শিক্ষার সুযোগ সমবায় সমিতিগুলিকে নানা ভাবে, দেওয়া হয়ে থাকে। রাজ্য সরকারের শিল্প বিভাগের বিভিন্ন বিভাগ থেকে বিশেষজ্ঞ কর্মচারী দ্বারা সমবায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদিগকে বিনা পয়সায় কাজ শেখানো হয়ে থাকে।

(৪) সরকারী খাস জমি, পুকুর প্রভৃতি বিলি করার সময় সমবায় সমিতির দাবীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

(৫) সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং ভারত সরকার বহু কমিটি গঠন করেছেন।

এই ভাবে সরকারী সাহায্য দিনের পর দিন সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে বেড়ে চলেছে। সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সেবামূলক কাজগুলির কথা, দেশের জনগণের ভিতর ক্রমশঃ ছড়িয়ে দেওয়ার পিছনেও রয়েছে যথেষ্ট সরকারী প্রচেষ্টা।

সমবায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইরূপ সরকারী সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে ততদিনই, যতদিন না দেশের লোক সমবায় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হচ্ছে এবং সমিতির প্রতি সভ্যদের দায়িত্ব ও সমিতির সভ্যদের প্রতি যে কর্ত্তব্য সেগুলিও ভাল ভাবে শিক্ষা করছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃ কমিয়ে আনতে হবে। এই আন্দোলন যখন যথেষ্ট শক্তিশালী হবে এবং সরকারী সাহায্য বা নির্দ্দেশ ইত্যাদি ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে চল্‌তে পারবে একমাত্র তখনই সমস্ত প্রকার সরকারী নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া সম্ভব হবে।

চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদ

পরিকল্পনা ও সমবায়

পরিকল্পনার অর্থ—

পরিকল্পনা বলতে বোঝায় কোন কিছু করার আগে সেটা কি ভাবে করলে ঠিক মত হবে তার ব্যবস্থা করা। আমরা যা উপার্জ্জন করি তা দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভাব মেটাতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের এই অভাব বা প্রয়োজন জিনিষটা এত বেশী যে সবগুলিকে মেটানো আমাদের সীমাবদ্ধ আয়ের দ্বারা সম্ভব হয় না। তাই আগে থেকে একটা পরিকল্পনা করে বিশেষ দরকারী বিষয়ের অভাব আগে মিটিয়ে অপেক্ষাকৃত কম দরকারের দিকে নজর দিতে হয়। তা' না হলে কম দরকারের ক্ষেত্রেই সব টাকা শেষ হয়ে যায় আর আসল দরকারের ক্ষেত্রে আর টাকা থাকে না। পরিকল্পনা করে খরচ করার তাই প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও ঠিক ঐ রকম অবস্থা হয়। বিভিন্ন ভাবে কর আদায় দ্বারা রাষ্ট্র আয় করে আর বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা ব্যয় করে। যেমন—নিরাপত্ত', আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি জন কল্যাণের কাজ। সমবায়মূলক সাধারণ তন্ত্রে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কল্যাণ রাষ্ট্রের নীতি হচ্ছে সর্ব্বাধিক লোকের কল্যাণ করা। আর সেই কারণে অর্থনৈতিক দিক হতে অবাধে নিজের খুশীমত ব্যবসা বাণিজ্য করার নীতি গ্রহণ করা চলে না, লোকের কল্যাণের জন্য সেটা ক্ষুণ্ণ করতে হয়। জন কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে তাই রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রয়োজনের খাতে ব্যয় বরাদ্দ করতে হয়। একনায়ক রাষ্ট্রে যথা, রাশিয়া, জার্ম্মাণী এবং ইটালীতে ঐ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সেখানে কোন ব্যক্তির আর্থিক প্রচেষ্টার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তি মালিকানা এবং সরকারী মালিকানা উভয়কেই স্বীকার করা হয়। এখানে নাগরিকদের সর্ব্বাধিক কল্যাণের জন্য দরকার হলে রাষ্ট্র ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তপেক্ষ করে থাকে। আমাদের সম্পদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ, জনসাধারণকে অবাধভাবে সেগুলি ব্যবহার করতে দিলে অপচয় হতে পারে। বেশী মুনাফার আশায় একই শৌখীন বস্তু প্রচুর উৎপন্ন হলে বাজারে চাহিদার তুলনায় যোগান বেশী হয়ে যায়। ফলে প্রচুর পরিমাণে ঐ জিনিস জমা পড়ে থাকে। তখন ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে বাধ্য হয় এবং তাদের কর্ম্মচারীরা বেকার হয়ে পড়ে। দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি ব্যাহত

হয়। এই অপচয় যাতে না হয়, এবং দেশের সম্পদের যাতে সদ্ব্যবহার হয়, সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র, কোন্ জিনিস কতটা উৎপন্ন করতে হবে তা ঠিক করে দেয়। কোন্ জিনিসের চাহিদা বাজারে কত এবং কতটা পরিমাণ সেটা উৎপন্ন করা যেতে পারে সেটা রাষ্ট্রকে জানতে হয়। শৌখীন জিনিসের উৎপাদন কমিয়ে জনসাধারণের বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদন বাড়াতে হয়। ব্যবসায়ীরা তখন শৌখীন জিনিস একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করতে বাধ্য হয়। কোন দেশের সমস্ত রকম অবস্থা বুঝে দেশের সীমাবদ্ধ সম্পদ বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে ব্যবহার করার নীতিকেই পরিকল্পনা বলা হয়। সকল প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দেশেই জনসাধারণের কল্যাণের জন্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ ব্যবসায় নীতির কুফল দূর করার জন্য কিছু না কিছু বিভিন্ন ধরনের আংশিক পরিকল্পনা দেখা যায়।

বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা ঃ—

নির্দ্দেশিত (Planning by direction) আর প্রবর্ত্তিত (planning by persuasion) এই দুই প্রকারের পরিকল্পনা হতে পারে। পরিকল্পিত অর্থনীতি সম্পন্ন একনায়ক রাষ্ট্রে নির্দ্দেশিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯১৭ সালের আন্দোলনের পর সর্ব্বপ্রথম রাশিয়াতেই রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা প্রচলিত হয়। জার্ম্মানীতে হিটলারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলে দ্রুত উন্নতি হয়। পরিকল্পিত অর্থনীতি সম্পন্ন একনায়ক রাষ্ট্রে উৎপাদন এবং ভোগের ব্যবস্থা আগে থেকে নির্দ্ধারিত থাকে। এরূপক্ষেত্রে রাষ্ট্রই একমাত্র অধিনায়ক। এখানে সাধারণ উৎপাদকের উৎপাদন বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন হাত নেই। সব রকম অর্থনৈতিক কাজকর্ম্ম রাষ্ট্রের দ্বারাই পরিচালিত হয়। আমাদের এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কিন্তু জলবায়ু, মাটি, কর্ষিত জমির পরিমাণ এবং সামাজিক জীবন প্রভৃতি সবই বিভিন্ন ধরনের। তাই এ ধরনের পরিকল্পনা এখানে খাটে না।

প্রবর্ত্তিত নামে আর এক ধরনের যে পরিকল্পনা ব্যবস্থা আছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেটা চলতে পারে। এরূপ রাষ্ট্রে মতামত প্রকাশের ক্ষমতা এবং ব্যাক্তিগত প্রারম্ভিক অধিকার সম্পূর্ণ ক্ষুন্ন করা হয় না। রাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত পরিকল্পনার উপকারিতা সম্বন্ধে তাদের ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হয় যাতে তারা ঐ পরিকল্পনা কাজে লাগাতে পারে বা ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে রাষ্ট্র কিছু কিছু সাহায্যও করে। যেমন, যদি চাষীরা একত্রিতভাবে তাদের জমি চাষ করতে রাজি হয় তাহলে সরকার চাষীদের

কম সুদে টাকা ধার দিয়ে অথবা ধার্য্য কর কম করে নিয়ে সাহায্য করতে পারেন। শিক্ষা দিয়ে প্রচার কার্য্য চালিয়ে, কোন কিছু প্রবর্তন করে এবং প্রদর্শন করিয়ে, পরিকল্পনার উপকারিতা সম্বন্ধে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাতে হবে আর সেই সংঙ্গে এই নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী যাতে তারা উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে হাত লাগায় সেই চেষ্টা করতে হবে। এক নায়ক রাষ্ট্রে জনসাধারণকে পরিকল্পনা গ্রহণে বাধ্য করা হয় কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণ পরিকল্পনার উপকারিতা বুঝে নিজেরাই রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা একটি সমাজ ব্যবস্থার মত। তাই এখানে প্রত্যেক নাগরিকই কিছু না কিছু অংশ গ্রহণ করতে পারে। এরূপ রাষ্ট্রে জনমত এবং জনগণের সহযোগিতাই প্রধান শক্তি। এখানে রাষ্ট্রের কোন বাধ্যতামূলক নীতি কাজ করে না, জনগণ স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে।

সমবায়ের সঙ্গে পরিকল্পনার সামঞ্জস্য: সমবায়ের সেখানে করণীয় কাজ কি?

পরিকল্পনায় রাষ্ট্রের কিছুটা নির্দেশ থাকা প্রয়োজন হয়। অনেক সময় সমবায়ের মধ্যে স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে কাজ করার নীতি থাকে বলে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সমবায়ের স্থান নেই বলা হয়। এ রকমও বলা যেতে পারে যে সমবায় কোন ক্রমেই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার অঙ্গ হতে পারে না, কারণ তাহলে তাতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ আসতে পারে। সমবায় পরিকল্পনা কমিটি এর উত্তরে বলেছেন—"আর্থিক পরিকল্পনার গণতান্ত্রিক রূপায়নে সমবায় বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। স্থানীয় সংস্থা হিসাবে সমবায় দুই রকম কাজ করতে পারে। সে একাধারে জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়ে জনমতকে অনুকূলে আনতে পারে এবং পরিকল্পনার কাজ সম্পন্ন করতে পারে। যে কোন পরিকল্পনার কাজেই রাষ্ট্র চায় জনসাধারণের কাছ থেকে একটা সহৃদয়তার ভাব পেতে। এই কাজে রাষ্ট্র ব্যক্তি বিশেষের পরিবর্তে কোন একটি বিশেষ অর্থনৈতিক সংস্থার কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেতে পারে। এই সংস্থা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়ে তাদের মধ্যে উৎসাহ জাগাতে পারে। সমবায় সমিতি সেইরূপ সংস্থার শ্রেষ্ঠ সংস্থা—কারণ সে তাদের সভ্যদের মধ্যে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে, পরিকল্পনাকে জনপ্রিয় করে, স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার

সৃষ্টি করে।” অতএব দেখা যায় সমবায়ের পক্ষে পরিকল্পনাতে যথাযোগ্য স্থান নেওয়ার কোন বাধা নেই। সমবায় আন্দোলনের উন্নতি করার জন্য রাষ্ট্রকে নেতৃত্ব করতে হবে, কারণ তা না হলে সমবায়ের উন্নতি দ্রুত গতিতে হবে না। কি ভাবে উপযুক্তভাবে সমবায়ের উন্নতি হতে পারে সে সম্বন্ধে জনগণকে শিক্ষা দিয়ে এবং সমবায়ের উন্নতির নানারকম সুযোগ সুবিধা করে দিয়ে রাষ্ট্র জনসাধারণের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতার ভাব এবং আত্মবিশ্বাস জাগাতে সাহায্য করে।

ভারতে পরিকল্পনার প্রয়োজন

ভারতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যে প্রয়োজন তা প্রথম ১৯৩৮ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বুঝতে পারে এবং তখনই শ্রীজহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির কাজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের পরই বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৩ সালে বম্বে পরিকল্পনা নামে একটি পরিকল্পনা ৮০ জন বৃহৎ শিল্পপতি দ্বারা গঠিত হয়েছিল। এই পরিকল্পনাকে গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করবার মত কোন ক্ষমতা এর পিছনে ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫০ সালে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়। ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো অনুন্নত এবং তা অনেক পিছনে পড়ে আছে। একদিকে আমাদের বৃহৎ জনবল যেমন আংশিকভাবে বা পূর্ণভাবে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে আছে অন্যদিকে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ তেমনই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এই প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। ভারতের লোকদের জীবন যাত্রার মান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নীচে। গ্রামের শিল্পগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে; জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে; শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুবই কম, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার সমস্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে, মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ২৬৫ টাকা এবং লোকের আয়ু গড়ে ৩২ বছর হয়েছে। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে দেশ বিভাগের কুফল—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মাল ও সেবার অসমবণ্টন। আর আয়, সম্পদ ও সুযোগের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য বিরাজ করছে। এই রকম অর্থ নৈতিক অবস্থার মধ্যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকার চুপ করে থাকতে পারে না।

“ভারত সরকার বুঝতে পেরেছেন যে অর্থনৈতিক অসঙ্গতি দূর না করলে দেশের কোন রকম উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়, তাই তারা সুষ্ঠু আথিক পরিকল্পনা

প্রণয়ন করে, কৃষির পুনর্গঠন, শিল্পোন্নয়ন, যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, ব্যাঙ্কিং, বিপণন, দেশী ও বিদেশী ব্যবস্থার স্থিতি সাধনের কাজে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা আরও উপলব্ধি করেছেন যে, ধনের সুসমবণ্টন করতে হবে। সমাজসংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করে দরিদ্রদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া এবং ঐরূপ ব্যবস্থা বর্ত্তমানে অপরিহার্য্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।" ভারত সরকার দ্বারা নিযুক্ত 'পরিকল্পনা কমিশন' ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি খসড়া প্রস্তুত করেন। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐ খসড়া লোক সভায় উপস্থাপিত করা হয়।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য—প্ল্যানিং কমিশনের কথায়—"পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হল যে, দেশে এমন অবস্থা আনতে হবে যাতে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়, আর স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই জীবন ধারণের ও উন্নতির পূর্ণ সুযোগ সুবিধা পায়।" প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এই রকম অনেকগুলি পরিকল্পনার মধ্যে একটি। ১৯৫০-৫১ সাল থেকে হিসাব করে দেখা গেছে যে ২৭ বছরের মধ্যে মাথাপিছু আয় দাঁড়াবে গড়ে দ্বিগুন বেশী। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয় শতকরা ১১ ভাগ বাড়বে বলে অনুমান করা হয়েছে। জনগণের কল্যানের জন্য সরকারী আর বেসরকারী প্রচেষ্টা পাশাপাশি কাজ করে চলবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য "অধিকতর উৎপাদন, পূর্ণ কর্ম্মসংস্থান, আর্থিক সাম্য এবং সামাজিক সুবিচার সুপ্রতিষ্ঠিত করা।"

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যৎ উন্নতি সাধন, এই উন্নতি করার জন্য সব চাইতে বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল কৃষির উপর। আমদানী বন্ধ করবার জন্য দেশের খাদ্য-শস্য উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল এবং বানিজ্যিক শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করে ও শিল্পগুলির উৎপাদনে সহায়তা করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কৃষি, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি করা আর সব কিছুর উৎপাদন বাড়ানো।

যানবাহন ও যোগাযোগের উন্নতির ক্ষেত্রে সমধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে প্রথম পরিকল্পনায় শিল্প প্রাসারের ভার বেসরকারী উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের উপর অনেকাংশে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে

২০৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, পরে পরিকল্পনার ব্যয় বাড়িয়ে ২৩৫৬ কোটি টাকা করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে জাতীয় আয় শতকরা ১৮ ভাগ বেড়েছিল; মথাপিছু আয় বেড়েছিল শতকরা ১১ ভাগ আর খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছিল শতকরা ২০ ভাগ। ৬০ লক্ষ একর বাড়তি জমিতেও সেচ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

দেশে প্রথম পরিকল্পনা কালে মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় তাদের কর্ম্মসংস্থান করা সম্ভব হয়নি। অর্থ বিনিয়োগ ক্ষেত্র বর্দ্ধিত না হওয়ায় নতুন নতুন কর্ম্মসৃষ্টি অতি অল্পই হয়েছিল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিনিয়োগ ও কর্ম্মসংস্থান বাড়ানোর দিকে বিশেষ জোর দিতে হবে বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় আয় এমন পরিমানে বাড়াতে হবে যাতে দেশের জীবনযাত্রার মান উপযুক্ত ভাবে উন্নত হয়, দেশের শিল্পক্ষেত্রে উন্নতি করার জন্য বড় বড় মূল এবং প্রধান শিল্পগুলির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ যাতে বাড়ে এবং লোকের উপার্জ্জন, ধনসম্পদ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাতে সমতা আসে সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে। প্রথম পরিকল্পনায় খরচ বাবত ১৯৬০ কোটি টাকা ধরা ছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেটা বাড়িয়ে ৪৮০০ কোটি টাকা করা হয়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায়ের স্থান

প্রথম পরিকল্পনায় সমবায়ের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন সরকারের সমস্ত বিভাগে এই নির্দ্দেশ পাঠান যে দেশে দালাল শ্রেণী বিলোপ করে সমবায় সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। অতি প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে রাষ্ট্রনীতিতে সমবায়কে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় সমবায়ের পথই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামের অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য সমবায়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্দ্দেশিত হয়। কৃষি-উৎপাদন, গ্রাম্য ও কুটির শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে সমবায় ব্যবস্থার পথ নির্দ্ধারিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই বাবত ৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। পল্লী-ঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গ্রাম্য ঋণ ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনায় ৩টি মূলনীতি আছে, যথা—

(১) রাষ্ট্রীয় অংশীদারীত্ব। প্রতিস্তরে এই অংশীদারীত্ব থাকবে—অর্থাৎ রাজ্য সরকারগুলির বিভিন্ন স্তরে সমবায় সমিতির অংশ গ্রহণ করা।

(২) সমবায় ঋণের সঙ্গে অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্য্যের সংযোগ সাধন—বিশেষ করে বিপণন ও প্রকরণ সমিতির সংযোগ রক্ষা করা।

(৩) শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা সমবায় সমিতিগুলি পরিচালনের ব্যবস্থা করা।

গ্রাম্য ঋণ ব্যবস্থার উন্নতির দায়িত্ব পড়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওপর এবং সমবায় বিপণন, প্রকরণ প্রভৃতি সমিতিগুলির উন্নতির দায়িত্ব ভারত সরকারের ওপর পড়ে। এই উদ্দেশ্যে "জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণাগার বোর্ড" ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে লোকসভার বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা গঠিত হয়। পণ্য সংরক্ষণাগার, সমবায় সমিতির গুদাম ঘর নির্ম্মাণ, বিক্রয়করণ প্রভৃতির কাজে নিযুক্ত সমবায় সমিতিগুলিব উন্নয়ন এবং রাষ্ট্র পণ্য সংরক্ষণ কর্পোরেশন ও বাজ্য পণ্য সংরক্ষণ কর্পোরেশনগুলিকে আথিক সাহায্য দান প্রভৃতি বিষয়ক কাজের ভার অর্পিত হয় এই বোর্ডের ওপর। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষে স্বল্প মেয়াদী কর্জ্জদাদনের লক্ষ্য ছিল ১৫০ কোটি টাকা এবং মধ্য মেয়াদী কর্জ্জ দাদনের লক্ষ্য ছিল ৫০ কোটি টাকা। এই দাদনে চাষীদের মোট ঋণ চাহিদার শতকরা ১৫ ভাগ মেটানো যাবে বলে ধরা হয়। সমন্বিত ঋণ পরিকল্পনা অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনা মোটামুটি দ্বিতীয় পরিকল্পনার পূর্ব্বানুবৃত্তি। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালীন ৩টি কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করেই এই তৃতীয় পরিকল্পনাটি রচিত হয়েছে। এই ৩টি কমিটি হচ্ছে:—শিল্প সমবায়ের ক্ষেত্রে একটি পর্যাবেক্ষকদল (রায়ান কমিটি), সমবায় চাষের ক্ষেত্রে একটি পর্য্যবেক্ষক দল (নিজলিঙ্গাপ্পা কমিটি) এবং সমবায় ঋণের ক্ষেত্রে একটি দল (মেহেতা কমিটি)। ভারত সরকার এই কমিটিগুলির প্রায় সব সুপারিশগুলিই গ্রহণ করেন। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫০০ কোটী টাকা স্বল্পমেয়াদী ও মধ্য মেয়াদী ঋণ এবং প্রায় ১৫০ কোটি টাকা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দাদনের প্রস্তাব হয়। গ্রামের জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ লোককে সমবায় আন্দোলনের মধ্যে আনতে হবে এবং প্রতি গ্রামে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবে এই হল তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য। ৩১৮টি পাইলট প্রজেক্ট কেন্দ্রে সমবায় চাষ সমিতি স্থাপন করা হবে। প্রতিকেন্দ্রে ১০টি করে যৌথচাষ সমিতি হবে। ৪০০০টি সমবায় ভাণ্ডার সমিতি স্থাপিত হবে। সারা ভারতে ২৩০০টি বিপণন কেন্দ্র আছে এবং আরও ২০০টি বিপণন কেন্দ্র স্থাপন করার কথা আছে তৃতীয় পরিকল্পনা কালে। ১৬টি

হিমঘর ছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে আরও ৩৩টি হিমঘর তৈরী করার প্রস্তাব হয়েছে। সমবায় চিনিকল ও অন্যান্য প্রকরণ সমিতি ৮৪০টি হওয়ার কথা হয়। সমবায়, বিপণন, চাষ, ভাণ্ডার, সেবাসমিতিগুলিতে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক অংশগত মূলধন বা শেয়ার গ্রহণের ও প্রস্তাব করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যেমন করা হয়েছিল ঠিক সেইরকম ভাবেই সমবায় সমিতিগুলিতে ঋণ ও দান প্রভৃতি ব্যবস্থাও তৃতীয় পরিকল্পনায় করা হয়। সমবায় শিক্ষণ ও শিক্ষার প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ

সমবায়, সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থা

'ক' বিভাগ

সমাজ উন্নয়নের অর্থ এবং অন্তর্নিহিত ভাব—সমাজ উন্নয়নকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। "এটা হল এমন কার্য্যক্রম যার উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণের উদ্যোগ ও সক্রিয় সহযোগিতায় দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথ সুগম করা।" আবার অনেকে বলেন, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা এমন একটি পরিকল্পনা যা কোন এক স্থানে বসবাসকারী, সাধারণ লোক সমষ্টির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা করে। দেশের খাদ্য-শস্যের উৎপাদন এবং কৃষি ও গ্রাম্য কুটীর শিল্পের উৎপাদন দ্রুত বাড়ানোই হচ্ছে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতিও এর উদ্দেশ্য। এই কারণে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনার একটি উদ্দেশ্য হল জনসাধারণের উদ্যোগের উপর আস্থা স্থাপন করা। আমাদের দেশের পল্লীঅঞ্চলে অবহেলিত প্রচুর জনশক্তিকে গঠনমূলক কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু যদি তারা মান্ধাতা আমলের উৎপাদন ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে থাকে বা জরাজীর্ণভাবে জীবন ধারণ করে, তাহলে তা কখনও সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থায় কাজ করতে হবে। এভাবেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশও উন্নতি লাভ করেছে এবং আমাদেরও পিছিয়ে থাকার কারণ নেই। উন্নততর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির উপায় জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন। সম্প্রসারণ কর্ম্মচারীদের উপর এ ভার ন্যস্ত আছে। গ্রাম্য লোকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং জীবন-ধারনের জন্য উন্নতর ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়াই হবে তাদের প্রাথমিক কাজ। কিছু কিছু সাহায্য বা সেবা যদি গ্রাম্য লোকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তবে এই শিক্ষা দেবার কাজ ফলপ্রসূ হতে পারে।

এই পরিকল্পনা আরম্ভ করার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। বৃটিশ রাজত্বে 'আইন ও শৃঙ্খলা' রক্ষাই ছিল সরকারের মূলমন্ত্র। জনমঙ্গলের ওপর সরকারের

মোটেই নজর ছিল না। শিক্ষা, সমবায়, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি সরকারী 'বিভাগ অবশ্য বৃটিশ রাজত্বের শেষভাগে খোলা হয়। কিন্তু তাও আবার মহকুমা পর্য্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে, সরকারকে জনসাধারণের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকতে হতো এবং তাতে সাধারণলোক সরকারকে স্বভাবত:ই সন্দেহের চোখে দেখত। স্বাধীনতার পর জন সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরাই শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। দেশের উন্নতির জন্য তাই সরকারী কর্ম্মচারী ও জনসাধারণের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের প্রয়োজন। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীরা যদি গ্রাম্যলোকদের সঙ্গে মিশতে না পারে, তা হলে তা সম্ভবপর নয় এবং সেজন্যই গ্রামের নিকটে সরকারী অফিস স্থাপনের প্রয়োজন। কিন্তু জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন সরকারী বিভাগে দেশের উন্নতির জন্য প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে কাজ করত। সকলের একই উদ্দেশ্য থাকা সত্বেও এ সব সরকারী বিভাগ কখনই যুগ্মভাবে কাজ করত না। বস্তুতপক্ষে পূর্ব্বে, গ্রাম্য জীবনকে সমগ্রভাবে কখনই বিচার করা হয়নি এবং কোন একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দলগত সংহতির সাহায্যে এদের উন্নতিরও কোন চেষ্টা হয় নি। কিন্তু এই সমন্বয়ের প্রয়োজন ১৯২৮ সালে রাজকীয় কৃষিকমিশন (Royal Cmmission on Agriculture) বুঝতে পেরেছিল। তাছাড়া স্বাধীনতার পর 'খাদ্য বাড়াও' আন্দোলন সম্পর্কিত অনুসন্ধান কমিটিও অনুরূপ সুপারিশ করেছে। প্রশাসনিক সমন্বয় সাধনই হচ্ছে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। গ্রাম পর্য্যায়ে তা' হচ্ছে একমাত্র সর্ব্বার্থসাধক প্রতিষ্ঠান। গ্রাম্য লোকদের সমস্যার সমাধানের কাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ কর্ম্মপদ্ধতির অসুবিধা এ ভাবে দূর করা হয়েছে। দলগত সংহতির প্রয়োজনে সমাজ উন্নয়ন অধিকারিক কে (B. D. O.) দলপতি করা হয়েছে এবং তার পরিচালনায় বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক বিভাগের কর্ম্মচারীরা ঐক্যবদ্ধভাবে গ্রামের সমস্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে।

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার আর একটি উদ্দেশ্য হল অন্যের সাহায্যে নিজেকে সাহায্য করা। সত্যিকারের উন্নতি সম্ভব তখনই যখন জনসাধারণ নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসবে। এই স্ব-প্রণোদিত উন্নতির চেষ্টাকে ফলপ্রসূ করার জন্য সরকার অবশ্য জনসাধারণকে কারিগরী ও আর্থিক সাহায্য করবে। জনসাধারণ নিজেরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করার উপযুক্ত হওয়ায় প্রত্যেক লোকের আত্মবিশ্বাস এবং সমগ্র সমাজের উদ্যোগের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর উপরও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র জলসেচ, জমি পুনরুদ্ধার, মাটি সংস্করণ, বনসম্পদ বাড়ান এবং পশুপালন ও মৎস্য চাষ ব্যবসার উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা এই সামগ্রিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। উন্নততর রাস্তা ঘাট তৈরী, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা, উন্নততর ঘর-বাড়ী তৈরী, শিক্ষার প্রসার, স্ত্রী ও শিশুমঙ্গলের ব্যবস্থা, গ্রাম্য, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি, যুব আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি ইত্যাদিও পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে।

গ্রাম, ব্লক ও জেলা পর্য্যায়ের বিভিন্ন জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পরিকল্পিত কার্য্যসূচী এই সামগ্রিক পরিকল্পনায় রূপ দেওয়া হয়।

পরিকল্পনার সূচনা—১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ৫২টি প্রোজেক্টে এই পরিকল্পনার কাজ গ্রহণ করা হয়। (প্রথমদিকে তিনটি ব্লক নিয়ে একটি প্রজেক্ট গঠিত হত)। প্রতি ব্লকের সীমানা সাধারণতঃ ১৫০ বর্গমাইল হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক ব্লকে ১০০ টি গ্রাম ও ৬০ থেকে ৭০ হাজার লোক বাস করে। উপজাতীয় ও পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রতি ব্লকে লোকসংখ্যা কম হয় (সাধারণতঃ ২৫,০০০)। আশা করা যায়, ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চল এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা—জাতীয় পর্য্যায়ে এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজ উন্নয়ন ও সমবায় দপ্তরের পরিচালনাধীন। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, কৃষি ও খাদ্য এবং সমাজ উন্নয়ন ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রীসহ একটি কেন্দ্রীয় কমিটি এর দেখাশোনা করে। এই কমিটি সর্ব্বোচ্চ পর্য্যায়ে এর কর্ম্মসূচী নির্দ্দেশ ও নীতি নির্দ্ধারণ করে।

রাজ্য পর্য্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ভার রাজ্যসরকারের উপর। সাধারণতঃ প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করে 'রাজ্য উন্নয়ন কমিটি' থাকে এবং পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ভার এর উপরই থাকে। মুখ্যমন্ত্রী এই কমিটির সভাপতি এবং উন্নয়ন কমিশনার এর সম্পাদক। উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী-এর সদস্য। পরিকল্পনার রূপায়নে কমিটি লক্ষ্য রাখেন।

জেলা পর্য্যায়ে, জেলাশাসক 'জেলা উন্নয়ন কমিটির' সভাপতি এবং জেলায় পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বেসরকারী প্রতিনিধি ছাড়াও সরকারী সকল উন্নয়ন বিভাগের জেলা পর্য্যায়ের কর্ম্মচারী এই কমিটির

সদস্য। এই জেলা কমিটি বিভিন্ন ব্লকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ব্লকের মধ্যে সরকারী সাহায্য বিনিয়োগ করে থাকে। পরিকল্পনার অগ্রগতির ওপর এই কমিটি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখে।

ব্লক পর্য্যায়ে পরিকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য আইন অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতিতে পঞ্চায়েৎ ও সমবায় সমিতির প্রতিনিধি একজন মহিলা প্রতিনিধি এবং উন্নত কৃষি চালু করেছে এমন কয়েক জন কৃষক ও সমাজ সেবী নিয়ে গঠিত 'ব্লক উন্নয়ন কমিটির' ওপর পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা থাকে। ব্লক হতে নির্ব্বাচিত রাজ্য সভা ও বিধান সভার সদস্য পদাধিকার বলে এই কমিটির সদস্য হন। একজন ব্লক উন্নয়ন অফিসার, একটি ব্লকের ভার প্রাপ্ত অফিসার। কৃষি, পশুপালন, কুটির শিল্প, সমবায় প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অফিসারদের নিয়ে গঠিত দলের ইনি দলপতি।

গ্রাম পর্য্যায়ে গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে আইন অনুমোদিত পঞ্চায়েৎ পরিকল্পনার কাজ গ্রহন করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কার্য্যকরী উপ-সমিতির মাধ্যমে কাজ করে থাকে। যুব সংঘ, কৃষক সভা এবং মহিলা সমিতির সদস্য এসব উপ-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। প্রতি ৫ থেকে ১৮টি গ্রামের জন্য 'গ্রামসেবক' নামে গ্রাম পর্য্যায়ের একজন কর্ম্মী থাকেন।

ব্লকের কর্ম্মীবৃন্দ: বর্ত্তমানে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ৫ বৎসরের কার্য্যক্রমে দুই পর্য্যায়ে কার্য্যকরী হয়। প্রথম পর্য্যায়ের কাজ হচ্ছে সুদূর প্রসারী উন্নতি সাধন। প্রথম পর্য্যায়ের শেষে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে আবার ৫ বৎসরের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ সুরু করা হয়। প্রথম পর্য্যায়ের কাজ সুরু করার আগে প্রত্যেক ব্লক আবার 'প্রাক সম্প্রসারণ' পর্য্যায়ে এক বৎসরের জন্য কাজ করে থাকে। এই পর্য্যায়ে শুধুমাত্র কৃষির উন্নতির উপর জোর দেওয়া হয়। প্রথম পর্য্যায়ের কাজের জন্য প্রত্যেক ব্লক ৫ বৎসরের জন্য ১২ লক্ষ টাকা এবং দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ৫ লক্ষ টাকা পায়। 'প্রাক সম্প্রসারণ' পর্য্যায়ে ১৮,০০০ টাকা মাত্র ব্যয়ের ব্যবস্থা থাকে।

প্রথম বা দ্বিতীয় পর্য্যায়ের প্রতি ব্লকে ১ জন করে উন্নয়ন অফিসার, ৮ জন সম্প্রসারণ অফিসার (কৃষি, সমবায়, পঞ্চায়েৎ, গ্রাম্য শিল্প, গ্রাম্য রাস্তা ঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য, সমাজ শিক্ষা, স্ত্রী ও শিশু শিক্ষা, পশু চিকিৎসার জন্য) থাকে। তাছাড়া ১০ জন গ্রামসেবক, ২ জন গ্রামসেবিকা এবং অন্যান্য কয়েকজন

কর্ম্মচারী থাকে। প্রথম পর্য্যায়ের ব্লকে উপরোক্ত কর্ম্মচারীগণ ব্যতীত আরো কয়েকজন কর্ম্মচারী থাকে। গ্রামসেবকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ—গ্রাম সেবকদের 'বহু-উদ্দেশ্যসাধক কর্ম্মচারী' বলা হয়। এদের মাধ্যমে গ্রাম্য জনসাধারণ ও ব্লকের অফিসারদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ব্লক উন্নয়ন অফিসার এদের সাধারণ কাজ এবং অন্যান্য কারিগরী কর্ম্মচারী এদের কারিগরি কাজ তদারক করেন। এদের কাজ কি তা এরূপ বলা হয়েছে :—

"গ্রাম্য লোকদের সমস্যা সম্পর্কে তাদের সচেতন করা; সুন্দরতর জীবন ধারণে তাহাদের অনুপ্রাণিত করা, নিজেদের চেষ্টায় নিজেরা কতটা উন্নত হতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া, নিজেদের সম্পদের পরিমাণ সম্পর্কে তাদের জ্ঞাত করা। বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনে সাহায্য করা এবং তাহাদের পরিকল্পনা রূপায়ণে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের দেয় সাহায্য ও সেবা তাদের কাছে যাতে পৌছায় তার জন্য তাদের সাহায্য করা।"

পরিকল্পনা কমিশনের মতে, গ্রাম সেবকদের কাজের মূল উদ্দেশ্য হলো :—

(১) উৎপাদন ক্ষেত্রে কৃষি ও পশুপালনের উন্নততর আধুনিক ব্যবস্থায় গ্রামবাসীদের শিক্ষা দেওয়া এবং জলসেচ প্রভৃতি উৎপাদনশীল গঠনমূলক কাজে তাদের সাহায্য করা।

(২) পঞ্চায়েৎ, সমবায়, সামাজিক ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রামবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করা। বিশেষতঃ উদ্দেশ্যমূলক কাজে নেতার পদ গ্রহণে স্থানীয় লোকদের অনুপ্রাণিত করা এবং সমষ্টিগত উন্নতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণে গ্রাম্য লোকদের মধ্যে উদ্দীপনা জাগানো এদের কাজ। তার ফলে গ্রাম্য জীবনের উন্নতির জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার সূত্রপাত হবে।

(৩) নিজেদের তথা সমাজের উন্নতির জন্য যুব সংঘ, মহিলা সংঘ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করবে।

(৪) গ্রাম্যলোক ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে প্রধান ও প্রয়োজনীয় মাধ্যম হিসাবে এরা কাজ করবে। কাজেই এরা বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানকে গ্রামবাসীর প্রয়োজন ও সমস্যার কথা জানায়।

(৫) গ্রাম্য লোকদের সেবক বা ভৃত্য হিসাবে এদের কাজ করতে হয়। প্রত্যেক গ্রামবাসীর উৎপাদন পরিকল্পনা রূপায়ণে কারিগরী সমস্যার সমাধানে

প্রকৃত উপায় উদ্ভাবনে এরা গ্রামবাসীদের সাহায্য করবে। এরা গ্রামবাসীদের বন্ধুভাবে পরিচালিত করবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয়—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাজেটের ৯৬·৫ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৫২·৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনায় নির্দ্দেশিত ৩০০টি সমাজ উন্নয়ন ব্লক ও ১,২০,০০০ গ্রাম নিয়ে ৮০০টি সম্প্রসারণ ব্লক স্থাপন করা হয়েছে।

‘খ’ বিভাগ

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমবায়ের স্থান ঃ—

উপরে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকের প্রকৃতি ও কার্য্যাবলী আমরা আলোচনা করেছি। কোনো স্থানের জন সম্পদ ও বস্তু-সম্পদের সম্ভবপর সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন এদের উদ্দেশ্য। একদিকে জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নততর জ্ঞান গ্রাম্য লোকদের ঘরে ঘরে পৌছে দিতে হবে। ব্লকের সম্প্রসারণ অফিসারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অত্যাবশ্যক সেবা, ঋণ প্রভৃতির দ্বারাই এ ব্যবস্থা সার্থক করে তুল্‌তে পারা যায়। অপর দিকে, নতুন জ্ঞান সংগ্রহ বা নতুন জীবনযাপনের আগ্রহকে সমগ্র সমাজের মধ্যে উদ্দীপিত করতে হবে। এ বিষয়ে গ্রাম্য লোকদেরই উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং আত্মনির্ভরের বিশ্বাস রাখার জন্য তাদের হাতে কলমে শিক্ষা দিতে হবে। নিজ নিজ উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করার জন্য সমবায়ে তাদের নিজেদেরই সমবায় সংস্থা গঠন করতে হবে। গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিকল্পনা কার্য্যকরী করাই হলো সমাজ উন্নয়নের মূল লক্ষ্য এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে গ্রাম্য উন্নতির সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হলো সমবায় ব্যবস্থা। দৃষ্টিভঙ্গী বা কার্য্য পদ্ধতিতে সমবায় সংস্থা গণতান্ত্রিক উপায় গ্রহণ করে। এই কারণেই পরিকল্পনা কমিশন সমাজ উন্নয়নের প্রতি পদক্ষেপে সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন। পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার জন্য গ্রাম্য লোকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে এবং পরিকল্পনা রূপায়ণেও স্থানীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান সাহায্য করতে পারে। এই ভাবে পরিকল্পনা স্বতঃ-প্রবৃত্ত ভাবেই কার্য্যকরী ও জনপ্রিয় হতে পারে।

সমাজ উন্নয়নে সমবায় সংস্থাকে নিম্নলিখিতভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে ঃ—

(১) সেবা অর্থাৎ সার্ভিস সমবায় সমিতি প্রভৃতি গ্রাম্য কৃষি-ঋণদান

সমিতির মাধ্যমে উৎপাদন উদ্দেশ্যে স্বল্প মেয়াদী ও মধ্য মেয়াদী ঋণ দেওয়া যেতে পারে। গ্রাম পর্য্যায়ে এই ধরনের গ্রাম্য কৃষি ঋণদান সমিতি স্থাপনের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) জমি-বন্ধকী সমবায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়া যেতে পারে।

(৩) বিপণন সমিতির মাধ্যমে শস্য বিক্রয় করা যেতে পারে।

(৪) শিল্প সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম্য ক্ষুদ্র শিল্পে নিয়োজিত কারিগরদের ঋণ, কাঁচামাল এবং উৎপাদনের উন্নততর ব্যবস্থা যোগান দেওয়া যেতে পারে এবং এই সমিতির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৫) উন্নততর কৃষি ব্যবস্থার জন্য সমবায় চাষ এবং সেচ সমবায় গঠন করা যেতে পারে।

(৬) ঠিকাদারদের পরিবর্তে শ্রম-সমবায় সমিতির মাধ্যমে গঠনমূলক কাজ করা যেতে পারে।

(৭) কোনো জায়গায় ব্যবসায়-বাণিজ্যও সমবায়ের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

(৮) পণ্য গুদামজাত করার এবং প্রস্তুত প্রক্রিয়ার সুবিধা সমবায়ের মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে।

(৯) গ্রাম্য জীবনের যে কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমবায়ের মাধ্যমে করা যেতে পারে। পারস্পরিক সাহায্য দ্বারা নিজেকে সাহায্য করার সুবিধা এভাবে পাওয়া যেতে পারে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমবায় বিভাগের কর্মীদের স্থান :

বোম্বাই সরকার সমবায় সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছেন যে সমবায়ের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা রূপায়ণে সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রার সম্পূর্ণ দায়ী থাক্‌বেন। আইনগত কর্ত্তব্য ছাড়াও সমবায় বিভাগের কর্মচারীরা সমবায় সমিতির সংগঠন এবং তদারকের কাজে সাহায্য করবেন। বিভিন্ন সমবায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাও কর্মচারীদের কর্ত্তব্য। যাতে কোনো সরকারী বিভাগের কাজ অন্য কোন সরকারী বিভাগের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হয় এবং খুব কম খরচায় বেশী ফল পাওয়া যায়, এই বিভাগের কর্মচারীদের তাও দেখতে হবে। এদের মনে রাখতে হবে যে, গণতান্ত্রিক

উপায়ে পল্লী পুনর্গঠনের প্রধান পথই হলো সমবায় ব্যবস্থা। সমবায়ের সাফল্য শুধু মাত্র তাদের উৎসাহ, প্রচেষ্টা এবং সমস্যার প্রতি উপযুক্ত মনোভাবের উপরই নির্ভর করে না। বিভিন্ন বেসরকারী নেতার বা সরকারী অভিজ্ঞ কারিগরী কর্মচারীর সাহায্যের উপরও বহুলাংশে নির্ভর করে। সেজন্য তাদের শুধু মাত্র জনসাধারণ এবং সহকর্মীদের সমবায় নীতি ও রীতি সম্পর্কে শিক্ষা দিলেই চলবে না—তাদের নিজেদের বিভিন্ন বিষয়ে অন্যদের নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গী এবং কার্য্য পদ্ধতির উন্নতি সাধন করতে হবে।

ব্লকের সমবায় সম্প্রসারণ অফিসার একজন বিশেষজ্ঞ এবং স্বভাবতঃই সমবায়ের ক্ষেত্রে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণকে তিনি সাহায্য করতে পারেন। সমবায়ের উদ্দেশ্য এবং তার উপকারিতা সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হবে। নিজের সীমানায় অবস্থিত বিভিন্ন সমবায় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাকে ভাবতে হবে এবং তার অধীনে বিভিন্ন সমবায় কর্মীর কাজ তদারক ও সাহায্য করাও তার কর্ত্তব্য। তাকে বিভিন্ন সমবায় সংস্থা পরিদর্শন করতে হবে এবং নতুন সমবায় সংস্থা গঠনে জনসাধারণকে প্রভাবান্বিত করতে হবে।

এ বিষয়ে কানাডার প্রফেসর, এ. এফ. লেড্‌ল (A. F. Laidlaw)র দৃষ্টি-ভঙ্গী স্মরণ করা যেতে পারে। কলম্বো পরিকল্পনা অনুযায়ী সমবায় শিক্ষার পরামর্শদাতা হিসাবে ভারতের সমবায় শিক্ষাবিষয়ক কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। সমবায়ের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ কাজ তিনি তার 'সমবায় আন্দোলনে সম্প্রসারণের কাজ' নামক ছোট বইতে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন।

"সম্প্রসারণ কাজ-এর অর্থ হচ্ছে সব রকমের সমবায়ের উদ্যমের প্রসার সাধন করা। বহুল পরিমাণে লোক সমবায়ের সুযোগ-সুবিধা যাতে গ্রহণ করতে পারে তার জন্য অধিকতর সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে। অন্যে যাতে সমবায়ের সুযোগ-সুবিধা পায়, সত্যিকারের সমবায় কর্মী তাই চায় এবং সেজন্য সে তার প্রসার কামনা করে। যেখানে সমবায় সমিতির প্রয়োজন, সেখানে সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন, সমবায় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা বাড়ানো এবং সর্ব্বোপরি সমবায় সমিতির নীতি নির্দ্ধারণের বাপ্যারে সভ্যদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং দায়িত্ব গ্রহণে তাদের উৎসাহিত করতে হবে।

প্রফেসর লেড্‌ল'র মতে অন্যান্য সম্প্রসারণ কাজের চেয়ে সমবায় সম্প্রসারণ কাজ অনেক বেশী কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন যে, কৃষিকার্য্যে উন্নততর কৃষি ব্যবস্থা গ্রহণে কৃষকগণকে রাজী করানো সহজ, কিন্তু সংঘবদ্ধ হয়ে সমবায় সমিতির সাফল্যের জন্য চেষ্টা সহজসাধ্য নয়। কেননা বাহ্যিক বস্তু নিয়ে হাতে কলমে কোনো কিছু বোঝান যেতে পারে এবং তাতে জনসাধারণও সাড়া দেয়। কিন্তু সমবায় সম্প্রসারণ কাজে প্রথম দিকে কতকগুলি দুরূহ জিনিস নিয়ে কাজ করতে হয়; তাই সমবায়ের সুবিধা খুব দ্রুত দেখানো সম্ভবপর নয়। এজন্য তার মতে সমবায় সম্প্রসারণ কাজে সফলতা লাভের জন্য দক্ষ ও উপযুক্ত কর্মীর প্রয়োজন। সমবায় আন্দোলনে নিয়োজিত সম্প্রসারণ কর্মীকে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত এবং হাতে কলমে কাজ করবার যোগ্য হতে হবে।

একজন সমবায় সম্প্রসারণ অফিসার কি ভাবে তার কর্ত্তব্য সম্পাদন করবেন, প্রঃ লেড্‌ল তা' বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, "সত্যিকারের সম্প্রসারণ কাজ করতে হলে যাদের সাহায্য করা দরকার, তাদের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। সেজন্য কখনও গ্রাম্য লোকদের সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ ভাবা উচিত নয়। তাদের শিক্ষিত করে তোলবার জন্য এসব গ্রাম্য লোকদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার যাচাই করা প্রয়োজন। একজন সাধারণ গ্রাম্য লোক বা কর্মী অশিক্ষিত হতে পারে বা প্রয়োজনীয় কতক বিষয়ে তাদের জ্ঞান না থাকতে পারে, কিন্তু তারা কখনো বোবা নয়। তথাকথিত শিক্ষিত লোকদের মত পাথিব জ্ঞান তাদের না থাকলেও বোঝবার মত যথেষ্ট জ্ঞান এদের আছে। এদের সঙ্গে মেলা-মেশা করলে এ কথা উপলব্ধি করা যায়।

সম্প্রসারণ কাজ আরম্ভ করার পূর্ব্বে অনেক যুবক জিজ্ঞাসা করে থাকে—"কোত্থেকে আরম্ভ করব? কি ভাবে আরম্ভ করব?" এর সব চেয়ে ভাল উত্তর হচ্ছে, গ্রাম্য লোকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করো। প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে ভিন্ন ভাবে পরিচয় করতে হবে, তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় যথেষ্ট সময় দিতে হবে। যতটা সম্ভব তাদের সমাজ ও সমস্যা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হবে। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন, মাঝে মাঝে গ্রামে যাওয়া এবং প্রচুর সময় নিয়ে গ্রাম্য লোকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। তাদের কাছে যেতে হবে, তাদের সঙ্গে থাকতে হবে অর্থাৎ তাদেরই একজন হতে হবে। বর্ত্তমান পরিবহনের যুগে (যখন প্রায় প্রত্যেক সরকারী অফিসারের জীপ্‌গাড়ী থাকে)

সরকারী কর্মচারীরা গ্রাম্য লোকদের ভাসা ভাসা ভাবে দেখে থাকে এবং কখনই তাদের সংস্পর্শে এসে তাদের জানবার প্রয়োজন বোধ করে না। সেজন্য পরিকল্পনা রূপায়ণে গ্রাম্য জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলবার জন্য সম্প্রসারণ অফিসারের কর্ত্তব্য তাদের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক স্থাপন করা। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অনেক সভার ব্যবস্থা সম্প্রসারণ অফিসারকে করতে হয়। ঠিকভাবে সভা করতে পারলে গণতান্ত্রিক নীতি ও উপায় সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর হয়।

সুদৃঢ় ও সুদূরপ্রসারী অন্দোলন তৈরী করতে জনসাধারণকে সাহায্য করতে হলে প্রঃ লেড্‌ল'র মতে একজন সমবায় সম্প্রসারণ অফিসারকে নিম্নলিখিত বিষয় মনে রাখতে হবে :—

(১) জনসাধারণ যে বিষয় তাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় মনে করবে সেই বিষয়েই সমবায়ের কাজ সুরু করতে হবে এবং এই নীতিই হবে সমবায় প্রথায় কাজ করার মূল সূত্র। নিজের বা অন্য সরকারী অফিসারের মতে প্রয়োজনীয় কাজ কখনও প্রথমে সুরু করতে নেই। জনসাধারণের সঙ্গে ভালভাবে মিশে এরা কি চায়, তা বুঝে কাজ করতে হবে।

(২) সন্দেহজনক বেশীসংখ্যক সদস্য নিয়ে সমবায় সংস্থা গঠন করার চেয়ে অল্পসংখ্যক বিশ্বাসযোগ্য সদস্য নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন করা অনেক ভাল। রচ্‌ডেলের অগ্রদূত সমিতি যখন কাজ সুরু করে, তখন তার সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২৮ জন। কিন্তু গোড়া থেকে প্রত্যেকেই ছিল প্রকৃত সমবায়ী।

(৩) সমবায়ের গুনাবলীর কথা ভাবী কোন সদস্যকে বাড়িয়ে না বলাই ভাল। সমবায় যাদুর মত কাজ করবে এরকম মনোভাব তাদের মধ্যে না জাগানই উচিত। (বরং এদের বুঝানো উচিত যে তারা অনেক কিছু করতে পারত অথচ করেনি। তারা নিজেরাই যদি অগ্রনী হয়ে একসঙ্গে কাজ করত, তাহলে তাদের অনেক সমস্যারই সমাধান হত)।

(৪) আবার কোনকিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যই যে শুধু সমবায়ের প্রয়োজন তাও নয়। উদাহরণস্বরূপ মহাজন বা দালাল প্রভৃতি লোকদের তাড়াবার জন্যই যে শুধু সমবায়ের প্রয়োজন তা নয়। নিজেদের জিনিস নিজেদের শক্তিতে নিজেরা করবে এই ইচ্ছা তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনীয় কাজ কোথায় এবং কি ভাবে তারা অবহেলা করে থাকে তা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। মরিস কলম্বিয়ান (Maurice Colombian) নামক একজন

সমবায় লেখক তাই বলেছেন যে সমবায় আন্দোলন সদস্যগণকে শুধুমাত্র ঋণদাতা মুনাফাকারীদের কাছ থেকে মুক্তি দেয় না, তাদের নিজেদের বদ্ অভ্যাস্ হতেও তাদের মুক্তি দেয়।

(৫) সমবায় সংগঠন সম্পর্কে কোন একটি নির্দিষ্ট ধারনা থাকা উচিত নয়। অবশ্য প্রত্যেক সমবায় সংস্থার একই মৌলিক নীতি রয়েছে। সমবায় সংস্থার প্রকৃতি বা সংগঠনপ্রনালী একই হতে পারে না। একস্থানে যেটা ভালো অন্য জায়গায় সেটা ভালো নাও হতে পারে। এক জায়গায় হয়ত কোন সমিতি ভাল কাজ করতে পারছেনা, কিন্তু অন্য জায়গায় খুব ভাল করা অসম্ভব নয়। কোন জায়গায় বৃহদাকার ঋণদান সমিতি ভাল কাজ করতে পারে আবার, অন্য জায়গায় ক্ষুদ্র ঋণদান সমিতিও ভাল কাজ করতে পারে। কোন জায়গায় সরাসরি ব্যক্তি সদস্য নিয়ে বিপণন সমিতি গঠিত হতে পারে। কিন্তু অন্য জায়গায় বিভিন্ন সমিতি নিয়ে গঠিত বিপণন সমিতি ভাল কাজ করতে পাবে। এভাবে সমবায় সমিতি নীতিগত ভাবে এক। কিন্তু রকমভেদে বিভিন্ন হতে বাধ্য।

(৬) সমবায় সমিতি কখনই সমস্যা সমাধানের শেষ পর্য্যায় নয়। সমবায় হচ্ছে কোন কিছু লাভ করার উপায় মাত্র। এ যেন একটা যন্ত্র বিশেষ। সমিতি এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়—সুন্দর জীবন, সুন্দর পারিবারিক জীবন এবং সুন্দর সমাজ কি ভাবে তৈরী করা যায়, তাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। বাহির থেকে কোনো সমবায় সমিতি ভাল মনে হতে পারে কিন্তু সুন্দর, উন্নত মানুষের পরিপ্রেক্ষিতে এর বিচার হওয়া উচিত।

পঞ্চায়েৎ ও সমবায়
'গ' বিভাগ

পঞ্চায়েতের অর্থ ও কার্য্যক্রম :—গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ (democratic decentralisation) কথাটি বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে পঞ্চায়েৎ, সমাজ উন্নয়ণ ব্লক প্রভৃতি জনসাধারণের নিকটতম প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতার হস্তান্তরিতকরণ'ই হচ্ছে সব চেয়ে জনপ্রিয় ব্যাখ্যা। এই ক্ষমতা প্রশাসনিক, সামাজিক, অসামরিক ও অর্থনৈতিক হতে পারে। কিন্তু পরিকল্পনা বলতে এমন একটি কেন্দ্রীয় ক্ষমতার কথা বোঝায় যাতে নিশ্চিত কিছুর উপায়ে নিশ্চিত কিছু করা যায় এবং যার সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট কোন সীমায় পৌছানো যায়। এই সব পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য প্রয়োজন কোন প্রতিষ্ঠানের। সরকারকে এজন্য আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করতে হয়। সেক্ষেত্রে সমগ্র

সমাজের উপর আমলাতন্ত্রের প্রভাব চিরস্থায়ী হবার সম্ভাবনা থাকে।' এই সম্ভাবনা দূর করতে বিকেন্দ্রীয়করণই হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। একদিকে রয়েছে গ্রাম পর্য্যায়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা, অপরদিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের উন্নতি। এদের বিপরিত ধর্ম্মী মনে হতে পারে; কিন্তু জাতীয় উন্নতিতে এদের দুটো অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। এ ভাবেই পাঞ্চায়েতের উৎপত্তি। বৃটিশ আমলের ইউনিয়ন বোর্ড বা জেলা বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন এখন থাকতে পারে না। গ্রাম্য লোকদের এবং সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভবপর সব কাজই নতুন ধরণের পঞ্চায়েৎ করবে। সমগ্র গ্রামের কৃষি, উদ্যান, সেচ প্রভৃতি বিষয়ের পরিকল্পনা তারা করতে পারে। জন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, তারা বলতে পারে-যে, কোথায় কয়টি পানীয় জলের কল বসাতে হবে। বাধ্যতামূলক শিশুশিক্ষার জন্য তারা স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে পারে। গ্রামের মধ্যে নাটক অভিনয় করার পরিকল্পনা তারা গ্রহণ করতে পারে এবং এই সকল কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করতে পারে। গ্রামে কি ধরনের কুটির শিল্পের উন্নতি হতে পারে, তারা তার পরিকল্পনা করতে পারে। এই সকল কাজ কয়েকজন লোক দ্বারা গঠিত কোন একটি প্রতিষ্ঠান করে উঠতে পারে না। এই কাজের জন্য ৫টি বা ৬টি কার্য্যকরী উপসমিতি থাকতে পারে। নির্ব্বাচিত সদস্যগণ ছাড়াও প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও উপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে বেসরকারী লোক বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য এই সমিতির কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজ উন্নয়ণ ও সমবায় বিভাগের মন্ত্রী শ্রী এস, কে, দে মহাশয়ের মতে পঞ্চায়েৎ হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা শুধুমাত্র কয়েকটি ল্যাম্পপোষ্ট বা কয়েকটি নর্দ্দমারই দেখাশুনা করবে না। যদি পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজে কোন স্বার্থ থাকে এবং যদি তা স্বায়ত্বশাসনের সত্যিকার প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলে সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কাজই পঞ্চায়েৎকে করতে হবে। ৪ থেকে ৫ জন সদস্য প্রতিষ্ঠানের দেখাশুনা করবে। তাছাড়া যারা কোনো একটি বা বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ তাদের প্রতিষ্ঠানে আনতে হবে। সেজন্যই উপসমিতির কথা চিন্তা করা হয়েছে। গ্রাম পর্য্যায়ের কিছু কিছু কাজ শুধুমাত্র এইসকল উপসমিতির মাধ্যমে করা যেতে পারে।

পঞ্চায়েৎ ও সমবায়ের মধ্যে সম্পর্ক—এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে—সে কথা প্রায়ই আলোচনা করা হয়। এদের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। মনে রাখতে

হবে যে, পঞ্চায়েৎ গ্রাম্য জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠান। সুতরাং সমাজ ব্যবস্থার কাজকর্ম এবং অর্থনৈতিক উন্নতি বিষয়ক সকল প্রকার গ্রামের কাজ থাকবে এই প্রতিষ্ঠানের উপর। এই কারণে আপাতঃদৃষ্টিতে পঞ্চায়েৎ সমবায়ের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রথমদিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ পঞ্চায়েৎ সহজে করতে পারে না। আর তাছাড়া ক্ষমতা বহির্ভূত বিভিন্ন কাজের ভার তার ওপর চাপানো উচিত নয়। এজন্য গ্রামের যথাযথ উন্নতি বা গ্রামের সবরকম কাজ দক্ষভাবে পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েৎ ও সমবায়ের কাজের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা থাকার প্রয়োজন আছে। পঞ্চায়েৎ শুধুমাত্র সামাজিক ও বেসামরিক কাজ করতে পারে এবং অর্থনৈতিক কাজের ভার সমবায়ের উপর ন্যস্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এই দুই প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্পূর্ণভাবে পৃথক হতে পারে। তাছাড়া এমন অনেক কাজ থাকতে পারে, যা এই দুই প্রতিষ্ঠানের কেউই গ্রহণ করতে পারে না, যেমন অনুর্ব্বর জমির দেখাশুনা এবং জমির পুনর্গঠন করা। এসব ক্ষেত্রে পঞ্চায়েৎ এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানের সদস্য দ্বারা গঠিত একটি যুগ্মসমিতির উপর এ ভার দেওয়া যেতে পারে।

আবার কেহ বলেন, প্রত্যেক গ্রামকে একটি একক অংশ হিসাবে দেখতে হবে। এজন্য গ্রাম পর্য্যায়ের প্রতিষ্ঠান যতদূর সম্ভব কমাতে হবে। পঞ্চায়েৎ ও সমবায় একই সঙ্গে কাজ করবে যাতে তারা একটি প্রতিষ্ঠান বলে মনে হয়। কিন্তু তার বিপদও রয়েছে। পঞ্চায়েতে রাজনৈতিক প্রভাব অবশ্যম্ভাবী এবং এই প্রভাব সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রচুর। তাছাড়া আর্থিক দিক থেকে দুর্ব্বল পঞ্চায়েৎ প্রয়োজনীয় তহবিলের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। সমবায় সমিতিতে রাজনীতির প্রবেশ খুবই ক্ষতিকর এবং তা নীতির দিক থেকেও কখনই গ্রহণীয় হতে পারে না। আবার পঞ্চায়েৎ থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ সমবায় সমিতির অংশীদার হিসাবে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণের কম। সুতরাং এই দুইটি প্রতিষ্ঠানকে একই পর্য্যায়ে ফেলা ঠিক হবে না। ইহাছাড়া অর্থনৈতিক কারণে সমবায়ের এলাকা পঞ্চায়েতের এলাকা থেকে বড় হতে পারে। এজন্যও এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে একই পর্য্যায়ে ফেলা ক্ষতিকর হতে পারে। এজন্য অনেকে মনে করেন যে, পঞ্চায়েৎ বা সমবায় সংস্থাকে স্বাধীনভাবে এবং সমন্বয়ের মধ্যে কাজ করতে হবে। পঞ্চায়েৎ কখনই সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক দিনের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। এই

দুই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, কর্ম্মাধ্যক্ষ, সম্পাদক নিয়ে গঠিত একটি উপদেষ্টা কমিটি এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধিতার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজ উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রীসভা দ্বারা গঠিত ওয়ার্কিংগ্রুপ্ বলেছেন :—

গ্রাম পর্য্যায়ে পঞ্চায়েৎ ও সমবায় প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলীর মধ্যে সীমানা নির্দ্দিষ্ট করার প্রয়োজনীয়তার কথা এখনই চিন্তা করা প্রয়োজন। পঞ্চায়েৎ প্রধানতঃ গ্রাম্যলোকদের দ্বারা গঠিত একটি প্রশাসনিক সংস্থা এবং গ্রামের সম্পদ আহরণের এবং কর চাপানোর ক্ষমতা এদের আছে। কিন্তু সমবায় একটি ব্যবসামূলক প্রতিষ্ঠান। তার আয় নির্ভর করে ব্যবসার উপর। কোনো কোনো কাজ, পঞ্চায়েৎ এবং কোনো কোনো কাজ সমবায় সংস্থা করতে পারে। তাছাড়া গ্রাম পর্য্যায়ের আরও অনেক কাজ আছে যা স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী এই দুই প্রতিষ্ঠানের যে কেহ করতে পারে। এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পূর্ণ সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং দুই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত যুগ্ম কমিটির মাধ্যমে তা সম্ভব হতে পারে। এই কমিটি শুধুমাত্র এই দুই প্রতিষ্ঠানের কাজেরই সমন্বয় সাধন করবে না; সময় সময় প্রয়োজন অনুসারে এই দুই প্রতিষ্ঠানের আর কি কাজ করা উচিত, সে সম্পর্কেও নির্দ্দেশ দিতে পারে।

ষট্‌বিংশতি পরিচ্ছেদ

সমবায় আন্দোলন পুনর্গঠনে রিজার্ভব্যাঙ্ক ও স্টেটব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার স্থান

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ১৯৩৪ সালে রিজার্ভব্যাঙ্ক আইন পাশ হওয়ার পর, ১৯৩৫ সালে এই ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে ইহার করণীয় সব কাজই করে এই ব্যাঙ্ক। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষি প্রধান অর্থনীতিতে এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটা কাজ রয়েছে। সেটা হচ্ছে, কৃষিঋণ সরবরাহের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৫৪ ধারায় একটি কৃষিঋণ বিভাগ স্থাপনের উল্লেখ রয়েছে। এই বিশেষ বিভাগের নিম্নলিখিত কাজ ধার্য্য হয় :—

(১) কৃষিঋণ সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যা পরীক্ষা ও সমাধান কল্পে বিশেষজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ ; (২) কৃষিঋণ ব্যাপারে রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ করা। ১৯৫৫ সালের সংশোধনী আইনে পল্লীঋণ ব্যাপারে একজন পৃথক ডেপুটি গভর্নরের পদ সৃষ্টি হয়েছে। এই বিভাগের প্রধান কর্মকর্ত্তা হিসেবে রয়েছেন 'চীফ্ অফিসার'। প্রথমে মাদ্রাজ, কলিকাতা বোম্বাই ও দিল্লীতে চারটি আঞ্চলিক অফিস স্থাপিত হয়। পরে আরও অফিস স্থাপিত হয়। এই অফিসগুলোর কাজ হচ্ছে, রাজ্য সরকার ও রাজ্যের সমবায় সমিতির মধ্যে যোগাযোগ রাখা। প্রধান প্রধান ঋণদান সমিতি পরিদর্শন করা ও বোম্বাইতে অবস্থিত প্রধান কার্য্যালয়ে বিভিন্ন রাজ্যেব সমবায় আন্দোলনের খবরাদি পরিবেশন করা।

সমবায় আন্দোলনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা—

১৯৪৯ সাল অবধি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিপদকালে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সাময়িক অর্থাভাব দূর করার জন্য তাদের প্রয়োজন মত ঋণ দিত। সমবায় আন্দোলন বা সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা উন্নয়নে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু করেনি। কিন্তু তারপর থেকে সমবায় আন্দোলনে এই ব্যাঙ্ক একটা বিরাট অংশ গ্রহণ করেছে। ১৯৪৯ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ হয়। কৃষিঋন ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকাকে সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা :—

(১) প্রাক্ স্বাধীনতা কাল (১৯৩৫-৪৭) ;

(২) স্বাধীনতা উত্তর কাল থেকে সমীক্ষা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ হওয়া অবধি সময় (১৯৪৭-১৯৫৪) ;

(৩) সমীক্ষা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে (১৯৫৪) আজ অবধি।

(১) প্রাক্ স্বাধীনতা কাল (১৯৩৫-৪৭)—

এই সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় আন্দোলনকে কি করে পুনর্গঠিত করা যায় তার উপায় বের করতে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য, ব্যাঙ্কের আওতার বাইরে ছিল বলে, পুনর্গঠনের কাজ সম্ভব হয়নি। তা' ছাড়া এই পুনর্গঠনের কাজে ব্যাঙ্ক তেমন গা দেয় নি। স্বাধীনতার পর সমবায় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের মূলে রয়েছে সরকারী নীতির পরিবর্তন। এই ব্যাঙ্ক প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহের সর্বোচ্চ ঋণের সীমা বেঁধে দিয়েছিল সত্য, কিন্তু ঋণের পরিমাণ মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। প্রথম কয়েক বছর শুধু রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কদের সাময়িক অর্থাভাব মোচনে প্রয়োজনীয় ঋণ দিয়েই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দায়িত্ব শেষ করত। অবশ্য ক্রমশঃ গ্রামাঞ্চলে চাষীদের সত্যিকারের উপকার করার জন্য প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলোকে অল্প সুদে ঋণদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে কৃষি ঋণ বিভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প সুদে শস্য বিপণন কল্পে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলোকে ঋণদানের পরিকল্পনা রচনা করে। ঋণের সুদ হচ্ছে, ব্যাঙ্কেব স্বাভাবিক সুদের চেয়েও কম। ১৯৪৪ সালে সাময়িক চাষাবাদ উদ্দেশ্যেও ঋণদানের ব্যবস্থা কবা হয়। এইসব ঋণের উপর সুদের হার ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক সুদ থেকে শতকরা ১৲ কম (১৯৪২ সালে) ছিল। আবার ১৯৪৬ সালে স্বাভাবিক সুদের হার বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এইসব ঋণের সুদও শতকরা ৷৹ আনা বাড়ানো হয়। ১৯৪৭ সালের মে' মাসে স্বাভাবিক সুদের হার বাড়িয়ে শতকরা ৫৲ টাকা করা সত্ত্বেও এইসব ঋণের ওপর শতকরা ২৲ টাকা সুদ নেওয়া হচ্ছে। এই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের ঋণের চাহিদা তেমন বাড়েনি। তার কারণ হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ও যুদ্ধোত্তরকালে সমবায় ব্যাঙ্কগুলোর এত উদ্বৃত্ত তহবিল ছিল যে, এরা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নি।

(২) স্বাধীনতা উত্তরকাল (১৯৪৭-১৯৫৪)—

এই সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় আন্দোলন, বিশেষ করে সমবায় ঋণদান আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। অবশ্য এই সক্রিয় অংশ গ্রহণের মূলে

রয়েছে, ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও ১৯৪৯ সালে ব্যাঙ্কের জাতীয়-করণ। কৃষিঋণ ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় উন্নত ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারে ব্যাঙ্কের ওপর একটা বিরাট দায়িত্ব অর্পিত হয়।

সর্বপ্রথম সমবায় ঋণদান আন্দোলন উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হচ্ছে, ১৯৪৯ সালে সমবায় ঋণদান আন্দোলন সমস্যা পরীক্ষা ও তার সমাধান কল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্য পল্লী ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ। তারপর ১৯৫১ সালে ব্যাঙ্কের করণীয় কাজের সুপারিশ করার জন্য একটি বে-সরকারী সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনের পরামর্শ অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃষি ঋণদান ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধন করে। সমবায় সমিতি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতির পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপনে কৃষিঋণ বিষয়ক "ষ্ট্যাণ্ডিং এড্ভাইসরী কমিটি" গঠন করে, ১৯৫১ সালে ও ১৯৫৬ সালে এই কমিটির পুনর্গঠন হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুঝতে পারেন যে, কৃষি ঋণদান পরিকল্পনা তেমন কার্য্যকরী করাও সমবায় সমিতির সম্ভব নয়; যদি ব্যাঙ্কের কর্মনীতি ও প্রচেষ্টা, বিভিন্ন রাজ্য সরকারদের সমবায় বিষয়ক নীতি ও প্রচেষ্টা একীভূত না হয়। কাজেই সমবায়ের প্রকৃতি বা আকৃতি ভারতের সর্বত্র সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাজেই সর্বাগ্রে যেখানে কেবল ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক ছিল না সেখানে, যথা, সৌরাষ্ট্র, পেপসু, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান ও মধ্য ভারতে ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ, মহীশূর ও হায়দ্রাবাদের রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলোকে পুনর্গঠন করা হয়। তবে, এসব প্রচেষ্টা হচ্ছে সাময়িক প্রচেষ্টা। সুতরাং দীর্ঘ মেয়াদী প্রচেষ্টার ও প্রয়োজন অনুভূত হয়। ১৯৫১ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা আহুত এক বে-সরকারী সম্মেলন ভারতের সর্বত্র সমবায় আন্দোলনের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করার প্রস্তাব করে এবং এই প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৫১ সালে নিখিল ভারত পল্লী ঋণ সমীক্ষা কমিটি নিযুক্ত হয় এবং ১৯৫৪ সালে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

(৩) সমীক্ষা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশকাল থেকে আজ অবধি (১৯৫৪ থেকে আজ অবধি)—

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার সমূহ সমীক্ষা কমিটির সমন্বিত কৃষিঋণ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর একটা বিরাট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, ঋণ, বিপণন, শস্য-সংরক্ষণ ও গুদামজাত-

করণ, সমবায় শিক্ষার ব্যবস্থা, পল্লী অঞ্চলে ব্যাঙ্কিংএর সুযোগ সুবিধার প্রসার প্রভৃতি বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সংক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে বলা হয়। কাজেই এসব কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য ১৯৫৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংশোধনী আইনে তৃতীয় গভর্ণরের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ভারত সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক রাজ্য সরকারদের সহযোগে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায় আন্দোলন উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন কার্য্য সূচী রচনায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কএর বিশেষ অবদান রয়েছে।

স্বল্প-মেয়াদী ঋণদানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্থান—

স্বল্প-মেয়াদী ঋণদানের ব্যবস্থা—প্রথমাবস্থায় রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কদের ঋণদানের ব্যবস্থা বেশ কঠোর ছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণের পুরোপুরি ঋণ দেওয়ার তারিখ থেকে ৯ মাসের ভেতর অথবা ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যেটা আগে আসবে তার মধ্যে দিতে হ'ত। তা' ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্থিরীকৃত সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ মাত্র একবারই পাওয়া যেত। তারপর ১৯৫১ সালের সংশোধনী আইনে ঋণ-পরিশোধের সময় ৯ মাস থেকে ১৫ মাসে বাড়ানো হয় এবং কোনও সমবায় বৎসরে সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নিয়ামকের অনুমোদন ক্রমে ঠিক করা হয়। সর্বোচ্চ ঋণ-গ্রহণের সময়ের মধ্যে ঋণী-ব্যাঙ্ক যতবার খুসী ঋণ নিতে ও পরিশোধ করতে পারে। তবে বকেয়া ঋণের পরিমাণ সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণের বেশী কখনো হ'বে না। সর্বোচ্চ ঋণের মধ্যে সীমাবদ্ধ যে কোন ঋণ গ্রহণ পৃথক ঋণ হিসেবে গণ্য হ'বে এবং পুরোপুরি ১২ মাস এদের মেয়াদ থাকবে। এই ঋণের উপর রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কদের শতকরা ২৲ সুদ দিতে হয়। সাধারণ ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের জন্য ঋণ গ্রহণ করলে, সুবিধে হারে সুদ দেওয়ার সুযোগ লাভ করা যায় না। এমন কি সমবায় চিনির কারখানার জন্য ঋণ গ্রহণ করলেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক সুদের হার অর্থাৎ শতকরা ৪৲ দিতে হ'বে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ১৭(২)(ক), ১৭(২)(খ), ১৭(২)(খখ), ১৭(৪)(গ), ১৭(৪)(ঘ) ধারায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্বল্প মেয়াদী ঋণদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৫৩ সালের সংশোধনী আইনের ১৭(২)(খখ) ধারায় ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকে ঋণদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

কি কি উদ্দেশ্যে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেওয়া হয়?

স্বল্প-মেয়াদী ঋণ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে :—

প্রথমে (১) সাময়িক চাষাবাদ বা (২) শস্য বিপণন উদ্দেশ্যেই স্বল্প-মেয়াদী ঋণ দেওয়া হ'ত। কিন্তু ১৯৫৩ সালের সংশোধনী আইনে ঋণদান ক্ষেত্রের পরিধি অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যথা (৩) কৃষি সম্পর্কিত যে কোন উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া যেতে পারে। কাজেই দুগ্ধ সমবায়, মিশ্র সমবায় চাষ বা ধান ভাঙ্গা, তুলা তৈরী সম্পর্কিত সমিতিকে ঋণ দেওয়ার জন্য রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ পেতে পারে। তারপর, (৪) পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, উৎপাদন ও বিপণন কাজের জন্য ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকে ঋণ দেওয়ার জন্য রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক বা রাজ্য আর্থিক কর্পোরেশন ঋণ পেতে পারে। অবশ্য এ ধরনেব ঋণ আজ অবধি বোম্বাই, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, উড়িষ্যা ও বিদর্ভ নিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলোকে ১৯৪৬-৪৭, ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে যথাক্রমে মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার, ৩৫ কোটি ৮১ লক্ষ ও ৬১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা দিয়েছে।

মধ্য মেয়াদী ঋণ—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪৬ক ধারায় ও ২(খ) উপধারায় মধ্য মেয়াদী ঋণদান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা রয়েছে।

মধ্য মেয়াদী ঋণদান ব্যবস্থা—

১৫ মাস থেকে ৫ বছরের মেয়াদে সাধারণতঃ মধ্য মেয়াদী ঋণ দেওয়া হয়। পূর্ব্বে এই ঋণ ৩ বছরের মেয়াদে দেওয়া হ'ত। কিন্তু পরে ১৯৫৬ সালে ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সুপারিশে ৫ বছর অবধি মেয়াদ বাড়ানো হয় এবং সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণের শতকরা ২৫ ভাগ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। প্রকৃত পক্ষে এই ঋণ স্থায়ী ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়। আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিজের তহবিল থেকেই এই ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু পরে "জাতীয় কৃষি ঋণ (দীর্ঘ মেয়াদী কার্য্য) তহবিল" সৃষ্ট হওয়ার পর উক্ত তহবিল থেকেই এই মধ্য মেয়াদী ঋণ দেওয়া হচ্ছে।

মধ্য মেয়াদী ঋণদানের উদ্দেশ্য—

মধ্য মেয়াদী ঋণ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় :—

(১) পতিত জমি উদ্ধার বা অন্যান্য জমি উন্নয়নমূলক কাজ;

(২) সেচ ব্যবস্থা ও তার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(৩) রাসায়নিক সার, কৃষিজাত যন্ত্রপাতি, যানবাহন প্রভৃতি কেনা ;

(৪) জমির শস্য রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঘর তৈরী ও গোশালা তৈরী ;

(৫) পশুপালন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় ;

(৬) সমবায় চিনির কারখানার প্রয়োজনীয় অংশ ক্রয়ের জন্য ছোট বা গরীব চাষীদের অর্থ যোগানর জন্য।

৬নং উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ঋণ শতকরা ২৲ সুদের হারে পাওয়া যেতে পারে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ককে মোট মধ্য মেয়াদী ঋণদানের পরিমাণ :—

১৯৫৪-৫৫—২৬ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা

১৯৫৬-৫৭—১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা

১৯৫৭-৫৮—২ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা

দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ—

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরাসরি কোন দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদান করে না। সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের ঋণপত্র কিনে পরোক্ষ ভাবে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদানের কাজ করে, ঋণ-পত্রের শতকরা ২০ ভাগ কিনে নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, ১৯৫৩ সাল থেকে ভারত সরকার, রাজ্য-সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একযোগে সমস্ত ঋণপত্রের শতকরা ৪০ ভাগ বা অবিক্রীত ঋণপত্র (যাহা কম) কিনে নিচ্ছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজস্ব তহবিলের সাধারণ বিনিয়োগের উৎস হিসেবে এইসব ঋণ-পত্র কিনে নিত এবং তার জন্য আইনের ১৭(৮) ধারায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু পরে "জাতীয় কৃষি ঋণ তহবিল (দীর্ঘ মেয়াদী কার্য্য)" সৃষ্ট হওয়ার পর, ঋণপত্র এখন এই তহবিল থেকেই কিনে নেওয়া হয়। আবার এই তহবিল থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এখন কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ককে ২০ বছরের মেয়াদে সরাসরি দীর্ঘ মেয়াদী ঋণও দিতে পারে। ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মোট ৮৫ লক্ষ টাকার ঋণপত্র কিনেছে।

তাঁত শিল্পের জন্য ঋণ—

১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হস্তচালিত তাঁত শিল্পকেও ঋণ দিয়ে আসছে। আগে সাধারণতঃ "সেস্ ফণ্ড" থেকেই তাঁত শিল্পকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য রেশম ও পশম শিল্পকে সাহায্য করার মতো

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে নাই। তাই "সেস্ ফণ্ড" থেকেই রেশম ও পশম শিল্পকে আর্থিক সাহায্য করা হচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ককে স্বাভাবিক সুদের হারের চেয়ে শতকরা ১॥০ টাকা কমে তাঁত শিল্পের ঋণ দেয়। তবে সর্ত্ত হচ্ছে যে, এই ঋণ সমবায় তাঁত শিল্পকে শতকরা ৩৲ হার সুদে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক বা শিল্প সমবায় ব্যাঙ্কের নিজস্ব তহবিলের সমপরিমাণ পর্য্যন্ত এবং শীর্ষ বা আঞ্চলিক সমবায় তাঁতী সমিতির নিজস্ব তহবিলের ৩ গুণ পরিমাণ ঋণ পাওয়া যেতে পারে। এই ধরনের ঋণ যাতে অন্যান্য কুটির শিল্প যেমন মৎসজীবী সমিতি, লবণ-তৈরীর সমিতি, নারকেল ছোবড়া সমিতি, চর্ম্মশিল্প সমিতি, গুড়শিল্প, ঘানির তৈল শিল্প, ঢেকি সমিতি পেতে পারে সেদিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিবেচনা করছেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে, সমবায় তাঁত শিল্পের জন্য মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন। তার মধ্যে ৪৯ লক্ষ টাকা মাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া হ'য়েছে।

সমবায় সমিতিতে সরকারী অংশীদারী সার্থক করার জন্য রাজ্য-সরকারদের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দান—

সমীক্ষা কমিটির সুপারিশক্রমে সমন্বিত কৃষিঋণ পরিকল্পনা সার্থক করার জন্য সমবায় সমিতিতে সরকারী অংশীদারীর ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করে, ১৯৫৬ সালে "জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘ মেয়াদী কার্য্য), তহবিল" নামে একটা তহবিল গড়েছে। এই তহবিল থেকেই রাজ্য সরকারদের সরকারী অংশীদারীর জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করবে। এই ঋণের মেয়াদ সাধারণতঃ ১২ বছর এবং প্রথম কিস্তি চতুর্থ বছর থেকে দেয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, এই খাতে মোট ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ও ১৯৫৭-৫৮ সালে ৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছে।

টাকা প্রেরণের সুযোগ সুবিধে—

সুষ্ঠুভাবে ব্যাঙ্কের কাজ চালাতে হ'লে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় টাকা প্রেরণের উত্তম ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি এই ধরনের সুব্যবস্থা না থাকে, তা' হ'লে ব্যাঙ্কের পক্ষে ব্যাঙ্কিং কাজ করা কঠিন হ'য়ে পড়ে। খুব অল্প খরচায় বা বিনা খরচায় টাকা প্রেরণের এই ধরনের সুব্যবস্থার ভার সাধারণতঃ প্রত্যেক উন্নত দেশেই সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিয়ে থাকে। তাই ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রথম থেকেই সমবায় ও ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কদের হিতার্থে

টাকার আদান প্রদান বা প্রেরণের সুব্যবস্থার প্রতি নজর দেন। ১৯৫০ সালে পল্লীব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি বর্ত্তমান ব্যবস্থার উন্নতি কল্পে সুপারিশ করেন। সমীক্ষা কমিটিও বর্তমান ব্যবস্থার আরও উন্নতিকল্পে সুপারিশ করেন।

এই সুপারিশ সমূহের ভিত্তিতে সমবায় ব্যাঙ্কদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হয়েছে :—

(১) রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের হিসাবে বিনা খরচে টাকা আদান প্রদানের ব্যবস্থা ;

(২) রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্যে বিনা খরচে টাকা আদান প্রদানের ব্যবস্থা ;

(৩) বিভিন্ন সমবায় সমিতিদের মধ্যে অল্প খরচায় টাকা আদান প্রদানের ব্যবস্থা।

অবশ্য উপরিউক্ত ব্যবস্থা সাধারণতঃ কতকগুলো সর্ত্তাধীনে করা হ'য়ে থাকে।

সমবায় সমিতি পরিদর্শন—

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের টাকা যে উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে, সে উদ্দেশ্যে লাগান হচ্ছে কিনা এবং কার্য্য পদ্ধতি ও হিসাব রাখা পদ্ধতির উন্নতিকল্পে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীগণ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করছেন। ইতিমধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উপরিউক্ত অনেক ব্যাঙ্কই পরিদর্শন করেছেন। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ছাড়া কতকগুলো সমবায় চিনির কারখানা, কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ও শীর্ষ বিপণন সমিতি পরিদর্শন করেছেন। ১৯৫৮ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৪৪০টি সমবায় সমিতি পরিদর্শন করেছেন। এই সব পরিদর্শনে ত্রুটি বিচ্যুতি দেখানো হয় ও তাদের সংশোধনের জন্য সমিতিকে অনুরোধ করা হয়। পরবর্ত্তী পরিদর্শনে দেখা হয় পূর্ব্বের পরিদর্শনে দেখানো ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন সত্যিকারের করা হ'ল কিনা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থির করেছেন যে, বছরে একবার অন্ততঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করা হ'বে। এই ধরণের পরিদর্শন সাধারণতঃ বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, পাটনা, ইন্দোর, বাঙ্গালোর ও লক্ষ্ণৌ, প্রভৃতিতে অবস্থিত আঞ্চলিক অফিসের কর্ম্মচারীরা করেন।

সমবায় শিক্ষা—

সমবায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সমবায় শিল্পের প্রসার পূর্ব্ববর্তী অনুচ্ছেদএ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, বোম্বাই প্রাদেশিক সমবায় শিক্ষায়তন ও পুনায় অবস্থিত সমবায় শিক্ষায়তনের সহযোগে ১৯৫২ সালে সমবায় শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা স্থরু করেছিল; ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারত সরকারের সহযোগিতায় "সমবায় শিক্ষা বিষয়ক কেন্দ্রীয় কমিটি" গঠন করেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উচ্চ ও মধ্য পর্য্যায়ের সমবায় কর্ম্মীদের শিক্ষার ভার নেন; আর নিম্ন পর্য্যায়ের কর্ম্মীর শিক্ষার ভার নেন ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার। উপরিউক্ত কমিটির আবশ্যকীয় কাজকর্ম্ম করার ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের "কৃষিঋণ বিভাগ" এর উপর রয়েছে।

সমবায় পুস্তকাদী—

সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত কতকগুলো পুস্তক ও পত্রিকা রিজার্ভব্যাঙ্ক নিয়মিত প্রকাশ করে থাকেন। তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য :—

(১) ভারতের সমবায় আন্দোলনের পর্য্যালোচনা (দু'বছর-পরপর)

(২) ভারতের সমবায় আন্দোলন বিষয়ক তথ্য (বার্ষিক)

(৩) সমবায় খবরা-খবর (মাসিক)

ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও সমবায় আন্দোলন—

সমীক্ষা কমিটির স্থপারিশ অনুযায়ী রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও উহার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও প্রাথমিক সমিতির ঋণ গ্রহনের প্রধান উৎস হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। কিন্তু পল্লী ঋণ ব্যবস্থা স্থদৃঢ় করার জন্য সারাদেশ-ব্যাপী শাখা অফিসে ভরপুর একটি সরকারী অংশীদারীতে শক্তিশালী ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কও দরকার। কাজেই ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সৃষ্টি হ'য়েছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ছাড়াও ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া পল্লী ঋণ ও বিপণন ইত্যাদি সমিতির সাহায্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। সকল জেলা ও মহকুমা শহরে এমন কি স্থদূর পল্লী অঞ্চলের নামকরা জায়গায় শাখা অফিস স্থাপন করে ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা অফিস হিসেবে ও সমবায় সমিতিদের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করবে।

সমবায় সম্পর্কিত বিষয়ে ষ্টেট্ ব্যাঙ্কের কাজ হচ্ছে :—

(১) সমবায় ব্যাঙ্কদের টাকা আদান প্রদান ব্যবস্থায় সাহায্য, সমবায়

ব্যাঙ্কদের স্বল্প মেয়াদী ঋণদান এবং সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কদের ঋণ-পত্র ক্রয়। উপরিউক্ত সাহায্য সত্যিকারের পল্লী ঋণ ব্যবস্থা উন্নয়নে অনেকটা সহায়তা করবে বলে আশা করা যায় ;

(২) বিপণন ও প্রসেসিং বা খোসা ছাড়ানর কাজে নিযুক্ত সমিতিকে ঋণ দান ;

(৩) দেশের শস্য সংরক্ষণ ও গুদামজাত ব্যবস্থায় সাহায্য ;

(৪) সমবায় ঋণদান সমিতি ও ষ্টেট্ ব্যাঙ্কের নীতি এবং পরিকল্পনার সমন্বয় সাধন।

পল্লীঋণ উন্নয়নে ষ্টেট্ ব্যাঙ্কের দান—

(ক) টাকা প্রেরণ বা আদান প্রদানের সুযোগ সুবিধে—

(১) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি (এজেন্ট) হিসাবে ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ককে সপ্তাহে তিনবার বিনা খরচায় একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। যেখানে ষ্টেট্ ব্যাঙ্কের অফিস রয়েছে, সেখান থেকে সপ্তাহে তিনবার রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক বা শিল্প সমবায় ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এককালীন ৫০০৲ টাকা বা ততোধিক টাকা, ষ্টেট্ ব্যাঙ্কের যে প্রধান হিসাব রিজার্ভ ব্যাঙ্কে থাকে সেই হিসাবে পাঠাতে পারে ;

(২) সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলিও অনুরূপভাবে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কে টাকা পাঠাতে পারে ;

(৩) সমবায় ব্যাঙ্ক (শীর্ষ ব্যাঙ্ক সমেত) ও বিনা খরচে সপ্তাহে একবার তাদের শাখা অফিসে টাকা পাঠাতে পারে। ১৯৫৯ সালের ৩১ শে মার্চ পর্য্যন্ত ষ্টেট্ ব্যাঙ্কের ৬৯০টি শাখা অফিস ও উপ-অফিস স্থাপিত হয় এবং ১৯৬০ সালের শেষে ৭০০ টি মোট শাখা অফিস স্থাপিত হয়।

(খ) স্বল্প মেয়াদী ঋণদান—

(১) ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক তার স্বাভাবিক সুদের হারের শতকরা ১॥০ টাকা কমে (৩ শত করা ৩৲ টাকার কম নয়) সরকারী সিকিউরিটীর জামিনে সমবায় ব্যাঙ্ক গুলোকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ ও ওভারড্রাফ্‌ট্ বা গচ্ছিত টাকার চেয়ে বেশী টাকা তোলার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

(২) আবার মালের জামিনে সমবায় ব্যাঙ্কদের আগাম ঋণও দিচ্ছে। এই ঋণের সুদের হার হচ্ছে ষ্টেট্ ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক সুদের হারের শতকরা ১॥ ভাগ কম।

(৩) সভ্য সমিতিদের ঋণ দেওয়ার জন্য সরকারী গ্যারান্টিতে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

(৪) যেখানে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের শাখা অফিস নেই, সেই জায়গায় সমবায় ব্যাঙ্কের কোন চেক্ বা বিল ভাঙ্গিয়ে দেয় ষ্টেট্ব্যাঙ্ক; তাছাড়া রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের ওপর অন্যান্য সমবায় ব্যাঙ্কের চেক্ ও ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক শতকরা মাত্র দু' পয়সার (৩ নঃ পঃ) খরচে ভাঙ্গিয়ে দেয়।

(গ) দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দান—

(১) ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের ঋণ পত্রও কেনে;

(২) জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের ঋণ পত্রের জামিনেও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়; ঋণ পত্র বাজারে চালু হওয়ার ব্যাপারেও যথেষ্ট সাহায্য করে;

(৩) ঋণ পত্র ছেড়ে অর্থ সংগ্রহ করার আগে সরকারী গ্যারান্টিতে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ককে সাময়িক ঋণ দিয়ে থাকে

বিপণন ও প্রসেসিং সমিতির জন্য অর্থ সাহায্য—

যে সব জায়গায় কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক বিপণন ও সমজাতীয় সমিতিকে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করতে পারছেনা, সে ক্ষেত্রে ষ্টেট্ব্যাঙ্ক সরাসরি সমিতিকে অল্প সুদে ঋণ দিচ্ছে। রাজ্যের নিয়ামক শীর্ষ সমবায় ব্যাঙ্কের সঙ্গে পরামর্শ করে কোনও অঞ্চল বা সম্পূর্ণ রাজ্যের এই ধরনের ঋণদান ব্যাপারে ষ্টেট্ ব্যাঙ্ককে অধিকার দিতে পারে।

শস্য সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণ—

সমন্বিত পল্লীঋণ পরিকল্পনায় অসংখ্য শস্য-গুদামঘর ও তার সংরক্ষণে বিপণন ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় আইনও পাশ হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গুদাম কর্পোরেশনও গঠিত হয়েছে। সমবায় ঋণ ও বিপণনের যোগাযোগ সার্থক করে তুলতে বিপণন সমিতিও গড়ে উঠছে। কিন্তু শস্য গুদামজাত ও সংরক্ষণ বা বিপণন ব্যবস্থার অগ্রগতি সম্ভব নয়, যদি গুদাম ঘরের রসিদ ভাঙ্গিয়ে চাষী ব্যাঙ্ক থেকে টাকা সংগ্রহ করতে না পারে, কাজেই ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক এই দায়িত্বও পুরোপুরি পালন করছে এবং পরোক্ষভাবে গ্রামের চাষীদের ঋণদান করছে।

ষ্টেট্ ব্যাঙ্কের ও সমবায় ব্যাঙ্কের নীতি ও পরিকল্পনায় যোগাযোগ—

সমবায় ব্যাঙ্ক গুলোর আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করণে ও উহাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সাহায্য দানে ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক তার কার্য্যপন্থা স্থির করছে। যে সব অঞ্চলে সমবায় ব্যাঙ্ক অনুন্নত বা দুর্ব্বল সেখানেই সাধারণতঃ ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক অর্থ সাহায্যের নীতি গ্রহণ করেছে।

সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ

সমবায় আন্দোলনের সফলতা, বিফলতা ও ভবিষ্যৎ

ভারতে সমবায় আন্দোলনের সফলতা—

ভারতে সমবায় আন্দোলন কতটা সফল হয়েছে তা, নির্ণয় করতে হলে বলা চলে যে মোটামুটি সমবায় আন্দোলন একেবারে ব্যর্থ হয়নি। সমবায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা সফলতা অর্জ্জন করেছে। দীর্ঘ ৫০ বছরের বেশী সময় ধরে এই আন্দোলনের যতটা সফলতা লাভ করা উচিত ছিল তা অবশ্য হয়নি। সমবায় আন্দোলন যে দেশের সামগ্রিক উন্নতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির একমাত্র পথ সেই আত্মগরিমায় ভারতের সমবায় আন্দোলন দীর্ঘ দিনের চেষ্টাতেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি দেশের লোকের কাছে।

ঋণদাদনের ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির সংখ্যা, সভ্যসংখ্যা, ঋণদাদনের পরিমাণ ও কার্য্যকরী মূলধন হিসাব করলে মোটামুটি বলা যায় সমবায়ের অগ্রগতি সন্তোষজনক। এই আন্দোলন ভারতীয় কৃষকের একাংশকে মহাজনদের কবল থেকে মুক্ত করেছে। যারা ঋণ পেয়েছে তারাত উপকৃত হয়েছেই, উপরন্তু সমবায় ঋণ দেওয়া হতে থাকায় গ্রাম্য মহাজনও সুদের হার কমাতে বাধ্য হয়েছে। তাকে খাতকের সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করতে বাধ্য হতে হয়েছে এবং তার অমানুষিক অত্যাচার ও অন্যায়গুলি বন্ধ করতে হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে পাশাপাশি সমবায় ঋণদান সমিতি ছিল বলেই। পরোক্ষভাবে সমবায়ের এই দান নগণ্য নয়। গ্রাম্য লোকদের মধ্যে এই আন্দোলন, সঞ্চয় প্রবৃত্তি, পরস্পর সহযোগিতা ও আত্মনির্ভরতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। ঋণদান ছাড়াও অন্যান্য দিকে এই আন্দোলন কিছুটা সাফল্য নিয়ে, হাজার হাজার লোকের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাব সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা করেছে।

প্রয়োজনের তুলনায় এই আন্দোলন যথেষ্ট সার্থক না হলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা চমকপ্রদ কাজ দেখিয়েছে। যেমন খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে, ঘাটতি দ্রব্য সমবণ্টনের নীতিতে, বাস্তুহারা ও অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকের পুনর্বাসন, তন্তুশিল্পীদের চরম বিপর্য্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে এই আন্দোলন প্রভূত সাহায্য করেছে। সমবায় সাধারণতন্ত্র সরকারী অর্থনীতির লক্ষ্য। এই ঘোষণায়, বর্তমান সমবায় আন্দোলন, পূর্ব্বের প্রচলিত প্রথা হতে বিশেষ ভাবে ভিন্ন আকার গ্রহণ করেছে। ১৯৪৭ সাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত সমবায় যেটুকু সফলতা অর্জ্জন করেছে তা সার্থক হয়ে উঠেছে তখনই যখন এ কথা স্বীকার করে নেওয়া

হয়েছে যে, সমবায়ের পথই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির উপায় স্বরূপ। সমিতির সংখ্যা, সভ্যসংখ্যা, মূলধন, ঋণ গ্রহণ প্রভৃতির কথা বিচারমূলক ভাবে, ১৯৫৯ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত দেখলে দেখা যাবে যে সমবায় আন্দোলন এই সময়ের ভিতর যথেষ্ট প্রসারলাভ করেছে। ১৯০৯-১৯১০ সালে দেশে মোট সমিতির সংখ্যা ছিল ১৯০০ শত এবং এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫৮-৫৯ সালে দাঁড়ায় ২,৮৪০০০ হাজার। সভ্যসংখ্যা ১৬,২০০ হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২,৭৪০০০,০০ এবং মূলধনের পরিমাণ ৬৮,০০,০০০ লক্ষ থেকে ৮৮০,০০,০০০ লক্ষ দাঁড়ায়! এই সময় প্রাথমিক ঋণদান সমিতির মাধ্যমে, ঋণদাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৬০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য সমিতিগুলির দ্বারা দাদন হয়েছিল প্রায় ৫০৯ কোটি টাকা। রাজ্যের শীর্ষ ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে মূলধনের পরিমাণ বেশ কিছু বেড়েছিল। এইভাবে আমানত ও মূলধনের পরিমাণ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। এতেই বোঝা যায় জনসাধারণের সমবায়ের প্রতি বিশ্বাস ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে ঋণদাদনে ও ঋণ আদায় ক্ষেত্রে সমবায় যথেষ্ট এগিয়ে গিয়েছে এবং অন্যান্য উন্নতিমূলক সমবায়ের কাজগুলি এতটা সাফল্য আর কিছুতে আনতে পারেনি। আমাদের দেশে শতকরা ৬৫ ভাগ ঋণদান সমিতি। ১৯৫৮-৫৯ সালে এই ঋণদান সমিতির সংখ্যা ছিল ১.৮৩ লক্ষ, সমবায় তাঁতশিল্প ও অন্যান্য শিল্প সমিতির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে প্রায় ১০,৫০০ এবং ১৪৮০০ হাজার মাত্র। এছাড়া সমবায় আর দুইটি বিষয়ে বেশ কিছু সাফল্য অর্জ্জন করেছে। সেটা হচ্ছে সমবায় গৃহ নির্ম্মাণ ও ক্রেতা বা ভাণ্ডার সমবায় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। ১৯৫৯ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত অকৃষি-ঋণদান সমিতির সংখ্যা, সভ্যসংখ্যা ও মূলধনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১০৮৪, ৪০২২ লক্ষ এবং ১২১,৪৭ কোটি টাকা। এই ধরনের সমিতির মাধ্যমে ঋণদাদনের পরিমাণ ১৯৫৮-৫৯ সালে ছিল প্রায় ১১০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটীর ও ক্ষুদ্র সমবায় শিল্পগুলি নানা প্রকার সরকারী সাহায্য পেয়েছে। কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির মূলধনের চাহিদা অন্যান্য সংস্থা হতে মিটলেও এই শিল্পগুলির উন্নতির জন্য সরকার আরও ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। এই ব্যয় বেশ কিছু সাফল্য এনেছে ; কারণ সমবায়ের ক্ষেত্রে তাঁতের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গিয়েছে। মাদ্রাজ অঞ্চলে, নিয়ন্ত্রিত ঋণ পরিকল্পনা, বিশেষতঃ বাণিজ্যিক শস্যের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু-ভাবে সফলতার সঙ্গে কাজ করেছে। এই পরিকল্পনাই কিছু পরিবর্তিত হয়ে, ঋণের সঙ্গে বিপণনের সংযোগ রক্ষা নামে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গীভূত

হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক অনুমিত হয়েছিল যে, গ্রাম্য লোকসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ লোককে ১৯৫৮ সালের মধ্যে সমবায় আন্দোলনের ভিতর আনা যাবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি থেকে বোঝা যায় জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে সমবায়ের স্থান কোথায়। নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের স্থান কম নয়। গ্রাম্য লোকেরা ব্যাঙ্কে টাকা পয়সা রাখতে অভ্যস্ত হয়েছে; সমিতি চালাতে যে সব কাজকর্ম্ম করতে হয়, তাও তারা শিক্ষা করতে পারছে অতি সহজে। সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকদের পরস্পর উন্নতি সাধনের জন্য একত্র মিলিত করেছে এই সমবায়।

এই সব আলোচনা থেকে বোঝা যায় ভারতে সমবায় আন্দোলন বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। কিছুকাল পর বিশ্বের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসে ভারতবর্ষ গৌরবময় স্থান অধিকার করবে।

সমবায় আন্দোলনের বিফলতা—

বহু সমস্যা জড়িত ভারতবর্ষে এত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কতখানি সমস্যা দূর করতে পেরেছে সে দিক দিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সমবায় আন্দোলন বিশেষ কিছু করতে পারে নাই। ব্যাপকভাবে দেখতে গেলে বলতে হয়, দেশের উপকার এই দীর্ঘদিনের চেষ্টায় সমবায় আন্দোলন অতি অল্পই করেছে এবং এই দীর্ঘদিনের তুলনায় অনগ্রসরতাকে ব্যর্থতা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। অনগ্রসরতার বহু কারণ আছে এই সব কারণগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্ব্বলতা, দারিদ্র, অসমবণ্টন, ঋণগ্রস্ততা, জনসাধরণের মধ্যে শিক্ষার অভাব, খণ্ডীকৃত ক্ষুদ্র জমি, প্রাচীন কৃষি-পদ্ধতি, যানবাহন রাস্তাঘাটের অভাব, চাষবাসের কাজে বৃষ্টিদেবতার উপর নির্ভরতা প্রভৃতি।

এগুলি ছাড়া আরও আভ্যন্তরীণ অনেক কারণ রয়েছে মূল সমবায়ের ভিতর। স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে সমবায় আন্দোলন ভারতের মাটিতে দেখা দেয় নি। এই সম্বন্ধে সমীক্ষা কমিটি নিম্নরূপ মতামত প্রকাশ করেছে :—

"সমবায়রূপী বৃক্ষ, ভারতের মাটিতে শিকড় গারতে পারে নাই। কারণ ভারত সরকার মাটির উপর এই গাছটিকে দুই হাত দিয়ে ধরে রয়েছেন।" আবার বলেছে—"যে সমস্ত কাজগুলি নিজেরাই ভাল ভাবে করা যায়, তা না করে প্রতি কাজেই সরকাবের উপর নির্ভর করা।" এই অভ্যাসের ফলে আত্ম-বিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার শক্তি নিজেরাই হারিয়ে ফেলেছে। সমবায় সমিতি-গুলি তাদের পরিচালনার ব্যাপারে দক্ষতা না থাকার ফলে বহু সমিতি অকালে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ব্যবসায় পদ্ধতি না জানার কারণ এই আন্দোলনের গতিকে

যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত করেছে। অনেক ক্ষেত্রে দলগত স্বার্থ ও নেতৃত্ব করার লোভ বহু সমিতি নষ্টের কারণ হয়েছে।

সমবায় ভাণ্ডার সমিতিগুলির ব্যবসায় বুদ্ধি ও জ্ঞান না থাকার ফলে ব্যবসাদারদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকতে পারে নি।

লোকেরা এই দুর্ব্বল সমিতিগুলিতে টাকা আমানত হিসাবে জমা দিতে সাহস পায় নি। সমবায় শিক্ষার প্রসার না হওয়ার ফলেও এই আন্দোলনের গতি অনেক পরিমাণে ব্যাহত হয়। সভ্যদের মধ্যে সমবায় শিক্ষার প্রচার ছাড়া সমবায়ের প্রতি আনুগত্য আশা করা যায় না। এই শিক্ষা না থাকার ফলে সমবায়ের প্রকৃত কর্ম্মী গড়ে তোলাও সম্ভবপর হয়নি, যার জন্য এই আন্দোলন অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে।

নিখিল ভারত পল্লী ঋণ সমীক্ষা কমিটি সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে বলে মতপ্রকাশ করেন। নিম্নলিখিত কারণগুলি এই ব্যর্থতার কারণ বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন।

(১) গ্রাম্য মহাজন ও ব্যবসাদারগণ শহরাঞ্চলের বানিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় যে আর্থিক সঙ্গতি লাভ করেছিল, সে তুলনায় সমবায় আন্দোলন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে অনেক দুর্ব্বল ছিল।

(২) সমবায় সমিতিগুলি ঋণদান ছাড়া অন্য কাজ বিশেষ করেনি—সেগুলি বহু উদ্দেশ্য সাধক না হওয়ায় সভ্যদের সকল চাহিদা মেটাতে পারেনি।

(২) সমিতির আকার ক্ষুদ্র হওয়ায় এবং অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট হওয়ায় আন্দোলনের গতি ব্যহত হয়।

(৪) সমবায়ে দলগত নেতৃত্বের লোভ, ক্ষমতাশালী স্থানীয় ব্যক্তি ও ব্যবসাদার প্রভৃতির প্রাধান্য থাকে এবং তার ফলে গরীব কৃষকের প্রয়োজন উপেক্ষিত হয়।

(৫) সমবায় সমিতি চাষীদের জরুরী প্রয়োজন ও সম্পূর্ণ চাহিদা মেটাতে পারেনি।

(৬) চাষীদের ক্রেতা হিসাবে জিনিসপত্র ক্রয়ের চাহিদা ও সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য অর্থ সমবায় যোগাতে পারেনি। তার ফলে চাষীরা ঋণের টাকা উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যয় না করে অন্য উদ্দেশ্যে খরচ করে ফেলে অথবা এই সব অর্থ জোগাড়ের জন্য মহাজনের দারস্থ হয়।

(৭) সমবায় বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর অভাব।

সমবায়ের ভবিষ্যৎ—

ভারতে সমবায় আন্দোলনের উৎপত্তি হয় সরকারী প্রচেষ্টায়। গ্রাম্য-ঋণ গ্রস্ততার কুফলের হাত থেকে চাষীদের বাঁচানর উদ্দেশ্যেই এই আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হয়। কাজেই প্রারম্ভে ঋণদানই ছিল সমবায়ের প্রধান কাজ। পরে বহু উদ্দেশ্য সাধক সমিতি গড়ে ওঠে ব্যাপকভাবে। ১৯৩০ সালের বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় মূল্যমান হ্রাস হওয়ায় বহু সমিতি নষ্ট হওয়ায় সমবায়ের পুনর্গঠন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে ধরা হয়। ভারতের স্বাধীনতার পূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সমবায় আন্দোলন কিছু মাত্র উপকৃত হয়নি। আন্দোলনের সৃষ্টির প্রথম থেকেই সমবায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও নির্দ্দেশ অনুযায়ী চলে। কিন্তু রাষ্ট্র কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করে যেন সময় সময় অনুষ্ঠানে যোগদান করার মত ভাবে অন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। ফলে দীর্ঘ ৫০ বছরের চেষ্টায় সমবায় অতি অল্পই অগ্রসর হয়েছিল। কৃষকদের মোট ঋণের মধ্যে সমবায় সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ শতকরা ৩·১ ভাগ মাত্র। এই সমস্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় অন্দোলনের পুনর্গঠনের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। ভারত সরকারও তা অনুমোদন করেন এবং তা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করা হয়। সুসমন্বিত ঋণ পরিকল্পনা নীতির উদ্দেশ্য হল ঋণদানের সঙ্গে অন্যান্য অর্থ নৈতিক গ্রামীন প্রচেষ্টাগুলির সংযোগ সাধন। এই প্রচেষ্টাকে সফল করতে হলে সর্ব্বস্তরে সমবায়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অংশীদারীত্বের কথা সুপারিশ করা হয় এবং সরকার কর্তৃক তা অনুমোদিতও হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয় এবং বৃহদাকার ঋণদান সমিতি গঠন আরম্ভ হয়। কিন্তু প্রায় ৩ বছর পর জাতীয় উন্নয়ণ সংসদ বৃহদাকার সমিতি গঠনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। বৃহদাকার ঋণদান সমিতির পরিবর্ত্তে ছোট এলাকা নিয়ে, আর্থিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে সেবা সমিতি গঠনের কাজ তারপর থেকেই সুরু হয়। বর্ত্তমান বৃহদাকার সমিতিগুলিও কাজ করে যেতে পারে, যেখানে তারা কাজ কর্ম্ম ভালভাবে করে চলেছে। দরকার হলে সুবিধার জন্য তাদের ভেঙ্গে ছোট ছোট সমিতিও করা চল্‌তে পারে। যে সব পুরাতন ছোট সমিতি ভালভাবে কাজ করছেনা সেগুলিকেও পুনর্গঠন করতে হবে। এইভাবে সমবায়ের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখা চল্‌বে। ছোট সমিতিগুলিতে ও সরকারী অংশীদারীত্ব থাকবে এবং এই বিষয়ে 'সেবা সমিতি' নামক অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

বিপণনের ক্ষেত্রে আদর্শ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তবে বর্ত্তমান

পরিপ্রেক্ষিতে বিপণনের ক্রমোন্নতির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করলে ভবিষ্যতের উন্নতি আশা করা যায়।

কুটীর ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে সমবায়ের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বিভিন্ন বোর্ড অনেক শিল্পের জন্য সৃষ্ট হয়। রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্র উৎপাদকগণের প্রতিযোগীতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এর উপায় হচ্ছে শিল্পগত সমবায় স্থাপন।

সমবায় চাযের ক্ষেত্রে, পর্য্যবেক্ষকদলের মতামত সমবায় চাষ অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ৩য় পরিকল্পনায় সমবায় চাষ সমিতির ভূমিকাও সেই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

এইভাবে গৃহ নির্ম্মাণ ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণদান, কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য ও নির্দ্দেশনায় সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হওয়ার আশা আছে। পৌর ব্যাঙ্কগুলি প্রায়ই কোন প্রকার সরকারী সাহায্য না পেয়েও সফলতার সঙ্গে কাজ করেছে। সমবায় ভাণ্ডারগুলি, নিয়ন্ত্রণ চালু থাকাকালীন ভালভাবেই চলেছিল কিন্তু নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ার পর খোলাবাজারের প্রতিদ্বন্দিতার সম্মুখীন হতে পারেনি এবং এই সময়ে অনেক ভাণ্ডার সমিতি নষ্ট হয়ে যায়। দেশের শিল্পগত উন্নতির সঙ্গে এবং শিল্পমালিকগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ভাণ্ডার সমিতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আশা করা যায়। ৩য় পরিকল্পনায় ভাণ্ডার সমিতিতে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক অংশগ্রহণ, মূলধনের টাকা যোগান এবং ম্যানেজারের মাহিনাবাবত অর্থ সাহায্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমবায়ের প্রচারের জন্য ১৯৫৯ সাল পর্য্যন্ত ২৯টি রাজ্য সংস্থা ও রাজ্য প্রতিষ্ঠান ছিল ৪৪৮ জন বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিয়ে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় ১ লক্ষ সভ্য, ১৭,০০০ অফিস পরিচালক ও ১১,০০০ বেতনভোগী কর্ম্মীকে সমবায় শিক্ষা দিয়েছে। এই ভাবে উচ্চ পর্য্যায়ের কাজকর্ম্ম চালানর জন্য এবং সমবায়ের সফলতা আনার জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা চলেছে। দেশের সমবায় নেতাগণের চেষ্টা দ্বারা, রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতা দ্বারা উপরন্তু রিজার্ভব্যাঙ্কের সহযোগিতায় সমবায়ের প্রসার ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায়ের কার্য্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে একথা সুনিশ্চিত এবং কালক্রমে সমবায় একটি শক্তিশালী আন্দোলন হিসাবে দেশের অর্থনৈতিক ও সমাজিক সংগঠনের অংশ হয়ে দাঁড়াবে।

বিদেশের সমবায় আন্দোলন

ইস্রাইলে সমবায় আন্দোলন

ভুমিকা—ইস্রাইলের সমবায় আন্দোলনের রূপদানে ইহুদীদের পুনর্বাসন ও ইহুদীদের নিজস্ব স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপন সমস্যার একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক্ থেকে সত্যিকারের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপন আন্দোলন প্রকটরূপ ধারণ করে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এডমুণ্ডডী রথ্‌চাইল্ড 'প্যালেষ্টাইন ইহুদী ঔপনিবেশ সংঘ (P. J. C. A) স্থাপন করে এক বিশেষ কৃষক শ্রেণীর সৃষ্টি করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হ'তে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ অবধি ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে ইহুদীরা দলে দলে প্যালেষ্টাইনে আস্‌তে সুরু করে। ১৮৯৭ সালে World Zionist Organisation নামে একটা বিশেষ ইহুদী সংঘ গড়ে ওঠে, প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের স্থায়ী বাসস্থান স্থাপন করার জন্য। তারপর ইহুদীদের জন্য জমি সংগ্রহ উদ্দেশ্যে ইহুদী কংগ্রেস, ইহুদী জাতীয় তহবিল (Jewish National Fund) গঠন করেন ১৯০১ সালে। ১৯১৯ সালের ভেতর প্রায় ২২,৩৬৩ ডুনাক জমি সংগ্রহ হয়। ১৯২৯ সালে, Jewish Agency নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যাদের পুনর্বাসন করা হয়েছে, এদের স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্জ্জ দেওয়ার জন্য Jewish Foundation Fund নামে আর একটা তহবিল গঠন করা হয়, ১৯২০ সালে। Jewish Agencyর প্রধান কার্য্যালয় জেরুজালেমে। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ রাষ্ট্রেই ইহার অফিস রয়েছে। ইহুদীদের প্যালেষ্টাইনে আসার ব্যাপারে সহায়তাই এদের কাজ। প্যালেষ্টাইন-গামী ইহুদীকে কৃষিবিদ্যা ও কায়িক শ্রম, একসঙ্গে কাজ করা, বাস করা, হিব্রু ভাষা প্রভৃতিতে শিক্ষা দেওয়াও হয়। সম্ভব না হলে প্যালেষ্টাইনে যাওয়ার পর এদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে ৬০টি পরিবারএর একটি দল হ'লেই সমবায় চাষের জন্য জমির ব্যবস্থা করা হত। বৃহদাকার খামারের প্রবর্ত্তন একটা বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সাধারণতঃ ৫ থেকে ৭ একর সেচ জমি এবং ২২ থেকে ৩০ একর অ-সেচ জমি প্রতি পরিবারকে দেওয়া হয়। ইহুদী এজেন্সী বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে কৃষিঋণ, সেচ, উন্নত ধরনের কৃষি উৎপাদন প্রভৃতির ব্যবস্থা করে। এভাবে বেশ কতগুলো সমবায় কৃষি উপনিবেশের সৃষ্টি হয়, ১৯৪৮ সালে ইহুদীরা প্যালেষ্টাইনে স্বতন্ত্র ইস্রাইল রাষ্ট্র স্থাপন করে, উহার অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করার কাজে এবং পুনর্বসতির ব্যাপারে প্রাণপণ

লেগে যায়। ১৯৪৮ সালে পুনর্বাসন—ইহুদীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০০,০০০। বর্ত্তমানে লোকসংখ্যা ২০০০,০০০তে পৌঁছেছে। কাজেই অর্থ নৈতিক কাঠামো সুদৃঢ়করণে ও ইহুদীদের পুনর্বসতির ব্যাপারে সমবায়ের দান কম নয়। অন্যদিকে পুনর্বসতি সমস্যাই অনেকটা সমবায়ের রূপদান করেছে। ইস্রাইলে সমবায় আন্দোলনে আর একটা জিনিস উল্লেখযোগ্য। সেটা হচ্ছে জমির মালিকানা স্বত্ব। কোন সরকারী নীতি ঘোষণা না করে, জাতীয়করণ আইন না করে, অধিকাংশ জমি সরকার বা অন্যান্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান নিজেদের আওতায় আনতে সমর্থ হয়েছে। রাষ্ট্রের সমস্ত জমির শতকরা ৭৭·৩ ভাগের মালিক হচ্ছে সরকার বা সরকারী কোন প্রতিষ্ঠান; শতকরা ১৬·৩ ভাগের মালিক ইহুদী জাতীয় তহবিল; শতকরা ০·৭ ভাগের মালিক প্যালেষ্টাইন ইহুদী উপনিবেশ সংস্থা; আর ব্যক্তিগত মালিকানা—শতকরা ৩·১ ভাগ (ইহুদী) ও শতকরা ২·৬ ভাগ (আরব)। শ্রমের মর্য্যাদাও একটা লক্ষণীয় বিষয়। যাই হোক, ইস্রাইল একটা ছোট রাষ্ট্র। ইহার আয়তন মাত্র ৮,০০০ বর্গমাইল। ভারতের মত ইহা কৃষি প্রধান দেশ নয়; মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ কৃষিজীবি। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে সাইট্রাস ফল, খড়, শাক-সব্জী, আলু, গম, ডিম ও দুধ উল্লেখযোগ্য। গত দশ বছরে লোকসংখ্যা প্রায় ৩গুণ বেড়ে গেছে; কৃষি উৎপাদনও বেড়ে গেছে তেমনি, যদিও প্রতি কৃষি-পরিবারের জমির পরিমাণ গড়ে ১০ একরেরও কম। মিশ্র কৃষি উন্নয়ন, সমবায় চাষ, উন্নত ধরনের কৃষি ব্যবস্থা, অধিক পরিমাণে কৃষি-কলের ব্যবহার, সরকার ও অন্যান্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক অর্থ বিনিয়োগ ইত্যাদি উৎপাদন বাড়ার মূলে রয়েছে।

ইস্রাইলে সমবায় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য—

১। **সমবায় আইন**—১৯২০ সালে প্রথম সমবায় সমিতি সম্পর্কিত একটা অর্ডিনান্স জারী হয়, ১৯১২ সালে ভারতীয় সমবায় আইনের উপর ভিত্তি করেই এই অর্ডিনান্সের খসড়া তৈরী হয়েছিল। তারপর তৎকালীন সরকার পাঞ্জাবের প্রাক্তন নিয়ামক মিঃ ষ্ট্রিক্ল্যাণ্ডকে সমবায়ের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করেন, তার প্রস্তাবে ১৯৩৩ সালে আর একটা নতুন অর্ডিনান্স জারী হয়। এই অর্ডিনান্স বোম্বাই সমবায় আইনকে ভিত্তি করেই তৈরী হয় এবং এই অর্ডিনান্সই আজও প্রধান সমবায় আইন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

২। **সমবায় সমিতির বিভিন্ন কার্য্যধারা**—পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে সমবায় আন্দোলন গড়ে ওঠে, কোন একটা বিশেষ দিকে (যেমন ইংল্যাণ্ডে সমবায় ভাণ্ডার আন্দোলন); ইস্রাইলে কিন্তু ঠিক এর উল্টো। সমবায় ছড়িয়ে পড়ছে, বিভিন্নদিকে,—একদিকে সমবায় যৌথ চাষ, সমবায় কৃষি বিপণন, সমবায়—প্রসেসিং, সেচ-সমবায়, শস্য-বীমা সমবায়; অন্যদিকে যানবাহন, গৃহনির্ম্মাণ, ঋণ, জীবন ও সাধারণ বীমা, পণ্যভাণ্ডার, শিল্প উৎপাদন ও বিপণন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সমবায় বেশ প্রসারলাভ করেছে। বস্তুতঃ ইস্রাইলে সমবায়ের ভেতর কেহ জন্মগ্রহণ করতে পারে, বাঁচতে পারে এবং মরতেও পারে।

৩। **একসঙ্গে বাসব্যবস্থা**—ইস্রাইলের 'কিব্বুৎ' (Kibbutz) সমবায়ে বিভিন্ন কার্য্যধারার সমাবেশ দেখা যায়। শুধু যৌথ চাষ বা তৎসংলগ্ন কাজেই উহা সীমাবদ্ধ নয়; সভ্যদের যাবতীয় চাহিদা, যেমন, খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসব্যবস্থা, স্বাস্থ্যোন্নতির উপকরণ যোগান, শিক্ষা প্রভৃতির সমবেত প্রচেষ্টা ও এর কাজ।

৪। **শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ**—রাষ্ট্রের শ্রমিক আন্দোলনের সংগে সমবায় আন্দোলনের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে; শ্রম দপ্তরের একটা শাখা হিসেবে সমবায় বিভাগ কাজ করছে। কাজেই সরকারও এই নিবিড় যোগাযোগ মেনে নিয়েছেন। 'হিস্তাদ্রুৎ' (Histadrut) নামে একটা শ্রমিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, অনেক দিন থেকে। একে ঠিক ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা যায় না; কেননা, স্ব-শ্রমনীতিতে বিশ্বাসী যে-কোন লোক এর সভ্য হ'তে পারে। হিস্তাদ্রুতের কাজের ভেতর, শ্রমিক কলেজ মারফৎ সমবায় ও শ্রম আন্দোলনের নেতাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, 'কুপৎ হলিম' নামক স্বাস্থ্য সংস্থার মাধ্যমে স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯২৪ সালে 'হেভ্রাট্ অভ্ডিম' (Hevrat Ovdim) নামে আর একটা সমবায় ইহুদী শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সমবায় সমিতি সমূহের শতকরা ৮০ ভাগ এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য এবং উহাদের সবাইকে 'হিস্তাদ্রুতে'র সাধারণ নীতি মেনে চল্‌তে হয়। তা' ছাড়া সমবায় সমিতির সভ্যপদ লাভ করতে হলে কাউকে আগে হিস্তাদ্রুতের সভ্য হ'তে হয়। আবার 'হেভ্রাট্ অভ্ডিম' এর ক্ষমতাও কম নয়। কোন সমবায় সমিতির সভ্য হ'তে গেলে, উহার অনুমোদন দরকার; প্রাথমিক সমিতির পরিচালন কমিটির সদস্য নির্বাচনেও উহার যথেষ্ট হাত রয়েছে। তা' ছাড়া প্রাথমিক সমিতির কোন প্রস্তাব বাতিল

করে দেবার মত এর অধিকার রয়েছে। তবে, সাধারণতঃ এই অসাধারণ অধিকার বা ক্ষমতা বড় একটা কাজে লাগানো হয় না। এই ধরণের ক্ষমতা 'হেভ্রাট্ অভ্ডিম্' বিভিন্ন অডিট ইউনিয়নের মাধ্যমে প্রয়োগ করে। প্রত্যেক অডিট ইউনিয়নের মারফৎ সমবায় সমিতিগুলোকে নির্দেশ, উপদেশ ইত্যাদি দেওয়া হয়।

৫। **সমবায়-সহায়ক যৌথ কোম্পানী**—উর্দ্ধতম কি নিম্নতম ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিগুলো তাদের নিজস্ব এক বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে Daughter Socities বা Daughter Companies বলা হয়। আবার এই Daughter Companies and Societies এরও সহায়ক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব সহায়ক প্রতিষ্ঠান যৌথ কোম্পানী হিসেবে রেজিষ্ট্রীকৃত। সমবায় সমিতিগুলো, এই প্রতিষ্ঠানগুলোর পুরো বা আংশিক মালিক। হেভ্রাট্ অভ্ডিম্ যে ক'টা সহায়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে সব ক'টাই খুব বড প্রতিষ্ঠান যেমন, 'কুর লিঃ', হাস্নে ইন্সিওরেন্স কোম্পানী' 'শ্রমিক ব্যাঙ্ক' ইত্যাদি এই সহায়ক কোম্পানীগুলো গড়ে ওঠার মূলে রয়েছে; বৈদেশিক মূলধন সহজে পাওয়া, সমবায় সমিতির মালিকানা অথচ কাজে অধিকতর স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি নীতি।

৬। **সমবায় আন্দোলন ও সরকার**—ইস্রাইলের সমবায় আন্দোলন ইস্রাইল রাষ্ট্রের চেয়েও পুরানো। কাজেই উভয়ের ভেতর সম্পর্ক অনেকটা প্রাক-স্বাধীনতার সম্পর্ক। ইস্রাইলের সমবায় আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন একযোগে বরাবর নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে চেয়েছে। তাই আমরা হেভ্রাট্ অভ্ডিম্ এর জাতীয় প্রকৃতির পরিচয় পাই। হেভ্রাট্ অভ্ডিম্ এর যা কিছু ক্ষমতা, সবই বিভিন্ন প্রাথমিক উৎপাদনকারী ও মজুরদের কাছ থেকে পাওয়া। সমবার সমিতিগুলোর হিসাব নিরীক্ষণের ব্যাপারেও সরকারের কোন হাত নেই। দেশের বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলোর হিসাব নিরীক্ষণ ও দেখাশোনার দায়িত্ব ররেছে ১০টা অডিট ইউনিয়নের ওপর। এমন কি, সমবায় সমিতি ও সভ্যদের মধ্যে কোন মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তির জন্য হেভ্রাট্ অভ্ডিম্ এক বিশেষ শ্রেণীর শালিশী আদালত (Court of Arbitration) এর সৃষ্টি করেছে। সমবায় সমিতির ব্যাপারে সরকারের কর্ত্তব্য হচ্ছে, সমবায় আইন প্রয়োগ—শুধু সমিতি রেজিষ্ট্রীকরণ ও লিকুইডেশনের কাজ। কাজেই ইস্রাইল সরকারের সমবায় বিভাগ খুব ছোট। নিয়ামক সমেত মাত্র ১৪ জন কর্মচারী রয়েছে, এই বিভাগে।

সমবায় সমিতি ও বিভিন্ন কর, খাজনা ইত্যাদি—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের শাসনকালে সমবায় সমিতিগুলোর কোন আয়কর দিতে হত না; কিন্তু এখন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত সমবায় সমিতিগুলোকে আয়কর দিতে হয়। তবে এইসব কর বা খাজনা পুনঃপ্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সমবায় সমিতিগুলো একটা নতুন পথ করে নিয়েছে। উদ্বৃত্ত লাভ সভ্যদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিলি করে দেওয়া হচ্ছে, যাতে কোন আয়কর দিতে না হয়।

রাজনীতি ও সমবায়—সাধারণতঃ অধিকাংশ রাষ্ট্রেই সমবায় রাজনীতি হতে দূরে থাকে; কিন্তু, ইস্রাইলে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। হেভ্রাট্ অভ্‌ডিম এর পরিচালন কমিটিতে সদস্য নির্ব্বাচনে রাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। আবার প্রাথমিক সমিতিগুলোও কোন না কোন রাজনৈতিক সংস্থার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এই সকল সংস্থাগুলোও কিন্তু সমবায় আইনে রেজিষ্ট্রিকৃত।

স্বেচ্ছামূলকতা—সমবায় সমিতিগুলোতে সভ্য হওয়ার ব্যাপারে কোন আবশ্যকীয় চাপ প্রয়োগ করা হয় না। সভ্য হওয়া না হওয়া ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু একবার সভ্যতালিকাভুক্ত হলে, সভ্যপদের যাবতীয় দায়িত্ব সকলকে মেনে চল্‌তে হয়। সভ্যপদ লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিলিকৃত জমি ফিরিয়ে নেওয়া হয় বা বিলি বাতিল করে দেওয়া হয়।

কৃষি সমবায়

কৃষি ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সমবায়ের বিবরণ ও সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হল।

	সংখ্যা (১৯৫৮)
কিব্বুৎ—	২৩০
মোশোভিম্—	২৮৩
মোশোভিম্ শিটুকিম্—	২০
কৃষি-বিপণন—	৩৮
সেচ—	৬৫
সাধারণ কৃষি সমবায়—	১২৭
কৃষি বীমা—	৪
অন্যান্য—	১০১
মোট :	৮৬৮

যুগোশ্লেভিয়ার সমবায় আন্দোলন

সমবায়ের রূপ ও ধারণা—

যুগোশ্লেভিয়ার সমবায়ের রূপ সম্পর্কে উপ-রাষ্ট্রপতি কার্ডেল কয়েকটি সুন্দর কথা বলেছেন। ইনি বলেছেন, "যুগোশ্লেভিয়ার সমবায় নিজেদের সাহায্যের জন্য নয়। এদেশের সমবায় একটা বিশেষ ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের সম্পদের মাধ্যমে সমাজ ও ব্যক্তিগত চাষীর স্বার্থ সমন্বয়ই এর লক্ষ্য। সমবায়ের সম্পদ তার নিজস্ব সম্পদ নয়—রাষ্ট্রের সম্পদ। সমবায় কর্মী শুধু এই সম্পদ ব্যবহার করে, যেমন দেশের নাগরিকগণ রাষ্ট্রের অন্যান্য সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার করে।

কাজেই সমাজতান্ত্রিক সমবায়ের রূপদানে কতগুলো মূলনীতি মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ দেশের বৃহত্তর উৎপাদন, বৃহত্তর শ্রম উৎপাদনের (Greater Labour Productivity) পরিপ্রেক্ষিতে 'সমবায়' একটি উপায় বিশেষ। কাজেই এ দেশের সমবায় কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়; চাষী সমবায় সমিতি ও অন্যান্য সামাজিক ও অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টা মাত্র।

যুগোশ্লেভিয়ার কৃষিনীতির পেছনে রয়েছে, দেশের সমস্ত জমি ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা জাতীয়করণ বা পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার রূপায়ণ। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনে খুব সহজ অথচ বাস্তব পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। জমির পূর্ণ জাতীয়করণ সময় সাপেক্ষ। তাই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমশঃ সমাজ-তান্ত্রিকধাঁচে আনার জন্য কৃষি সমবায়দের সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।"

সমবায় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য—

(১) **সমবায় আন্দোলন ও সরকার**—যুগোশ্লেভিয়ায় ভারতের ন্যায় সরকারের কোন সমবায় বিভাগ বা সমবায় নিয়ামক নেই। অবশ্য প্রয়োজনানুযায়ী মাঝে মাঝে সমবায় বিষয়ক কিছু কিছু আইনও পাশ হয়েছে।

সমবায় আন্দোলন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা রচনায় সরকার ও কম্যুনিষ্ট লিগ (League of Communists) ও শ্রমিক সামাজিক সংঘ (Socialist alliance of the working people)—এই দুইটি রাজনৈতিক দলের একটা নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে। এই সব রাজনৈতিক দল সমবায় ইউনিয়ন ও গণ কমিটির মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনের উন্নয়নে সংক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকে।

১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫১ সাল অবধি সমবায় আন্দোলনে সরকার প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পরে বিভিন্ন কৃষি সংস্কার পরিকল্পনা ও বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনায় সমবায় আন্দোলন প্রত্যক্ষ সরকারী আওতায় না এলেও জেলা ও কমিউন্ পর্য্যায়ে 'গণ-কমিটি'র মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রকারান্তরে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

(২) **সমবায় ইউনিয়ন**—জেলার সমস্ত সমবায় সমিতি জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভ্যভুক্ত। আবার, জেলা ইউনিয়নগুলো রিপাব্লিকান্ সমবায় ইউনিয়নের সভ্য। রিপাব্লিকান্ সমবায় ইউনিয়ন ফেডারেল ইউনিয়নের সভ্য। সমবায় বিষয়ক আইন প্রণয়ন, নীতি নির্দ্ধারণ প্রভৃতি ব্যাপারে ফেডারেল ইউনিয়ন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছে। রিপাব্লিকান ইউনিয়ন তার এলাকার-সমবায় আন্দোলন উন্নয়ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করছেন। জেলা ইউনিয়নগুলো কিন্তু দেশের সমবায় আন্দোলনে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। জেলা গণ কমিটির সহযোগে এ সব ইউনিয়ন, এলাকাভুক্ত সমবায় সমিতির কাজ-কর্ম দেখাশুনা করছে। সত্যিকারের এই জেলা ইউনিয়নগুলোই সমবায় বিভাগ ও সমবায় সমিতির নিয়ামকের করণীয় কাজ করছে। গণ কমিটি ও জেলা সমবায় ইউনিয়নের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন সমবায় সমিতি রেজিষ্ট্রী করা হয় না। কোথায় কি ধরনের সমিতি হবে, সমিতি কি ভাবে কাজ করবে ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়ও জেলা সমবায় ইউনিয়ন স্থির করেন। সমবায় সমিতিদের হিসাবপত্র জেলার সমবায় ইউনিয়নের কর্মচারীরাই পরীক্ষা করেন। আবার গণ কমিটিকে দিয়ে নিরীক্ষিত হিসাবপত্র চূড়ান্তভাবে অনুমোদনও করাতে হয়।

(৩) **গণ কমিটি**—দেশের সমবায় আন্দোলনে গণ কমিটির ভূমিকা আগেই কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। সমবায় সমিতিগুলোর উন্নয়নে জেলা সমবায় ইউনিয়ন ও গণ কমিটি—উভয়েই একসঙ্গে কাজ করছে। তবে কতগুলো ব্যাপারে ইউনিয়নের চেয়ে গণ কমিটির ক্ষমতা অনেক বেশী, যেমন, কোন সমবায় সমিতি রেজিষ্ট্রী হওয়ার আগে গণ কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন; সমিতির নিরীক্ষিত হিসাবপত্র চূড়ান্ত ভাবে অনুমোদনও করে, এই কমিটি। আবার সমিতিতে উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগও এই কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ; কোনও সমিতিকে যে কোন সময় প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশও দিতে পারেন; কোন সমিতির উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বরখাস্তও করতে পারেন; আবার আইন লঙ্ঘন হেতু বা

অশোভনীয় পরিচালনার জন্য সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি ভেঙ্গেও দিতে পারেন। আবার কোন সমিতিকে তুলে দেওয়ারও অধিকার রয়েছে এই কমিটির।

(৪) **ব্যবসায়ী ইউনিয়ন** (Business Unions)—

সমবায় ইউনিয়নগুলো কোন ব্যবসায় করে না। তদারকী ও অন্যান্য কাজই করছে। কিন্তু এই ব্যবসায়ী ইউনিয়নগুলো শুধু ব্যবসায়ই করছে। এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন কৃষি সমবায়ের সংস্থা। কতগুলো সমবায়ের কয়েকটি বিশেষ ধরনের কাজ এরা করে থাকেন, যেমন, গ্রামের সমিতিগুলোকে উন্নত ধরনের বীজ ইত্যাদি সরবরাহ করার জন্য রয়েছে শস্য চাষ ইউনিয়ন (Crop Farming Business Union); আবার সমিতিদের কৃষি যন্ত্রপাতি, সার ইত্যাদি সরবরাহের জন্য রয়েছে, আর এক ধরনের ব্যবসায়ী ইউনিয়ন। জেলা পর্য্যায়ে, রিপাব্লিক পর্য্যায়ে ও ফেডারেল পর্য্যায়েও এই ধরনের ব্যবসায়ী ইউনিয়ন রয়েছে।

বিভিন্ন সমবায় সমিতি

কৃষিক্ষেত্রে সাধারণতঃ দু' রকমের প্রাথমিক সমবায় রয়েছে, যথা, (১) চাষী শ্রমিক সমবায় (Peasant Workers' Co-operative) ও (২) সাধারণ কৃষি সমবায় (General Agricultural Co-operative).

(১) **চাষী শ্রমিক সমবায়**—

১৯৪৫ সালের প্রথম কৃষি সংস্কারে যে সব জমি উদ্বৃত্ত হয়, তার কিছুটা রাষ্ট্রীয় চাষ-সংস্থাকে দেওয়া হয়, আর কিছুটা নিয়ে চাষী শ্রমিক সমবায় গড়ে ওঠে। তখন সাধারণতঃ তিন রকমের চাষী শ্রমিক সমবায় গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে ছিল, কতক যৌথ চাষ সমিতি, আর কতক ছিল সমষ্টিগত চাষ সমিতি। কোন সভ্য সমিতিতে যোগদানের পর অন্ততঃ তিন বছর সমিতি থেকে চলে যেতে পারত না। চলে যাবার সময় তাকে তার নিজস্ব জমি বা অনুরূপ উর্বর জমি ফিরিয়ে দেওয়ারও ব্যবস্থা ছিল।

প্রত্যেক সভ্যকেই জমিতে কাজ করতে হ'ত। সভ্যদের কতগুলো কর্মীদলে (Work Brigade) ভাগ করে কাজ দেওয়া হ'ত। সমিতির উদ্বৃত্ত আয় বছরের শেষে সভ্যদের ভাগ করে দেওয়া হ'ত। আনুমানিক বার্ষিক মজুরীর অর্দ্ধেক আগাম দেওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। যে যত ঘণ্টা কাজ করত, সেই

অনুপাতে মজুরী পেত। বিশেষ দক্ষতার জন্য অতিরিক্ত মজুরী দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। উৎপাদন ব্যয়, যন্ত্রপাতি বদল বা বসানোর ব্যয়, অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক বিশেষ সাহায্য বাবত ব্যয় ও জমির খাজনা (Rent) বাবত ব্যয় হিসাব করার পর সাধারণতঃ সভ্যদের বছরের মজুরী দেওয়া হ'ত। আর যেটুকু বাকী থাকত, তা' সংরক্ষিত তহবিল, জাতীয় তহবিল বা সাংস্কৃতিক তহবিলে জমা দেওয়া হ'ত।

যদিও এসব সমিতিতে যোগদান ব্যাপারে কোন বাধ্যতামূলক আইনগত ব্যবস্থা ছিল না তবু বলতে গেলে পরোক্ষভাবে চাষীদের সমিতিতে যোগদান করা ছাড়া উপায় ছিল না; কেননা, চাষীদের ব্যক্তিগত ভাবে কতগুলো বিশেষ কৃষি কর, উৎপন্ন শস্যের একটা নির্দিষ্ট অংশ সরকারকে দিতে হ'ত। তা'ছাড়া এরা কৃষিঋণের কোন সুযোগ-সুবিধে পেত না। ১৯৪৯ সালে ৬৫০০ চাষী-শ্রমিক সমবায় গড়ে ওঠে। আবার ১৯৫২ সালে সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০০০। কিন্তু ১৯৫১ সাল থেকে এ সব সমিতির কাজ সম্পর্কে যথেষ্ট সমালোচনা সুরু হয়। অধিকাংশ সভ্য তাদের বলদ-গরু, কৃষি যন্ত্রপাতি সব বিক্রী করে দিয়ে এ সব সমিতিতে যোগদান করত। স্বভাবতঃই, এ সব সভ্য নিয়ে সমিতির অবস্থা তেমন আশাপ্রদ ছিল না। সভ্যদের জমি নিয়ে বড় খামার করলেও তেমন কিছু লাভ হ'ত না। দক্ষতা নির্বিশেষে সভ্যদের সমান মজুরীতে অপেক্ষাকৃত দক্ষ শ্রমিক চাষীদের মধ্যে ক্রমশঃ অসন্তোষের মাত্রা বেড়ে গেল। সভ্যেরা তাদের নিজেদের জমির ওপর বেশী নজর দিতে লাগলো। এ ভাবে সমিতিগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা বিশেষ ব্যাহত হ'ল। আবার দ্বিতীয় সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে উৎপন্ন শস্যের নির্দ্দিষ্ট অংশ দেওয়ার প্রথা লোপ পায়। তা'ছাড়া, চাষীরা ব্যক্তিগতভাবে অধিকতর সরকারী সাহায্য পেতে সুরু করে। এইভাবে সভ্যেরা একে একে সমিতি ছেড়ে ব্যক্তিগত চাষে মন দেয়। সমিতির সংখ্যা ৭০০০ (১৯১২ সালে) থেকে ১৯৫৯ সালে দাঁড়ায় মাত্র ৩৭০টি। কাজেই সরকার সমিতির পুনর্গঠনে মন দেন। চাষীদের ব্যক্তিগত জমির মালিকানা অক্ষুন্ন রেখে সমিতিতে যোগদানের ব্যবস্থা হলো; দক্ষতা অনুযায়ী মজুরীর হারের তারতম্যের ব্যবস্থা হলো; চাষীরা তাদের নিজ নিজ বলদ-গরু, কৃষি যন্ত্রপাতি নিজেরাই রেখে সমিতিতে কাজ করার জন্য পৃথক মজুরী পেতে লাগলো। পুরানো সমিতির কিছু কিছু তুলেও দেওয়া হ'ল।

আবার কতগুলোকে রাষ্ট্রীয় চাষ সংস্থার সঙ্গে বা সাধারণ কৃষি সমবায়ের সঙ্গে একত্রীভূত করা হলো। কিছু সমিতি কিন্তু আগের নাম দিয়েই কাজ করতে লাগলো। অবশ্য সমিতির কার্য্যপদ্ধতির একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটল।

(২) সাধারণ কৃষি সমবায়—

গত মহাযুদ্ধের আগে এই সমিতিগুলো ক্রেতা সমবায় হিসেবে কাজ করছিল। তারপর ক্রমশঃ সার, বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের কাজও শুরু করে। খুচরা-ব্যবসায় সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্তের পর, এ সমিতিগুলোর ওপর কৃষি বিপণন, কৃষি সম্প্রসারণ সাহায্য প্রভৃতি কাজেরও ভার দেওয়া হয়। আজকাল এ সব সমিতি সাধারণতঃ সরকার থেকে বা ব্যক্তিগত চাষীর সঙ্গে চুক্তি করে জমি নিয়ে চাষাবাদের কাজও করছে। বল্‌তে গেলে, এ সব সমিতি হচ্ছে, সেবা ও সমবায় চাষ সমিতি।

এলাকা—সমিতির এলাকা বেশ বড়। কোন গ্রামের প্রায় দশহাজার লোকসংখ্যা নিয়ে বা ১০ হাজার একর জমি নিয়ে বড় সমিতির এলাকা রয়েছে। তবে সাধারণতঃ সমিতির আর্থিক স্বাচ্ছল্য ও কাজের সুবিধা অনুযায়ী সমিতির এলাকা সীমাবদ্ধ থাকে।

কাজ—সমিতির কাজ ক্রমশঃই বহুমুখী হয়ে বেড়ে যাচ্ছে। কৃষি ঋণদান বিপণন-ব্যবস্থা, বীজ, সার, যন্ত্রপাতি সরবরাহ ইত্যাদির কাজ করছে। ভারতের সেবা সমিতির মতো শুধু এ সব সরবরাহ করেই সমিতির কাজ শেষ হয় না, চাষীর জমিতে সার, বীজ ইত্যাদি লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিরও ভার নেও। বিভিন্ন রকমের সাহায্যের জন্য এ সব সমিতির নিজস্ব কৃষি ইঞ্জিনিয়ার, কৃষি অর্থনীতিবিদ্‌ ও অন্যান্য কারিগরী ব্যাপারে শিক্ষিত কর্মচারীও রয়েছে। আগেই বলেছি, এসব সমিতির নিজস্ব কিছু জমিও রয়েছে। তা'ছাড়া সরকার ও ব্যক্তিগত চাষীর কাছ থেকেও জমি পাচ্ছে। অনেক সময় চাষী অধিকতর আয়ের জন্য শহরে চলে যায় বা শারীরিক অসুস্থতার জন্য চাষাবাদ করতে পারে না। তখন সে কোন সাধারণ কৃষি সমিতিকে তার জমি চাষাবাদের জন্য দিতে পারে। সমিতি থেকে কোন সাহায্য পেতে হ'লে, চাষীকে তার চাহিদা জানাতে হয়। তারপর একটা চুক্তি করে নিতে হয়। সমিতি অনেকক্ষেত্রে স্থিরীকৃত বর্দ্ধিত উৎপাদনেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

সভ্যপদ—সমিতি থেকে নানারকম সাহায্য পেতে হ'লে চাষীকে সভ্য না হলেও চলে, কাজেই সভ্য ও সভ্য নয় এমন চাষীদের সমিতি থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যাপারে সমান অধিকার রয়েছে। সমিতির মোট সভ্যসংখ্যা কত বা কত অংশগত মূলধন—এ সব ব্যাপারে সমিতি মোটেই মাথা ঘামায় না। কতজন চাষী সমিতির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হল বা এসব চুক্তির ফলে চাষীর কতটা উৎপাদন বাড়লো—এগুলো নিয়েই সমিতির যত মাথা ব্যথা!

পরিচালন—অন্যান্য সমবায় সমিতির ন্যায় এসব সমিতিতে একটি কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি থাকে। যদিও সভ্য বা অপরকে সাহায্যদানে কোনরকম বৈষম্য নেই, তবু সমিতির সাধারণ সভায় যোগদান বা কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটিতে সভ্য ছাড়া, আর কেউ যোগদান করতে পারেনা। দৈনন্দিন কার্জ পরিচালনার জন্য প্রত্যেক সমিতিতে একজন করে জেনারেল ডিরেক্টর বা ম্যানেজার থাকে।

তহবিল—সমিতির বহুমুখী কাজের জন্য যথেষ্ট মূলধন দরকার হয়। মূলধনের অধিকাংশই আসে জেলা সমবায় সেভিংস্ ব্যাঙ্ক থেকে ধার হিসেবে। সমিতির যা লাভ হয়, তার সবটুকুন সংরক্ষিত তহবিল ও বিনিয়োগ তহবিলে জমা পড়ে। অংশগত মূলধনের পরিমান খুবই কম।

কৃষিক্ষেত্রে এই দু'রকম সমিতি ছাড়াও আরও এক শ্রেণীর সমিতি রয়েছে, যাদের নাম হচ্ছে, "সমবায় ব্যবসায়ী ইউনিয়ন" এদের কাজ ও সংগঠন সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এদের নিজস্ব কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামতের কারখানা, কারিগরী ব্যাপারে শিক্ষিত কর্মচারী ও গুদামঘরও রয়েছে।

সমবায় সেভিংস্‌ব্যাঙ্ক—এই ব্যাঙ্কগুলো প্রকৃতপক্ষে সমবায় আইনে রেজিষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্ক নয়। সরকার থেকে টাকা নিয়ে বা জনসাধারণ বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে আমানত সংগ্রহ করে এই ব্যাঙ্কগুলো অন্যান্য সমবায় সমিতিদের কর্জ্জদাদন করে।

গ্রেট বৃটেনের সমবায় আন্দোলন

ভূমিকা : অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গ্রেট বৃটেনে কৃষি ও শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটে। কৃষি ক্ষেত্রে পুঁজীবাদী কৃষি ব্যবস্থার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায় নিজ নিজ পেশা ছেড়ে দলে দলে শহরাঞ্চলে কল-কারখানায় কর্মসংস্থানে ছুটে যায়। সরকারের কৃষিনীতির বিভিন্ন কঠোরতম ব্যবস্থায় চাষাবাদ আর তেমন লোভনীয় পেশা রইল না। শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য শ্রমিকের কর্মচ্যুতি ঘটে। আর যে সব শ্রমিক কলকাখানায় রয়ে গেল, এদের দুর্দ্দশার সীমা রইল না। পূর্ণবয়স্ক শ্রমিকদের দিনে ১৭।১৮ ঘণ্টা করে কাজ করতে হ'ত। আর ৪।৫ বছরের শিশুদেরও দিনে ১৪।১৫ ঘণ্টা করে কাজ করতে হ'ত। এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেও তেমন পারিশ্রমিক মিলত না। কিন্তু ধনীদের, কল-কারখানার মালিকদের আয় দিন দিন বেড়ে যায়। কাজেই এই শিল্প ও কৃষি বিপ্লবে ধনীদের ধন আরও বেড়ে গেল, আর গরীবদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে দাঁড়ালো। দেশের সর্ব্বত্র অসন্তোষের মাত্রা তীব্র আকার ধারণ করল। এই সময় কয়েকজন সামাজিক, দেশহিতৈষী কর্মীর আবির্ভাব হয়। এদের মধ্যে রবার্ট ওয়েনের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রমিকদের দুর্দ্দশা লাঘবের জন্য তিনি তার কারখানায় কতগুলো বিশেষ সংস্কার সাধন করেন, যেমন, শ্রমিকদের কার্য্যকাল কমানো, শ্রমিকদের জরিমানা দেওয়ার প্রথার বিলোপ সাধন প্রভৃতি। তিনি ভেবেছিলেন অন্যান্য কারখানার মালিকরাও কারখানায় তাঁদের অনুরূপ সংস্কার করবে, কিন্তু কিছুই হল না।

শ্রমিক কলোনী : শেষে তিনি এমন এক শ্রমিক কলোনীর পরিকল্পনা করলেন, যেখানে শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে পরস্পরের সাহায্যে নিজেদের কর্মসংস্থান, বাস গৃহ ইত্যাদির বাবস্থা করবে। কিন্তু নানা কারণে এই পরিকল্পনাও পুরোপুরি কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় নি। তারপর ১৮৩২ সালে তিনি 'শ্রম বিনিময়ে' (Labour Exchange) নামে আর একটি নতুন পরিকল্পনা রচনা করেন। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কারিগর সভ্য তৈরী করে এই বিনিময় সংস্থাকে দিত ও বিনিময়ে, শ্রমপত্র (Labour Notes) পেত। এই 'শ্রম পত্র' ভাঙ্গিয়ে শ্রম বিনিময় সংস্থা (Labour Exchange) সরাসরি

উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে বা বিনিময় সংস্থার কাছ থেকে অন্যান্য জিনিসপত্র কিন্‌তে পারত। কিন্তু নানাকারণে এই বিনিময় সংস্থাগুলোও (Equitable Labour Exchange) বেশীদিন টিকে থাক্‌তে পারেনি। একথা অনস্বীকার্য্য যে সর্ব্বপ্রথম ওয়েনের বিভিন্ন পরিকল্পনায় সমবায়ের শেকড় গড়ে ওঠে।

রচ্‌ডেলের উদ্যোক্তাগণ: এইভাবে শ্রমিক কল্যাণের বিভিন্ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে কারখানায় ধর্মঘট ইত্যাদি করেও মজুরী বাড়ানো সম্ভব হল না তখন তারা অন্য কোন উপায়ে নিজেদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য মাথা ঘামাতে সুরু করলো। ঠিক এই সময় ১৮৪৩ সালে রচ্‌ডেলের ২৮ জন তাঁতী একটি সমবায় বিপণি গঠনের প্রস্তাব করেন এবং ১৮৪৪ সালে ২৮ পাউণ্ড তহবিল নিয়ে রচ্‌ডেল ইকুইটেব্‌ল্ পাইওনিয়ার্স সোসাইটি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন ও টোড্‌ (Toad) লেনে বার্ষিক দশ পাউণ্ডে একটি ঘরভাড়া করে দোকানের কাজ সুরু করেন। প্রথম পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

সমিতির উদ্দেশ্য: (ক) সভ্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহে একটি সাধারণ তহবিলের টাকা দিয়ে সভ্যদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন;

(খ) ন্যায্যদামে সভ্যদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহে একটি দোকান চালু করা;

(গ) স্বয়ং সম্পূর্ণকলোনী স্থাপন করে সভ্যদের পরিচালনাধীনে দ্রব্য উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা;

(ঘ) সভ্যদের গৃহ সংস্থানের ব্যবস্থা;

(ঙ) সভ্যদের কর্মসংস্থানহেতু বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা;

(চ) বেকার সভ্যদের দিয়ে চাষাবাদের কাজের জন্য জমি কেনা বা বন্দোবস্ত লওয়া;

(ছ) সমিতির নিজস্ব গৃহে হোটেল চালানো, ইত্যাদি।

সমিতির কাজে উদ্যোক্তারা নিম্নলিখিত নিয়মগুলো মেনে চলেছিলেন:—

(১) বাজার দরে মাল বিক্রী করা;

(২) অংশগত মূলধনের উপর স্থিরীকৃত লভ্যাংশদানের ব্যবস্থা;

(৩) সভ্যদের মাল কেনার ওপর রিবেটের ব্যবস্থা;

(৪) সমিতি কর্ত্তৃক নগদ টাকায় মাল কেনা ও বেচা;

(৫) স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সমান অধিকার লাভ;

(৬) প্রত্যেক সভ্যের মাত্র একটি করে ভোটদানের অধিকার;

(৭) সঠিক ওজনে ও খাঁটি দ্রব্যাদি বিক্রীর ব্যবস্থা;

(৮) সভ্যদের শিক্ষার ব্যবস্থা;

(৯) ধর্ম্মীয় বা রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা।

উপরিউক্ত নীতিগুলো মেনে 'রচ্ডেল অগ্রদূত সমিতি' অসাধারণ সাফল্য দেখায়, এইজন্যই এই নীতিগুলো সমবায়ের আবশ্যকীয় নীতিহিসেবে সর্ব্বত্র সমাদৃত। রচ্ডেল সমিতির দৃষ্টান্তে দেশের সর্ব্বত্র সমবায় ভাণ্ডার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫১ সালের মধ্যে প্রায় ১৩০টি সমিতি ইংল্যাণ্ড ও স্কট্ল্যাণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় গড়ে ওঠে। ১৮৫২ সালের ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ও প্রভিডেণ্ট সোসাইটির আইনে এসব সমবায় বিপণি রেজিষ্ট্রীর ব্যবস্থা হয়। ১৮৮১ সালের শেষে এইসব সমবায় বিপণির সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১ হাজার এবং সভ্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৫ লাখ। ১৮৮১ সাল থেকে ১৯৫৫ অবধি সমবায় বিপণি গুলির অগ্রগতি নিম্নলিখিত তালিকা হ'তে প্রতীয়মান হ'বে।

বছর	সমিতিসংখ্যা	সভ্যসংখ্যা
১৮৮১	৯৭১	৫৪৭,২১২
১৮৯১	১৩০৭	১০৪৪,৬৭৫
১৯৩১	১১৮৮	৬৫৯০,০২০
১৯৪১	১০৫৯	৮৭৭৩,২৫৫
১৯৫১	১০০৬	১০৬৯১,৮৪৩
১৯৫৫	৯৬৪	১১৭৮৩,২৬৭

অংশগত মূলধন ও নিজেদের সঞ্চয়ী ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ্জ গ্রহণ করে সমিতিগুলো কারবার চালায়। ব্যবসায়ের লাভ থেকে প্রত্যেক সমিতি প্রচুর সংরক্ষিত তহবিল গড়ে তুলেছে। অধিকাংশ সমিতিই হচ্ছে অসীমদায়িত্ব বিশিষ্ট; কিন্তু কোন সভ্যকে ৫০০ পাউণ্ডের বেশী শেয়ার কিনতে দেওয়া হয়না। সমিতিগুলির সভ্যেরা যে-কোন সময় সমিতি থেকে শেয়ারের মূল্য তুলে চলে যেতে পারে। খাদ্যদ্রব্য নিয়েই সমিতির প্রধান ব্যবসায়, যদিও অন্যান্য নানারকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্যও বিক্রী করে। সমিতির সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা থাকে সাধারণ সভার ওপর, আর সভ্যদের নির্ব্বাচিত কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি সমিতির কার্য্য পরিচালনা করে। বিভিন্ন কাজ করা ও দেখার জন্য উপ কমিটিও রয়েছে।

১৯৫৬ সালের শেষে এইসব সমিতির সভ্য সংখ্যা ছিল ১'২ কোটি ও

অংশগত মূলধন ছিল ২৪·৬ কোটি পাউণ্ড। একই বছরে বিভিন্ন সমিতি মোট ৯০·৮ কোটি টাকার দ্রব্য বিক্রী করে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা দরকার। যে রচ্‌ডেলের উদ্যোক্তাদের কর্মসাফল্যে ইংল্যাণ্ডে একটি বিরাট ক্রেতা সমবায় আন্দোলন গড়ে উঠেছে। তাদের "অগ্রদূত" আখ্যা দেওয়া হয় কেন? সত্যিকারের রচ্‌ডেল সমিতিই প্রথম ক্রেতা সমবায় নয়, তার আগেও বহু ক্রেতা সমবায় গড়ে উঠেছিল। তবে রচ্‌ডেলের উদ্যোক্তাদের নিম্নলিখিত কারণে অগ্রদূত আখ্যা দেওয়া হয়েছে :—

১। সত্যিকারের এরাই প্রথম ক্রেতা সমবায় সফল করতে পেরেছিল ;

২। এরাই সমবায়ের মূলনীতিগুলো উদ্‌ঘাটন করে সেগুলিকে কাজে রূপ দিতে পেরেছিল ;

৩। এদের ক্রেতা সমবায় আন্দোলন সার্থক করার প্রচেষ্টাই শুধু ইংল্যাণ্ডে কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমবায় অন্দোলনের পথকে সুগম করতে পেরেছিল ;

৪। উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের নেতা ছিলেন। এদের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য শুধু দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা ;

৫। এরাই সমবায় পাইকারী সমিতি (যা বৃটেনে গৌরবের বস্তু) সংগঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল।

সমবায় পাইকারী সমিতি (Co-operative Wholesale Society) :

খুচরা সমবায় বিপণিগুলোর সুবিধার জন্য ১৮৬৩ সালে উত্তর ইংল্যাণ্ড সমবায় পাইকারী সমিতি নামে একটি সমতি গড়ে ওঠে। ১৮৬৭ সালে এই সমিতির নতুন নামকরণ হয়, "সমবায় পাইকারী সমিতি"। ১৮৬৪ সালে আবার স্কটল্যাণ্ডের সমবায় বিপণিগুলো তাদের নিজস্ব আর একটি পাইকারী সমিতি গঠন করে। এই সমিতির নাম হচ্ছে "স্কটিশ সমবায় পাইকারী সমিতি" (Scottish Co-operative Whoelsale Society)। পরে এই দুটো পাইকারী সমিতি কতগুলো বিশেষ কাজের সুবিধার জন্য, যথা, চা, কফি, কোকো প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য তাদের একটি সাধারণ সমিতি সংগঠন করে। এই সমিতির নাম দেওরা হয়, "ইংলিশ ও স্কটিশ যৌথ সমবায় পাইকারী সমিতি" (The English & Scottish Joint C. W. S. Ltd). সমবায় বীমা সমিতি নামে আর একটি সমিতিও গড়ে ওঠে।

সমবায় পাইকারী সমিতির সভ্য—সবরকম সমিতিই এই পাইকারী

সমিতির সভ্য হ'তে পারে। তবে কোন ব্যাক্তিবিশেষকে সভ্য করা চলেনা। ১৯৫২ সালে ১০১৯ টি সমিতি এই পাইকারী সমিতির সভ্য ছিল।

অংশগত মূলধন—প্রত্যেক সভ্যের অন্ততঃ একটি করে শেয়ার কিনতে হয়, শেয়ার বদল করা চলে, কিন্তু শেয়ারের টাকা ফেরৎ দেওয়া চলেনা। ১৯৫৩ সালের ১লা জানুয়ারীতে সমিতির মোট ২৩.৭৯২,৬২৬ পাউণ্ড অংশগত মূলধন ছিল।

অন্যান্য অর্থসংস্থানের উৎস—অংশগত মূলধন ছাড়াও সভ্য-সমিতি তাদের অধিকাংশ তহবিল এই সমিতিতে গচ্ছিত রাখে। ১৯৫৩ সালে সমিতির ব্যাঙ্কিং বিভাগে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়ায়, ১৯ কোটি পাউণ্ড, আর সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০ লাখ পাউণ্ডের উপর।

পরিচালনা—সমিতির পরিচালন ব্যবস্থা গণতন্ত্রসম্মত। প্রত্যেক সভ্য-সমিতির একটি করে ভোটদানের অধিকার থাকে। সভ্যেরাই সমিতির পরিচালন কমিটি নির্ব্বাচন করে। এই পরিচালন কমিটিতে ২৮ জন ডিরেক্টার থাকেন। প্রত্যেক ডিরেক্টার বছরে ৭৫০ পাউণ্ড করে মাইনে পান।

লভ্যাংশ—শেয়ারের অনুপাতে সমিতির লাভ সভ্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। মাল কেনার ওপরও সভ্য ও সভ্য নয় এমন সংস্থাকেও লভ্যাংশ দেওয়া হয়। তবে সাধারণতঃ সভ্যদের দেয় লভ্যাংশের অর্দ্ধেক পরিমাণ দেওয়া হয়, সভ্য ব্যতিরেকে অন্য সংস্থাকে।

উৎপাদন ব্যবস্থা—সভ্যদের মুনাফা বাড়াবার জন্যে ও মাল সংগ্রহের খরচ কমাবার জন্যে ১৮৭৩ সালে সমিতি বিভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন করার ব্যবস্থা সুরু করে। বর্ত্তমানে সমিতির ২০০টি বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা রয়েছে। সমিতির আবার একটি চায়ের কারখানা ও চা-বাগানও রয়েছে। ১০ হাজার একর জমিও রয়েছে সমিতির।

সম্প্রতি ক্রেতা সমবায়দের কাজে অনেক অসুবিধে দেখা দিচ্ছে। তাই ইংল্যাণ্ডে ক্রেতা সমবায়ের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করার জন্যে একটি সমবায় স্বাতন্ত্র্য কমিশন নিয়োগ করা হয় ১৯৫৫ সালে। এই কমিশন কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা, ব্যক্তিগত মালিকানায় দ্রব্যের দোকানের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে ও এদের লেন-দেন ক্রেতা সমবায়দের চেয়েও অনেক বেশী, ক্রমশঃই ক্রেতা সমবায়দের আয়তন কমে যাচ্ছে

ইত্যাদি। ক্রেতা সমবায়ের উন্নয়নে ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করেন :—

(১) সমিতিকে গুণসম্পন্ন ম্যানেজার রাখতে হবে ও এদের ওপর ব্যবসায় পরিচালনার অধিকতর ক্ষমতা দিতে হ'বে। শুধুমাত্র পরিকল্পনা ইত্যাদি ব্যাপারে কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি কাজ করবেন ;

(২) এক হাজারের অধিক বর্ত্তমান খুচরা ক্রেতা সমবায়গুলোকে একত্রিত করে ২০০ থেকে ৩০০ সমিতিতে পরিণত করতে হ'বে ;

(৩) বিক্রী ব্যবস্থা, ব্যবসায়ের অন্যান্য দিক ও পরিচালন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য সমবায় খুচরা উন্নয়ন সমিতি (Co-operative Retail Development Society) গঠন করতে হ'বে ;

(৪) সভ্য খুচরা সমিতির কাছে পাইকারী সমিতি বাজার দরে মাল বিক্রী করবে ইত্যাদি।

বীমা সমবায়—১৮৬৭ সালে একটি বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় ও ১৮৯৯ সালে এই কোম্পানী সমবায় সমিতি হিসেবে কাজ করতে সুরু করে। ১৯০৪ সালে এই সমবায় সমিতি সমষ্টিগত জীবন বীমার পরিকল্পনা চালু করে। এই পরিকল্পনায় একটি মাত্র বীমা পত্রে কোন সমবায় সমিতির সমস্ত সভ্যের জীবন বীমার ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য বর্ত্তমানে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের পাইকারী সমিতির যৌথ সমিতিতেই বীমার ব্যবসায় করছে।

সমবায় ইউনিয়ন—সমবায় সমিতিগুলোর বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা ও সমাধানের জন্য ব্যবসায় ভিন্ন আর একটি জাতীয় সমবায় সংস্থার প্রয়োজন। তাই ১৮৬৯ সালে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠিত হয়। ১৮৮৯ সালে এই বোর্ডই সমবায় ইউনিয়নরূপে কাজ সুরু করে। সমবায় আন্দোলনের উন্নয়নই হচ্ছে এই ইউনিয়নের মূল উদ্দেশ্য। এই ইউনিয়নের উদ্যোগে প্রতি বছর সমবায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উৎপাদন সমবায়—ক্রেতা সমবায় ছাড়াও বৃটেনে প্রায় ৪০টি উৎপাদন সমবায় রয়েছে। সাধারণতঃ বিভিন্ন শিল্পের কারিগরদের নিয়েই এসব সমিতি গঠিত হয়। অবশ্য কারিগর ছাড়াও কিছু সংখ্যক অন্যান্য লোক বা সংস্থা সভ্যভুক্ত রয়েছে। এই সব সমিতির পরিচালনা করছে, সভ্য-শ্রমিক বা কারিগররাই। এইসব সমিতি বস্ত্রাদি, জুতা, ছাপা প্রভৃতির ব্যবসায় করছে। আবার এইসব উৎপাদন সমিতি সমবায় উৎপাদন মহাসংঘ (Co-operative Productive Federation) এর সভ্য।

কৃষি সমবায়—ইংল্যাণ্ডে সাধারণতঃ তিন রকমের কৃষি সমবায় রয়েছে ; যথা—

(১) উপকরণ সমবায়,

(২) বিপণন সমবায়।

(৩) সেবা সমবায়।

উপকরণ সমবায়গুলো তাদের সভ্যদের সার, বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরবরাহ করে ; বিপণন সমিতি সভ্যদের উৎপন্ন দ্রব্য যথা, ডিম, ফল, শাক-সব্জী ইত্যাদির বিপণনের ব্যবস্থা করে ; আর সেবা সমিতি কৃষকদের বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করে, যেমন, বীজ উৎপাদন, কৃষিজাত দ্রব্যের পরিবহন, কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা ইত্যাদি। ১৯৪৯ সালে কৃষি সমবায়দের সাহায্য দানের জন্য ও দেশে কৃষি সমবায় আন্দোলনের উন্নয়নে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ সমবায় কৃষি মহাসংঘ (British Isles Federation of Agricultural Co-operative) নামে আর একটি সমিতি স্থাপিত হয়েছে।

নিম্নলিখিত তালিকা থেকে বৃটেনের কৃষি সমবায় সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাবে :

১৯৫৩ সাল

সমিতি	সমিতির সংখ্যা	সভ্য সংখ্যা	অংশগত মূলধন	ব্যবসায়
১। উপকরণ সমিতি	৭৩	৯১,০০২	৩,১৩৯,৫৬৭ পাঃ	৪১,৬৪৭,৪৫৫ পাঃ
২। বিপণন সমিতি	৯৫	৫৬,৬৯২	৮৫৮,৭৩৯ „	৩০,১৩২,৬৬৯ „
৩। সেবা সমিতি	৪০	১৫,৯৭১	১১৮,১৮৯ „	২,৫৮১,১৩৬ „
মোট :	২০৮	১৬৩,৬৬৫	৪,১১৬,৪৯৫ „	৭৪,৩৬১,২৬০ „

সমবায় শিক্ষা—দেশে সমবায় শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি সমবায় স্কুল ও কলেজ আছে। তা' ছাড়া সমবায় পুস্তকের পৃথক লাইব্রেরীও রয়েছে।

গৃহসংস্থান সমবায়—ইংল্যাণ্ডে সাধারণতঃ তিন রকমের গৃহ সংস্থান সমবায় রয়েছে। প্রথম ধরনের সমবায়ে সভ্যদের বাড়ী কেনা বা তৈরী করার জন্য শুধু ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় রকমের সমবায়ে সমিতি বাড়ী তৈরী করে, তা' সভ্যদের বিক্রী করে বা ভাড়া দেয়। আবার প্রথম রকমের

সমিতিগুলো দু' ভাগে বিভক্ত। কতগুলোকে বলা হয় 'টারমিনেটিং বিল্ডিং সোসাইটি', আবার কতগুলোকে 'পারম্যান্যান্ট বিল্ডিং সোসাইটি'। প্রথম রকমের সমিতি নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন সভ্য নিয়ে কাজ করে। সভ্যদের সাপ্তাহিক বা মাসিক চাঁদা দিতে হয়। এভাবে যখন আশানুরূপ তহবিলের সৃষ্টি হয়, তখন সমিতি এক এক জন সভ্যকে ঋণ দেয়। আর দ্বিতীয় রকমের সমিতিতে কোন নির্দ্দিষ্ট সভ্য সংখ্যা থাকে না। শেয়ার বিক্রী করে আমানত বা কর্জ্জগ্রহণ করে সমিতি মূলধন যোগাড় করে। আর এক রকমের সমিতি রয়েছে, যাদের বলা হয় প্রজাস্বত্বে অংশীদারী গৃহসংস্থান সমবায়। সমিতি যে সব বাড়ী তৈরী করে তার মালিকানা সমিতিরই থাকে। বাড়ীর মূল্যের সম পরিমাণ শেয়ার কিনতে হয় সভ্যকে। সভ্য, সমিতির প্রজা বা ভাড়াটিয়া হিসেবে বাড়ীতে বসবাস করে। সমিতি জমি কিনে সভ্যদের জন্য বাড়ী তৈরী করে। শেয়ারের টাকা ছাড়াও সমিতি প্রয়োজন বোধে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী বা সরকার থেকে দীর্ঘ মেয়াদী কর্জ্জ নেয়। ১৯০৭ সালে সমবায় সহঅংশীদারী গৃহসংস্থান সংঘ নামে একটি সমিতিও গঠিত হয়। এই সমিতির কাজ হচ্ছে, গৃহসংস্থান সমিতিদের পরস্পর যোগাযোগ রক্ষা করা ও বিভিন্ন রকমের সাহায্য করা।

ডেন্‌মার্কের সমবায় আন্দোলন

ডেন্‌মার্ক খুব ছোট দেশ। জনসংখ্যা মাত্র ৪৪ লাখ। মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ২০ জন কৃষিকার্য্যের ওপর নির্ভরশীল; কিন্তু ডেন্‌মার্কের রপ্তানীদ্রব্য মূল্যের ⅘ ভাগই হচ্ছে, কৃষিজাত দ্রব্য মূল্য। ডেন্‌মার্কে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমবায় আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই সময়ে সমবায় আন্দোলন গড়ে ওঠার মূলে কতগুলো বিশেষ কারণ ছিল, যেমন,—

(১) গ্রামের লোকদের মধ্যে একটা গভীর সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা উন্নয়ন প্রচেষ্টা সুরু হয়েছিল;

(২) শতাব্দী ধরে দেশের চাষীদের ওপর যে অত্যাচার, অবিচার চলে এসেছিল, তার অবসান হ'ল স্বাধীন সংবিধান রচনায়;

(৩) পরস্পর মিলে মিশে কাজ করার অভ্যেস্ ডেন্‌দের পুরোমাত্রায় ছিল; গ্রামীন শিক্ষা-কেন্দ্র গুলোর (Folk High Schools) অবদানও প্রচুর। সমবায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকলেও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যুবসম্প্রদায়ের ভেতর পরস্পর সংযোগ বা মিলেমিশে কাজ করার মত প্রকৃত শিক্ষাদান করেছে;

(৫) পূর্বে চাষাবাদই ছিল লোকের প্রধান উপজীবিকা; কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে কৃষিজাত দ্রব্য বিপণন বা বিদেশে রপ্তানী প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। তাই ইংল্যাণ্ডের শিল্প শ্রমিকদের ন্যায় ডেন্‌মার্কের জনসাধারণ অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পেল সমবায়ের ভেতর। অবশ্য রচ্‌ডেলের দৃষ্টান্তও এদের বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল।

সমবায় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য:

(১) ডেন্‌মার্কের অধিকাংশ সমিতি একক-উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত।

(২) স্বেচ্ছামূলকতার পূর্ণ অধিকার রয়েছে, সমিতিতে যোগদানের ব্যাপারে। সভ্যদের সঙ্গে সমিতি চুক্তিবদ্ধ এবং সমিতি ও সভ্যদের মধ্যে একটা ব্যবসায় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে;

(৩) দেশে কোন সমবায় বিষয়ক আইন নেই। তবু সমিতিগুলো কতগুলো সমবায় নিয়ম বা নীতি পুরোপুরি মেনে চলে;

(৪) সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতিতে সমবায় শিক্ষার তেমন স্থান নেই। প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ শিক্ষা কেন্দ্রগুলোই আন্দোলনের উন্নয়নে অনেকটা দায়ী।

(৫) অনেক সমবায় সমিতি আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও কাজ করছে ;

(৬) ডেন্‌মার্কের চাষী বা তাদের সমবায় সমিতি সরকার থেকে কোন দান সাহায্য পায়না ;

(৭) পল্লীঅঞ্চলে ক্রেতাসমবায়ের আধিক্য রয়েছে।

(৮) প্রত্যেক চাষী বিভিন্ন উদ্দেশ্যে স্থাপিত বেশ কয়েকটি সমিতির সভ্য রয়েছে।

১৯৫৯ সালে ডেন্‌মার্কের সমবায় আন্দোলনের রূপ নিম্নলিখিত তালিকা হ'তে সুস্পষ্ট হ'বে :—

	সমিতির শ্রেণী	সমিতিসংখ্যা	সভ্যসংখ্যা
১।	প্রাথমিক ক্রেতা সমবায়	১,২৫৩	৫,০৩,০০০
২।	সমবায় ডেয়ারী	১,১৯২	১,৬৫,০০০
৩।	সমবায় বেকন্ ফ্যাক্টরী	৬২	১,৯২,০০০
৪।	খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ সমবায়	১,৭৭৩	১,০২,০০০
৫।	সার সরবরাহ সমবায়	১,৭৫৫	১,০২,০০০

সমবায় ডেয়ারী বা দুগ্ধ সমবায় :—দেশের ১,৯৫,০০০ চাষীর মধ্যে ১,৬৫,০০০ চাষীই হচ্ছে, সমবায় ডেয়ারীর সভ্য। এসব সমবায় ডেয়ারী দেশের মোট উৎপন্ন দুগ্ধের শতকরা ৯০ ভাগ নিয়ে ব্যবসায় করছে। উৎপন্ন মাখনের মোট ⅔ ভাগ জাতীয় সমবায় মাখন রপ্তানী সংস্থার মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে।

ডেয়ারীরকাজ—(১) সভ্যদের দায়িত্ব অসীম। অধিকাংশ সমবায়ের সভ্যসংখ্যা হচ্ছে ১৪৪ জন চাষী, যাদের প্রায় ১০০০টি গাভী রয়েছে।

(২) নিজের খাওয়ার মত দুধ রেখে বাকী সব দুধ সভ্য সমিতিকে দিয়ে দেয়। এই দুধ দেওয়ার ব্যাপারে সাধারণতঃ দশ বছরের চুক্তি করা হয় ;

(৩) সমিতির জন্য যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কেনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোন ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক বা সঞ্চয়ী ব্যাঙ্ক থেকে সভ্যদের যৌথ দায়িত্বে ঋণহিসেবে নেওয়া হয় ; সমিতির মুনাফা থেকে এই ঋণ শোধ করা হয়।

(৪) সমিতির গাড়ী গিয়ে সভ্যদের কাছ থেকে দুধ নিয়ে এসে পরীক্ষান্তে মাখন আলাদা করে নেওয়া হয়। মাখনতোলা দুধ আবার সভ্যদের ফেরৎ দেওয়া হয়, দুধের গুণানুসারে সভ্যদের ১৫ দিন পর দুধের দাম দিয়ে দেওয়া হয়।

(৫) দুধে জল মেশালে বা দুধ নিয়মিত না দিলে সভ্যদের জরিমানা বা সমিতি থেকে বার করে দেওয়া হয়।

(৬) সমিতির কার্য্য পরিচালনার জন্য একটি করে কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটি থাকে। সমিতির সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা থাকে সাধারণ সভার ওপর। সাধারণ সভায় প্রতি সভ্যের একটি করে ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে।

(৭) সমিতির হিসাবপত্র পরীক্ষা করার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি একজন অডিটার নিযুক্ত করেন।

ডেয়ারী-সমবায় মহাসংঘ :—ডেন্‌মার্কের ২৪টি জেলার প্রতিটিতে একটি করে জেলা ডেয়ারী-সমবায় রয়েছে। জেলার সমস্ত ডেয়ারী সমবায়, এই সমিতির সভ্য; জেলা সমবায়গুলো তিনটি প্রাদেশিক সমবায়ের যে কোন একটির সভ্য; আবার এই তিনটি প্রাদেশিক সমবায়, ডেন্‌মার্কের মাখন ও ডেয়ারী-সমিতির জাতীয় মহাসংঘের সভ্য। আবার এই মহাসংঘ জাতীয় সমবায় কাউন্সিল (National Council of Co-operation) এর সভ্য। তা' ছাড়া ৯টি সমবায় মাখন রপ্তানীবিষয়ক সংস্থাও রয়েছে। প্রত্যেক ডেয়ারী তার সমস্ত মাখন এসব মাহাসংঘ বা মাখন রপ্তানী বিষয়ক সমবায়কে দিতে বাধ্য থাকে। মহাসংঘগুলো ডেয়ারীর মাখনের গুণ বৃদ্ধিতে গবেষণা করছে, বিশেষজ্ঞ দিয়ে ডেয়ারী পরিদর্শন ও তদারকের কাজ ইত্যাদি করছে।

সমবায় ডেয়ারীর সাফল্যের কারণ :—

(১) সমিতির অসীম দায়িত্ব (২) চাষী সভ্যদের সমিতির প্রতি অসাধারণ সহানুভূতি। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত দুধের ন্যায্য দাম দিয়ে সমিতি অনেকটা সহানুভূতি লাভ করতে পেরেছে; (৩) দুধের গুণ ও পরিমাণ দুই-ই বাড়াবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। প্রত্যেক চাষী সভ্যকে গাভীর স্বাস্থ্যরক্ষা, খাবার ইত্যাদি ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য কতগুলো নিয়ন্ত্রণ-সমিতি (Control Societies) রয়েছে; (৪) দুধের গুণ রক্ষার জন্য দুধের তৈল জাতীয় গুণের (Fat Content) ভিত্তিতে দুধের দাম দেওয়া হয়। (৫) বিজ্ঞানসম্মত ভাবে মাখন তৈরীর ব্যবস্থা রয়েছে। বিভিন্ন ডেয়ারী মহাসংঘও বিজ্ঞানসম্মত ডেয়ারী ব্যবস্থার আবশ্যকীয় তথ্য সরবরাহ করছে; (৬) মাখন রপ্তানী সংস্থাগুলো মাখন বিক্রীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করছে।

সমবায় বেকন্ (Bacon) বা শূকর মাংস সমবায় কারখানা :— সমবায় ডেয়ারীতে অসাধারণ সাফল্য অন্যান্য ক্ষেত্রে সমিতি সংগঠনের পক্ষে খুবই

অনুকূল ছিল। ডেন্‌মার্কের চাষীরা বহুকাল ধরে শূকর পোষে। সংখ্যা বাড়াতে এই পশু অদ্বিতীয়। খাদ্যের দিক্ দিয়ে কোন ভাবনা নেই। মাখন তোলার পর যে দুধ চাষী সভ্যকে ডেয়ারী-সমবায় ফেরৎ দেয়, তা' খাইয়ে শূকরদের শ্রী বাড়াচ্ছে। সমস্যা দাঁড়লো, এই অগণিত শূকরশ্রেণী নিয়ে কি করবে? কত আর নিজেরা খাবে? তাই শূকর মাংস সমবায় গঠন করা সুরু হল। শত শত শূকর কারখানায় কেটে, তার মাংস বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্যাকিং করে বিদেশে, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে চালান দিতে সুরু করল। এ ভাবে বেশ ব্যবসায় জমে গেল। অবশ্য ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে শূকর বল্লির কারখানাও ছিল প্রচুর। স্বভাবতঃই সমবায় শূকর বলির কারখানা প্রথমে বাধাও পেয়েছিল।

শূকর মাংস সমবায়ের কাজ—সাধারণতঃ যাদের মোটামুটি কিছু শূকর আছে, এদের নিয়েই এই সমিতি গড়ে উঠেছে। সমিতির দায়িত্ব অসীম, স্বভাবতঃই বড় এলাকা নিয়ে রয়েছে, এক একটা সমিতি। কিন্তু এই বড এলাকাকে আবার ছোট ছোট এলাকায় ভাগ করে সভ্যদের পরস্পর জানা-শোনার পথ সুগম করেছে। সভ্যদের ৫ থেকে ২০ বছর পর্য্যন্ত সময় কারখানায় স্থিরীকৃত শূকর দিতে হয়। প্রত্যেকটি কারখানা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরিচালিত; শূকরের মাংসের গুণ ও পরিমাণ অনুযায়ী সভ্যদের দাম দেওয়া হয়। প্রতিটি শূকর মারার আগে পশুচিকিৎসক তাকে ভাল করে পরীক্ষা করেন। শূকরের মাংস ছাড়া আরও অন্যান্য জিনিস যেমন রক্ত, হাড় সবই কাজে লাগে। সমিতির পরিচালনের ভার থাকে কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির ওপর। দৈনন্দিন কাজ করার জন্য একজন করে ম্যানেজিং ডিরেক্টরও থাকেন। এইসব শূকর মাংস সমবায়েরও মহাসংঘ রয়েছে। এই মহাসংঘ শূকরদের অল্পব্যয়ে বীমারও ব্যবস্থা করছে, বিদেশে শূকরের মাংস রপ্তানীরও ব্যবস্থা করছে ইত্যাদি।

ডিম রপ্তানী সমবায়—মুরগীপালন ডেন্‌মার্কের কৃষি ব্যবস্থার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সমবায় অল্পদামে চাষী সভ্যদের ভালজাতের মুরগী বিক্রী করে ও তাদের খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেয়। এসব সমিতির প্রধান কাজ হচ্ছে, সভ্যদের ডিম বিক্রীর ব্যবস্থা করা। সভ্যের কাছ থেকে ডিম পাওয়া মাত্র, সমিতি ডিমগুলোর ওপর সমিতির মোহর দিয়ে দেয় এবং ডিমের গুণ অনুযায়ী সভ্যদের দাম দেয়।

খাদ্যদ্রব্য, সার, সিমেণ্ট, জ্বালানীকাঠ বা, কয়লা সরবরাহের জন্য ডেন্মার্কে কতগুলো সমবায় সরবরাহ সমিতি গড়ে উঠেছে।

ক্রেতা সমবায়—অধিকাংশ দেশে সাধারণতঃ শহরাঞ্চলেই ক্রেতা সমবায় গড়ে উঠেছে। কিন্তু ডেন্মার্কে অধিকাংশ ক্রেতা সমবায়ই রয়েছে পল্লী অঞ্চলে। ডেন্মার্কে সর্ব্বপ্রথম গ্রাম্য বিপণি নিয়েই সমবায় আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৫৫ সালে এক একটি সমবায় বিপণির আয়তন গড়ে এইরূপ ছিল :—

সভ্য সংখ্যা—২৫০, ব্যবসায়—৩২ হাজার পাউণ্ড, ব্যবসায়ের উপর মোট মুনাফা—শতকরা ১৫·৮ পাউণ্ড ; পরিচালন খাতে ব্যয়—শতকরা ১২·৩ পাউণ্ড ; নীট্ উদ্বৃত্ত—৩·৫ পাঃ, সভ্যদের মধ্যে বিলি—২·৫ পাঃ, কর্ম্মচারীর সংখ্যা—৪। অধিকাংশ প্রাথমিক ক্রেতা সমবায়ের দায়িত্ব অসীম, সমিতিতে অংশগত মূলধনের পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ সব চাইতে বেশী। সভ্যদের মাল কেনার শতকরা ২ পাউণ্ড অবধি তাদেব লভ্যাংশ দেওয়া হয় ; কিন্তু এই লভ্যাংশ এদের হাতে না দিয়ে সমিতিকে সমিতির দেনা হিসেবে থাকে। বণ্টনযোগ্য উদ্বৃত্ত যদি শতকরা ২ পাউণ্ডের বেশী হয়, তা' হলে অবশ্য অতিরিক্ত সভ্যদের নগদ ফেরৎ দেওয়া হয়। এভাবে যতদিন শেয়ার ও সংরক্ষিত তহবিল মোট মূলধনের ⅓ ভাগ না হচ্ছে, ততদিন সমিতির উদ্বৃত্ত সমিতিতে রেখে নিজস্ব মূলধন বৃদ্ধি করা হয়। সমিতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধারে মাল বিক্রী করে কেননা, সমিতির ম্যানেজার ধারে মাল বিক্রী করে টাকা আদায়ের সম্পূর্ণ ভার নেয়। আবার কোন কোন সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি ধারে মাল বিক্রীর সর্ব্বোচ্চ সীমা ঠিক করে দেয়, এক্ষেত্রেও সমিতির ম্যানেজারকে সমিতির লোকসানের অর্দ্ধেক পূরণ করে দিতে হয়। সমিতির চেয়ারম্যান বছরে ৫ পাউণ্ড করে পারিশ্রমিক পান।

সমবায় পাইকারী ক্রেতা সমিতি (Danish Co-operative Wholesale Society) : ১৮৯৬ সালে এই সমিতি গড়ে ওঠে। ১৯৫৩টি খুচরা সমিতির মধ্যে ৯০৮টি হচ্ছে এই পাইকারী সমিতির সভ্য, আর বাকী সমিতিগুলো, ছোট পাইকারী সমবায় সমিতির সভ্যভুক্ত। আবার, প্রায় ৮০টি খুচরা সমিতি উভয় পাইকারী সমিতিরই সভ্য। কাঁচা-মাল প্রভৃতি সরবরাহের সুবিধার জন্য ১৪০টি কৃষি সমিতিকেও সমবায় পাইকারী সমিতির সভ্যভুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য এদের ভোটদানের কোন অধিকার

নেই। কাজের সুবিধার জন্য পাইকারী সমিতি দেশের প্রধান প্রধান জায়গায় ১৬টি বিক্রয় কেন্দ্র খুলেছে। আজকাল পাইকারী সমিতির মোট বিক্রীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে, ৮০ লাখ পাউণ্ডের উপর। এই পাইকারী সমিতির নিজস্ব সাবান তৈরীর কারখানা, ভেষজ তৈল তৈরীর কারখানা, ময়দা তৈরীর কারখানা ইত্যাদি রয়েছে। আসবাবপত্র, গেঞ্জীর জিনিষপত্র, বাইসাইকেল, চামড়ার জিনিষপত্রও এই সমিতি তৈরী করছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী বছরে অন্ততঃ ৫ পাউণ্ডের মাল কিনেছে এমন ২০টি সভ্যের জন্য ৫ পাউণ্ড করে খুচরাসমিতি পাইকারী সমিতিকে চাঁদা দেয়। মাল কেনার ওপর রিবেট থেকে খুচরা সমিতি থেকে শেয়ারের টাকা আদায় করা হয়। শেয়ারের টাকা আদায় হয়ে গেলেও, খুচরা সমিতিকে দেয় লভ্যাংশের ½ ভাগ সংরক্ষিত তহবিলে রাখা হয়।

রাশিয়ার সমবায় আন্দোলন

ভূমিকা: রাশিয়ার সমবায় আন্দোলনের উৎপত্তি ও ক্রম উন্নয়ন দেশের ঐতিহাসিক অবস্থা ও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। রাষ্ট্রের কাঠামো পরিবর্ত্তন ও তজ্জনিত অর্থনীতির রদবদলের সঙ্গে সঙ্গে সমবায় আন্দোলনের ভাগ্যও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। এইজন্যেই রাশিয়ার সমবায় অন্দোলনের রূপ অন্যান্য দেশের সমবায় আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। জারের (Czar) রাজত্বকালে সমবায়ের উন্নয়ন মোটেই সম্ভব হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে কয়েক হাজার কৃষি সমবায় গড়ে ওঠে। তারপর রাশিয়ায়, জাপান যুদ্ধের সময়ও সমবায় আন্দোলন বেশ এগিয়ে যায়—সরকার কৃষি সমিতিদের হাতে খাদ্য দ্রব্য সরবরাহের ভার ছেড়ে দেন। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের ঠিক আগে প্রায় ৫৪ হাজার সমিতি গড়ে ওঠে। এদের ভেতর ২৫০০০ ছিল ক্রেতা সমবায়। ১৯১৮ থেকে ১৯২৮ সাল সমবায় আন্দোলনের স্বর্ণময় কাল বলা যেতে পারে। নতুন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনায় (New Economic Policy) শিল্প ও কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধিতে সমবায়ের বিশিষ্ট ভূমিকা স্বীকৃত হল এই সময়। ১৯২৮ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাই বৃহদাকারে চাষাবাদ ও দ্রব্য সরবরাহে সমবায়ের আবশ্যকীয় কাজ বেঁধে দেওয়া হ'ল।

বিভিন্ন সমবায়:

ক্রেতা সমবায়—১৮৬৩ সাসে প্রথম ক্রেতা সমবায় গড়ে ওঠে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব অবধি প্রায় ২৫ হাজার খুচরা ক্রেতা সমবায় ও একটি পাইকারী ক্রেতা সমবায় (Centro Soyus) বেশ ভাল কাজ করে। ১৯১৮ সালে ব্যক্তিগত ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর ক্রেতা সমবায়গুলোর কাজ অনেক বেড়ে যায় বটে, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য যায় অনেক কমে। এদের পরিচালনা ও দৈনন্দিন কাজে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রকট হয়ে ওঠে। অবশ্য নতুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় সমিতিগুলো আবার এদের স্বাতন্ত্র্য ফিরে পায়।

রাশিয়ায় সর্ব্বনিম্ন পর্য্যায়ে প্রাথমিক ক্রেতা সমবায়, জেলাপর্য্যায়ে জেলা ক্রেতা সমবায় ইউনিয়ন, অঞ্চল পর্য্যায়ে আঞ্চলিক ক্রেতা সমবায় ইউনিয়ন ও আবার কেন্দ্রীয় ক্রেতা সমবায় ইউনিয়নও রয়েছে। শহরাঞ্চলে ক্রেতা সমবায়গুলোকে 'গোরপস্' ও পল্লী অঞ্চলে 'সেলপস্ (Selpos) বলা হয়।

সেণ্ট্রাসয়াস্ (Cntro Soyus) সমবায় ইউনিয়ন ও সমবায় পাইকারী ক্রেতা সমিতির কাজ করছে। একে শীর্ষ ক্রেতা সমবায় বলা চলে।

প্রাথমিক সমিতির কাজ—এসব সমিতিতে যোগদান স্বেচ্ছামূলক। অধিকাংশ সভ্যই হচ্ছে যৌথ খামারের চাষী বা শিল্প শ্রমিক বা পল্লীবাসী। সভ্য হ'তে গেলে ভর্ত্তি ফি ও শেয়ার বাবত কিছু দিতে হয়। প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক বা বিশেষ সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ সাহায্য সমিতি পায়। শীর্ষ সমিতি একসঙ্গে বহুমাল কিনে সভ্য-সমিতিদের মধ্যে বিলি করে; আবার প্রাথমিক সমিতিগুলো সরকারী শিল্প সংস্থা, উৎপাদন সমবায় ও যৌথখামার থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনে। •আবার অনেক সমিতির নিজস্ব পণ্য দ্রব্যের কারখানাও রয়েছে। কোন কোন সমিতি চায়ের দোকান, খাবারের দোকানও চালায়। তিনমাস পর পর সমিতির সাধারণ সভা হয়। সাধারণ সভায় উপবিধি সংশোধন, কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি গঠন; অডিট কমিটি গঠন ও অন্যান্য কাজ করা হয়। প্রত্যেক সমিতির মাসিক বিক্রীর পরিমাণ আগে থেকেই স্থির করা হয়। এই স্থিরীকৃত পরিমানের বেশী বিক্রী করতে পারলে কর্মচারীদের মাইনের শতকরা ১০ রুবল পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়। রাশিয়ায় সমবায় বেকারী ও (Bakeries) ভাল কাজ করছে। ১৯৪০ সালে এইসব বেকারীর সংখ্যা ছিল, ২৬,৫০০। ক্রেতা সমবায়ের লাভের শতকরা ২০ ভাগ, লভ্যাংশ হিসেবে দেওয়া হয়, ১০ ভাগ সমিতির উন্নয়ন তহবিলে যায়, ১৫ ভাগ সাংস্কৃতিক তহবিলে, ৫ ভাগ শিক্ষাখাতে, আর বাকীটা সংরক্ষিত তহবিলে রাখা হয়। ১৯৫৮ সালের শেষে প্রাথমিক ক্রেতা সমবায়ের সংখ্যা ছিল ২০ হাজার।

জেলা ক্রেতা সমবায় ইউনিয়ন—জেলার প্রাথমিক ক্রেতা সমবায়গুলো এর সভ্য। এই ইউনিয়নের নিজস্ব অনেক উৎপাদন-কারখানাও রয়েছে। করখানায় উৎপন্ন দ্রব্য ও অন্য কোথাও থেকে মালপত্তর কিনে প্রাথমিক সমিতিদের পাইকারী দরে বিক্রীর ব্যবস্থা করে।

আঞ্চলিক ক্রেতা সমবায় ইউনিয়নও জেলা সমবায় ইউনিয়নের অনুরূপ কাজ করে।

কেন্দ্রীয় ক্রেতা সমবায় ইউনিয়ন (Centro Soyus):—রাশিয়ার সমস্ত ক্রেতা সমবায়দের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা, সমিতির সুষ্ঠু পরিচালনায় পরামর্শ দান, পাইকারী ব্যবসায়, ক্রেতা সমবায়দের হ'য়ে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন, বিদেশ থেকে ভোগ্য পণ্য আমদানী, ক্রেতা সমবায়দের নিয়ে

বার্ষিক সম্মেলন বা সভা আহ্বান ইত্যাদি এর কাজ। এই সমিতির পাইকারী ব্যবসা বিষয়ক ছয়টি বিভাগ আছে, যথা, (১) সৌখিন জিনিসপত্র বিভাগ, (২) শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিভাগ, (৩) শিল্পজাতদ্রব্য বিভাগ, (৪) লৌহ-ইস্পাত বিভাগ, (৫) পাট ইত্যাদির বিভাগ ও (৬) মুদি দ্রব্যের বিভাগ। সমিতির সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা কংগ্রেসের উপর। এই কংগ্রেস বা সাধারণ সভা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বসে। কার্য্য পরিচালনার জন্য একটি পরিচালন কমিটি ও রয়েছে।

সমবায় ঋণ—যৌথ খামার প্রবর্ত্তনের পর কৃষি ঋণদান সমিতিগুলোর আর অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কই স্বল্প-মেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা করে; আর বিশেষ সমবায় ব্যাঙ্ক (Special Co-operative Bank) দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দেয়।

মৎস্যজীবী সমবায়—রাশিয়ার মৎস্যজীবীদের প্রায় শতকরা ৯৬ জন সমবায়ের মাধ্যমে কাজ করছে। ১৯৩৬ সালে এ ধরণের সমিতির সংখ্যা ছিল ১,৬৪০টি। দেশের মোট মৎস্য সরবরাহের শতকরা ৬০ ভাগ এসব সমবায় সমিতির কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

হস্তশিল্প সমবায়—বহুকাল ধরে রাশিয়ায় হস্তশিল্প সমবায় কাজ করছে। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের আগে বিভিন্ন হস্তশিল্পের কারিগররা একসঙ্গে কাজ করত। এই একসঙ্গে কাজ করার সংস্থাকে বলা হ'ত 'আর্টেল' (Artel)। ছুঁতোর মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি শ্রেণীর কারিগরদের নিজস্ব 'আর্টেল' ছিল। পুঁজী-বাদীরা এসব 'আর্টেলে'র মাধ্যমে চুক্তিতে কোন শিল্পদ্রব্য বা নির্মাণমূলক কাজ করিয়ে নিত। সাধারণতঃ ন্যায্য মজুরী পাওয়ায় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করায় কারিগররা এইসব 'আর্টেল'এ যোগদান করত। ১৯১৭ সালের পর থেকে বিভিন্ন 'আর্টেল', সমবায় সমিতিতে রূপান্তরিত হ'তে সুরু করে এবং প্রায় ৪,৫০০ সমবায় গড়ে ওঠে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলোর পরিপূরক বা সহযোগী সমবায় শিল্প হিসেবে। ১৯৩৭ সালে এ ধরণের সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ হাজার। সাধারণতঃ বর্ত্তমানে তিন রকমের শিল্পদ্রব্য উৎপাদন সমবায় রাশিয়ায় রয়েছে, যথা, (১) কোন কোন সমিতি কাঁচামাল সরবরাহ করছে, সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যও উৎপন্ন করছে; (২) কোন কোন সমিতির সভ্যেরা নিজ নিজ বাড়ীতে দ্রব্য উৎপাদন করে সমিতিকে দিচ্ছে, আবার (৩) কোন কোন সমিতিতে সমিতির কারখানায় সভ্যেরা উৎপাদনের কাজ করছে। এইসব সমিতিতে যেসব জিনিস উৎপন্ন হ'বে, তা' রাষ্ট্রায়ত্ত কোন শিল্প সংস্থায় উৎপন্ন করা চলবে না।

কৃষি সমবায়—জারের (Czar) আমলে দেশের ⅔ ভাগ উর্ব্বর জমি ছিল জমিদারও বড় বড় চাষীদের হাতে। অধিকাংশ চাষীর জমি একেবারে ছিল না বললেই চলে। ১৯১৭ সালের রাজনৈতিক বিপ্লবের ঠিক আগে মোট জমির মাত্র শতকরা ১০ ভাগ ছিল ব্যক্তিগত চাষীর কাছে। বিপ্লবের পর অবশ্য বহু জমি জমিদারের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় ও ভূমিহীন চাষীকে বিলি করা হয়। তা' সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদন মোটেই বাড়েনি। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময় ১৬৫০০টি ঋণ সংস্থা, ৮০০০টি কৃষি সংস্থা ও প্রায় ৫০০০ উৎপাদন সংস্থা ছিল। কিন্তু নতুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকালে কৃষিক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে। ১৯২৭ সালে ৮০,০০০ কৃষি সমবায় গড়ে ওঠে। নতুন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পর ৫০ বছর কৃষিক্ষেত্রে আর কোন পরিবর্ত্তন ঘটেনি। চাষী তার ছোট ছোট খামারে কৃষিকার্য্য করে যাচ্ছিল। শীঘ্রই বড় খামার ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হল। তাই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যৌথ খামারের রূপ সুস্পষ্ট হয়ে যায়। ১৯৩৮ সালের শেষে প্রায় ২,৪২,৪০০টি যৌথ খামার গড়ে ওঠে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'কোলখোজ'।

কোলখোজ—রাশিয়ার কোলখোজগুলো ৬০০ থেকে ১৮০০ একর জমি নিয়ে চাষাবাদের কাজ করছে। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৪০ সাল অবধি রাশিয়ার ১৯০ লাখের ওপর চাষী পরিবার কোলখোজে যোগদান করেছে। ১৬ বছরের পুরুষ, মহিলা নির্ব্বিশেষে কোলখোজে যোগদান করতে পারে। চাষীদের সমস্ত কৃষি যন্ত্রপাতি ও কৃষি উপকরণ নিয়ে কোলখোজে আসতে হয়। প্রত্যেক সভ্যের কাছ থেকে ভর্ত্তি ফি আদায় করে, তা' সংরক্ষিত তহবিলে রাখা হয়। কোন সভ্য কোলখোজ ছেড়েও চলে আসতে পারে। চলে আসার সময় জমিও ফিরে পেতে পারে। সভ্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে কিন্তু 'কোলখোজের' কোন হাত নেই। ব্যক্তিগত চাষের জন্য সভ্যদের ¼ একর থেকে ২½ একর জমি অবধি রাখতে দেওয়া হয়।

কোলখোজের পরিচালন ব্যবস্থা—কোলখোজের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা রয়েছে সাধারণ সভার ওপর। সাধারণ সভা কার্য্যনির্ব্বাহক বোর্ড, চেয়ারম্যান ও অডিট কমিটি নির্ব্বাচিত করে। তা' ছাড়া সভ্যদের বহিষ্কার, বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদন প্রভৃতি কাজও সাধারণ সভা করে থাকে। সাধারণ সভায় মোট সভ্যের অর্দ্ধেক উপস্থিত থাকতে হয়। দৈনন্দিন

কাজকর্ম দেখা হচ্ছে চেয়ারম্যানের কাজ। আর্থিক ব্যাপারে পরীক্ষার কাজ করে 'অডিট কমিটি'।

খামারের কাজ—খামারে যারা কাজ করে তাদের কাজের গুণাগুণ ও পরিমাণ অনুযায়ী পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা রয়েছে। চাষাবাদের কাজে চাষী সভ্যদের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য শ্রমিক-উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কার্য্যদিন (work days) বাড়িয়ে বিশেষ বোনাস্ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। খামারের কাজ করার জন্য সভ্যদের কয়েকটি ব্রিগেড্ বা দলে ভাগ করে দেওয়া হয়, যেমন, (১) যারা শারীরিক পরিশ্রম করে কাজ করবে, যন্ত্রপাতির সাহায্য নেবে না, তাদের নিয়ে একটি দল, (২) যারা ট্রাক্টর নিয়ে কাজ করবে তাদের নিয়ে একটি দল, এবং (৩) যারা খামারের ডেয়ারীতে কাজ করবে, তাদের নিয়ে একটি দল। প্রত্যেক দলের নির্দ্দিষ্ট এলাকা থাকে। এক একটি দলে ৩০ জন থেকে ৮০ জন অবধি শ্রমিক সভ্য থাকে। আবার প্রত্যেক দলে একজন করে দলপতি বা Brigade Leader থাকে। দলের সভ্যদের দলপতির নির্দ্দেশ মেনে চল্‌তে হয়। সরকার নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক সভ্যকে বছরে কম পক্ষে ১৫০ দিন কাজ করতে হ'বে।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সার, উন্নত ধরনের বীজ অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। তা' ছাড়া রাষ্ট্রের "মেশিন ট্রাক্টর ষ্টেশন"গুলো কোলখোজগুলোকে প্রচুর সাহায্য করছে। এসব ষ্টেশনে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর প্রভৃতি যন্ত্র মেরামতের কারখানা, কৃষি ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ্ ইত্যাদিও রয়েছে। বিশেষ সর্ত্তে প্রতিটি ষ্টেশন অন্ততঃ গড়ে ৩০টি কোলখোজের কাজ করে। এ সমস্ত সাহায্যের বিনিময়ে ট্রাক্টর ষ্টেশন, কোলখোজের মোট উৎপন্ন শস্যের কিছু অংশ পায়। ১৯৪১ সালে মোট ৬,৬৪২টি "মেশিন ট্রাক্টর ষ্টেশন" ছিল। তাদের মোট ৪,৯৭,০০০টি ট্রাক্টর, ১,৪০,০০০টি শস্য কাটার যন্ত্র ছিল।

কোলখোজের আয় কি করে ভাগ করা হয়?

(১) সরকারী দেনা শোধ, যথা, কৃষি আয়কর, বীমা খরচ, সরকার থেকে নেওয়া কর্জ্জ শোধ ইত্যাদি।

(২) চাষাবাদের খরচা, যেমন, উৎপাদন ব্যয়, পরিচালন খাতে ব্যয় (২% এর বেশী নয়), ক্ষয়পূরণ (Sinking) তহবিলে জমা (১০ থেকে ২০%এর বেশী নয়), চাষীদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক খাতে ব্যয় ইত্যাদি। নীট্ আয়ের

সবটা খামারের সভ্যদের নিজ নিজ কার্য্যদিনের ভিত্তিতে নগদ টাকায় বা সমতুল্য দ্রব্যে দেওয়া হয়।

কোলখোজকে সমবায় বলা যায় কি-না—যদিও কোলখোজের কাজ যতটা সম্ভব গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে চলে, তবু গণতান্ত্রিক সমবায় ব্যবস্থার পূর্ণরূপ এদের নেই। এদের কার্য্য পরিচালনের ক্ষেত্রে সরকার অনেক কিছুই করতে পারেন। প্রকৃত পক্ষে, কৃষিক্ষেত্রে সরকারী নীতি বা পরিকল্পনা রূপায়ণে, এরা অনেকটা সরকার-নিয়ন্ত্রিত সংস্থা। অবশ্য সমবায়ের কতগুলো গুণ এদের আছে, যেমন,

(১) সভ্যপদ ঐচ্ছিক। সভ্য ইচ্ছা করলে যৌথ খামারে যোগদান করতেও পারে, নাও করতে পারে এবং এই সভ্যপদ সবার জন্য উন্মুক্ত ;

(২) যৌথ খামারের কাজ অন্যান্য সমবায়ের মতো কার্য্য পরিচালনা বোর্ড ও সাধারণ সভা পরিচালনা করে ;

(৩) সত্যিকারের কাজের ভিত্তিতেই শ্রমিক চাষী সভ্যদের মধ্যে খামারের মুনাফা ভাগ করে দেওয়া হয়। কিন্তু কোলখোজের এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যাতে করে এদের সমবায় সমিতি আখ্যা দেওয়া চলেনা, যেমন, (ক) রাশিয়ার আইন অনেকটা পরোক্ষভাবে চাষীদের কোলখোজে যোগদান করতে বাধ্য করে ; (খ) যৌথ খামারের নিজস্ব পরিচালন বোর্ড থাকা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারই এদের কার্য্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করেন যেমন, উৎপাদন পরিকল্পনা রচনা করে দেন, সভ্যদের কাজেরও একটা পরিকল্পনা করে দেন। এসব ব্যাপারে কিন্তু সত্যিকারের সভ্যদের কিছুই করার নেই। স্থিরীকৃত কাজ এদের করে যেতে হয় ; (গ) যৌথ খামারগুলো সরকার পরিচালিত "মেশিনট্রাক্টর ষ্টেশন", "রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক", রাষ্ট্রীয় বীমা সংস্থার ওপর নির্ভরশীল। তা'ছাড়া পরিচালন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে সাধারণতঃ একজন কমিউনিষ্ট কেন্দ্রীয় পার্টির লোক থাকেন।

চীনদেশের সমবায় আন্দোলন

অন্যান্য দেশের ন্যায় চীনদেশের সমবায় আন্দোলনের শীর্ষস্থানে রয়েছে একটি শীর্ষ সংস্থা, যার নাম হচ্ছে "সর্ব্বচীন সমবায় সংঘ (All China Federation of Co-operatives)"। এই সংঘ ১৯৫০ সালে গঠিত হয়। তা' ছাড়া বিভিন্ন কাজের জন্য রয়েছে ২৮টি প্রাদেশিক সংঘ, আর ৬টি আঞ্চলিক সংঘ। প্রাথমিক পর্য্যায়েও বহু স্থানীয় সমবায় সমিতি রয়েছে।

সমবায় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ঃ

চীনদেশে কৃষি উৎপাদন সমবায়গুলোর কতগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে; যেমন, (১) জেলা বা রাজ্যপর্য্যায়ে উৎপাদন সমবায়দের কোন মহাসংঘ নেই, (২) সমবায়গুলোর উৎপাদন পরিকল্পনা সরকারকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়, (৩) প্রত্যেক সমবায় সমিতিতে কমিউনিষ্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য রয়েছে। স্বভাবতঃই সমিতিগুলোর সমবায় প্রকৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ হ'তে পারে। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে, চীনদেশের সমবায়, রাষ্ট্রের নীতি অনুযায়ী গড়ে উঠেছে; কেননা পরিকল্পিত অর্থনীতিতে সমবায় তার নিজস্ব পথ বেছে নিতে পারে না। আর্থিক কাজের সঙ্গে রাজনীতির কাজও সমবায়গুলোকে করতে হয়।

কৃষি সমবায় ঃ কৃষি উৎপাদনক্ষেত্রে চার রকমের সংস্থা রয়েছে :—

১। অস্থায়ী পরস্পর সহায়ক দল (Mutual Aid Team)—এই প্রতিষ্ঠানে সভ্যরা শ্রম, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি একত্র করে একটা দল গঠন করে ব্যক্তিগত চাষীদের জমিতে চাষাবাদ করে অধিকতর কৃষিদ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে। এ ধরণের পরস্পর সহায়ক দলগুলোকে পরে উৎপাদন সমবায়ে রূপান্তরিত করা হয়।

২। স্থায়ী পরস্পর সহায়ক দল (Permanent Mutual Aid Team)—এদের কাজ অনেকটা অস্থায়ী পরস্পর সহায়ক দলের মত।

৩। কৃষি উৎপাদনকারী সমবায়—এ ধরণের সমবায়ে সভ্যরা তাদের জমি একত্র করে যৌথ চাষের ব্যবস্থা করে।

৪। উন্নত কৃষি উৎপাদনকারী সমবায় (Advanced Agricultural Producers' Co-operatives)—প্রাথমিক উৎপাদনকারী সমবায়গুলোকে রূপান্তরিত করেই এ ধরণের উন্নত উৎপাদনকারী সমবায় গড়ে উঠেছে।

প্রাথমিক সমিতিতে সভ্যদের জমির ওপর কোন স্থিরীকৃত টাকা বা চাষাবাদের যাবতীয় খরচা বাদ দেওয়ার পর নীট্ উৎপাদনের একটি স্থিরীকৃত অংশ সভ্যদের দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু উন্নত উৎপাদন সমিতিতে জমির ওপর কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা নেই।

উন্নতকৃষি উৎপাদনকারী সমবায়—

সমিতির রেজিষ্ট্রেশন—১৯৫৬ সালে কৃষি উৎপাদনকারী সমবায়ের সংখ্যা ছিল মোট ১০ লাখ, সরবরাহ ও বিপণন সমিতি ৩০ হাজার, আর ঋণদান সমবায় ১ লাখ ১০ হাজার, হস্তশিল্প সমবায় ১১ লাখ। ভারতের ন্যায় চীনদেশে কোন পৃথক সমবায় আইন বা সমবায় নিয়ামক নেই। পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত কতগুলো নিয়ম-কানুন সমবায় সমিতির উপবিধিতে সন্নিবেশ করতে হয় মাত্র। সমিতিগুলো নিজেরাই নিজেদের উপ-বিধি তৈরী করে।

সভ্য—১৬ বছর বয়সের যে কোন পুরুষ বা স্ত্রী, চাষী সমিতির সভ্য হতে পারে। পূর্ব্বেকার জমিদার, ধনী চাষী প্রভৃতি শ্রেণীর জন্য প্রার্থী সভ্য (Candidate Membership) হিসেবে সমিতিতে যোগদানের ব্যবস্থাও রয়েছে।

উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত চাষীর জমি একত্র করে যৌথ চাষ করে উৎপাদন বৃদ্ধিই সমিতির মূল উদ্দেশ্য। সভ্যদের ব্যক্তিগত ভাবে চাষাবাদের জন্য ১ একরের কিছু বেশী জমিও দেওয়া হয়। সভ্যেরা সমিতিতে কাজ করে মাইনে পায়। বছরের ফসল উঠে গেলে যে কোন সভ্য সমিতি ছেড়ে চলে যেতে পারে, চলে যাওয়ার সময় তার জমি, শেয়ারের টাকা সব ফেরৎ দেওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে।

অংশগত মূলধন—সভ্যদের সমিতির শেয়ার কিনতে হয়। শেয়ারের ওপর কোন লভ্যাংশ বা সুদ দেওয়া হয় না।

জমি ও অন্যান্য উৎপাদনের উপায়—প্রাথমিক সমিতিতে ব্যক্তিগত চাষীর মালিকানা অক্ষুন্ন থাকে। জমির পরিমাণ ও গুণ অনুসারে মালিককে কিছু খাজনা বা লভ্যাংশ দেওয়া হয়।

সংগঠন ও পরিচালন ব্যবস্থা—সমিতির সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা থাকে সাধারণ সভার। ৫ থেকে ১৫জন সভ্য নিয়ে একটি পরিচালন কমিটিও নির্ব্বাচন করা হয়ে থাকে। ছোট সমিতির পরিচালন কমিটিতে ২ থেকে ৩ জন ভাইস্-চেয়ার-ম্যান থাকেন, আর বড় বড় সমিতিতে ৫।৬ জন পর্য্যন্ত ভাইস্-চেয়ারম্যান থাকেন।

চেয়ারম্যানের কাজ—উৎপাদন ব্যবস্থা ও জন-সংযোগ ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করা ;

১ম ভাইস চেয়ারম্যানের কাজ—ব্যবসায়, পরিকল্পনা ও কারিগরী দিকে নজর রাখা ;

২য় ভাইস চেয়ারম্যানের কাজ—কৃষি ছাড়া অন্যান্য অবসরকালীন কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা ;

৩য় " —মহিলা সভ্যদের ওপর নজর রাখা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা ;

৪র্থ " —সমিতির নিরাপত্তার ব্যবস্থা ;

৫ম " —অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা।

হিসাবপত্র—সমিতির হিসাবপত্র পরীক্ষার জন্য সরকারী কোন কর্মচারী নেই। সমিতির সুপারভাইজরী কমিটিই হিসাবপত্র পরীক্ষা করার ভার নেয়।

কাজ—প্রত্যেক সমিতিকে বাৎসরিক উৎপাদনের একটা পরিকল্পনা তৈরী করতে হয়। আবার সভ্যদের জন্য মাসিক বা সাপ্তাহিক কাজের তালিকাও তৈরী করা হয়। সমিতির সভ্যদের কয়েকটি দলে ভাগ করে, পৃথক পৃথক কাজের ভার দেওয়া হয়। প্রত্যেক দলে আবার একজন করে দলপতিও থাকে, দিনের কাজের শেষে দলপতি প্রত্যেক সভ্যের কাজ যাচাই করে নিয়ে তার পারিশ্রমিক পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে ঠিক করে দেয়। প্রত্যেক দল সমিতিকে নিম্নতম উৎপাদনের একটা অঙ্গীকারনামা দেয়। যদি এই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের বেশী উৎপাদন করতে পারে, তা' হলে দলকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয় ; আর যদি স্বিরীকৃত পরিমাণের কম উৎপন্ন হয়, দলকে খেসারৎও দিতে হয়, অবশ্য প্রতিটি দল যা'তে সুষ্ঠুভাবে চাষাবাদের কাজ করতে পারে, তার জন্য যাবতীয় সাহায্য সমিতি করে থাকে।

আয় বণ্টন—সমিতির আয় সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা হয় :—

(১) পরবর্ত্তী বছরের উৎপাদন খরচা বাবত আনুমানিক টাকা আলাদা করে রাখা হয় ;

(২) প্রথমাবস্থায় সমিতির বার্ষিক নীট্ আয়ের শতকরা ৫ ভাগের অনধিক সংরক্ষিত তহবিলে জমা দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে সংরক্ষিত তহবিলে টাকা রাখার পরিমাণ শতকরা ৮ ভাগ (খাদ্যশস্যের বেলায়) আর শতকরা ১২ ভাগ

(অর্থকরী শস্তের বেলায়) দাঁড়িয়েছে। জমির উন্নয়ন, কৃষি যন্ত্রপাতি কেনা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত তহবিল ব্যবহৃত হয় ;

(৩) প্রাথমিক সমিতি ও উন্নত সমবায়ের বার্ষিক নীট্ আয়ের শতকরা যথাক্রমে ১ ভাগ ও ২ ভাগ জনহিতকর তহবিলে জমা দেওয়া হয়। এই তহবিল সাধারণ জনহিতকর কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আর যা বাকী থাকে তা, শেয়ার তহবিলে জমা দেওয়া হয় এবং জমির মালিকানার খাজনা বা লভ্যাংশ ও শ্রমিক সভ্যদের পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হয়।

কম্যিউন্ কি ?—কয়েকটি সমষ্টিগত চাষ সংস্থা বা প্রাথমিক উৎপাদনকারী সমবায়দের একত্র করে 'কমিউন্' গঠিত হয় : এই 'কমিউন্'গুলো হচ্ছে শিল্প, কৃষিকার্য্য, ব্যবসায়, শিক্ষা, কৃষ্টি, রাজনীতি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, দেশরক্ষা বিষয়ক সামাজিক কেন্দ্র ; আর প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলো হচ্ছে কৃষি উৎপাদনে এক একটি বিশেষ সংস্থা। 'কমিউন্' এ জমি, বাড়ী ও অন্যান্য সম্পত্তির মালিকানার বিলোপ ঘটিয়েছে। এখানে চাষীকে স্থিরীকৃত আয়ের (খাদ্য হিসেবে ও অন্যান্য জীবন ধারণ উপযোগী দ্রব্যাদি ও সাহায্যাদির) বিনিময়ে কাজ করতে হয়। প্রত্যেক সভ্যকে আবার বন্দুক, রাইফেল ইত্যাদি দিয়ে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করা হয়। যৌথ চাষ ও আর্থিক ব্যবস্থা, বস-বাস, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির দৃষ্টান্ত হচ্ছে এক একটি 'কমিউন'। 'কমিউন্'গুলো কিন্তু সমবায় সমিতি নয়।

সরবরাহ ও বিপণন সমিতি—নতুন চীনদেশে পল্লীঅঞ্চলে অবস্থিত সরবরাহ ও বিপণন সমিতির সংখ্যা দেশের অন্যান্য সমিতির সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। এ সব সমিতির কাজ হচ্ছে সভ্যদের উৎপন্ন শস্য ও অন্যান্য দ্রব্য বিপণনের ব্যবস্থা করা। সমিতি আবার সভ্যদের কৃষি যন্ত্রপাতি, বীজ, সার ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও সরবরাহ করে। সরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো এদের ভোগ্য-পণ্য কম দামে সরবরাহ করে ও সমিতির শস্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রীর ব্যবস্থা করে।

শিল্পসমবায় :

হস্তশিল্প সমবায়—চীনদেশে তিনরকমের হস্তশিল্প সমবায় রয়েছে, যথা (১) উৎপাদনকারী দল (২) সরবরাহ ও বিপণন সমবায় ও (৩) হস্তশিল্প উৎপাদনকারীদের সমবায়।

(১) উৎপাদনকারী দল—এ ধরণের সংস্থা যৌথভাবে শিল্প সমবায়দের পক্ষ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে ও তাদের উৎপন্নদ্রব্য বিক্রী করার ব্যবস্থা করে। প্রতি সংস্থায় বা দলে সামান্য কয়েকজন সভ্য থাকে। সভ্যগণ সাধারণতঃ নিখুঁত কারিগর বা ছোট ছোট শিল্প কারখানার মালিক।

(২) সরবরাহ ও বিপণন সমবায়—এ ধরণের হস্তশিল্প সরবরাহ ও বিপণন সমবায় হাতের কাজ জানা কারিগরদের নিয়ে গঠিত হয়। হস্তশিল্প কারিগরদের সঙ্গে সরবরাহ ও বিপণন সমবায় ক্রেতা সমবায় বা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনই হচ্ছে প্রধান কাজ। কাঁচামাল সংগ্রহ উৎপন্ন দ্রব্য বিপণন, অর্ডার সংগ্রহ ইত্যাদি কাজ এই যোগাযোগের প্রধান অঙ্গ।

(৩) হস্তশিল্প উৎপাদনকারী সমবায়—নিজ নিজ বাড়ীতে কাজ না করে কারিগরগণ সমিতিতে একসঙ্গে কাজ করে। এধরণের সমবায় অনেকটা কারখানা জাতীয় শিল্প সমবায়ের মত। ১৯৫৩ সালে হস্তশিল্প সমবায়ের সংখ্যা ৪,৮১৩টি এবং সভ্যসংখ্যা ছিল ৩ লাখ, আজকাল রাষ্ট্রীয় শিল্প সংস্থাগুলোও হস্তশিল্প সমবায়গুলোকে অল্পদামে যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা, কারিগরদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা বা পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নে যথেষ্ট সাহায্য করছে। তা'ছাড়া সরকারও কর দেওয়ার ব্যাপারে এ সব হস্তশিল্প সমবায়কে যথাসম্ভব রেহাই দিচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কও অল্পসুদে এ সব সমবায়দের ঋণ যোগাচ্ছে। এসব ব্যবস্থা শুধু হস্তশিল্প সমবায় উন্নয়নের জন্যেই নয়, কারিগররা যাতে সমবায়ের মাধ্যমে ক্রমশঃ সমাজতান্ত্রিক আওতায় আসতে পারে, তার জন্যেও বটে।

সাধারণ শিল্প সমবায়—২০ বছর বয়স্ক অন্ততঃ সাতজন কারিগর মিলে একটি শিল্প সমবায় গড়ে তুলতে পারে। রেজিষ্ট্রীকৃত অন্য কোন সংস্থা যাদের মুনাফা উদ্দেশ্য নয়, তারাও শিল্প সমবায়ের সভ্য হ'তে পারে। সমিতির কারখানায় সভ্যদের কাজ করতে হয়। সমিতির কাজ হচ্ছে—

(১) মালপত্তর ও যাত্রী পরিবহনের ব্যবস্থা করা ;

(২) শ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন ;

(৩) শিল্পদ্রব্য তৈরী করা ও বিক্রী করা ;

(৪) কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি কেনা ;

(৫) অন্যান্য শিল্প সমবায়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন। এ ধরণের Indusco বা শিল্প সমবায় ডাঃ সান্‌ইয়াৎ সেনের আমল থেকে গড়ে ওঠে।

১৯৫১ সালের চীনদেশের সমবায় আন্দোলনের রূপ নিম্নলিখিত তালিকা হ'তে বোঝা যাবে :—

সমিতি	সমিতির সংখ্যা	মোট সমিতির শতকরা কত ভাগ	সভ্যসংখ্যা (হাজারে)	মোট সভ্যসংখ্যা শতকরা কত ভাগ	আদায়ীকৃত অংশগত মূলধন
সরবরাহ ও বিপণন সমিতি	৩৬,৩৯০	৮৬'৭	৪৩৬১৯'০০০	৮৪'৩	২২১২১৭
ক্রেতাসমবায়	৪,৪৩৫	৯'৫	৬৩০১'৬৪০	১২'৩	৭৯৩৫৩
উৎপাদনকারী সমবায় :—					
(১) শিল্প	৯৬৭	২'৪	২২১'৪৭২	০'৪	২১১৬০
(২) কৃষি	২০০				
অন্যান্য সমিতি	৪৩৩	১'৪	৮৫৭'৮৮৮	৩'০	৭২৯২

(অঙ্ক দশলাখ ইউয়ানে)

জার্ম্মাণীর সমবায় আন্দোলন

জার্ম্মাণীর সমবায় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দু'জন মনীষী—এফ র‍্যাফাইসেন (F. Raiffeisen) এবং এফ্, স্থলজ্ (F. Schulze)। দু'জনেরই উদ্দেশ্য ছিল সহজ উপায়ে ও সুলভ হারে সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষক, স্বল্পবিত্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের জন্য ঋণদানের ব্যবস্থা। কিন্তু তাদের কর্মস্থল ও কর্ম পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। র‍্যাফাইসেন কাজ করেছিলেন গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে আর স্থলজ্ সহরে সামান্য আয়ের লোকদের মধ্যে।

র‍্যাফাইসেন ১৮১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে সামরিক বিভাগে যোগ দেন। কিন্তু কিছুদিন পর চোখের অসুখ হওয়ায় তাকে ঐ চাকৃরী ছেড়ে দিতে হয়। তারপর তিনি জার্ম্মাণ সরকারের অধীনে অন্য একটি চাকৃরী গ্রহণ করেন। সরকারী কর্মচারী হিসাবে ঐ সময়ে তাঁকে গ্রামের লোকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আস্‌তে হয়। ১৮৪৬ সালে ওয়েষ্টার-ওয়াল্ড জেলায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়। লোকে পেটের জ্বালায় ঘরবাড়ী, চাষের জমি মহাজনদের কাছে বন্ধক দিয়ে চড়া সুদে টাকা ধার নিতে থাকে। কিন্তু তারা কিস্তিমত টাকা পরিশোধ করতে না পারায় প্রায় সর্ব্বস্বান্ত ও নিঃস্ব হ'য়ে পড়ে। র‍্যাফাইসেন এই দৃশ্য দেখে অভিভূত

হ'য়ে পড়েন। তিনি ভাবলেন—কৃষকেরা যদি নিজেদের পায়ে নিজেরা দাড়িয়ে সংঘবদ্ধ অবস্থায় প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে, তবে চিরকালই তাদের মহাজন ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নানারকম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে। প্রথমে তিনি একটি রুটির কারখানা স্থাপন করলেন। কিছুদিন পরই গবাদি ক্রয়-সংস্থা নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই গড়ে উঠেছিল ধনী ও উদার মতাবলম্বী লোকদের নিয়ে। কোন কৃষক এই দুই প্রতিষ্ঠানের কোনটিতেই সভ্য ছিলেন না। আন্‌হোসেন নামক স্থানে ১৮৬২ সালে তিনি সর্ব্বপ্রথম কৃষকদের নিয়ে সমবায় ঋণদান সমিতি গড়ে তুললেন। ধীর পদক্ষেপে সমিতি উন্নতির পথে এগিয়ে চল্‌ল। ক্রমে ক্রমে সমিতির ক্রমোন্নতির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তার ফলে ১৮৮০ সালের মধ্যে সমগ্র জার্ম্মাণীতে আন্‌হোসেনের আদর্শ নিয়ে এই রকম বহু সমিতি গ'ড়ে উঠ্‌ল।

র‍্যাফাইসেন প্রবর্ত্তিত সমিতির মূলনীতিগুলি এইরূপ :—

(১) সমিতির ঋণ পরিশোধের জন্য সভ্যদের অসীম দায়িত্ব :—

"সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এই আদর্শে র‍্যাফাইসেন বিশ্বাসী ছিলেন। সমিতি যদি সভ্যদের সুবিধার জন্য কর্জ্জ নেয় এবং সে ঋণ যদি সমিতির সম্মিলিত সম্পত্তি হ'তে শোধ না করা যায়, তবে সভ্যগণকে হারাহারি ভাবে সে ঋণ শোধ করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি প্রয়োজন হয়, তবে একজনের সম্পত্তি থেকেই সমিতির সমুদয় ঋণ আদায় করা যাবে। এই নিয়মের সুফল হ'চ্ছে এই যে সমিতির ওপর সমিতির মহাজনদের বিশ্বাস বেড়ে যায়। ফলে সমিতিতে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ঋণ গ্রহণকারী সভ্যদের ঋণের চাহিদা মেটানো যায়। তা ছাড়া সমিতির কর্ম্মধারার ওপর সভ্যদের দৃষ্টি থাকে। সৎ ও সাধু মানুষ হবার জন্য লোকের ইচ্ছা প্রবল হয়। গৃহীত ঋণের টাকা দিয়ে উৎপাদন বাড়াবার দিকে সভ্যদের ঝোঁক হয়।

(২) সমিতির ক্ষুদ্র এলাকা :—

র‍্যাফাইসেন মনে ক'রতেন যে অসীম দায়িত্ববিশিষ্ট সমিতি সুষ্ঠুভাবে চালাতে হ'লে সমিতির এলাকা খুব ছোট হ'তে হবে। গ্রামাঞ্চলে ৪০০ শত থেকে ২০০০ হাজার অধিবাসী নিয়ে এক একটি পৃথক ঋণদান সমিতি গঠন করতে হবে। ক্ষুদ্রায়তন এলাকার অনেক সুবিধা আছে। সভ্যেরা পরস্পরকে ভাল ভাবে জানতে পারে এবং একে অন্যের আর্থিক অবস্থা, কর্ম্মক্ষমতা, মনোবল, চরিত্র

ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক্ জান্‌বার সুবিধে পায়। পঞ্চায়েৎ কমিটিতে সৎস্বভাব ও কর্ম্মক্ষম সভ্যের নির্ব্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকে। ঋণ নিয়ে তা ঠিক কাজে লাগানো হ'চ্ছে কিনা সেটার ওপর সহজে লক্ষ্য রাখা যায়।

৩ (ক) শেয়ারের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ না করা :—র‍্যাফাইসেন সমিতিতে শেয়ার বিক্রী ক'রে মূলধন সংগ্রহ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তিনি ব'লতেন, "চাষীরা গরীব। তারা সমিতিতে আসে ঋণ নিয়ে তাদের অভাব মেটাতে। সেই লোকদের যদি ঘর থেকে টাকা বের ক'রতে হয় তবে তা উপহাসেরই নামান্তর মাত্র হবে।" সভ্যদের চাষের জমি, গবাদি পশু এবং কৃষি-যন্ত্রপাতিই আমানত ও ঋণ গ্রহণের জামিন হিসেবে যথেষ্ট মনে করা হ'ত। মূলধন সংগ্রহের সেটাই ছিল মাধ্যম। পরে অবশ্য আইনের তাগিদে শেয়ার বিক্রীর ব্যবস্থাও এইরূপ সমিতিতে প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল।

(খ) আমানত গ্রহণের মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি—র‍্যাফাইসেন সমিতিতে মোট মূলধনের শতকরা ৯০ ভাগই আসত আমানত হ'তে। সমিতিতে সাধারণ অবস্থার লোকেরা আমানত রাখত। আমানত যত অল্পই হোক্ না কেন, তা গ্রহণ করা হ'ত। সভ্য নয় এমন লোকও টাকা জমা রাখ্‌তে পারত। তবে সুদের ব্যাপারে একটু তফাৎ ছিল। সভ্যদের জমা রাখা টাকার ওপর সুদের হার একটু বেশী ছিল। উদ্দেশ্য ছিল যাতে সভ্যভুক্ত হয়নি এমন আমানতকারীরা সকলে সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হয়।

(৪) ঋণ-গ্রহণ :—আমানতের মাধ্যমে যে মূলধন সৃষ্টি হ'ত তা যদি সভ্যদের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ না হ'ত তবে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক অথবা অন্যান্য ব্যাঙ্ক থেকে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ গ্রহণ ক'রে সে চাহিদা মেটানো হ'ত।

(৫) লাভ-বণ্টন ও রিজার্ভ ফাণ্ড :—ঋণ আদান প্রদানের মাধ্যমে যে লাভ হ'ত, তা সমিতির নিজস্ব সম্পত্তি ব'লে মনে করা হ'ত। তা থেকে সভ্যদের মধ্যে কোন অংশই বণ্টন করা হ'ত না। পরে যখন সরকারী আইনের বলে লাভ বণ্টনের প্রথা প্রবর্তিত হ'ল তখনও লাভের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই রিজার্ভ-ফাণ্ডে রেখে দেওয়া হ'ত।

রিজার্ভ ফাণ্ড দু'রকমের ছিল। (ক) সাধারণ রিজার্ভ ফাণ্ড্ (খ) এন্‌ডাউমেণ্ট ফাণ্ড্। প্রথমোক্ত ফাণ্ড সমিতির কারবারে কোন লোকসান হ'লে তা পূরনের জন্য ব্যয়িত হোত। শেষোক্ত ফাণ্ড অবিভাজ্য ব'লে বিবেচিত হ'ত। সমিতি উঠে গেলেও সেই ফাণ্ড আলাদা ক'রে জমা রাখা হ'ত। সেই

এলাকায় অন্য কোন সমিতি পরে প্রতিষ্ঠিত হ'লে তাকে সে টাকা ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হ'ত।

(৬) ঋণদান-পদ্ধতি :—সভ্যদের তিন রকমের ঋণ দেওয়া হ'ত।

(ক) সাধারণ ঋণ (খ) চল্‌তী আমানতের ওপর ঋণ (গ) সম্পত্তি হস্তান্তর ঋণ।

(খ) অস্থাবর সম্পত্তি অথবা অন্য কোন প্রকার সম্পদ যথা সোনা রূপা ইত্যাদি বন্ধক রেখে ঋণ দেওয়া হ'ত। অনেক সময় ব্যক্তিগত জামিনে ঋণ দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত ছিল। মানুষের স্বাভাবিক সৎ প্রবৃত্তি ও নৈতিক গুণাবলীর ওপর র‍্যাফাইসেনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি ব'লতেন ঋণ তারাই পাবে যারা তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করবে এবং যারা মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী ও কর্ম্মকুশল হবে। তা হ'লেই দেশের সম্পদ্ বাড়বে, লোকের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি হবে।

(গ) চল্‌তি আমানতের ওপর ঋণ দেওয়ার পদ্ধতি সহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রাম্যসমিতিতে তার প্রচলন ছিল না।

(ঘ) সম্পত্তি হস্তান্তর ঋণদান পদ্ধতি একটু বিচিত্র ধরণের। অনেক সময় অবস্থার চাপে অনেক সভ্যকে তাদের জমি বিক্রী ক'রতে হত। ক্রেতারা সে অবস্থার সুযোগ নিয়ে অতি অল্পদামে সে' জমি কিনে নিত। সমবায় সমিতি এ' অবস্থায় সমিতির সভ্যদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। সভ্যদের মধ্যে যদি কোন ক্রেতা থাকে তবে সমিতি তাকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেয়, তা' দিয়ে সে অন্য সভ্যের জমি কিনে নিতে পারে। এর ফলে বিক্রেতা-সভ্য জমির উপযুক্ত মূল্য পায়।

(৭) পরিচালনা :—সমিতির সাধারণ সভায় কয়েকজন সদস্য নির্ব্বাচিত হন। তাঁরা একত্রে পঞ্চায়েৎ কমিটি গঠন করত। সমিতির সভ্যদের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের সমিতির কার্য্য পরিচালনা করার ব্যবস্থা ছিল। সমিতির জন্য যে কাজ তাঁদের করতে হ'ত। সেজন্য তাঁরা কোন পারিশ্রমিক বা বেতন গ্রহণ করতেন না।

সুল্‌জ প্রবর্ত্তিত সমিতি

এফ্, সুল্‌জ ছিলেন বিচারক এবং প্রাসিয়ান লোকসভার সদস্য। তিনি র‍্যাফাইসেনের সমসাময়িক ছিলেন। র‍্যাফাইসেনের মত তিনিও ভাবতেন যে সমবায় প্রথায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করলে জর্ম্মানদের অনেক সুবিধা হবে। কিন্তু তাঁর কর্ম্মপদ্ধতি শহরের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকায় তাঁর প্রবর্ত্তিত সমবায় সমিতি ও

র‍্যাফাইসেন প্রবর্ত্তিত সমবায় সমিতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। স্যুল্জের ব্যাঙ্কগুলি শহরাঞ্চলের উপযোগী ছিল। র‍্যাফাইসেন পরস্পর পরস্পরকে জানাশুনা ও চেনাশুনা, এক কথায় পারস্পরিক সাহায্যের ওপর জোর দিয়েছিলেন। শহরে এইভাবে পারস্পরিক সাহায্যের ও জানাশুনার সম্ভাবনা খুব কম। তাই র‍্যাফাইসেনের মত তিনি নৈতিক আন্দোলন চাননি। তিনি চেয়েছিলেন শ্রমিক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণীর শহর বাসীদের দারিদ্র্য ও তজ্জনিত অনিশ্চয়তা দূর করতে। তাই তিনি সুষ্ঠু পদ্ধতিতে ঐ সব লোকদের ঋণদানের জন্য ব্যগ্র ছিলেন। তিনি ১৮৫০ সালে তাঁর প্রথম ঋণদান সমিতি স্থাপন করেন। তাঁর প্রবর্ত্তিত সমিতিগুলি জনসাধারণের ব্যাঙ্ক (People's Banks) নামে পরিচিত। স্যুল্জ প্রতিষ্ঠিত সমবায় সমিতির সভ্য ছিল ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র শিল্পপতি এবং দক্ষ কারিগরশ্রেণী। এদের ঋণের চাহিদা মেটানোই ছিল সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। শিল্পে ও বাণিজ্যে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। স্বভাবতঃই এই সমিতির মূলধন ও আয়তন র‍্যাফাইসেন সমিতি হ'তে অনেক বেশী।

স্যুল্জ প্রবর্ত্তিত সমিতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নীচে দেওয়া হল :—

১। সমিতির এলাকা ছোট নয়। দূরবর্ত্তী স্থানের লোকও সমিতির সভ্য হ'তে পারে।

২। প্রত্যেক শেয়ার ৫ পাউণ্ড হ'তে ৫০ পাউণ্ডের মধ্যে বিক্রী হ'ত। সমিতির মূলধন বৃদ্ধি করাই ছিল শেয়ারের উচ্চমূল্য নির্ধারণের কারণ। তার ওপর, সভ্যদের আর্থিক অবস্থার তুলনায় শেয়ারের মূল্য খুব বেশী বলে মনে হ'ত না।

৩। র‍্যাফাইসেন সমিতির মত নিট্ লাভের সম্পূর্ণ অংশ রিজার্ভ ফাণ্ডে দেওয়া হ'ত না। নিট্ লাভের ২০ শতাংশই রিজার্ভ ফাণ্ডে আলাদা করে রাখা হ'ত।

৪। শেয়ারের ওপর উচ্চহারে ডিভিডেণ্ড দেওয়ার রীতি ছিল। অনেক ধণী ব্যক্তি ভাল সুদে টাকা খাটাবার লোভে সমিতির শেয়ার কিনত। সমিতিরও তাতে লাভ হ'ত, কারণ মূলধন বৃদ্ধি পেত।

৫। সমিতির কাজ চালাবার জন্য রীতিমত অফিস ব'সত এবং উপযুক্ত বেতন দিয়ে ভাল লোক নিয়োগ করা হ'ত এবং তারা ডিরেক্টর বোর্ডের সভ্য হ'ত।

৬। ডিরেক্টর বোর্ডের কাজ দেখাশুনা করবার জন্য সাধারণ সভা দুই তিন

জন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করত, যার নাম ছিল "পরিদর্শন পরিষদ" (Council of Supervision), প্রত্যেক সপ্তাহেই তাদের সভা বস্‌ত এবং তার জন্য তারা পারিশ্রমিক পেতেন। ব্যাঙ্কের যাবতীয় কাজই এই সমিতি ক'রত— যেমন আমানত গ্রহণ ও কর্জ্জ দাদন, হুণ্ডি ও চেক্ ভাঙ্গানো।

৯। সাধারণতঃ তিনমাসের জন্য ঋণ দেওয়া হ'ত এবং পরে প্রয়োজন মত তা বাড়ানো যেত। সাধারণভাবে ঋণ পরিশোধের বেলায় সভ্যদের একবারেই ঋণ শোধ দিতে হ'ত।

১০। ডিরেক্টরবোর্ড গঠিত হ'ত কেবলমাত্র বেতনভুক কর্ম্মচারীদের নিয়ে। তারা সাধারণ সভার দ্বারা নির্ব্বাচিত হ'ত তিন বৎসরের জন্য। পরিদর্শন পরিষদই তাদের কাজ তদারক করত।

সুল্জ প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক-এর অনেক দোষ ত্রুটি ছিল। গরীব লোকের এতে স্থান ছিল না। শেয়ারের মূল্য উচ্চহারে নির্ধারিত হওয়ায় সাধারণ লোক তা কিনতে পারত না। ঋণের টাকা সভ্যরা ভাল কাজে খাটাচ্ছে কিনা, তা দেখবার কোন নিয়ম ছিলনা। ডিরেক্টর বোর্ডের সভ্যরা ব্যবসায়ের ওপর কমিশন পেত। ফলে, তারা অনেক অসাধু ব্যবসায়ীদেরও টাকা দাদন ক'রত এবং অনেক সময় সে' টাকা আদায় হ'ত না।

ভারতের সমবায় আন্দোলনের উপর জার্ম্মাণীর সমবায় আন্দোলনের প্রভাব :—

আমরা আগে আলোচনা করেছি যে গত শতাব্দীর শেষ দশকে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের প্রাদেশিক সরকার মিঃ ফ্রেডারিক নিকলসন্ নামে এক উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারীকে ইয়োরোপে পাঠান। উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ ক'রে তিনি ভারতের কৃষকদের ঋণগ্রস্ততার সমস্যার কোন সমাধানের পথ বাত্‌লে দেবেন। তিনি ভারতে ফিরে এসে তার রিপোর্ট দাখিল করেন। তিনি বলেছিলেন ভারতবর্ষে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করতে হ'লে সমবায় সমিতির মাধ্যমেই তা' করতে হবে। আর এই সমিতিকে জার্ম্মাণীর র‍্যাফাইসেন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত ঋণদান সমিতির মূল আদর্শ নিয়েই গড়ে তুল্‌তে হবে। তাঁর এই সুপারিশের ভিত্তিতেই আমাদের দেশের সর্ব্বত্র হাজার হাজার ঋণদান সমিতি গড়ে উঠেছিল। সুল্জ প্রবর্ত্তিত সমিতিগুলি গরীবের উপযোগী হবে না বলে নিক্লসন্ তাঁর রিপোর্টে এইরূপ সমিতি প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করেননি।

ইটালীর সমবায় আন্দোলন

জার্ম্মাণীর মত ইটালীর সমবায় আন্দোলনও দু'জন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। তাঁরা হলেন লাউগি লুজাট্টি (Lougi Luzzatti) এবং ডাঃ উলেমবর্গ (Dr. Wollemborg). লুজাট্টি সুলজের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন এবং ডাঃ উলেমবর্গকে বলা হয় ইটালীর র‍্যাফাইসেন। এঁরা দুজনেই ইটালীতে ঋণদান ব্যাঙ্কের প্রবর্ত্তন করেন।

লুজাট্টি প্রবর্ত্তিত ব্যাঙ্কের বৈশিষ্ট্য

লুজাট্টি ইটালীর মন্ত্রী ছিলেন এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। সেজন্য তিনি যে সব ব্যাঙ্ক প্রবর্ত্তন করেন সেগুলি বেশ সাফল্যলাভ করে। এই সব ব্যাঙ্ককে ইটালীতে বলা হত "ব্যাঙ্কে পোপালারি" (Banche Popalari or People's Banks). মিলান সহরে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। যদিও তিনি জার্ম্মাণীর সুলজের অনুকরণে তাঁর ব্যাঙ্ক প্রবর্ত্তিত করেন তবুও কতকগুলি বিষয়ে তিনি সুলজ ব্যাঙ্কের নীতি মানেন নি। তার মধ্যে শেয়ারের দাম অল্প করা এবং তা দশটি কিস্তিতে নেওয়ার ব্যবস্থা করার প্রথা অন্যতম। তা ছাড়া এই সব ব্যাঙ্কের শেয়ার অনেক ক্ষেত্রে বাজারে বিক্রী হত ঐ শেয়ারের ২।৩ গুণ মূল্যে এবং লুজাট্টি তা অনুমোদন করতেন।

ভারতের পৌরব্যাঙ্কগুলির অনেক নীতিই সুলজ্‌ ও লুজাট্টি প্রবর্ত্তিত ব্যাঙ্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তার কতকগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। ম্যানেজিং কমিটির সভ্যরা কোন পারিশ্রমিক নিতেন না। প্রতি বৎসর কমিটির সভ্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সভ্যকে অবসর গ্রহণ করতে হত। বৎসরে অন্ততঃ একবার সাধারণ সভা ডাক্‌তে হত। ব্যক্তিগত জামিনে ঋণ দেওয়া হত। ঋণ বেশীদিনের জন্য দেওয়া হত না এবং তার মেয়াদ মাত্র একবার বাড়ান যেত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর লুজাট্টি ব্যাঙ্কের সংখ্যা অনেক কমে গেছে।

উলেমবর্গ প্রবর্ত্তিত ব্যাঙ্কের বৈশিষ্ট্য

লুজাট্টির মত ডাঃ উলেমবর্গও ইটালীর মন্ত্রী ছিলেন। লুজাট্টির ব্যাঙ্কে গরীবদের বড় একটা স্থান ছিল না। গরীব কৃষকের দুরবস্থা দেখে ডাঃ উলেমবর্গ র‍্যাফাইসেনের অনুপাতে গ্রাম্য ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। তাঁর ব্যাঙ্ক-গুলি ইটালীতে "ক্যাসে রুর‍্যালি" (Casse Rurali or Village Banks) নামে

পরিচিত। লরেজিয়া নামক স্থানে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। র‍্যাফাইসেন ব্যাঙ্কের মত তাঁর ব্যাঙ্কেও প্রথমে কোন শেয়ার গ্রহণের প্রথা ছিল না। পরে সরকারের চাপে শেয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় এবং প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০ পেন্স মাত্র হয়। এই সকল ব্যাঙ্কের সমস্ত লাভই রিজার্ভফণ্ডে জমা হত এবং তা অবিভাজ্য ছিল। মোটামুটিভাবে র‍্যাফাইসেন ব্যাঙ্কের সকল নীতিই উলেমবর্গ ব্যাঙ্কে মানা হত।

সমবায় চাষ

ইটালীর সমবায় আন্দোলনের আর এক দিক হল সমবায় প্রথায় চাষ। পো নদী এবং অন্যান্য নদী উপত্যকায় জমিগুলি জলে ভর্ত্তি থাকৃত। কয়েকটি শ্রমিক একত্রিত হয়ে শ্রমিক সমিতি স্থাপিত করে এবং ঐ সব জমি ইজারা নিতে আরম্ভ করে। তারা ঐ সব জমি হতে জল ছেঁচে ফেলে জমি পুনরুদ্ধার করে তাতে চাষ আরম্ভ করে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে র‍্যাভেনা নামক স্থানে প্রথম এইরূপ সমিতি স্থাপিত হয়। সাধারণতঃ দু'রকমের চাষ সমিতি গঠিত হয়। একটি যৌথ খামারের পদ্ধতিতে গঠিত এবং অন্যটির ক্ষেত্রে জমি কখনও বা কয়েক বছরের জন্য লীজ্ দেওয়া হত আবার কখনও বা একেবারে দিয়ে দেওয়া হত।

শ্রমিক সমবায় সমিতি

ইটালীর শ্রমিক সমবায় সমিতিগুলিও সমবায় আন্দোলনে নূতন অধ্যায় রচনা করেছে। কন্ট্রাক্টরদের অধীনে যে সব শ্রমিক কাজ করে তারাই পরে শ্রমিক সমিতি স্থাপন করে এবং তার মাধ্যমে রাস্তা মেরামতের কাজ, সেতু নির্ম্মাণ, খাল কাটা, জমি সংস্কার, জলসেচ ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজ গ্রহণ করে। সরকার হতে এ সব সমিতিকে নানারকম সাহায্য এবং কর্জ্জদানও করা হয়। এই সব সমিতিকে কতকগুলি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হত। কন্ট্রাক্টরদের যে জামানত দিতে হত তা সমিতিকে দিতে হত না। ১৫ দিন অন্তর কাজের গতি দেখে চুক্তির টাকা দেবার পদ্ধতি এই সব সমিতির ক্ষেত্রে চালু ছিল। ইটালীর শ্রমিক সমিতির কৃতকার্য্যতার মূল কারণ হচ্ছে যে এখানে চাহিদার চেয়ে বেশী শ্রমিক পাওয়া যেত এবং শ্রমিক সমবায়ের মাধ্যমে যে কাজ করান হত তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশ সস্তা ছিল। উত্তর ইটালীর র‍্যাভেনা জেলায় শতকরা ৮৫ ভাগ সরকারী কাজ এখন এই শ্রমিক সমবায় সমিতিগুলি করে থাকে।

ব্যবহৃত পরিভাষা

Agricultural Produce (Development & Warehousing) Corporation Act, 1956—কৃষি-উৎপন্ন শস্য (উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণ) কর্পোরেশন আইন, ১৯৫৬।

Agricultural Finance Sub-Committee—কৃষিবিষয়ক অর্থ সরবরাহ উপ-কমিটি।

Agricultural Credit Corporation—কৃষি-ঋণ কর্পোরেশন।

Agricultural Credit Stabilisation Fund—কৃষিঋণ স্থিতিশীল তহবিল।

All-India Rural Credit Survey Committee—নিখিল ভারত পল্লী-ঋণ সমীক্ষা-কমিটি।

All-India Warehousing Corporation—নিখিল ভারত পণ্য সংরক্ষণ কর্পোরেশন।

Better Farming, better businces & better living—উন্নততর চাষ ব্যবস্থা, ব্যবসায় ও জীবনধারণ।

Central Banking Enquiry Committee—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি।

Debenture—তমসুকের মত ঋণপত্র।

Economic Depression—অর্থনৈতিক মন্দা।

Federal Structure—যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো।

Guarantee—পরিশোধের আশ্বাস।

Housing-Socity—বাসগৃহ সংস্থান সমিতি।

Joint stock Bank—যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক।

Joint-stock Company—যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান।

Land Improvement Loans Act—জমি উন্নয়ন বিষয়ক ঋণ আইন।

National Co-operative Development Fund—জাতীয় সমবায় উন্নয়ন তহবিল।

National Co-operative Development & Warehousing Board—জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও পণ্য সংরক্ষণ বোর্ড।

National Agricultural credit (Long-term operation) Fund—জাতীয় কৃষি-ঋণ (দীর্ঘ মেয়াদী) তহবিল।
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund—জাতীয় কৃষি-ঋণ (স্থিতিশীল) তহবিল।
National Warehousing Development Fund—জাতীয় পণ্য সংরক্ষণোন্নয়ন তহবিল।
National Development Council—জাতীয় উন্নয়ন সংস্থা।
National Co-operative Union—জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন।
Productive Debt—উৎপাদনশীল ঋণ।
Rural Banking Enquiry Committee—পল্লী ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি।
Royal Commission on Agriculture—রাজকীয় কৃষি কমিশন।
Registrar, Conference—নিয়ামকদের সম্মেলন।
Relief & Guarantee Fund—সাহায্য ও প্রতিশ্রুতি তহবিল।
Standing Advisory Committee—স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটি।
State Warehousing Corporation—প্রাদেশিক পণ্যসংরক্ষণ কর্পোরেশন।
Special Bad Debt Reserve—অনাদায়ী ঋণ বিষয়ক বিশেষ সংরক্ষণ তহবিল।
State Co-operative Union—রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন।
Special Bad debt Reserve—অনাদায়ী ঋণ বিষয়ক বিশেষ তহবিল।
Urban Bank—পৌর ঋণ-দান সমিতি।
U. N. O.—সম্মিলিত রাষ্ট্র পুঞ্জ।
Warehousing Corporation—পণ্য সংরক্ষণাগার কর্পোরেশন।
Warehouse—পণ্য সংরক্ষণাগার।
Welfare State—জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র।
Working Group—কার্য্য বিশেষজ্ঞ সংস্থা।